Sayed Ahmad
🟢 জরুরী ওয়াজাহাত

আকিদার মর্মকথা বইটিতে কিছু ভুল থাকা ও আমার দায়বদ্ধতা

সদ্য প্রকাশিত আকিদার মর্মকথা বইটির মূল হচ্ছে উর্দু ভাষায় লিখিত "সামরাতুল আকাইদ", যা আমি আরো অনেক আগেই দেখেছি। তখনই কিতাবটি বিভিন্নভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, বিশেষত কুরআন হাদিস-ভিত্তিক হওয়াতে খুব ভালো লেগেছিল।

দুই মাস আগে চেতনা প্রকাশন এর পক্ষ থেকে ফেসবুকে বিষয়ভিত্তিক ভালো লেখক প্রিয় এক ভাই আমার সাথে যোগাযোগ করে বলেছিলেন, বইটিতে ভূমিকা স্বরূপ কিছু লিখে দেওয়ার জন্য।

আমি বলেছিলাম, আপনি ভালো লেখক, আপনিও তো লিখতে পারেন। আর আমি তো বড় কেউ নই!

সাথে আরও বলেছিলাম, কিছু লেখার জন্য তো বইটি দেখতে হবে, এত বড় বই দেখা সম্ভব না। আর আপনি ছাড়া অন্য কেউ এটা বললে সাথে সাথেই আমি তাকে না করে দিতাম!

কিন্তু তিনি অনেকটা নাছোড় বান্দা। অর্থাৎ আমাকে লিখতেই হবে। তাই কিছুদিন পর বইটির প্রিন্ট কপি আমার কাছে পৌঁছানো হলো।

কিন্তু নানা ব্যস্ততার কারণে আমার কাছে একমাস থাকার পরও দেখার সুযোগ হয়নি এবং ভুমিকাটাও লিখতে পারিনি।

তাই ভূমিকা না দেওয়ার নিয়ত করেছিলাম। কিন্তু এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরো একাধিক ব্যক্তির অনুরোধ-আবদার যোগ হলো যে, লেখাটা দেওয়ার জন্য।

এদিকে মূল কিতাব যেহেতু আমি আগেই দেখেছিলাম এবং আমাদের হানাফি ফিকহের পরিচিত ভালো লেখক মুহতারাম আব্দুল্লাহ আল মামুন সাহেব হাফিযাহুল্লাহ সম্পাদনা করেছেন দেখে এর উপর আস্থা রেখে সংক্ষিপ্তাকারে ভূমিকা দিয়ে দিলাম।

আর ভূমিকার একেবারে শেষে দায় এড়ানোর জন্য লিখে দিয়েছি, "এই কিতাবের মূলটা আমি আগে দেখেছি। এতে বড়দের অভিমত রয়েছে...."

সুতরাং উক্ত বইয়ে ভুল থাকলে, তা স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে ভূমিকা লেখক এর উপর আসার কথা না।

তবে হাঁ, আমি একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করি যে, এভাবে কোন বই (অনুবাদ হলেও) না দেখে ভূমিকা দেওয়া উচিত না এবং আমানতদারিতা না। আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করুন এবং যারা আমার উপর আস্থা রেখে মনোক্ষুন্ন হয়েছেন, তাদের কাছেও ক্ষমা চাচ্ছি। এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলাম এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হলাম।

প্রকাশক বোরহান আশরাফি ভাই ভালো মানুষ। তবে তিনি এই অঙ্গনের জটিলতা, আমানতদারিতা ও দায়বদ্ধতা মনে হয় বুঝতে পারেননি। আশা করি তিনিও ভবিষ্যতে আরো সতর্ক হবেন এবং ভুলগুলো তাদের পেজ থেকে সংশোধনী দিয়ে তুলে ধরবেন।

বলাবাহুল্য, পুরো বইটিতে বা বড় অংশে ভুল রয়েছে আমি দাবী করছি না। আর এটা সাধারণত কোন বইয়ে হয় না।

উল্লেখ্য, এক সপ্তাহ যাবত আমি ফেসবুক থেকে দূরে ছিলাম। তাই বিষয়টা ওয়াজাহাত করতে দেরি হয়েছে।

🟢 Abdullah Al Mamun

'আকিদার মর্মকথা' বই ও দুটি বিষয়ে ওয়াজাহাত।

চেতনা প্রকাশন - Chetona Prokashon থেকে সদ্য প্রকাশিত 'আকিদার মর্মকথা' বইটি বেশ অসাধারণ ও চমৎকার বিষয়বস্তুর আলোকে সাজানো। মূল বইটিতে বলতে গেলে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মৌলিক আকিদার সমাবেশ ঘটেছে কুরআন ও সুন্নাহর দলিলের আলোকে। যারা মূল বইটি আদ্যোপান্ত ভাল করে পড়েননি তারা বুঝবেনা এতে কত উপকারী বিষয় রয়েছে। বইটির লিখক মাওলানা সামীরুদ্দীন

কাসেমী হাফি. একজন বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন। হাদীস, ফিকহ, ভুগোল, ফালাকিয়াত, ফাদ্বাহিয়াত শাস্ত্রে তাঁর কিছু অনবদ্য রচনা ও খেদমত রয়েছে।

সর্বোপরি মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। সম্প্রতি বইটি অনুবাদ হয়ে বের হওয়ার পর এই বইতে দুইটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ফলে একদল সাধারণ পাঠক যারা ইতিমধ্যে বইটি ক্রয় করেছেন তাদের কেউ কেউ আতংকিত ও হতাশ হয়ে বলছে, অমুকের উপর ভরসা করে বইটি কিনেছিলা!!! অর্ডার দিয়েছিলাম কিংবা সাজেস্ট করেছিলাম!

মূল বইটি ভাল করে না পড়েই এধরনের আপত্তি ও হতাশাবাক্য উচ্চারণ ঠিক নয়। ভুল যা হবে তা অবশ্যই শুধরে নেওয়ার মনোভাব থাকতে হবে আর যেস্থানে ভুল নেই সেটিকে জোর করে কোন সম্ভাবনা ও কন্সপিরেসি থেকে ভুল বলাটাও ঠিক নয় সুতরাং এমন প্রমান হলে অভিযোগকারীদেরও উচিৎ তা থেকে রুজু করা। এবং কোন ক্ষোভ থেকে অভিযোগ করার ধরণ একরকম হয় আবার সংশোধনের উদ্দেশ্যে আপত্তি করার ধরণ ভিন্ন হয়। সেক্ষেত্রে ৫৮২ পৃষ্ঠা ব্যাপী এত চমৎকার বইয়ের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরে এই এই স্থানে এই এই ভুল হয়েছে যা সংশোধনযোগ্য ইত্যাদি বলে লিখলে সাধারণ পাঠক যারা এর থেকে ব্যাপক উপকৃত হতে পারে তাদের জন্য বিষয়টি ভীতিকর হতনা।

যেহেতু বইয়ের সম্পাদনায় অধমের নাম জুড়ে আছে তাই ওয়াজাহাত করা জরুরী মনে করে এই লিখাটি লিখা হচ্ছে,

সমস্যা নং (১) : রহমান আরশে ইস্তিওয়া করেছেন। এখানে ইস্তিওয়ার অর্থ 'সমাসীন' লিখা হয়েছে।

সমস্যা নং (২): এই বই পড়ে একজন দ্বীনি ভাই এই দাবী করেছেন, বইটি পড়লে বুঝা যায় আল্লাহ আরশে সমাসীন আছেন এটিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা!

প্রথম সমস্যার জবাব: অনুবাদক মহোদয় মূল বই থেকে ইস্তিওয়ার অনুবাদ করেছিলেন 'সমাসীন'। হয়ত তিনি কুরআনের সচারাচর অনুবাদে সমাসীন পেয়েই এই অনুবাদ করেছেন। কিন্তু কিতাবটির মূল উর্দু নাম হচ্ছে 'সামারাতুল আকায়েদ', আর এই মূল উর্দুতে মূল লিখক উর্দুতেও ইস্তিওয়ার কোন অনুবাদ করেননি। বরং তিনি উর্দুতে এর অনুবাদ এভাবে করেছেন, 'ফের উসনে আরশ পার ইস্তিওয়া ফারমায়া' অর্থাৎ অতঃপর তিনি আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন। এবং তিনি এই বিষয়ে ৭টি আয়াত নিয়ে এসেছেন।

কিন্তু যখন আমি দেখলাম অনুবাদে এটিকে সমাসীন অর্থ করা হয়েছে তখন আমি 'সমাসীন' অংশ কেটে দিলাম। আর যিনি প্রকাশকের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছিলেন তাকে বারবার বলেও দিয়েছি এই শব্দে সমস্যা রয়েছে উপরন্তু মূল লেখকও এর অনুবাদ করেননি। তাই এগুলো কেটে দিতে হবে। উনি বলেছেন জি বুঝেছি। পরবর্তীতে দেখলাম 'আকিদার মর্মকথা' বইয়ের ৩৯১-৩৯২ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ৭ টি আয়াতের প্রথম ৬টি তেই

ইস্তিওয়ার অর্থ ইস্তিওয়াই আছে স্রেফ ধারাবাহিক ৭ম আয়াতেই কেবল ইস্তিওয়ার অর্থ সমাসীন করেছেন।

এরপর ৭ম আয়াতের একদম পরপরই বলা হয়েছে 'এই ৭টি আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলা আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন। '

সুপ্রিয় পাঠক, এতে বুঝাই যাচ্ছে, এডিটর সাহেব হয়ত ভুলে শুধু শেষোক্ত আয়াতের অনুবাদ কেটে ইস্তিওয়া শব্দটি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি। (আল্লাহু আ'লাম)

হ্যাঁ, ৪০০ নং পৃষ্ঠায় এই ভুলটির আবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। যেমন সেখানে বলা হয়েছে, ইস্তিওয়া তথা সমাসীনের অর্থ জানা আছে ......। এখানেও মূল লেখক এমন অর্থ করেননি বরং আগের মতই বিষয়টি পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। অনুবাদকের সাথে ইতিপূর্বে কথা বলে যদ্দুর বুঝেছি, তিনিও ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থে যা বলা হয় সেটিই লিখেছেন। এক্ষেত্রে আকিদার মারপ্যাঁচ সম্পর্কে তখন তাঁর তেমন ধারণা ছিলনা।

২য়ত সমস্যার জবাব: আল্লাহ কোথায় এই শিরোনামের শুরুতেই লিখক মহোদয় এব্যাপারে তাঁর অবস্থান তুলে ধরেন। মূল শিরোনাম শুরু করেই তিনি বলেন,

আল্লাহ তাআলার সত্তা সম্পর্কে চারটি কথা স্মরণ রাখা জরুরি। যথা:

১. আল্লাহ তাআলার সত্তা হলো ওয়াজিবুল ওজুদ তথা অত্যাবশকীয় সত্তা। তিনি চিরদিন ছিলেন এবং চিরদিন থাকবেন। এজন্য তাঁর গুনা বলতেও কোনপ্রকার ধ্বংস নেই।
২. তিনি সর্বপ্রকার দিক হতে পবিত্র। তিনি কোন দিকে নেই। অর্থাৎ ওপর-নিচ ডান-বাম কোন দিকেই নেই।
৩.তিনি আকার-আকৃতি থেকে পবিত্র। অর্থাৎ মানুষ ও বিভিন্ন বস্তুর যেমন বিভিন্ন আকৃতি রয়েছে, আল্লাহ তাআলার মধ্যে তা নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা তো নিজেই আকার-আকৃতির সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তাঁর আকার-আকৃতি কিভাবে হবে?
৪. আল্লাহ তায়ালার মত কোন বস্তু নেই। না গুনাবলীর ক্ষেত্রে তাঁর কোন উপমা আছে আর না সত্তাগতভাবে তাঁর কোন উপমা আছে।...........

(আকিদার মর্মকথা পৃ.৩৮৭- অষ্টাবিংশ অধ্যায়)

এই আলোচনা দিয়েই তিনি শুরু করেছেন। তাহলে এখান থেকে লেখকের আকীদা কি আর পাঠকের আকিদা কেমন হবে তা প্রাথমিক অবস্থাতেই তিনি বলে দিয়েছেন।

কিন্তু এই আলোচনার পরে তিনি বলেন,

আল্লাহ তাআলা কোথায়! এ সম্পর্কে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। আর এর কারণ হলো, এ সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস রয়েছে। সুতরাং কোন একটিকে নির্দিষ্ট করা কঠিন। এজন্য এ ব্যাপারে ৬ টি দল হয়ে গেছে। যথা: (এরপর তিনি দলগুলোর আকিদা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর উল্লেখিত ১ম সমস্যার

বিষয়ে আলোচনা এসেছে ২য় দলের ব্যাপারে। এখানে লেখকের ও পাঠকের কোন আকিদার কথা উল্লেখ করা হচ্ছেনা।)

(আকিদার মর্মকথা পৃ.৩৮৮-৩৮৯)

এই ধারবাহিকতায় লেখক মহোদয় হাফি. ৬ টি দলের মধ্যে ষষ্ঠ ও সর্বশেষ দলের আকিদা এ ব্যাপারে কি তার উল্লেখ করেছেন। সেই দলের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, তাদের নিকট ইমাম মালেকের এই বক্তব্যটি খুবই প্রসিদ্ধ। বক্তব্যটি হলো-................।
(আকিদার মর্মকথা পৃ.৩৯৮)

এই বক্তব্যটি ইমাম মালেক থেকে ইমাম বাইহাকি রহ. তাঁর 'আল এতেকাদ ওয়াল হিদায়াহ ইলা সাবিলির রাশাদ' পৃ.১১৯-এ উল্লেখ করেছেন। এতে একটি বিতর্কিত বিষয় রয়েছে, আর তা হচ্ছে- ইস্তিওয়া তো আর অজানা নয়!

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এখানে বিষয়টি ভাল করে লক্ষ্য করুন, প্রথমত লেখক মহোদয় এ ব্যাপারে বিভিন্ন দলের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করার সুবাদে ৬ নং দলের বক্তব্য স্রেফ নকল ও অনুবাদ করেছেন, আমাদের আকিদা এমন হওয়া উচিত এরুপ বলেননি। কেননা তিনি এখানে স্পষ্ট করেই বলেছেন, "তাদের নিকট.... "। বরং আমাদের আকিদা এক্ষেত্রে কিরুপ হবে তা তিনি প্রথম ৪ টি পয়েন্টেই নিয়ে এসেছেন।

২য়ত, এই দলটির আলোচনা শেষে লেখক হাফি. সুরা আলে ইমরানের ৭ নং আয়াত এনে বলেন,

এই আয়াতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে- মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) বাক্যের পেছনে না পড়ার। বরং এমতাবস্থায় এ সকল আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনা এবং চুপ থাকার। এজন্য আমরা ইস্তিওয়ার বিশ্লেষণের পেছনে না পড়ে চুপ থাকি।

(আকিদার মর্মকথা পৃ.৩৯৯)

এই কথা বলার পর তিনি শরহে ফিকহে আকবার কিতাবের হাওয়ালায় ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে একটি বর্ণনা আনেন। যার নিচে অধম কর্তৃক টীকা সংযুক্ত করা হয়েছে।

সেখানে বলা হয়েছে,

এ সকল বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের প্রসিদ্ধ ও অধিকাংশ আলেমরা 'তাফবিজ' করেন। অর্থাৎ এর আসল অর্থ ও প্রকৃতি মহান আল্লাহই ভাল জানেন।

(আকিদার মর্মকথা পৃ.৪০০ টীকা নং ৭১৩)

এখানেও তো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মূল আকীদা কি হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর লেখক মহোদয় আরও সুস্পষ্ট ও খোলাসা করে এই সমস্যার নিরসনে লিখেছেন। তিনি বলেন,

ইমাম গাজালি রহ. বলেন, ইস্তিওয়া অর্থ আরশে স্থির হওয়া কিংবা বসা নয়। বরং এর অর্থ হলো, আরশের হেফাজত করেছে, আরশকে জব্দ করেছে, আরশকে বাকি রেখেছে। কারন ইস্তিওয়ার........... (এসব অর্থ করলে) এতে আল্লাহ তাআলার আকৃতি প্রকৃতির বিষয় আসেনা। সুতরাং পূর্বের অর্থের মধ্যে আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে তর্ক বির্তক করার প্রয়োজন নেই। (কাওয়াইদুল আকাইদ পৃ.১৬৭)

(আকিদার মর্মকথা পৃ.৪০০-৪০১)

এই বক্তব্যের পরপরই তিনি ইমাম তহাবির অভিমত আনেন। তিনি বলেন,

ইমাম তহাবি রহ. এই মত অবলম্বন করেছেন - আরশ এবং কুরসি সত্য। আল্লাহ তাআলা আরশ ও কুরসি থেকে অমুখাপেক্ষী।

এই ছয় দল ও চারজন মনীষীর অভিমত তুলে ধরলাম। এখন আপনারাই ভেবে দেখুন।

(আকিদার মর্মকথা পৃ.৪০১)

এই বক্তব্য গুলো থেকে কি প্রতীয়মান হচ্ছে? ইমাম গাজালি ও তহাবির বক্তব্য দিয়ে তো উনি অনেকটাই স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন আরশে ইস্তিওয়ার অর্থ কি?

শুধু কি তাই? এব্যাপারে ২য় দলের বক্তব্য উল্লেখ করে তিনি নিজ থেকে এইভাবে সংযুক্ত করেছেন যে,

'ইস্তিওয়া' শব্দটি আরবী শব্দ। যার অর্থ হলো সোজা হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া, কর্তৃত্ব পাওয়া। আবার কোন কোন সময় তার অর্থ বসাও হয়। এই শব্দটি অস্পষ্ট একটি শব্দ। এজন্য আল্লাহ তাআলার জন্য তার কোন অর্থ নির্ধারণ করা কঠিন। কেননা তিনি সোজা হয়ে দাড়ানো এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে পবিত্র (অনুরুপভাবে তিনি বসা ও স্থানান্তরিত হওয়া থেকেও পবিত্র)। তিনি সর্বপ্রকার আকার-আকৃতি থেকেও পবিত্র।

(আকিদার মর্মকথা পৃ.৩৯২)

এখানে ইস্তিওয়ার এত সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার পরেও তো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বরং ৩য় দলের বক্তব্যকেও তো তিনি এভাবেই উপস্থাপন করেছেন। এবং উপস্থাপনার ভঙ্গিতে তিনি এই বক্তব্যের দিকে ঝুকেছেন বলে বুঝা যায়।

তিনি বলেন,

তৃতীয় দলের মত হলো, আল্লাহ তাআলা এ জগতে তাঁর জ্ঞান, শক্তি ও দৃষ্টিগতভাবে বিরাজমান। সত্তাগতভাবে জগতে

বিরাজমান নয়। বাকি তিনি কোথায়- এ ব্যাপারে তারা চুপ। তাদের দলিল হলো তারা বলে যে, এ জগৎ তো আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। তাহলে তিনি এ জগতে কিভাবে বিদ্যমান থাকবে। দ্বিতীয় কথা হলও, এ জগৎ ধ্বংসশীল। সুতরাং যদি আল্লাহ তাআলার সত্তা এ জগতে বিরাজমান হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলার সত্তাও ধ্বংসশীল হয়ে যায়।

(আকিদার মর্মকথা পৃ.৩৯৩-৩৯৪)

তবে বইটিতে আরও স্পষ্ট করে আমি এ ব্যাপারে একটি টীকা লিখেছিলাম। যেটি বারাবার এডিটর সাহেবকে আমি স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, এটা অবশ্যই সংযুক্ত করবেন। কিন্তু তিনি কোন কারণে সংযুক্ত করেননি। মূল বইয়ে আমি সে টীকা না দেখতে পেয়ে তাকে নক করেছিলেম, কোন রেসপন্স পাইনি। আর বর্তমানে তিনি বেশ অসুস্থ, তখনও নাকি অনেক অসুস্থ ছিলেন। আল্লাহ তাকে শিফায়ে কামেলা আজেলা নসীব করুন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের জন্য আমি ঐ টীকার কিয়দাংশ এখানে উল্লেখ করে দিচ্ছি,

এক্ষেত্রে (আল্লাহ কোথায় এ বিষয়ে) আলী রাদি. ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অন্যান্য ইমামগন থেকে বর্ণিত বক্তব্যই সবচেয়ে নিরাপদ আক্বীদাহ। আর তা হচ্ছে, 'সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টির পূর্বে যেমনিভাবে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা কোনপ্রকার স্থান ছাড়াই বিদ্যমান ছিলেন ঠিক তেমনিভাবে সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টির পরেও তিনি কোন প্রকার স্থান ছাড়াই আগের মতই বিদ্যমান রয়েছেন।'

আলী রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বলেন,

كان- الله- ولا مكان، وهو الأن على ما- عليه- كان اهـ. أي بلا مكان.

'আল্লাহ ছিলেন কোন (তখন যেমন কোন) স্থান ছিলনা। এবং এখনও তিনি আছেন আগে যেখানে ছিলেন। (অর্থাৎ কোন সৃষ্ট স্থানেই নেই)

[আল ফারকু বাইনাল ফিরাক্ক,বাগদাদীঃ ৩৩৩]

তিনি রাদি. আরো বলেন-

إن الله تعالى خلق العرش إظهارًا لقدرته لا مكانا لذاته

" নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'লা আরশ সৃষ্টি করেছেন তার ক্ষমতা প্রকাশের জন্য। তার নিজের বাসস্থানের জন্য নয়।"[প্রাগুক্ত]

তিনি রাদি. আরো বলেন-

من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود

"যে ভাবে আমাদের ইলাহ কোন স্থানে সীমাবদ্ধ সে একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য স্রষ্টার ব্যাপারে অজ্ঞ!"

[হিলইয়াতুল আউলিয়া-আলী রাদি. এর তরজমা ১/৭৩]

তাবেয়ী ইমাম যাইনুল আবেদীন (৯৪ হি.) রহ. বলেন,
أنت الله الذي لا يحويك مكان
আপনিই আল্লাহ যিনি কোন স্থান দ্বারা পরিসীমিত নয়।

[ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, যাবেদী ৪/৩৮০]

তিনি আরো বলেন,

أنت الله الذي لا تحد فتكون محدودا

আপনার এমন কোন সীমারেখা নেই যাতে আপনি সীমিত।

[প্রাগুক্ত]

ইমাম জাফর আস সাদেক (১৪৮ হি.) রহ. বলেন,

من زعم أن الله في شيء، أو من شيء، أو على شيء فقد أشرك. إذ لو
كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو
كان من شيء لكان محدثا- أي مخلوقا

"যেই ব্যক্তি ভাবে- আল্লাহ কোন কিছুতে, কোন কিছু থেকে,
অথবা কোন কিছুর উপর সে শিরক করল! যদি তিনি কোন
কিছুর উপর থাকেন তাহলে ঐ জিনিস তাকে বহন করছে!!, আর
যদি কোন কিছুর মাঝে থাকেন তাহলে তিনি পরিসীমিত!, এবং

যদি তিনি কোন কিছু থেকে হয় তাহলে তাহলে তিনি নশ্বর (তথা সৃষ্টি)!"

[রিসালাতুল কুশাইরিয়াহ পৃ.৬]

ইমাম আবু হানীফাহ (১৫০হি.) রহ. বলেন,

ونقر بأن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه، وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين، ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا"

"আমরা এই বিশ্বাস স্থাপন করি যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা আরশের উপর ইস্তেওয়া করেছেন আরশের প্রতি কোন প্রয়োজন ও স্থির হওয়া ছাড়াই।..... যদি তিনি আরশে বসা ও স্থির হওয়ার মুখাপেক্ষিই হতেন তাহলে আল্লাহ আরশ সৃষ্টির পূর্বে কোথায় ছিলেন?? আল্লাহ তা'লা এসব থেকে অনেক অনেক উর্ধ্বে। "

[কিতাবুল ওয়াসিয়্যাহঃ২ -শায়খ যাহেদ আল কাওসারীর টীকাযুক্ত]

ইমাম আবূ হানীফাকে জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহ কোথায়? তিনি বললেন -

كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق، وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء

"(যেমনিভাবে) আল্লাহ তা'লা সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার আগে কোন স্থানে ছিলেন না (তেমনিভাবে সৃষ্টি করার পরেও কোন সৃষ্ট স্থানে নেই)। অনুরূপ আল্লাহ তা'লা ছিলেন কিন্তু তিনি কোথাও ছিলেন না (অর্থাৎ স্থানে ছিলেন না), কোন সৃষ্টিতে ছিলেন না এবং কোন কিছুতেই ছিলেন না। কেননা সব কিছু তো তিনিই সৃষ্টি করেছেন।"

[আল ফিক্বহুল আবসাত্ব, আল্লামা কাওসারী রহ. এর টীকাযুক্ত পৃ.২৫; আদ দালীলুল ক্বউইম, আব্দুল্লাহ আল হারারী আল হাবশীঃ৫৪]

ইমাম সাহেব রহ. আরো বলেন-

ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة حق

জান্নাতীদের আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়ার বিষয় সত্য। তবে সৃষ্টির কোনরুপ সাদৃশ্য, ধরণ ও দিক ব্যতিতই।

[আল ওয়াসিয়্যাহ পৃ.৪; শরহুল ফিক্বহিল আকবার পৃ.১৩৮]

ইমাম শাফেয়ী (২০৪ হি.) রহ. বলেন,

إنه تعالى كان ولا مكان فخلق المكان وهو على صفة الأزلية كما كان قبل خلقه المكان لا يجوز عليه التغيير في ذاته ولا التبديل في صفاته

" তিনি আল্লাহ ছিলেন কিন্তু কোন স্থান ছিলনা। অতঃপর তিনি স্থান সৃষ্টি করলেন, এতেও তিনি তার অনাদি গুনেই গুনান্বিত যেমনটি স্থান সৃষ্টি করার পূর্বে ছিলেন (অর্থাৎ তিনি কোন স্থান গ্রহন করেন নি)। আল্লাহর সত্বা ও গুনের কোন পরিবর্তন জায়েয নেই। (অর্থাৎ স্থান সৃষ্টির আগে তিনি স্থানহীন ছিলেন এখন স্থান সৃষ্টি করে তিনি কোন স্থানে দাড়িয়ে বা বসে নেই, নতুবা তা আল্লাহর যাত ও সিফাতকে তাগয়ীর ও তাবদীল তথা পরিবর্তন যোগ্য ধরা হবে!!)
[ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ২/২৪]

ইমাম আবুল হাসান আল আশ'আরী (৩২৪ হি.) রহ. বলেন,

" كان الله ولا مكان فخلق العرش والكرسي ولم يحتج إلى مكان، وهو بعد خلق المكان كما كان قبل خلقه "

"আল্লাহ ছিলেন কোন স্থান ছিলনা। অতঃপর তিনি আরশ, কুরসীকে সৃষ্টি করলেন স্থান পাওয়ার কোন প্রয়োজন ছাড়াই। তিনি স্থান সৃষ্টি করার পূর্বে যেখানে ছিলেন স্থান সৃষ্টি করার পরেও সেখানেই আছেন।

[তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারি, ইবনু আসাকির পৃ.১৫০]

ইমাম আবু মানসূর আল মাতূরীদি (৩৩৩হি.) রহ. বলেন,

إن الله سبحانه كان ولا مكان، وجائز ارتفاع الأمكنة وبقاؤه على ما كان، فهو على ما كان، وكان على ما عليه الان، جل عن التغير والزوال والاستحالة.

"আল্লাহ আগে থেকে স্থান ছাড়াই ছিলেন। আল্লাহকে সুউচ্চ স্থানে আসীন করা বৈধ। তবে এই ভেবেই যে, তিনি আগে যেখানে ছিলেন এখনও সেখানেই। আর আগে যা ছিল তা এখনও আছে। তিনি সকল পরিবর্তন, রুপান্তর, বিকাশ ও নিঃশেষ গুনাবলী থেকে অতি পবিত্র।"

[কিতাবুত তাওহীদ পৃ.৬৯]

ইমাম আবু সুলাইমান আল খাত্তাবী (৩৮৮হি.) রহ. বলেন,

وليس معنى قول المسلمين إن الله على العرش هو أنه تعالى مماس له أو متمكن فيه أو متحيز في جهة من جهاته، لكنه بائن من جميع خلقه، وإنما هو خبر جاء به التوقيف فقلنا به ونفينا عنه التكييف إذ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ).

"আর মুসলমানদের- 'আল্লাহ আরশের উপর' এই কথা অর্থ এই না যে, তিনি আল্লাহ আরশকে স্পর্শ করেছেন কিংবা এর উপর স্থান গেড়েছেন অথবা আরশের কোন দিক দ্বারা তিনি বেষ্টিত। বরং তিনি সমগ্র সৃষ্টির সীমানা থেকে পৃথক রয়েছেন। মূলত এই বিষয়ে চুপ থাকা শর্তে কুরআন ও হাদীসে সংবাদ এসেছে। তাই আমরা এটি বলে থাকি আর এর ধরণ কে নাকোচ করি। যেহেতু

আল্লাহ বলেন- " তিনি কারো মত না, অথচ তিনি শুনেন ও দেখেন।"

[মা'আলিমুস সুনানঃ২/১৪৭]

ইমাম আবু আব্দিল্লাহ আল হুলাইমী (৪০৩হি.) রহ. বলেন,

ومنهم من أجاز أن يكون على العرش كما يكون الملك على سريره، وكان ذلك في وجوب اسم الكفر لقائله كالتعطيل والتشريك.

"আর তাদের কেউ কেউ আল্লাহ কে আরশের উপর উপবিষ্ট বলে থাকে যেমন বাদশাহ তার সিংহাসনে বসে থাকেন। এই ধরনের কথা যে বলে তার জন্য কুফর সাব্যস্ত করা ওয়াজিব যেমনটি আল্লাহর গুন অস্বীকার কারীদের ও আল্লাহর শরীক স্থাপন কারীদের করা হয়। "

[শুয়াবুল ঈমানঃ১/১০৩; আল মিনহাজ ফি শুয়াবিল ঈমানঃ ১/১৮৪]

ইমাম ক্বাযী আবু বকর আল বাক্বিল্লানী (৪০৩হি.) রহ. বলেন,

ولا نقول إن العرش له- أي الله- قرار ولا مكان، لأن الله تعالى كان ولا مكان، فلما خلق المكان لم يتغير عما كان

"আর আমরা এটাও বলিনা যে, আরশে আল্লাহ স্থির হন বা জায়গা গাড়েন। কেননা আল্লাহ সৃষ্টির আগেও ছিলেন কিন্তু

তখন কোন স্থান ছিলনা, অতঃপর স্থান সৃষ্টির পর আল্লাহর আগের থাকার মাঝে কোন পরিবর্তন হয়নি।"

[আল ইনসাফ ফীমা ইয়াজিবু ই'তেক্বাদুহু ওয়ালা ইয়াজুযুল জাহলু বিহি পৃ. ৬৫]

আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ওরফে ইবনু ফূরাক (৪০৬ হি.) রহ. বলেন,

واعلم أنا إذا قلنا إن الله عز وجل فوق ما خلق لم يرجع به إلى فوقية المكان والارتفاع على الأمكنة بالمسافة والإشراف عليها بالمماسة لشيء منها.

"মনে রাখবে যখন আমরা বলি 'আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাঁর সৃষ্টির অনেক উপরে' তার অর্থ এই হয়না যে, তিনি কোন স্থনের উপরে যা দুরুত্বের আওতাধীন অথবা কোন কিছুর উপরে স্পর্শ করে তাশরীফ নিয়েছেন (তথা বসেছেন)।"

[মুশকিলুল হাদীস পৃ. ৬৪]

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর 'সহীহ' কিতাবের তা'লীকে ' বাবুর রাদ্দি আলাল জাহমিয়্যাতিল মুজাসসিমাহ' শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। এর ব্যাখ্যা হিসেবে ইমাম ইবনু বাত্তাল আল মালেকী (৪৪৯ হি.) রহ. বলেন,

غرض البخاري في هذا الباب الرد على الجهمية المجسمة في تعلقها بهذه الظواهر، وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه، فقد كان ولا مكان، وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف، ومعنى الارتفاع إليه اعتلاؤه- أي تعاليه- مع تنزيهه عن المكان.

"এই শিরোনাম রচনার দ্বারা বুখারীর উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহ তা'লা দেহময় নন। সুতরাং স্থির হওয়ার জন্য তার কোন স্থানের প্রয়োজন নেই। তিনি তো আগেও ছিলেন কোন স্থান ছিলনা। আর তাঁর নিকট বিভিন্ন হুকুম আহকাম উঠার ইজাফত (সম্পৃক্ততা) মূলত মর্যাদার দিকে ইঙ্গিত করে। আর আর 'ইরতেফা' মূলত স্থানের কোন প্রকার সাদৃশ্য ছাড়াই 'ইতেলা' তথা 'তা'আলী' অর্থে ব্যবহৃত হবে।"

[ফাতহুল বারী ১৩/৪১৬]

সর্বশেষে বলব, উল্লেখিত দুইটি স্থানে ভুল এবং সম্ভাব্য আরও ভুল পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করবে বলে প্রকাশক জানিয়েছেন। তবে মাওজুদা কিতাবটি বেশ উপকারী। যারাই কিতাবটি মনোযোগ দিয়ে পড়বেন ইনশাআল্লাহ উপকৃত হবেন, বিশেষ করে সাধারণ মুসলিমগন। অন্তত সূচীপত্র চোখ বুলালেও বুঝা যাবে, এই কিতাবের বিষয়বস্তু কি ও কার জন্য কতটা প্রয়োজনীয়। (কমেন্ট বক্সে আমি শর্ট পিডিএফ লিংক দিচ্ছে সেখানে আগ্রহীরা চাইলে সূচীপত্র দেখে নিতে পারেন।)

(আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভুল, ত্রুটি ও গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন। আর হকের উপর ইস্তিকামাত নসীব করুন। আমীন)

ثمرة العقائد

আকিদার মর্মকথা

মাওলানা সামীরুদ্দীন কাসেমী হাফি.

ভাষান্তর। এনামুল হক মাসউদ

এ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য

- অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় লেখা।
- বর্তমান সময়ের প্রয়োজনীয় আকিদা নিয়ে রচিত।
- প্রতিটি আকিদার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট আয়াত ও সহিহ হাদিসের সমাবেশ।
- সম্ভাব্য সকল মতাদর্শের লোকদের আকিদার আলোচনা।
- সম্মানিত খতিবদের জন্য এই গ্রন্থটি থেকে খুব সহজে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আয়াত ও হাদিস সংগ্রহ করে বয়ান করার সুবিধা।
- অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী একটি রচনা। যা সকল মতাদর্শের লোকদের জন্যই উপকারী।
- প্রতিটি আকিদার ক্ষেত্রে কয়টি আয়াত ও কয়টি হাদিস অধ্যায়ের শুরুতেই তা উল্লেখ করে দেওয়া এবং প্রতিটি আয়াত ও হাদিসের তথ্যসূত্র উল্লেখ করা।
- গ্রন্থটিতে প্রয়োজনীয় ছোট-বড় প্রায় ৩৫০টি আকিদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর উক্ত আকিদাসমূহ প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রতিটি আকিদার জন্য ৩টি করে আয়াত ও ৩টি করে হাদিস; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারও অধিক আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় স্থানে কিছুটা কম-বেশি করা হয়েছে।
- বর্ণিত আকিদাসমূহ প্রমাণের ক্ষেত্রে সর্বমোট ৫৬৩টি আয়াত এবং ৩৭৩টি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বমোট বিষয়বস্তু হলো ৪৬৫টি। আর মৌলিক আকিদা হলো ৪৪টি।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে অতি প্রয়োজনীয় ৩৫০টি আকিদা। প্রতিটি আকিদা ৩টি কুরআনের আয়াত ও ৩টি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ব্যতিক্রমধর্মী একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

ثمرة العقائد

আকিদার মর্মকথা

মূল ☐ মাওলানা সামীরুদ্দীন কাসেমী হাফি.

ভাষান্তর ☐ এনামুল হক মাসউদ

সম্পাদনা ☐ শায়খ আব্দুল্লাহ আল মামুন

অর্পণ

আমার আম্মা-আব্বার দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি, কল্যাণ এবং সুমহান মর্যাদা কামনায়, আল্লাহ তাআলা আমাকে দান করেছেন যাদের স্নেহ ও ভালোবাসার কোল।

যারা আমাকে দুনিয়া উপার্জনের মাধ্যম না বানিয়ে সোপর্দ করেছেন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনে তার দ্বীনের জন্য। তাদের জন্য আমার হৃদয়ের আকুতি

রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি সাগিরা।

তারা আমাকে যেভাবে লালন করেছেন শৈশবে, প্রভু সেভাবে অনুগ্রহ করো তাদেরও, দুঃখ দিয়ো না কভু।

—অনুবাদক

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহ তাআলার সত্তা

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহ তাআলার ওপর প্রতিদান কিংবা শাস্তি দেওয়া ওয়াজিব নয়

তৃতীয় অধ্যায়

'দাহরিয়া'দের আল্লাহ তাআলাকে মেনে নেওয়া উচিত

চতুর্থ অধ্যায়

আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ, আল্লাহকে দেখা

পঞ্চম অধ্যায়

নবিজি ﷺ-এর বড় বড় ১০টি ফজিলত

ষষ্ঠ অধ্যায়

নবিজি ﷺ মানুষ তবে আল্লাহ তাআলার পরে গোটা সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম সৃষ্টি

সপ্তম অধ্যায়

নবিজি ﷺ কবরে জীবিত

এই জীবন দুনিয়ার জীবন থেকে উর্ধ্বে
নবিজির পবিত্র দেহ পুরোপুরি সংরক্ষিত

অষ্টম অধ্যায়

হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা
নবিজি সর্বত্র হাজির তথা উপস্থিত নয়!

নবম অধ্যায়

মুখতারে কুল (সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী) একমাত্র আল্লাহ তাআলা

দশম অধ্যায়

ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার

একাদশ অধ্যায়

একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা

দ্বাদশ অধ্যায়

অসিলা

ত্রয়োদশ অধ্যায়

৫টি গুরুত্বপূর্ণ আকিদা

চতুর্দশ অধ্যায়

শাফাআতের বর্ণনা

পঞ্চদশ অধ্যায়

সকল নবিদের ওপর ঈমান আনা জরুরি

ষোড়শ অধ্যায়

গোস্তাখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সপ্তদশ অধ্যায়

সকল সাহাবায়ে কেরামের সম্মান অনেক জরুরি

অষ্টাদশ অধ্যায়

নবিজির পরিবার-পরিজনকে মহব্বত করা ঈমানের অংশ

উনবিংশ অধ্যায়

খিলাফতের সমস্যা

বিংশ অধ্যায়

ওলি কাকে বলে

একবিংশ অধ্যায়

ফেরেশতাদের বর্ণনা

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জিনের বর্ণনা

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

হাশরের ময়দান কায়েম করা হবে

চতুর্বিংশ অধ্যায়

মিজান সত্য

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা জান্নাত সৃষ্টি করেছেন

ষড়বিংশ অধ্যায়

কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম বা বাণী

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

শিরক সকল আসমানি কিতাবেই নিষিদ্ধ

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

একজন মুসলিম কখন মুরতাদ হয়

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

পির-মুরিদি বা আত্মশুদ্ধি

ষটত্রিংশ অধ্যায়

তাবিজ ব্যবহার

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

কবর বা মাজার জিয়ারত

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

কবর বা মাজারে উরস করা জায়েজ নেই

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

ফয়েজ বা বরকত হাসিল করা

চত্বারিংশ অধ্যায়

কবরের নিকট জবাই করা নিষেধ

একচত্বারিংশ অধ্যায়

বিলাপ করা হারাম

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

ইসালে সাওয়াব একটি মুস্তাহাব কাজ

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

মৃতব্যক্তির শ্রবণ

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

কিয়ামতের প্রধান নিদর্শনসমূহ

অনুবাদকের কথা

পৃথিবীর সকল মানুষ বিভক্ত দুটি দলে। একদল ঈমানদার বা মুমিন, আরেকদল বেঈমান বা কাফির। আরও সহজ করে বললে একদল বিশ্বাসী, আরেকদল অবিশ্বাসী।

ঈমানের মূল চালিকাশক্তি হলো আকিদা বা সুদৃঢ় ধর্মবিশ্বাস। সকল ইবাদত-বন্দেগি কবুলের পূর্বশর্ত হলো ঈমানের বিশুদ্ধতা। এজন্য এই বিশুদ্ধ চালিকাশক্তিকে ধ্বংস করতে যুগে যুগে বিশ্ব-কুফরিশক্তি মুসলিম সমাজে নানানভাবে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদা বা ভুল ধর্মবিশ্বাস। তাই তো উম্মাহর বিশুদ্ধ ঈমান-আকিদা রক্ষায় হক্কানি উলামায়ে কেরাম রচনা করেছেন আকিদাবিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থ। এটিও এমনই একটি চমৎকার গ্রন্থ। রচনা করেছেন দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক স্বনামধন্য কৃতী শিক্ষার্থী ভারতের প্রখ্যাত গবেষক আলেম, বর্তমানে লন্ডন প্রবাসী মুহতারাম মাওলানা সামীরুদ্দীন কাসেমী। তিনি গ্রন্থটিতে বর্তমান সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদাসমূহকে কুরআন-সুন্নাহ ও অকাট্য যুক্তির আলোকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে খণ্ডন করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাভাষী পাঠকের জন্য অধমের তা সহজ ভাষায় অনুবাদের তাওফিক হয়েছে। আশা করি এ গ্রন্থের মাধ্যমে যুগ-যুগ ধরে চলমান আকিদাবিষয়ক বিভিন্ন ভ্রান্তির কিছুটা হলেও নিরসন হবে ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থটি প্রকাশের এই শুভক্ষণে যার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করলে বড় বে-ইনসাফি হবে, তিনি হলেন আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম বরুড়া-কুমিল্লার সম্মানিত উস্তাদ মুহতারাম মুফতি রফিক সাহেব। বিশুদ্ধ আকিদার মহব্বতে মূল গ্রন্থের পিডিএফ ফাইলটি তিনিই

আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি হুব্বুনফিল্লাহর প্রিয় অগ্রজ মারুফ বিল্লাহ তকী ও বুরহান আশরাফী ভাইয়ের। যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় গ্রন্থটি ছাপার অক্ষরে পাঠকদের হাতে পৌঁছছে।

কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই আমিও অবশ্যই তার ব্যতিক্রম নই। সুতরাং সচেতন পাঠকের অনুসন্ধানী দৃষ্টি হোঁচট খেলে পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধনে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

পরিশেষে গ্রন্থটি পাঠ করে একজন পাঠকেরও যদি এখানে আলোচিত কোনো একটি আকিদা বিশুদ্ধ হয় তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

এই গ্রন্থ প্রকাশে যে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন সকলকে আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। গ্রন্থটিকে আমাদের নাজাতের অসিলা করুন।

এনামুল হক মাসউদ
psfoundation2001@gmail.com
০১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইসায়ি
সময় রাত ১টা

দুআ ও অভিমত

মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম নোমানী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম
মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ

হজরত মাওলানা সামীরুদ্দীন কাসেমী (ম্যানচেস্টার, ইংল্যান্ড)-এর বেশ কয়েকটি রচনা পূর্বেও দেখার ও অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়েছে। বিশেষ করে "সামারাতুল মিরাস বা মিরাসের মর্মকথা" ও "সমীরী ক্যালেন্ডার" থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি।

এই গ্রন্থটি (সামারাতুল আকাইদ বা আকিদার মর্মকথা) মাওলানার সদ্য রচিত একটি গ্রন্থ। যার মধ্যে ইসলামের মৌলিক আকিদাসমূহকে ৪৪টি অধ্যায়ে ইতিবাচক ও সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় বিবরণ এবং কুরআনের আয়াত ও হাদিসে নববি দ্বারা আকিদা প্রমাণিত হয়েছে। এ গ্রন্থে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদাসমূহ বর্ণনার পাশাপাশি ভারসাম্যপূর্ণ দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে অন্যান্য ভ্রান্ত দলের আকিদাগুলোও খণ্ডন করা হয়েছে এবং স্বীয় দাবিসমূহের দলিল-প্রমাণও উপস্থাপন করা হয়েছে।

আশা করছি আকিদার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে জনাবের এ গ্রন্থটি অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটিকে কবুল করুন এবং উম্মতকে এর থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন।

(মাওলানা মুফতি) আবুল কাসেম নোমানী গুফিরা লাহু
মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ
৮ মহররম ১৪৪১ হিজরি
৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

এই গ্রন্থটির মতো কুরআন ও হাদিসের রেফারেন্সে ভরপুর অন্য কোনো গ্রন্থ আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি

মাওলানা মারগুব সাহেব লাজপুরী দামাত বারাকাতুহুম

[নোট : হজরত মাওলানা মারগুব সাহেব লাজপুরী একজন মেধাবী আলেম। ছোট ছোট প্রায় ৩০০ পুস্তকের লেখক ও বড় বড় ১০টি গ্রন্থ তার কলম দ্বারা রচিত হয়েছে। যা পাঠকসমাজে অনেক গ্রহণযোগ্যও হয়েছে। তিনি অত্যন্ত বিশুদ্ধ চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিত্ব ও সঠিক পরামর্শদাতাও বটে। আমার এটা বলতে কোনো সংকোচ নেই যে, তিনি আমার ছাত্র বটে; কিন্তু আমার থেকেও অনেক অগ্রগামী হয়ে গেছে। এজন্য আমি আমার এ গ্রন্থটি সম্পাদনার জন্য তাকেই নির্বাচন করেছি। তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে এর সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং অনেক উপকারী পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেছেন। তার সম্পাদনায়ই গ্রন্থটি প্রকাশ করা হচ্ছে।—লেখক]

শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হজরত মাওলানা সামীরুদ্দীন কাসেমী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম ঈমানের হেফাজতের জন্য "সামারাতুল আকাইদ বা আকিদার মর্মকথা" নামে বিশুদ্ধ আকিদাসংক্রান্ত বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন। মাওলানা তার স্বভাবসুলভ কারণ ও বর্তমান যুগের প্রয়োজন এবং নিয়মানুসারে প্রতিটি আকিদা প্রমাণের জন্য দলিল-প্রমাণস্বরূপ পবিত্র কুরআনুল কারিমের আয়াত ও নবিজি ﷺ-এর হাদিসের এক ভাণ্ডার একত্র করেছেন। প্রতিটি আকিদার জন্য প্রথমে কুরআনুল কারিমের আয়াত তারপর নবিজি ﷺ-এর হাদিসের পরিপূর্ণ রেফারেন্সসহ চমৎকার এক পদ্ধতিতে লিখেছেন। যা পাঠ করে প্রতিটি মুমিন তার আকিদা বিশুদ্ধ করতে পারে।

এ গ্রন্থটি অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় রচিত। যে-সকল আকিদায় অধিক মতানৈক্য রয়েছে, তাতে অনেক বেশি আয়াত ও হাদিস একত্রিত করেছেন। যেন উক্ত আকিদা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তবে যে-সকল আকিদা

সম্পর্কে অধিক মতানৈক্য নেই, তাতে কম আয়াত ও হাদিস পেশ করেছেন।

হজরত তার স্বভাব অনুযায়ী ইশারা-ইঙ্গিতেও কারও ওপর আক্রমণ করেন না এবং কারও কথা পেশ করে তার খণ্ডনও করেন না। যাতে কারও কষ্ট না হয় এবং কিতাবও দীর্ঘ না হয়ে যায়। তিনি আকিদা উপস্থাপন করেছেন এবং এর জন্য আয়াত ও হাদিস পেশ করেছেন। যা উম্মতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন।

অধমের আলহামদুলিল্লাহ পুরো গ্রন্থটি অধ্যয়নের সুযোগ হয়েছে। মাশাআল্লাহ সর্বদিক থেকে উপকৃত হয়েছি। উলামায়ে কেরাম যদি এটা তাদের অধ্যয়নের তালিকায় রাখেন এবং মাঝেমধ্যে নিজেদের মসজিদে এর সারমর্ম আলোচনা করেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের সাধারণ মুসলমানদের আকিদাও বিশুদ্ধ থাকবে এবং তারা সর্বপ্রকার গোমরাহি তথা ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকবে।

আকিদার ওপর এমন গ্রন্থ আমার খুব কমই দেখার ও অধ্যয়নের তাওফিক হয়েছে। এ গ্রন্থের নিজ বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি কুরআন-হাদিসের এমন ব্যাপকতা ও রেফারেন্স বা তথ্যসূত্রে ভরপুর—এ গ্রন্থটির মতো দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। বাস্তবেই এ গ্রন্থটি অনেক উপকারী।

আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থটিকে কবুল করুন। আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থটিকে আকিদা বিশুদ্ধ করার উত্তম হাতিয়ার হিসেবে কবুল করুন এবং মাওলানাকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দান করে পরকালের নাজাতের অসিলা বানান। আমিন।

(হজরত মাওলানা) মারগুব আহমাদ লাজপুরী
৪ শাবান ১৪৩৯ হিজরি
২১ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
রোজ : শনিবার

ভূমিকা

ইসলামের বুনিয়াদ যে পাঁচটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান হলো ঈমান-আকিদা। বরং এটা এমন এক স্তম্ভ, যার ওপর নির্ভর করে বাকি চারটি স্তম্ভ তথা নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজসহ শরিয়তের সকল আমলের গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রতিদান পাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা। বিশাল দালান দাঁড়ানোর জন্য যেমন ফাউন্ডেশন আবশ্যকীয়, তেমনই নেক আমলের জন্য ঈমান প্রয়োজনীয়। এজন্য বিভিন্ন আয়াতে কারিমায় আল্লাহ তাআলা আমলের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রতিদানের জন্য ঈমানকে পূর্বশর্ত বলেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾

যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে এবং সেজন্য যথাযথ চেষ্টা করে, (শর্ত হলো) যদি সে মুমিন হয়, তবে এরূপ চেষ্টার পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে।—সুরা বনি ইসরাইল, ১৯

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾

পুরুষ-নারীর মধ্যে যে-কেউ নেক আমল করলে যদি ঈমানদার হয়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।—সুরা নিসা, ১২৪; সুরা নাহল, ৯৭

এই আয়াতসমূহ দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, সমস্ত আমলের রুহ হলো ঈমান। আর ঈমানবিহীন একজন মানুষের উদাহরণ হলো রুহবিহীন শরীরের মতো। দুনিয়ায় যেমন রুহবিহীন শরীরের কোনো মূল্য নেই, তদ্রূপ আখেরাতে ঈমান-আকিদার বিশুদ্ধতা ছাড়া ভালো কাজ ও আমলের কোনো গ্রহণযোগ্যতা ও প্রতিদান নেই। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾

> তারা (ঈমানবিহীন ব্যক্তিরা দুনিয়ায়) যা-কিছু আমল করেছে, আমি তার ফয়সালা করতে আসব এবং সেগুলোকে শূন্যে বিক্ষিপ্ত ধুলোবালি (-এর মতো মূল্যহীন) করে দেবো।—সুরা ফুরকান, ২৩

অর্থাৎ তারা যে-সকল কাজকে পুণ্য মনে করত, আখেরাতে তা ধুলোবালির মতো মিথ্যা মনে হবে। আখেরাতে তার বিনিময়ে কিছুই পাবে না। কেননা আখেরাতে কোনো কাজ গৃহীত হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত, যা তাদের ছিল না। তাই সেখানে এসব কোনো কাজে আসবে না।

আরও ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۢ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا﴾

> যারা কাফের, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকাসদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। অবশেষে সে যখন কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না।—সুরা নুর, ৩৯

মরুভূমিতে যে বালুরাশি চিকচিক করে, দূর থেকে তাকে মনে হয় পানি। আসলে তা পানি নয়, মরীচিকা। সফরকালে মুসাফিরগণ ভ্রমবশত তাকে পানি মনে করে বসে। কিন্তু বাস্তবে তা কিছুই নয়। ঠিক এরকমই কাফের ও ঈমানবিহীন ব্যক্তিরা যে ইবাদত ও সৎকর্ম করে আর ভাবে বেশ নেকি কামাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তার কিছুই কামাই হয় না, তা মরীচিকার মতোই ফাঁকি। এভাবেই তারা দেখতে পাবে তাদের কর্ম তাদের কোনো উপকারে আসেনি, বরং ক্ষতিরই কারণ হয়েছে।

উল্লেখ্য মানুষ দুধরনের, মুমিন-মুসলিম ও বেইমান-কাফের, এর বাইরে আর কোনো প্রকার নেই। ইরশাদ হয়েছে,

﴿هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ﴾

> তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন।—সুরা তাগাবুন, ২; সুরা দাহর, ৩

কাজেই মুমিন-মুসলিম ছাড়া সকল কাফের-বেইমান, নাস্তিক, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ধর্মহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপরিউক্ত বিধান প্রযোজ্য। যদিও মুসলিম নামধারী হোক না কেন, যেমন কাদিয়ানি সম্প্রদায়।

তাই আমাদের প্রথম ও প্রধান করণীয় হলো, ঈমান আনা ও আকিদা ঠিক করা। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

> عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ: فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ... وفي رواية: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى.

> নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল রা.-কে ইয়ামান অভিমুখে (শাসকরূপে) প্রেরণকালে বলেন, সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল এ কথার সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দেবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর প্রতিদিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন।—*সহিহ বুখারি*, ইফা ন. ১৩১৩

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

> তুমি (মুআয রা.) আহলে কিতাবদের এক কওমের কাছে চলেছ। অতএব তাদের প্রতি তোমার প্রথম দাওয়াত হবে, তারা যেন আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে নেয়।—*সহিহ বুখারি*, ইফা ন. ৬৮৬৮

হাদিসে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে, নামাজ ইত্যাদি আমলের পূর্বে প্রথম ও প্রধান কাজ হলো, ঈমান আনা ও আকিদা ঠিক করা। ইমাম গাজালি রহ. (মৃ. ৫০৫ হি.) *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন* কিতাবে এবং ইবনে খালদুন রহ. (মৃ. ৮০৮ হি.) তার *মুকাদ্দিমায়* বাচ্চাদেরকে আকিদা শেখানোর গুরুত্ব নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। আর আজ থেকে প্রায় ১ হাজার ১০০ বছর আগে ইমাম ইবনে আবি যায়দ কাইরাওয়ানি মালেকি রহ. (মৃত্যু ৩৮৬ হি.) *আর-রিসালা* কিতাবের শুরুতে বাচ্চাদের শেখানোর জন্য আকিদা লিখে গিয়েছেন।

ঈমান সংরক্ষণ প্রত্যেকের ওপর ওয়াজিব

এরপর ঈমানের দাবি ও সংরক্ষণের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং ঈমান-আকিদা বিনষ্টকারী কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। কারণ অনেক বেশি আমলকারীও ঈমানবিহীন হতে পারে।

আলি রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

> يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ... يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

> আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের কুরআন তিলাওয়াত, নামাজ ও রোজা তোমাদের চেয়ে ভালো ও বেশি হবে, (কিন্তু) তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তির তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে বের হয়ে যায়।—*সহিহ মুসলিম*, হা. ১০৬৬

অন্য হাদিসে আরও ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

> يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

> সকালের মুমিন সন্ধ্যায় ঈমানহারা কিংবা সন্ধ্যার ঈমানদার সকালে ঈমানছাড়া। দুনিয়ার সামান্য স্বার্থে নিজের দ্বীনকে ছেড়ে দেবে।—*সহিহ মুসলিম*, হা. ১১৮

এজন্য কোন কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা একজন মুমিনের জন্য ফরজে আইন এর তালিকায় আল্লামা ইবনে আবিদিন শামি রহ. (মৃ. ১২৫৮ হি.) 'তাবয়িনুল মাহারেম' কিতাবের হাওয়ালায় উল্লেখ করেন,

> لَا شَكَّ فِي فَرْضِيَّةِ... وَعِلْمِ الْأَلْفَاظِ الْمُحَرَّمَةِ أَوْ الْمُكَفِّرَةِ، وَلَعَمْرِي هَذَا مِنْ أَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ فِي هَذَا الزَّمَانِ؛ لِأَنَّكَ تَسْمَعُ كَثِيرًا مِنَ الْعَوَّامِ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا يُكَفِّرُ وَهُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ. وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يُجَدِّدَ الْجَاهِلُ إِيمَانَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَيُجَدِّدَ نِكَاحَ امْرَأَتِهِ عِنْدَ شَاهِدَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، إِذْ الْخَطَأُ وَإِنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ مِنْ النِّسَاءِ كَثِيرٌ.

> হারাম ও কুফরি শব্দ (তথা কোন কথা বা কাজ করলে ঈমান চলে যাবে) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। কসম, বর্তমান সময়ে যে-সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য, তন্মধ্যে এটি অন্যতম।

কারণ অনেক মানুষ কুফরি কথা বলে, যা তাকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। অথচ এই ভয়াবহতা সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ উদাসীন!

সতর্কতা হলো, জাহেল-সাধারণ (ও অনভিজ্ঞ আলেম) ব্যক্তি প্রতিদিন তার ঈমানকে নবায়ন করবে এবং প্রতি মাসে এক-দুবার দুজন সাক্ষীর সামনে বিবাহকে নবায়ন করবে। কেননা পুরুষরা যদিও কিছুটা সতর্ক থাকে, কিন্তু মহিলাদের থেকে কুফরি কথা খুব বেশি পরিমাণে বের হয়।—*ফাতাওয়া শামি*, ১/১৪০, ড. হুসামুদ্দিন ফারফুরের তাহকিককৃত নুসখা

এই ফরজের প্রতি আমরা চরম উদাসীন এবং এটি আমাদের মাঝে মারাত্মক অবহেলিত 'ফরজে আইন'। এ বিষয়ে আমরা ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবসমূহে শুধু 'মুরতাদ' অধ্যায় দেখলে এর গুরুত্ব বুঝে আসবে। আর সাধারণরা শুধু কাজি সানাউল্লাহ পানিপথি রহ.-এর 'মালাবুদ্দা মিনহু' (দশম অধ্যায়, কুফরি কালাম অধ্যায়ের আলোচনা, পৃ. ২৪৭-২৭০, মাও. আনোয়ার হুসাইনের অনুবাদ) দেখতে পারি।

মনে রাখতে হবে, ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় আর ঈমান একত্র হতে পারে না। যেভাবে অজু-নামাজ ভঙ্গের কারণ পাওয়া যায় আর অজু-নামাজ ঠিক থাকা একসাথে হতে পারে না। কিন্তু আমরা অজু-নামাজেরটা বুঝি, ঈমানেরটা বুঝি না। ফলে অজু-নামাজের বিষয়ে যতটা সচেষ্ট থাকি, ঈমান-আকিদার বিষয়ে ততই অবহেলা করি!

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমাদের ছেলেমেয়েরা অজু ভঙ্গের কারণ শেখে, অনেকেই নামাজ ভঙ্গের কারণও জানে। কিন্তু (কিছু আকিদার বিষয় জানলেও) ঈমান ভঙ্গের কারণ বা ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় শেখে না, কোন কথা বললে, কী কাজ করলে, কেমন বিশ্বাস রাখলে ঈমান চলে যায়, তা জানে না।

এভাবে আমাদের মাহফিল ও সম্মেলনগুলোয় ঈমান-আকিদার বিষয়বস্তুকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং জুমার দিন মিম্বার থেকেও এ সম্পর্কে আওয়াজ উচ্চারিত হয় না বা হতে দেওয়া হয় না। আর রচনা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধেও এ জাতীয় আলোচনা তেমন চোখে পড়ে না কিংবা গুরুত্ব পায় না।

ফলে যার ভয়াবহ পরিণতি আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। বর্তমানে এর চিত্র একেবারেই সুস্পষ্ট। এমনকি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি ও তাহাজ্জুদ

আদায়ের দাবিকারীর আচরণ-উচ্চারণেও এমন কিছু প্রকাশ পাচ্ছে, যা সর্বসম্মত আকিদাবিরোধী ও সরাসরি ঈমান বিনষ্টকারী।

এই চিত্র পরিবর্তন করার দায়িত্ব আমাদের। নতুবা এই দেশে নামে মুসলমান ঠিকই থাকবে, নামাজ, তাহাজ্জুদ ও কুরআন তিলাওয়াতকারীও পাওয়া যাবে, মসজিদ-মাদরাসা এমনকি খানকায় ধরনা দেওয়ার এমপি-মন্ত্রীরও দেখা মিলবে। কিন্তু তাদের ভেতর ঈমান থাকবে না।

একটি জরুরি মাসআলা

ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. বলেন,

وإذا أشكل على الإنسان شيءٌ من دقائق علم التوحيد: فإنه ينبغي له أن يعتَقِد في الحال ما هو الصواب عند الله تعالى، إلى أن يجد عالما فيسأله، ولا يسعه تأخير الطلب، ولا يُعذَر بالتوقف فيه، ويكفُر إن وقف.

যদি কারও মনে ঈমান-তাওহিদের কোনো সূক্ষ্ম বিষয়ে অস্পষ্টতা বা প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, তৎক্ষণাৎ করণীয় হচ্ছে, এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে যা সত্য-সঠিক, তাই আমার বিশ্বাস এরূপ বিশ্বাস পোষণ করবে। এরপর যত দ্রুত সম্ভব কোনো অভিজ্ঞ আলেম থেকে তা জেনে নেবে এবং দেরি করা বৈধ হবে না। আর এতে থেমে থাকা বা কোনোকিছুই বিশ্বাস না করার অপারগতা গৃহীত হবে না। বরং এরূপ করা কুফরি বলে গণ্য হবে।—*আল-ফিকহুল আকবর*, পৃ. ১১০

ঈমান-আকিদার মাসআলাসমূহের প্রকার ও হুকুম

এই কিতাবসহ ঈমান-আকিদাসংক্রান্ত কিতাবসমূহে সাধারণত ঈমান-আকিদার মাসআলাসমূহ তিন প্রকার হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক প্রকারের হুকুম জানা থাকা জরুরি।

১। মুমিন ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী আকিদা

ঈমান-আকিদার প্রথম ও প্রধানতম স্তর হলো এমন কিছু আকিদা-বিশ্বাস, যা পোষণ করলে একজন ব্যক্তি ইসলামের দৌলতে সৌভাগ্যমণ্ডিত হয়, এর বিপরীত হলে হতভাগা অমুসলিম হিসেবে গণ্য হয়। এ সমস্ত আকিদাকে পরিভাষায় বলা হয়, أصول أهل القبلة বা أصول الإيمان। এগুলো ইসলামের মূলনীতি বা মৌলিক পর্যায়ের আকিদা, যা ইসলাম ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী। যেমন ঈমানের আরকান তথা আল্লাহ, নবী-রাসুল, ফেরেশতা,

কিতাব, আখেরাত ও তাকদির এবং জরুরিয়্যাতে দ্বীন তথা দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ ও পরিচিত বিষয়সমূহ। উদাহরণস্বরূপ, কুরআন ও হাদিসের হুজ্জিয়াত (গ্রহণযোগ্যতা), খতমে নুবুওয়াত (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী হওয়া), নুযুলে ঈসা (কেয়ামতের পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালামের আসমান থেকে অবতরণ করা), মেরাজ সত্য, ইসলামই একমাত্র ধর্ম ও জীবনের সর্বত্র বিস্তৃত, আল্লাহ তাআলাই বিধানদাতা এবং নামাজ, জাকাত ও জিহাদ ফরজ আর সুদ, মদ ও জিনা হারাম হওয়া ইত্যাদি।

এ জাতীয় কোনোকিছু জেনে-বুঝে অস্বীকারকারীর হুকুম হচ্ছে, সে ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে কাফের হয়ে যাবে। এভাবে ঈমান বিনষ্টকারী যত বিষয় রয়েছে, এগুলোর কোনো একটা বিশ্বাস করলে বা মুখে বললে কিংবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা করলেও কাফের হবে।

উল্লেখ্য, কাউকে কাফের বলা বেশ জটিল ও খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। একজন মুসলমানকে উপযুক্ত কারণ ছাড়া কাফের বলার ওপর যেমন কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে, তেমনই একজন কাফেরকে সুস্পষ্ট কারণ থাকার পরও মুসলমান মনে করলে মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তবে প্রথমটার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে—

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالي، الإعلام بقواطع الإسلام للفقيه ابن حجر الهيتمي المكي، إكفار الملحدين في ضروريات الدّين للإمام أنور شاه الكشميري، وصول الأفكار في أصول الإكفار للمفتي شفيع، رحمهم الله تعالى أجمعين.

২। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ ও বিদআতপন্থীদের মাঝে পার্থক্যকারী আকিদা

ইসলামে কিছু আকিদা-বিশ্বাস রয়েছে দ্বিতীয় স্তরের, যা থাকা না-থাকার ওপর মুসলমান হওয়া না-হওয়া নির্ভর করে না, বরং একজন ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার পর সে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর অন্তর্ভুক্ত হওয়া না-হওয়া নির্ভর করে। এ জাতীয় আকিদাকে পরিভাষায় أصول أهل السنة বলা হয়। যেমন কুরআনকে মাখলুক বলা, আখেরাতে আল্লাহ তাআলার দিদার (দর্শন) লাভ, ইসমতে আম্বিয়া তথা নবীগণের নিষ্পাপত্ব ও তারা কবরে জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করা।

এ ধরনের আকিদা-বিশ্বাস কেউ রাখলে তার হুকুম হচ্ছে, সে আহলুল বিদআহ তথা বিদআতপন্থীদের মধ্যে গণ্য, পথভ্রষ্ট ও গুনাহগার এবং ৭২ দলের মধ্যে গণ্য হয়ে জাহান্নামি।

উল্লেখ্য, আকিদার কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যা প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে, না দ্বিতীয় প্রকারের হবে এ নিয়ে ইমামদের মাঝে ইখতেলাফ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে করণীয় হলো, অন্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়া না করা এবং নিজের ব্যাপারে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা।

৩। এমন কিছু শাখাগত আকিদা, যাতে পরস্পরবিরোধী দলিল রয়েছে এবং সাহাবায়ে কিরাম রা.-সহ পরবর্তী ইমামগণের মধ্যে ইখতেলাফ ও মতপার্থক্য হয়েছে। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজে আল্লাহ তাআলাকে দেখেছেন কি না এবং মৃতব্যক্তি শ্রবণ করে কি না।

এ প্রকার আকিদার ক্ষেত্রে কোনো পক্ষকে কাফের তো দূরের কথা, বিদআতপন্থী বা পথভ্রষ্টদের মধ্যেও গণ্য করা যাবে না, এমনকি গুনাহগারও বলা যাবে না।

কোন ধরনের আকিদা জানা জরুরি

আকিদার মাসআলাসমূহের মধ্যে কিছু আছে জানা জরুরি এবং এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতার সুযোগ নেই। যেমন আল্লাহ তাআলার পরিচয়, রিসালাত ও পরকালসংক্রান্ত বিষয়সমূহ। আর কিছু আছে এমন, যা না জানলেও কোনো অসুবিধা নেই। যেমন ফেরেশতাদের ওপর নবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব।—*ইতমামুদ দিরায়াহ*, সুয়ুতি, পৃ. ৫

সুতরাং ঈমান-আকিদার মৌলিক বিষয় বাদ দিয়ে কিংবা জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ও শাখাগত বিষয় নিয়ে মাতামাতি করা বা ব্যস্ত থাকা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। যেমন নবীর পিতা-মাতা জান্নাতি না জাহান্নামি, নবি মাটির তৈরি না নুরের তৈরি, 'আয়নাল্লাহ' তথা আল্লাহ (স্থানগত) কোথায়? এ জাতীয় বিষয় নিয়ে পড়ে থাকা কিংবা এই বঙ্গদেশে 'রহমান আরশের ওপর উঠেছেন' নামে সাড়ে ৫০০ পৃষ্ঠার বই লেখা কোনো প্রকৃত দাঈর কাজ হতে পারে না!

মৌলিক আকিদায় চার মাজহাব এক ও অভিন্ন

ইমাম তাজুদ্দিন সুবকি রহ. (মৃ. ৭৭১ হি.) বলেন,

وهذه المذاهب الأربعة - ولله الحمد - في العقائد واحدة، إلا من لحق منها بأهل الاعتزال والتجسيم. وإلا فجمهورها على الحق يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي، التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول.

আল্লাহর শোকর! চার মাজহাবের আকিদা এক ও অভিন্ন। তবে যারা মুতাযিলা বা অন্য কোনো ভ্রান্ত আকিদার অনুসারী হয়েছে, তারা ছাড়া (চার মাজহাবের) অধিকাংশ অনুসারী হকপন্থী এবং 'আকিদাতুত তাহাবি'র আকিদা পোষণকারী। যে কিতাবকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন।—*মুয়িদুন নিআম*, সুবকি, পৃ. ২৫

হাফেজুল হাদিস ইবনে আসাকির রহ. (মৃ. ৫৭১ হি.) 'তাবয়িনু কাযিবিল মুফতারি' গ্রন্থে লেখেন,

ولسنَا نرى الأئمة الْأَربَعَة الذين عُنِيتم فِي أَصُول الدّين مُخْتَلفين، بل نراهم فِي القَوْل بتوحيد الله، وتنزيهه فِي ذَاته وصفاته مؤتلفين، وعَلى نفي التَّشْبِيه عَن القَدِيم سُبْحانه وتعالى مُجْتَمعين.

আমরা চার ইমামের মাঝে মৌলিক আকিদার ক্ষেত্রে কোনো মতানৈক্য দেখতে পাই না। বরং এ বিষয়ে তারা ঐক্যবদ্ধ।—*তাবয়িনু কাযিবিল মুফতারি*, পৃ. ৬৩৭

ইমাম আবদুল কাহের বাগদাদি রহ. (মৃ. ৪২৯ হি.) 'আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক' কিতাবে বলেন,

فأما الفرقة الثالثة والسبعون: فهي أهل السنة والجماعة، من فريقَي الرأي والحديث، دون من يشتري لهو الحديث. وفقهاءُ هذَيْن الفريقين، وقرَّاؤهم، ومحدثوهم، ومتكلمو أهل الحديث منهم، كلهم متفقون على مقالة واحدة في توحيد الصانع وأسمائه وصفاته، وفي سائر أصول الدين... وهم الفرقة الناجية.. وقد دخل في هذه الجملة جمهورُ الأمة وسوادها الأعظم: من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري وأهل الظاهر. اهـ ملخصا.

সারকথা, প্রকৃত মুহাদ্দিস ও ফকিহদের মধ্যে যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ, তারা সবাই... মৌলিক আকিদার বিষয়ে একমত। তারা সবাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল। আর এতে ইমাম মালেক, শাফেয়ি, আবু হানিফা, আওযায়ি, (সুফিয়ান) সাওরি ও আহলে যাহেরের অনুসারীদের মধ্য থেকে বড় একটি অংশ এবং অধিকাংশ উম্মত অন্তর্ভুক্ত।—*আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক*, পৃ. ২৩

আকিদার তিনটি ধারা : কী ও কেন

কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর সবাই যদি আকিদার বিষয়ে একমত থাকেন, তাহলে 'আশআরিয়্যাহ' ও 'মাতুরিদিয়্যাহ' নামে তাদের মাঝে বিভক্তি কেন?

উত্তর হলো, প্রথমত মৌলিক আকিদায় তাদের মাঝে বিভক্তি নেই। তবে অমৌলিক ও শাখাগত কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য হয়েছে। আর তা গন্তব্যে পৌঁছার রাস্তা গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হয়েছে।

শাইখ আবু আবদিল্লাহ আল-বাক্কি রহ. (মৃ. ৯১৬ হি.) বলেন,

اعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم قد اتفقوا على معتقد واحد، فيما يجب ويجوز ويستحيل، وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ الموصلة إلى ذلك، أو في لِمِّيَّة المسالك.

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর সবাই মৌলিক আকিদায় একমত। যদিও তারা গন্তব্যে পৌঁছার রাস্তা গ্রহণে এবং কারণ বিবরণে মতভেদ করেছেন।—*তাহরিরুল মাতালিব*, পৃ. ৪০; *ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন*, মুরতাযা যাবিদি, ২/৬

কামালুদ্দিন বায়াদি রহ. (মৃ. ১০৯৭ হি.) 'ইশারাতুল মারাম' গ্রন্থে লেখেন,

إنهم متحدو الأفراد في أصول الاعتقاد، وإن وقع الاختلاف في التفاريع بينها...

মৌলিক আকিদার ক্ষেত্রে তারা এক ও অভিন্ন। যদিও তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মতপার্থক্য হয়েছে।—*ইশারাতুল মারাম*, পৃ. ১৩৮

ফকিহ ইবনে আবেদিন শামি রহ. বলেন,

أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والماتريدية، وهم متوافقون؛ إلا في مسائل يسيرة أرجعها بعضهم إلى الخلاف اللفظي، كما بين في محله.

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর অনুসারী 'আশায়িরা' ও 'মাতুরিদিয়্যাহ'-এর আকিদা এক ও অভিন্ন। তবে কয়েকটি মাসআলায় মতভেদ রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে কারও কারও অভিমত হলো, উক্ত মতভেদ শাব্দিক অর্থে তথা উপস্থাপনার ভিন্নতা (বাস্তবিক অর্থে নয়)।—*রদ্দুল মুহতার মুকাদ্দামা*, ১/১৪০

এ কারণেই দেওবন্দের অন্যতম ভাষ্যকার আল্লামা খলিল আহমাদ সাহারানপুরি রহ. 'আল-মুহান্নাদ' কিতাবে বলেন,

إنا بحمد الله ومشائخنا... ومتّبعون للإمام أبي الحسن الأشعري والإمام أبي منصور الماتريدي في الاعتقاد والأصول.

আমরা আকিদার ক্ষেত্রে ইমাম আবুল হাসান আশআরি ও আবু মানসুর মাতুরিদি রহ.-এর অনুসারী।—*আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ*, পৃ. ৪০-৪২

ইমাম বাইহাকি রহ. (মৃ. ৪৫৮ হি.), ইবনে আসাকির রহ. (মৃ. ৫৭১ হি.), সুবকি রহ. (মৃ. ৭৭১ হি.) ও মুরতাযা যাবিদি রহ. (মৃ. ১২০৫ হি.)-সহ অনেকে বলেছেন, ইমামদ্বয় দ্বীনের ক্ষেত্রে নতুন কোনো মাজহাব বা পথ ও মত সৃষ্টি করেননি। বরং ভ্রান্ত আকিদার অনুসারীদের বিরুদ্ধে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর আকিদাসমূহকে কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফের বক্তব্যের আলোকে সুবিন্যস্ত ও বিস্তৃত আকারে উপস্থাপন করেছেন।

আর এ কাজ করতে গিয়ে মানুষের স্বভাবজাত রুচির পার্থক্য ও বোধের তারতম্য থাকার কারণে অমৌলিক ও শাখাগত কিছু বিষয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। তাই প্রত্যেকে নির্দিষ্ট একটি নিয়ম ও পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেছেন। তাই ইখতেলাফকৃত বিষয়ে একে অপরকে বেদআতি-গোমরাহ বলেননি। এখন যারা আশআরি রহ.-এর তরিকা অবলম্বন করেন, তাদেরকে 'আশআরিয়্যাহ' আর যারা মাতুরিদি রহ.-এর পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তাদেরকে 'মাতুরিদিয়্যাহ' বলা হয়।—*ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন*, ২/৭; *তাবয়িনু কাযিবিল মুফতারি*, পৃ. ২৩০, ৬৩৬-৩৭; *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, সুবকি, ৩/৩৬৫, ৩৯৭; *আহলুস সুন্নাহ আল-আশায়িরা*, পৃ. ৩৪-৩৭ ও বান্দার *তাইসিরু ইলমিল আকিদার* ভূমিকা।

সহজে বুঝতে চাইলে বলতে পারেন, *বুখারি* ও *মুসলিমের* হাদিসের মাঝে যেমন বিভক্তি নেই তবে পার্থক্য রয়েছে, তদ্রূপ 'আশায়িরা' ও 'মাতুরিদিয়্যাহ'-এর আকিদার মাঝেও বিভক্তি নেই তবে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তা নির্দিষ্ট একটি নিয়ম ও পদ্ধতিতে উপস্থাপনের কারণে যেভাবে *বুখারির* হাদিস এবং মুসলিমের হাদিস বলা হয়, আকিদার ক্ষেত্রেও উক্ত দুই ইমামের দিকে নিসবত ও সম্বোধন করাটা অনেকটা এমনই। চতুর্থ শতাব্দীর শেষ থেকে আজ অবধি উম্মাহর অধিকাংশ আহলে ইলম হয়তো আশআরি নতুবা মাতুরিদি। এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উইকিপিডিয়ায় দেখতে পারেন।

আজ যে বা যারা বলছেন 'আশআরি-মাতুরিদি গোমরাহ' তাদের কি একটু তালাশ করে দেখার হিম্মত হবে যে, ১ হাজার বছরের বেশি সময় ধরে কুরআন, হাদিস, ফিকহ, ইতিহাস, জিহাদসহ ইসলাম প্রচারের আরও যত দিক রয়েছে, এতে কারা বেশি খেদমত করেছেন? সকলের নিকট পরিচিত সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ও মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ এবং আপনারা যাদের কিতাব থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেন, যেমন ইমাম বাইহাকি, নববি, কুরতুবি, ইবনে কাসির, হাফেজ ইবনে হাজার, সুয়ুতি ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি কারা ছিলেন? এখন 'আশআরি-মাতুরিদি গোমরাহ' বলার মানে এ মহান বিদ্বানগণ সবাই গোমরাহ! কত ভয়ংকর কথা!

মাতুরিদি ইমামগণের উল্লেখযোগ্য কিছু কিতাব—

«كتاب التوحيد» و«تأويلات القرآن» كلاهما للإمام الماتريدي (ت: ٣٣٣ هـ) «أصول الدين» لأبي اليسر البزدوي (ت: ٤٩٣هـ)، «التمهيد» لأبي شكور السالمي (ت: بعد ৪৬০ هـ)، «كتاب التوحيد»، و«بحر الكلام» و«تبصرة الأدلة» و«التمهيد في أصول الدين» كلها لأبي المعين النسفي (ت: ٥٠٨هـ)، «البداية» و«الكفاية في الهداية» و«المنتقى من عصمة الأنبياء» كلها لنور الدين الصابوني (ت: ٥٨٠هـ)، «التمهيد لقواعد التوحيد» لأبي الثناء اللامشي (ت: في أوائل السادس الهجري)، «العقائد النسفية» لنجم الدين النسفي (ت: ٥٣٧هـ)، «بدء الأمالي» (وهو نظم العقائد النسفية) للأوشي (ت: ٥٧٥هـ) وشرحه «ضوء المعالي» للقاري، «الشافي في أصول الدين» لابن دمرك (ت: منتصف القرن الثامن الهجري)، «عمدة العقائد»

وشرحها «الاعتماد في الاعتقاد» كلاهما لأبي البركات النسفي (ت: ٧١٠هـ)، «المسايرة» لابن الهمام (ت: ٨٦١هـ)، «إشارات المرام» للبَياضي (ت: ١٠٩٨هـ)، وشرح قواعد العقائد من «إتحاف السادة المتقين» للزَّبِيْدي (ت: ١٢٠٥هـ).

আশআরি ধারার গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিতাব—

«مقالات الإسلاميين» و«اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» كلاهما للإمام الأشعري (ت: ٣٢٤هـ)، «مقالات الأشعري» لابن فُورَك (ت: ٤٠٦هـ)، «الإنصاف فيما يجب اعتقاده» للباقلاني (ت: ٤٠٣هـ)، كتاب «الاعتقاد» و«الأسماء والصفات» كلاهما للبيهقي (ت: ٤٥٨هـ)، «مختصر الاعتقاد للبيهقي» للشعراني (ت: ٩٧٣هـ)، «أصول الدين» و«الأسماء والصفات» و«الفرق بين الفِرَق» كلها لعبد القاهر البغدادي (ت: ٤٢٩هـ)، «القصيدة القُشَيْرية» للقُشَيْري (ت: ٤٦٥هـ)، «الإرشاد إلى قواطع الأدلة» و«لمع الأدلة» كلاهما لإمام الحرمين الجويني (ت: ٤٧٨هـ)، «إلجام العوام» و«قواعد العقائد» و«الاقتصاد في الاعتقاد» و«المقصد الأسنى» كلها للغزالي (ت: ٥٠٥هـ)، «تأسيس التقديس» و«معالم أصول الدين» و«لوامع البينات» كلها للفخر الرازي (ت: ٦٠٦هـ)، «غاية المرام» و«أبكار الأفكار» للآمدي (ت: ٦٣١هـ)، «عقيدة ابن الحاجب» (ت: ٦٤٦هـ)، رسائل في العقائد لعِزّ ابن عبد السلام (ت: ٦٦٠هـ)، «المواقف» للإيجي (ت: ٧٥٦هـ)، «شرح العقائد النسفية» و«شرح المقاصد» كلاهما للتفتازاني (ت: ٧٩٣هـ)، الكتب الستة للسّنوسي (ت: ٨٩٥هـ)، «جوهرة التوحيد» لإبراهيم اللَّقاني (ت: ١٠٤١هـ)، «العقيدة الحسنة» لولي الله الدهلوي (ت: ١١٧٦هـ)، «الخريدة البهيَّة» وشرحها كلاهما لأحمد الدردير (ت: ١٢٠١هـ).

এভাবে আকিদার আরেকটি ধারার নাম হচ্ছে, 'আসারিয়্যাহ'। শাইখ সাফারিনি হাম্বলি রহ. (মৃ. ১১৮৮ হি.) لوامع الأنوار البهية গ্রন্থে বলেন,

أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد، والأشعرية وإمامهم الأشعري، والماتريدية وإمامهم الماتريدي. وأما فرق الضلال فكثيرة جدًّا.

আহলুস সুন্নাহর তিনটি ধারা রয়েছে। আসারিয়্যাহ, যাদের ইমাম আহমাদ রহ., আশআরিয়্যাহ ও মাতুরিদিয়্যাহ। আর পথভ্রষ্ট দলের সংখ্যা অনেক।

উল্লেখ্য, 'আসারি' দাবিদারদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি এমন আছেন, যারা আকিদার ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদের মাসলাক থেকে সরে দেহবাদী ও মুশাব্বিহাদের পথ গ্রহণ করেছেন। তাই 'আসারি' দাবিদারগণ দুভাগে বিভক্ত।

এক. ফুযালাউল হানাবিলা বা মধ্যমপন্থী হাম্বলি আহলে ইলম, যারা ইমাম আহমাদের মাসলাকের প্রকৃত অনুসারী ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবু বকর খল্লাল (৩১১ হি.), আবুল ফজল তামিমি (৪১০ হি.), ইবনুল জাওযি (৫৯৭ হি.), ইবনে কুদামা (৬২০ হি.), ইবনে হামদান (৬৯৫ হি.), মারয়ি কারমি (১০৩৩ হি.), ইবনে বালবান (১০৮৩ হি.) ও সাফারিনি (১১৮৮ হি.)। তাদের কিতাবসমূহ—

«العقيدة» برواية الخلال، «اعتقاد الإمام المنبل» للتميمي، «دفع شُبَه التشبيه» لابن الجوزي، «ذم التأويل» و«لمعة الاعتقاد» لابن بن قدامة، «نهاية المبتدئين» لابن حمدان، «قلائد العِقيان» لابن بَلْبان، «أقاويل الثقات» لمرعي الكرمي، «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني.

দুই. গুলাতুল হানাবিলা বা সীমালঙ্ঘনকারী হাম্বলি, যারা দেহবাদী ও মুশাব্বিহাদের দিকে ঝুঁকে গেছেন। তাদের উত্থানের তিনটি যুগ রয়েছে।

১. ইবনে হামেদ (৪০৩ হি.), আবু আলি আহওয়াযি (৪৪৬ হি.), আবু ইয়ালা হাম্বলি (৪৫৮ হি.)।

২. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হি.), ইবনুল কাইয়িম (৭৫১ হি.) ও ইবনে আবিল ইয হানাফি (৭৯২ হি.)।

৩. শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাব নজদি (১২০৬ হি.) ও সউদি সালাফিগণ, বিশেষত শায়খ খলিল হাররাস (১৩৯৫ হি.), শায়খ বিন বায (১৪২০ হি.), শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন (১৪২১ হি.), শায়খ আলবানি (১৪২০ হি.) ও শায়খ সালেহ ফাউজান। এ বিষয়ে ভালোভাবে জানার জন্য দেখতে পারেন,

"دفع شبه التشبيه" لابن الجوزي، "القول التمام" لسيف العصري، "الصفات الخبرية" لعياش الكُبيسي، "السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل" للتقي السبكي مع التكملة المسماة بــ"تبديد الظلام المخيَّم من نونية ابن القيم" للشيخ الكوثري، "نجم المهتدي ورجم المعتدي" لابن المُعَلِّم القُرَشي، "الحنابلة واختلافهم مع السلفية المعاصرة" لمصطفى الحنبلي، "رفع الغاشية عن المجاز والتأويل وحديث الجارية" لنضال، "تنزيه الحق المعبود عن الحيِّز والحدود" لعبد العزيز الحاضري، "إتحاف الكائنات ببيان مذهب الخلف والسلف في المتشابهات" لمحمود السبكي، "الفرق العظيم بين التنزيه والتجسيم" لسعيد فودة وكتبه الأخرى، "التجسيم والمجسمة" لعبد الفتاح اليافعي، "ابن تيمية ليس سَلَفيا" لمنصور محمد محمد عَوَيْس.

উল্লেখ্য, শেষ দুই যুগের ব্যক্তিদের আকিদা বিষয়ে আরও কিছু ভ্রান্তি রয়েছে। যেমন তাওহিদের ভুল বা অপব্যাখ্যা করা তথা তাওহিদকে তিন প্রকারে ভাগ করে মক্কার মুশরিকরা তাওহিদুর রুবুবিয়াতে বিশ্বাসী ছিল কিংবা নবী-রাসুলগণকে শুধু তাওহিদুল উলুহিয়া প্রতিষ্ঠা করার জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে ইত্যাদি বলে তাওয়াসসুল বা অসিলা গ্রহণ, তাবাররুক, তাবিজ লটকানো ও নবীজির কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর কিংবা অলিগণের মাজার জিয়ারত ইত্যাদির প্রসঙ্গ টেনে অপ্রয়োজনীয় তাকফির করা বা মুশরিক বলা। এর জন্য দেখতে পারেন,

"كلمة هادئة في بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد" لعمر عبد الله الكامل، "التنديد بمن عدد التوحيد" للسقاف، "التوسل بالصالحين" و"التبرك" كلاهما لعبد الفتاح اليافعي، "الرؤية الوهابية للتوحيد وأقسامه" لعثمان النابلسي، "تكفير الوهابية لعموم الأمة المحمدية" لعلي مقدادي، "شفاء السقام في زياره خير الانام" للتقي السبكي، "الجوهر المنظم في زياره القبر المعظم" لابن حجر الهيتمي وغيرها.

তারা আরও বলেন, মাতুরিদি-আশআরিরা তাওহিদে উলুহিয়ার আলোচনা করেন না। সৌদি আরবে তাবলিগ জামাতের নিষিদ্ধতার বয়ানেও একই অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, তাবলিগ ওয়ালারা তাওহিদুল উলুহিয়ার দাওয়াত দেয় না। এগুলো সবই মিথ্যাচার। স্বয়ং ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদির কিতাব تأويلات القرآن [সুরা ফাতিহা (১) : ৪; সুরা হুদ (১১) : ৫০, ৬১; সুরা ইসরা (১৭) : ২৩; সুরা কাহফ (১৮) : ৪৬], প্রসিদ্ধ

আশআরি আলেম ফখরুদ্দিন রাযির 'তাফসিরে কাবির' [সুরা ফাতিহা (১) : ৪], ইমাম বাকিল্লানির 'আল-ইনসাফ' (পৃ. ৯) এবং তাফতাযানির 'শরহুল মাকাসিদ' (৪/৩৯) দেখুন। তারা কত স্পষ্ট ভাষায় তাওহিদে উলুহিয়ার আলোচনা করেছেন। এভাবে তাবলিগের মৌলিক ছয় উসুলের পঞ্চম উসুল তথা সহিহ নিয়ত তাওহিদুল উলুহিয়াই সাব্যস্ত করে।

সালাফের আকিদা ও সালাফি আকিদা এক নয়

সালাফের আকিদা হচ্ছে, হুবহু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর আকিদা। আর আহলুস সুন্নাহ হচ্ছে, তিনটি ধারা তথা 'আশআরিয়্যাহ', 'মাতুরিদিয়্যাহ' ও 'আসারিয়্যাহ'। যারা সালাফ তথা সাহাবা, তাবেয়িন ও তাবে তাবেয়িনের আকিদারই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

আর 'সালাফি' হচ্ছে, আলোচিত 'গুলাতুল হানাবিলার' তিন যুগের সমষ্টিরূপ। যাতে সালাফের নামে এমন অনেককিছু আকিদার মধ্যে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে, যেগুলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর মুতাওয়ারাস আকিদার অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই 'সালাফের আকিদা' আর 'সালাফি আকিদা' দুটি এক নয়। এ পার্থক্য না জানার কারণে অনেক ভাই 'সালাফি আকিদা'-কে 'সালাফের আকিদা' মনে করে ধোঁকা খেয়ে বসে! আল্লাহ তাআলা হেফাজত করুন।

বলাবাহুল্য, আকিদা ও আমল দুটি ভিন্ন বিষয়। আশআরি, মাতুরিদি, আসারি, সালাফি, মুতাযিলা, জাহমিয়া, কাররমিয়া, মুজাসসিমা, মুশাব্বিহা কিংবা এ যুগের কাদিয়ানি, শিয়া ও বেরেলবি ইত্যাদি শব্দগুলো আকিদার ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকার প্রতি লক্ষ করে বলা হয়।

আর হানাফি, মালেকি, শাফেয়ি, হাম্বলি ও লা-মাজহাবি তথা আহলে হাদিস আমলের ভিন্নতাকে কেন্দ্র করে বলা হয়ে থাকে।

সুতরাং কেউ আমলের ক্ষেত্রে হানাফি হয়ে আকিদায় মুতাযিলি হতে পারে, যেমন যামাখশারি ছিলেন। যেভাবে আমলে হানাফি হয়ে আকিদায় বেরেলবি হতে পারে, যেমন আমাদের সুন্নি নামের বেদআতি ভাইয়েরা। এভাবে আমলে শাফেয়ি হয়ে আকিদায় আসারি হতে পারে, যেমন ইমাম যাহাবি ছিলেন। এটা বুঝে থাকলে সামনের কথা পরিষ্কার হবে।

'শরহুল আকিদাতিত তহাবিয়্যা'-এর লেখক ইবনে আবিল ইয হানাফি রহ., আরবের প্রসিদ্ধ হাদিস গবেষক শাইখ শুআইব আরনাউত রহ. ও ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. প্রমুখ আমলের ক্ষেত্রে হানাফি কিংবা উদারপন্থী

হলেও আকিদার অনেক বিষয়ে সালাফি। কাজেই ইবনে আবিল ইযের সাথে হানাফি শব্দ দেখে প্রতারিত হবেন না।

আহলে ইলমের কাছে এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, ইবনে আবিল ইযের উক্ত শরাহটি সহজবোধ্য ও আকিদার সাথে হাদিস-আসার উল্লেখ করা এবং কিছু বিষয়ে ভালো আলোচনা থাকার পাশাপাশি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর বিপরীত অনেক আকিদার কথা রয়েছে। আমার জানামতে ছোটখাটো বিষয় বাদ দিলেও মৌলিকভাবে ১৫টির চেয়ে বেশি ভ্রান্ত আকিদা, অপব্যাখ্যা ও ভুল তথ্য রয়েছে। শাইখ সাইদ ফুদার الشرح الكبير ও মুফতি রেজাউল হক সাহেবের العصيده السماويه দেখলে সহজে পেয়ে যাবেন।

তা ছাড়া উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থে ভ্রান্তির মূল কারণ হচ্ছে, তিনি শাইখ ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর কিতাবসমূহ থেকে তাদের নাম নেওয়া ছাড়া অসংখ্য কথা ও বক্তব্য ব্যাখ্যা হিসেবে এনেছেন। এটা নিছক দাবি নয়, বরং সালাফি আলেম ড. আবদুল আজিজ বিন মুহাম্মাদ এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। যার নাম হচ্ছে, مصادر ابن ابي العز في شرح العقيده الطحاويه, এতে তিনি এমন ১৭৮টি জায়গা চিহ্নিত করেছেন।

আশা করি ইবনে আবিল ইযের ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সালাফিদের কাছে প্রিয় হওয়া কিংবা তাদের মাদরাসার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং আমাদের কাছে তা অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ পরিষ্কার হয়েছে।

একটি বিনীত দরখাস্ত

সচেতন মহলের কাছে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র এবং বর্তমান সময়ের কঠিন অবস্থা ও বাস্তবতা অজানা নয়। তাই সময়ের আবেদন ও দাবিকে সামনে রেখে আমাদের কিতাবের দরসের পদ্ধতি সাজানো দরকার।

বর্তমানে আমাদের দরসগুলোয় যে-সকল ফন ও বিষয় বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে তন্মধ্যে 'আকিদা' প্রথম ও প্রধানতম। আমরা ফিকহের জন্য স্বতন্ত্রভাবে (নিচেরগুলো বাদ দিয়ে *নুরুল ইযাহ* থেকে *হেদায়াসহ*) অনেক কিতাব পড়লেও আকিদার জন্য শুধু 'শরহুল আকাইদ' পড়ি। তবে কোথাও কোথাও বছরের শেষে গুরুত্বহীনভাবে 'আকিদাতুত তাহাবি'-ও পড়ানো হয়। অথচ এ কিতাবটির প্রতি আরববিশ্বে কত গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এখানে আমার

নেসাব বিষয়ে আলোচনা করা উদ্দেশ্য না, আর আমি এটার আহলও না। এ বিষয়ে যারা উপযুক্ত ও যাদের দায়িত্ব তারা ফিকর করবেন ও বলবেন।

এখানে আমি যেটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি তা হলো, বর্তমান নেসাবের মধ্যেই আমাদের দরসগুলোয় ঈমান-আকিদা ও এ সংক্রান্ত বিষয়কে যথাযথ মূল্যায়ন করা। তাই আকিদার কিতাব এবং কিতাবুল ঈমান ও কিতাবুল ফিতান ওয়াল-মালহামা এবং এ সংশ্লিষ্ট আলোচনা সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রাণবন্ত করে তোলা প্রয়োজন এবং পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও মূল্যায়নেও ঈমান-আকিদাসংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

এ ক্ষেত্রে কয়েকটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়

১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর আকিদাগুলো নুসুসসহ ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা। এরপর তা হিফজ করানো। যেমন আরকানে ঈমান কয়টি ও এর নস কী ইত্যাদি। আর এমনিতেই নুসুস হিফজের ক্ষেত্রে আমাদের যা গাফলতি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আলহামদুলিল্লাহ, এই কিতাবে আকিদার নুসুস জমা করা হয়েছে। এটা থেকে সহজে হিফজ করতে পারবে।

২. কিতাবে উল্লেখিত ফেরকাগুলোর সাথে সাথে বর্তমান আলোচিত ফেরাকে ইসলামিয়া ও আদইয়ানে বাতিলা এবং সমকালীন রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক দর্শন ও মতবাদগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা। আর এতে الأهم فالأهم নীতির আলোকে প্রথমে ঈমান-কুফরের বিষয়, পরে আহলুস সুন্নাহ-বিদআতিদের বিষয় লক্ষ করা।

৩. একটা তিক্ত বাস্তবতা হচ্ছে, সাধারণত আমাদের দরস ও আলোচনাগুলোয় যা আলোচিত হয়, তা প্রচলিত না। আর যা প্রচলিত, তা আলোচিত হয় না। তাই ফেরকাগুলোর বিভিন্ন আকিদা ও দর্শন থাকলেও বর্তমানে তাদের কর্মপদ্ধতিও মাঠ পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা এবং পর্যালোচনা করা অপরিহার্য। যাতে রোগ অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়া যায়। অন্যথায় দরসের পড়া দিয়ে কাজের ময়দানে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ফল দেখতে হবে। এর অনেক উদাহরণ আছে।

৪. ফেরকাগুলোর আকিদা-দর্শন তাদের রচিত ও নির্ভরযোগ্য উৎস বা তাদের প্রকাশিত ও প্রচারিত লেখালেখি থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করা। এরপর 'কাইফিয়াতে রদ', বিশেষত তাদের উসুল ও মূলনীতির আলোকে রদের পদ্ধতি রপ্ত করানো।

কওমিতে পড়ে যখন কেউ বলে, আমি কওমিতে পড়লেও 'জাহমিদের' আকিদা গ্রহণ করি না (তথা সিফাতের ক্ষেত্রে 'তাফয়িযুল মানা' করার কারণে আমরা জাহমি), তখনও যদি সময়ের আবেদন ও দাবিকে অনুধাবন করতে না পারি, তাহলে এর চেয়ে আরও কঠিন ও মারাত্মক কিছু শুনতে প্রস্তুত থাকতে হবে! ওয়াল্লাহুল মুসতাআন।

শেষ কথা, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও পথ-পদ্ধতি অবিকৃত রাখতে দাওয়াহ ও মুজাদালাহ উভয়টি লাগবে। কেননা যুগে যুগে দ্বীন-ইসলামের প্রচার-প্রসার যেভাবে এগিয়ে নিয়েছেন ধারকবাহকরা, তেমনইভাবে বিন্দুমাত্রও পিছিয়ে নেই কুরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যাকারী ও পরিবর্তনকারীরা। হোক তা কলমের ডগায় কিংবা সাহিত্যের পাতায়, সরাসরি বক্তৃতায় কিংবা মিডিয়ার পর্দায়।

তাই ইসলামের প্রচার-প্রসারে যেভাবে দাওয়াহ জরুরি, তেমনই ইসলামের পথ-পদ্ধতি সুরক্ষিত ও অবিকৃত রাখতে মুজাদালাহও জরুরি। ইসলাম কেয়ামতের আগ পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় উড়তে থাকবে। আর তা ওড়ার জন্য দুটি ডানা লাগবে। তন্মধ্যে একটির নাম দাওয়াহ আর অপরটির নাম মুজাদালাহ। ইরশাদ হয়েছে,

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

> আপন পালনকর্তার পথের প্রতি দাওয়াত দিন হিকমতের সাথে ও সুন্দর উপদেশ শুনিয়ে এবং তাদের সাথে মুজাদালাহ বা বিতর্ক করুন সর্বোত্তম পন্থায়।—সুরা নাহল, ১২৫

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা দুটি আদেশ দিয়েছেন। এক. ঈমান ও আমলের দাওয়াহ। দুই. বিতার্কিকদের সাথে মুজাদালাহ তথা বিতর্ক ও দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে ভ্রান্তি ও বাতিলকে ভুল সাব্যস্ত করে সঠিকটা তুলে ধরা। কেননা দাওয়াহর দ্বারা উম্মাহ সঠিক পথের দিশা পাবে এবং ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে।

আর মুজাদালাহর মাধ্যমে—

১. দ্বীন-ইসলামের সঠিক রূপ ও পথ-পদ্ধতি কেয়ামত পর্যন্ত সুরক্ষিত ও অবিকৃত থাকবে।

২. ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি, ছাড়াছাড়ি, ভুল বা অপব্যাখ্যা, বিকৃতি, বিভ্রান্তি ও মিথ্যাচারসহ যাবতীয় প্রোপাগান্ডার অসারতা উম্মাহ বুঝতে পারবে।

৩. মুসলমানরা (জন্মলগ্ন থেকে মুসলিম হোক বা দাওয়াহর মাধ্যমে হোক) সব ধরনের সংশয়-সন্দেহ থেকে মুক্ত থেকে সঠিক আকিদা ও আমলের ওপর অবিচল থাকবে। অন্যথায় মুসলমানরা সন্দিহান হয়ে পড়বে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

> يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ.
>
> প্রত্যেক যুগে সৎ ও নিষ্ঠাবান লোকেরা কুরআন-হাদিসের ধারকবাহক হবে। তারা সীমালঙ্ঘনকারীদের অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি, পথচ্যুতদের মিথ্যাচার বা বিকৃতি এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা ও ছাড়াছাড়ি থেকে তা সুরক্ষিত ও অবিকৃত রাখবে।—হাদিস হাসান, সবিস্তারে দেখুন, বান্দার *আল-আরবায়ুনা হাদিসান ফিল ইলম*, পৃ. ৩৭-৩৮

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি, ছাড়াছাড়ি, ভুল বা অপব্যাখ্যা, বিকৃতি ও বিভ্রান্তি থেকে হেফাজত করুন।

এই কিতাবের মূলটা আমি আগে দেখেছি। এতে বড়দের অভিমত রয়েছে। এখন আমাদের উচিত এ থেকে উপকৃত হওয়া। আল্লাহ তাআলা লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবার মেহনত কবুল করুন এবং উত্তম বদলা দান করুন। আমিন।

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وصلي الله علي سيد المرسلين وعلي آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللّهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

সাঈদ আহমদ, আফাল্লাহু আনহু ওয়া আফাহু

খাদিমুত তালাবা,

দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

লেখক পরিচিতি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، أمّا بعد.

হজরত মাওলানা সামীরুদ্দীন কাসেমী দামাত বারাকাতুহুম একজন অত্যন্ত মেধাবী ও প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। তিনি ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ওপর চমৎকার কাজ সম্পাদন করেছেন। বর্তমান যুগের চাহিদাকে খুব ভালোভাবে বুঝে ছাত্রদের জন্য অনেক বিষয় একত্র করে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করেছেন। ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের মধ্যে হাদিসের রেফারেন্স বা তথ্যসূত্র যোগ করা, প্রতিটি আকিদাকে ১০টি আয়াত ও ১০টি হাদিস দ্বারা প্রমাণ করা, মিরাস বা উত্তরাধিকার বণ্টনকে আধুনিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা, বিজ্ঞান ও কুরআনের মতো নির্বাচিত গ্রন্থ রচনা করা এবং গোটা পৃথিবীর জন্য নির্ভুল ক্যালেন্ডার তৈরি করে এই অঙ্গনে ইমামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি হলো ওই সকল ব্যতিক্রম কাজ, যার ফলে কবির ভাষায় বলা যেতে পারে—

"হাজার বছর নার্গিস ফুল তার সৌন্দর্যহীনতার জন্য কাঁদছে

অনেক ত্যাগের বিনিময়েই বাগানের শোভা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়।"

জন্ম

হজরত মাওলানা সামীরুদ্দীন সাহেব ৬ নভেম্বর ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ২৫ মহররম ১৩৭০ হিজরিতে ভারতের ঝাড়খণ্ড প্রদেশের গুড্ডা জেলার মাহগাঁওয়া থানার ঘুট্টি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রদেশটি পূর্বে বাহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে পৃথক করে ঝাড়খণ্ড প্রদেশ বানানো হয়েছে। এই গ্রামটি গুড্ডা শহর থেকে ৩৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। যেখানে এখনো বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা নেই।

বংশ তালিকা

নাম সামীরুদ্দীন। পিতার নাম জামালুদ্দীন। দাদার নাম মুহাম্মাদ বখশ ওরফে লাদুনি। পরদাদার নাম চুলহায়ী। বংশ শায়েখ সিদ্দিকি। অনেক পরে গিয়ে তার বংশ হজরত আবু বকর রা.-এ সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এজন্য এই বংশকে শায়খে সিদ্দিকি বলা হয়। নিয়মতান্ত্রিক কোনো বংশতালিকা নেই। তবে তার বংশে এটাই প্রসিদ্ধ।

শিক্ষাজীবন

প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন নিজ গ্রামের মকতবে ভাগলপুর জেলার গরিয়াচক গ্রামের মৌলভি আবদুর রউফ ওরফে গুনি রহ.-এর নিকট। এই মকতবেই তিনি উর্দু, হিন্দি, ফারসি ও গণিতের শিক্ষা লাভ করেন। ১২ বছর বয়সে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে মাদরাসা দারুল উলুম আটকি রাচিতে শিক্ষা লাভ করার জন্য গমন করেন। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে পাটনা ভাগলপুরের মাদরাসা এজাজিয়ায় ভর্তি হন। ১৯৬৬ সালে গুজরাটের দারুল উলুম ছাপিতে যান এবং ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। শাবান ১৩৯০ হিজরি মোতাবেক ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন।

উস্তাদবৃন্দ

তিনি *সহিহ বুখারি* প্রথম খণ্ড পড়েছেন দারুল উলুমের তৎকালীন শায়খুল হাদিস হজরত মাওলানা আল্লামা ফখরুদ্দিন সাহেব রহ.-এর নিকট। *সহিহ বুখারি*র দ্বিতীয় খণ্ড পড়েছেন হজরত মাওলানা মুফতি মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহি রহ.-এর নিকট। *সহিহ মুসলিম* পড়েছেন হজরত মাওলানা শরিফ সাহেব রহ.-এর নিকট। *সুনানুত তিরমিজি* পড়েছেন হজরত মাওলানা ফখরুল হাসান সাহেব মুরাদাবাদী রহ.-এর নিকট। *সুনানু আবি দাউদ* পড়েছেন হজরত মাওলানা আবদুল আহাদ সাহেব রহ.-এর নিকট। *সুনানুন নাসায়ি* পড়েছেন হজরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ বাহারি রহ.-এর নিকট। *সুনানু ইবনি মাজাহ* পড়েছেন হজরত মাওলানা নাঈম আহমাদ দেওবন্দি রহ.-এর নিকট। *মুখতাসারুত তহাবি* পড়েছেন হজরত মাওলানা মিয়া আসগর হুসাইন সাহেব দেওবন্দির নিকট। *মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ* পড়েছেন মাওলানা আনজার শাহ কাশ্মীরি রহ.-এর নিকট। তিনি ছিলেন এ যুগের ইলমের পাহাড়। যার সামনে তিনি ছাত্র হয়ে বসার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

মিশকাতুল মাসাবিহ-এর প্রথম খণ্ড পড়েছেন হজরত মাওলানা নাসির খান সাহেবের নিকট। আর *মিশকাতুল মাসাবিহ*-এর দ্বিতীয় খণ্ড পড়েছেন হজরত মাওলানা সালেম কাসেমী দেওবন্দি সাহেবের নিকট।

ওই সময়ে শায়খুল হাদিস হজরত মাওলানা জাকারিয়া রহ. শায়খুল হাদিস মাদরাসা মাজাহেরুল উলুম সাহারানপুর এর নিকট দুইবার যথাক্রমে ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালে হাদিসে মুসালসাল পড়েছেন। আর *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা* পড়েছেন দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম আল্লামা কারি তৈয়্যব সাহেব রহ.-এর নিকট।

আরবি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন

তিনি ১৯৭১ সালে দারুল উলুম দেওবন্দের আরবি সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এ বিষয়ে তিনি দীর্ঘ তিন বছর দারুল উলুম দেওবন্দের আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উস্তাদ বর্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক হজরত মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানবি রহ.-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। যেখানে তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন সেখানে এটাও শিখেছেন—কীভাবে সহজ-সরলভাবে ছাত্রদের জন্য গ্রন্থ রচনা করা যায় এবং কঠিন ও জটিল বিষয়কে সহজ ও বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করা যায়। এই পদ্ধতি হজরতের জীবনে এমন শৈল্পিক রূপ ধারণ করেছে যে, আজ পর্যন্ত ছয়টি বড় বড় শাস্ত্রের ওপর কাজ করেছেন এবং সবগুলোকেই অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে ছাত্রদেরকে হৃদয়ঙ্গম করিয়েছেন। যার ফলে ছাত্ররা আজও হজরতকে স্মরণ করে থাকে। হজরত মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানবি রহ.-এর তত্ত্বাবধানে এটাও শিখেছেন যে, কীভাবে ছাত্রদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা যায় এবং কতটা সহজ-সরলভাবে জীবনযাপন করা যায়। যেন ছাত্ররা তাকে নিজের অভিভাবক ও কল্যাণকামী মনে করে। হজরত মাওলানা সামীরুদ্দীন সাহেব হজরত মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানবি রহ.-এর অত্যধিক ভক্ত ও অনুরক্ত। অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে স্মরণ করেন।

শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জন

১৯৭২ সালে শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য ভর্তি হন এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রের ওপর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। দারুল উলুম দেওবন্দের পাঁচ বছরের জীবন হজরত মাওলানার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ সময়ে তিনি সর্বদা একাকী নীরবে বসে জ্ঞান অর্জনে ব্রত থাকতেন। হজরত

মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেব একবার দারুল উলুম দেওবন্দের উস্তাদ হজরত মাওলানা আবদুল খালেক মাদরাজি সাহেবের সামনে মাওলানা সামীরুদ্দীনের আলোচনা করলে তিনি বলেন, মাওলানা সামীরুদ্দীন সেই ব্যক্তি না, যে কবরস্থানে বসে নীরবে অধ্যয়ন করতেন? আমি বললাম, হ্যাঁ! সে-ই। তারপর মাওলানা আবদুল খালেক মাদরাজি সাহেব মাওলানার পরিশ্রমের বেশ কয়েকটি ঘটনা শুনালেন। যার দ্বারা অধমের ধারণা হয়েছে যে, মাওলানা শিক্ষা জীবনের শুরুতেই অধ্যয়নের প্রতি কতটা পরিশ্রমী ছিলেন। যার ফল হলো, বর্তমানে তিনি ছয়টি শাস্ত্রের ওপর প্রায় ৪০টি বিশাল বিশাল গ্রন্থের লেখক।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ

শিক্ষকতাকালীনই তিনি হাইস্কুলে Gcse পরীক্ষা দেন এবং উচ্চ নাম্বার পেয়ে পাশ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কলেজে পরীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে আর তা হয়ে উঠেনি। তিনি ভূগোল সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞ। যার কারণে তিনি "সামারাতুল ফালাকিয়াত বা জ্যোতির্বিদ্যার মর্মকথা"র মতো বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন এবং "সামীরি ক্যালেন্ডার"-এর ন্যায় নির্ভুল ও ব্যতিক্রমী ক্যালেন্ডার তৈরি করে গোটা পৃথিবীকে অবাক করে দেন। হজরতের গণিতের ওপরও অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে। যার ফলে তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে উত্তরাধিকার বণ্টন সম্পর্কে "সামারাতুল মিরাস বা উত্তরাধিকারের মর্মকথা"র মতো ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলো তার ভূগোল ও গণিতের ওপর পাণ্ডিত্যেরই কারিশমা।

শিক্ষকতা

শাওয়াল ১৩৯৩ হিজরি মোতাবেক জানুয়ারি ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। তখন তিনি গুজরাটের মারগুব পাঠানের মাদরাসায়ে কানযে পাঁচ বছর ছিলেন। সেখানে তিনি শরহে জামি পর্যন্ত বিভিন্ন কিতাবের পাঠ দান করেন। তারপর তিনি গুজরাটের আনন্দের মাদরাসায়ে তালিমুল ইসলামে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং সেখানে তিনি পাঁচ বছর পর্যন্ত দাওরায়ে হাদিসের কিতাবসমূহের দরস প্রদান করেন। তারপর তিনি খানকায়ে রাহমানি মুঙ্গির বাহারে চলে যান। সেখানেও তিনি দাওরায়ে হাদিসের কিতাবসমূহের দরস প্রদান করেন এবং এখান থেকে ২১ জুন ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে মাদরাসায়ে তালিমুল ইসলাম ঢাজবেরি ইংল্যান্ড তাশরিফ নেন। যা গোটা ইউরোপে তাবলিগের অনেক বড় কেন্দ্র। তখন উক্ত

মাদরাসায় তিনি মেশকাত জামাত পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান করেন এবং *মিশকাতুল মাসাবিহ* দরসের দায়িত্ব তার ওপরই ন্যস্ত ছিল। এর কিছু দিন পর তিনি শিক্ষকতা থেকে অবসর নেন এবং পুরোপুরিভাবে লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন এবং আজ পর্যন্ত এই লেখালেখিতেই ব্যস্ত আছেন।

রচনাবলি

হজরত মাওলানা হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও ইংল্যান্ডের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার নিয়মিত কলামিষ্ট। যেগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কলাম ছাপা হয়ে আসছে। তিনি জামিয়া ইসলামিয়া ম্যানচেস্টার থেকে প্রকাশিত সাময়িকী 'আল-জামিয়া'-এর সম্পাদক। এ ছাড়াও এখন পর্যন্ত ৪০টি গ্রন্থ তার কলম থেকে জন্ম নিয়েছে। যার মধ্যে বিশেষ কিছু গ্রন্থ হলো :

১. আসমারুল হেদায়া (১৩ খণ্ড)
২. শরহে সামীরী (৪ খণ্ড)
৩. সামারাতুন নাজাহ ইলা নুরিল ইযাহ
৪. সামারাতুল আকাইদ (আকিদার মর্মকথা)
৫. সামারাতুল মিরাস
৬. সামারাতুল ফালাকিয়াত
৭. সাইন্স আওর কুরআন
৮. আসবাবে ফুসখে নিকাহ
৯. সামারাতুল আওযান
১০. তুহফাতুত তালাবা শরহে সাফিনাতুল বুলাগা
১১. হাশিয়ায়ে সাফিনাতুল বুলাগা (আরবি)
১২. খুলাসাতুত তালিল
১৩. রুইয়াতে হেলাল ইলমে ফালাকিয়াত কি রোঁশনিমেঁ
১৪. ইয়াদে ওয়াতন
১৫. আনওয়ারে ফারসি
১৬. তাফরিক ও তালাক
১৭. ইসাইয়াত কিয়া হ্যায়
১৮. সামীরী ক্যালেন্ডার

ছাত্রদের খেদমতের প্রবল ইচ্ছা

হজরত মাওলানা সামীরুদ্দীন সাহেব একজন কোমল হৃদয় ও অত্যন্ত নম্র স্বভাব এবং মানবসেবার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিত্ব। ছাত্রদের খেদমত করাকে যিনি নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করেন। এজন্য ছাত্রদের খেদমতের জন্যই উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহ রচনা করেন এবং তাদেরকে একজন আদর্শ শিক্ষক ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী বানাতে তিনি সর্বদাই সচেষ্ট। তাইতো যখন তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে পড়তেন, তখনো তার এলাকার গরিব-অসহায় বাচ্চাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন এবং মাদরাসায় ভর্তি করে দিতেন। যতদিন তিনি গুজরাটে শিক্ষকতা করেছেন, তখনো দশের অধিক বাচ্চাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন এবং মাদরাসায় ভর্তি করে পড়ালেখার ব্যবস্থা করে দিতেন। তখন তিনি হাদিসের উস্তাদ ছিলেন। *সুনানু আবি দাউদ* ও *সুনানুত তিরমিজি* পড়াতেন। কিন্তু এই বাচ্চাদের রেলগাড়িতে চড়ানোর জন্য কখনো কুলি ডাকতেন না। সর্বদা নিজ কাঁধে করেই বাচ্চাদের ট্রাঙ্ক ও সামানাপত্র রেলগাড়িতে উঠাতেন। অনেকবার এমনও হয়েছে—প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে অল্পবয়স্ক বাচ্চাদেরকে নিজের কাঁধের ওপর উঠিয়ে রেলগাড়িতে চড়াতেন। বাচ্চাদেরকে সিটে বসিয়ে নিজে নিচে সামানার ওপর বসে ভ্রমণ করেছেন এবং এর জন্য বাচ্চাদের থেকে কোনো প্রকার ভাড়া নেননি। বরং ছাত্রদের খেদমত করাকে নিজের সৌভাগ্য মনে করতেন। তার এই অবদানের ফলে তার এলাকার অসংখ্য গবির-অসহায় বাচ্চা উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে ও আলেমে দ্বীন হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত হয়েছে।

ছাত্রদের সঙ্গে তার বিনয়

তিনি ছাত্রদের জন্য মনপ্রাণ উজাড় করে দেন। আজও তার স্বভাব হলো, তিনি নিজে অনেক সুস্বাদু চা বানিয়ে একটু একটু করে কাপের মধ্যে ঢেলে তাঁর ছাত্রদেরকে নিজ হাতে পরিবেশন করে থাকেন। মাহফিলে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে কুরআন-হাদিস ও বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে পুরো মজলিসকে মাতিয়ে রাখেন। অনেক ছাত্ররাই নিজেদের জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতে নিয়মিত তার মজলিসে উপস্থিত হয়ে হৃদয় প্রশান্ত করে ফিরে যান।

তিনি অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা, বেশ কয়েকটি শাস্ত্রের পণ্ডিত। শুরুহাত তথা ব্যাখ্যাগ্রন্থের জগতে অনেক নিয়ম-কানুনের প্রবর্তক। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার জগতে তাকে পথপ্রদর্শক মনে করা হয়। তা সত্ত্বেও বিনয় ও নম্রতার এমন দৃষ্টান্ত আমি খুব কমই দেখেছি।

সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজ

তিনি যখন ইংল্যান্ডের বাসিন্দা হলেন, তখন সেখান থেকেও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ শুরু করেন। বেশ কয়েকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেগুলোতে শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেছেন। ত্রিশেরও অধিক এলাকায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। দুই শতাধিক নলকূপ স্থাপন। গরিব ও অসহায়দের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠনসহ জনকল্যাণমূলক কাজের এক বিরাট ছক তৈরি করেছেন। বর্তমানে তিনি প্রায় বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। অনেক রোগে আক্রান্ত। এজন্য উক্ত কাজসমূহে অনেক কমতি হচ্ছে। বর্তমানে অধিকাংশ সময় তিনি লেখালেখিতেই ব্যস্ত থাকেন। বর্তমানে তিনি শুভ্র মাথায় শুভ্র টুপি পরেন এবং শুভ্রতার সঙ্গে শুভ্র জীবনযাপন করছেন।

তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান

অত্যন্ত আশ্চর্যের একটি বিষয় হলো গ্রন্থের তথ্যসূত্র বের করা, কম্পোজ করা ও এগুলোর সেটিংয়ের জন্য অন্য কোনো লোক নেই। হাদিসের তাখরিজ তথা তথ্যসূত্র বের করা, আবার তা কম্পিউটারে কম্পোজ করা ও সেটাপ করা, পিডিএফ তৈরি করা এবং ইউটিউব ও ফেসবুকে আপলোড করা—এ সকল কাজ তিনি নিজে একাই করেন।

একবার তার শায়েখ ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত বুজুর্গ হজরত মাওলানা আবদুর রউফ সাহেব বাটেলী দামাত বারাকাতুহুম হজরতের বাসায় তাশরিফ আনেন। তার কাজ দেখে তিনি বলেন, মাওলানা সামীরুদ্দীন, আপনি তো নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন। এতগুলো গ্রন্থ রচনা করা, এতগুলো শাস্ত্রের তাহকিক, এ সকল বিষয়ের ওপর হাদিস সেট করা এবং উক্ত হাদিসসমূহের তথ্যসূত্র তালাশ করে বের করা, এগুলো তো এমন বড় বড় কাজ যে, এগুলোর জন্য স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। যেখানে ১০-২০ জন উলামা দরকার। বড় একটি অফিস দরকার। অর্থনৈতিক জোগান দরকার। তারপর গিয়ে এমন বড় বড় ও গ্রহণযোগ্য কাজ হতে পারে। আর আপনি তো আপনার বিশ্রাম কক্ষে মাত্র একটি কম্পিউটারে বসেই এ সকল কাজ নিজে একাই করে যাচ্ছেন এবং কোনো প্রকার দুনিয়াবি লোভ-লালসা ও প্রতিদান ছাড়াই সকল গ্রন্থ সকলের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন। সত্যিকথা হলো দারুল উলুম দেওবন্দের বুজুর্গদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের আদর্শকে জীবিত করেছেন।

আজ আমাদের গর্ব যে, ইংল্যান্ডের আধুনিক জাহিলিয়াতের অন্ধকার পরিবেশে বসে আল্লাহর এক বান্দা দ্বীনে হানিফের আলো প্রজ্বলিত করে যাচ্ছেন এবং বহু বছর যাবৎ যে কাজ হয়নি, বর্তমানে তা আঞ্জাম দিয়ে গোটা উম্মাহকে কৃতজ্ঞ করছে। ফালিল্লাহিল হামদ। কবির ভাষায়–

"এই সৌভাগ্য নিজের বাহুর জোরে নয় অর্জিত হয়নি

যদি মহান আল্লাহ তাআলা তাওফিক না দিতেন।"

অবশেষে আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করছি—তিনি যেন তাঁর ছায়া আমাদের ওপর দীর্ঘ করেন ও তাঁর দ্বারা আরও অধিক খেদমত নেন এবং সকল খেদমতসমূহ কবুল করে নেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

অধম সাজিদ গুফিরালাহু
১৯/০৮/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ- أَمَّا بَعْدُ.

একবার কিছু তালিবে ইলম এসে বলতে লাগলেন যে, আকিদার ওপর এমন কোনো গ্রন্থ লিখুন, যা আমাদের মতো তালিবে ইলমদেরও খুব সহজে বুঝে আসে। আমরা শুনে থাকি যে, আকিদার জন্য অকাট্য বর্ণনা প্রয়োজন। অর্থাৎ আয়াত এবং সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণ সমৃদ্ধ। এজন্য এমন গ্রন্থ লিখুন, যাতে শুধু পবিত্র কুরআনের আয়াত ও সহিহ হাদিস দ্বারা প্রতিটি আকিদা প্রমাণ করা হবে। অতঃপর সাধারণ আয়াত এবং হাদিস থাকবে যেগুলো সকল মতাদর্শের লোকেরা মানবে। তাই গ্রন্থটি অনেক সহজ-সরলভাবে লেখা হয়েছে, যাতে তালিবে ইলম ও সাধারণ পাঠকদের বুঝতে সুবিধা হয় এবং এই গ্রন্থে ওই সকল আকিদা অধিক আলোচনা করা হয়েছে, যা বর্তমান সময়ে অধিক প্রয়োজনীয়।

আমি অনেকদিন যাবৎ এ বিষয়ে ভাবতেছিলাম। অতঃপর কিছু দিনের মেহনতের পর আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে এ পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। এই পাণ্ডুলিপি তৈরির ব্যাপারে মাকতাবায়ে শামেলা থেকে অনেক সাহায্য নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটিতে তালিবে ইলমদের আবেদনের পুরোপুরি মূল্যায়ন করা হয়েছে। যেমন, এতে শুধু আয়াত এবং হাদিস দ্বারা আকিদা প্রমাণ করা হয়েছে। তবে অবশ্যই যে-সকল আকিদার ক্ষেত্রে অধিক মতবিরোধ রয়েছে, সে-সকল আকিদার ক্ষেত্রে আয়াত এবং হাদিসও অধিক আনা হয়েছে। যেন পাঠকদের সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হয়। আর যে-সকল আকিদার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার মতবিরোধ নেই, সে-সকল আকিদার ক্ষেত্রে আয়াত এবং হাদিস কিছুটা কম আনা হয়েছে। যেন গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না হয় এবং পাঠকের বিরক্তির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

আমি উলামায়ে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িদের বাণী ও ইজমা এবং কিয়াসকে অন্তর থেকে মানি এবং এগুলোর মূল্যায়নও করি। কিন্তু তালিবে ইলমদের আবেদন ছিল এ গ্রন্থে যেন কুরআন ও হাদিস অধিক থাকে। এজন্য আয়াত এবং হাদিস দিয়েই অধিকাংশ দলিল দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কথা

হলো উলামায়ে কেরামের ভাষ্যমতে আকিদার দলিল-প্রমাণ অবশ্যই অকাট্য বর্ণনা তথা কুরআনের আয়াত এবং সহিহ হাদিস হওয়া চাই। এজন্যও তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এক করে দিন

আয়াত এবং হাদিসের ওপর এজন্যও জোর দেওয়া হয়েছে যে, এগুলোই হলো মূল। সকল মত ও পথের লোকেরাই এগুলোকে মানে। সকলের আকিদার ভিত্তিও এই কুরআন এবং হাদিস। এজন্য আশা করা যায় যে, এই আকিদাসমূহের ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং মতবিরোধের এসব ফতোয়া কমে যায় এবং মুসলমানগণ একতাবদ্ধ হয়ে যায়। অথবা অন্তত এতটুকুও যদি হয় যে, বড় বড় আকিদাসমূহের ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে শাখাগত মাসাআলাসমূহের জন্য এ পথ খোলা রাখা যে, প্রত্যেক মতাবলম্বীগণ তাদের নিজেদের মতো আমল করবে।

এটা অনেক উত্তম হবে যে, সকল মতাবলম্বীগণ মুসলমানদের সম্মিলিত মাসআলাসমূহের ব্যাপারে বছরে কমপক্ষে একদিন একসঙ্গে বসবে। যেখানে একে অপরকে কোনো প্রকার তিরস্কার করবে না। কোনো প্রকার গন্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা করবে না; বরং সম্মিলিত মাসআলাসমূহের ওপর চিন্তাভাবনা করবে এবং সকলে মিলে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। তাহলে প্রশাসনের ওপর চাপ দেওয়া সহজ হবে। এটা বড় দুঃখজনক বিষয় যে, এক মতাবলম্বী বলে একরকম, অপর মতাবলম্বী বলে আরেক রকম। যার ফলে প্রশাসন নিরাশ ও মতবিরোধ মনে করে কারও মতের ওপরই আমল করে না। বরং আমাদেরকে আরও দুর্বল মনে করে বাতিল করে দেয়।

সুতরাং উক্ত ঐক্যের স্বার্থেই মূলত এই গ্রন্থটি লেখার চেষ্টা। আল্লাহ তাআলা যেন অধমের এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন এবং মানুষ আমার জন্য দুআ করেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলি, জান্নাত ও জাহান্নাম এ সবকিছুর হাকিকত তথা বাস্তবতা তো আয়াত এবং হাদিসের দ্বারাই জানতে হবে, কারও মুখের কথার দ্বারা নয়। এজন্য উলামায়ে কেরাম বলেন যে, আকিদার জন্য অকাট্য বর্ণনা তথা আয়াত এবং হাদিসই চাই। এজন্য আমি শুধু আয়াত এবং হাদিস একত্রিত করেছি এবং তা দিয়েই আকিদাসমূহ প্রমাণ করেছি।

আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী

আকাইদের মাসআলা অনেক জটিল। এ সম্পর্কে মতবিরোধও অনেক এবং প্রত্যেকের দলিলও অনেক। সুতরাং আমার জন্য এটা বলা খুবই মুশকিল যে, আমি সকল আকিদা সঠিক লিখেছি এবং এগুলোর দলিলও একদম সঠিক দিয়েছি। বরং আমার মত হলো, এতে ভুল থাকতে পারে। এজন্য এই গ্রন্থে কোনো ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। এমনকি এই গ্রন্থের কোনো আলোচনার দ্বারা কারও কোনো কষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে অন্তর থেকে ক্ষমা করে দিলে অনেক কৃতজ্ঞ থাকব।

এতটুকু অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে, আয়াত কিংবা হাদিসের সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা কোনো কথা প্রমাণিত হয়, আর আমি তার বিপরীত কিছু লিখে থাকি, তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। কেননা, কোনো আয়াত কিংবা হাদিসের খেলাফ কোনো আকিদা উপস্থাপন করে গুনাহে লিপ্ত হওয়া এবং এই বোঝা নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার আমার মোটেও ইচ্ছা নেই। তবে হ্যাঁ! কোনো উলামায়ে কেরামের মতের খেলাফ হলে আমি তাকেও সম্মান করি এবং তা মানি। কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তা উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে সমাধান পেশ করেছি

আয়াতের কোনো বাক্য কঠিন মনে হলে তার সমাধানের জন্য হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসির 'তানভিরুল মুকইয়াস' থেকে উক্ত বাক্যের সমাধান পেশ করেছি। কেননা, এই তাফসিরের সম্বন্ধ অন্তত একজন মহান সাহাবির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং অনেক মুফাসসিরদের মতে তার তাফসিরটি যথেষ্ট বিশুদ্ধ। এজন্য আবার অন্যান্য তাফসিরকে অস্বীকার করছি না। তবে সমাধানের জন্য আমি এটাকে নির্বাচন করেছি।

এ গ্রন্থে সরাসরি কারও নাম উল্লেখ করার বিষয়টি খুব সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। যেন পাঠক আবার তাকে খারাপ মনে না করে। এমনকি কারও সম্পর্কে ইশারা-ইঙ্গিতও করা হয়নি। যেন কারও অসম্মান না হয় এবং মতবিরোধ বৃদ্ধি না পায়। তারপরও কারও খারাপ লাগলে, আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে মাফ করে দেবেন।

এ গ্রন্থ রচনায় যে-সকল ব্যক্তিগণ আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে আমার স্ত্রীর কৃতজ্ঞতা

আদায় করছি। সে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা না করলে এই গ্রন্থ লিখতে পারতাম না। আল্লাহ তাআলা তাকে উভয় জাহানে এর উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি হজরত আল্লামা আখতার সাহেব ও হজরত মাওলানা আবদুর রউফ লাজপুরী সাহেবের। তারা সর্বদা আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন। হজরত মাওলানা মারগুব লাজপুরী সাহেব তো আমার এই পুরো গ্রন্থটি সম্পাদনাও করে দিয়েছেন। এজন্য তার নিকটও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাআলা এ সকল হজরতকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার পাঠকদের নিকট দুআর দরখাস্ত। আল্লাহ তাআলা যেন আমার পরকালকে ঠিক করে দেন এবং আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে আমাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন। আমার বর্তমান বয়স ৬৮ বছর। একদমই বৃদ্ধ বয়স। হাত একেবারেই খালি। ঠিক নেই কোন সময় ডাক এসে যায়। এজন্য যখনই স্মরণ হয় সম্ভব হলে তখনই একটু দুআর আবেদন।

দুআর মুহতাজ
অধম সামীরুদ্দীন কাসেমী গুফিরালাহু
ম্যানচেস্টার, ইংল্যান্ড
২০১৮/০২/১৩ খ্রিষ্টাব্দ
ইমেইল : samiruddinqasmi@gmail.com

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহ তাআলার সত্তা

এ আকিদা সম্পর্কে ৬১টি আয়াত এবং ৪টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

বর্তমানে কিছু লোক নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ তারা বলে যে, আল্লাহ নেই। এই পৃথিবী নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে। না হিসাব-নিকাশ আছে এবং না কেয়ামত আছে। এজন্য আমাদের আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করার এবং তাঁর ইবাদত করার প্রয়োজন নেই। এ বিপদ সকল আসমানি ধর্মাবলম্বীদের জন্যই। এজন্য আমি ওই সকল আয়াতসমূহ উপস্থাপন করছি, যা থেকে জানতে পারি যে, আল্লাহ আছেন। তিনিই সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই সকলকে ধ্বংস করবেন। কেয়ামত সংঘটিত করবেন এবং সকলের হিসাব নেবেন। আর যে ঈমানের সঙ্গে যাবে তাকে জান্নাত দেওয়া হবে এবং যে ঈমান ছাড়া মারা যাবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এ গ্রন্থে আমি এর ওপরও জোর দিয়েছি যে, জীবন-মরণ, সুস্থতা-অসুস্থতা, রিজিক, স্ত্রী-সন্তান—এ সবকিছু দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। এজন্য একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা উচিত এবং একমাত্র তাঁর নিকটই সকল প্রয়োজন পেশ করা উচিত।

আল্লাহ তাআলার সত্তাগত নাম 'আল্লাহ', বাকি সকল নাম গুণবাচক

'আল্লাহ' শব্দটি আল্লাহ তাআলার সত্তাগত নাম। আর এটা ব্যতীত যত নাম রয়েছে, তা সবই গুণগত নাম। অর্থাৎ সেই নামটি আল্লাহ তাআলার কোনো গুণের কারণে নামকরণ হয়েছে। যেমন, 'রাজ্জাক' নামটি এজন্য আল্লাহ তাআলার নাম হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা রিজিকদাতা। নিম্নের আয়াতে আল্লাহ তাআলার সত্তাগত নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

বলো, আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, একচ্ছত্র ক্ষমতাধর।[১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

তিনি পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ, তিনি এক, প্রবল পরাক্রান্ত।[২]

এই দুই আয়াতে আল্লাহ তাআলার সত্তাগত নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়াও আরও বহু আয়াত রয়েছে, যেখানে আল্লাহ তাআলার সত্তাগত নাম ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা চিরকাল ছিলেন এবং চিরকাল থাকবেন

আল্লাহ ওই সত্তাকে বলে, চিরকাল ছিলেন এবং চিরকাল থাকবেন। তাঁর কোনো শুরু নেই এবং কোনো শেষও নেই। যেমন কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

তিনিই প্রথম ও শেষ এবং প্রকাশ্য ও গোপন; আর তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।[৩]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

তাঁর চেহারা (সত্তা) ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল।[৪]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ.

হে আল্লাহ, আপনিই প্রথম। আপনার পূর্বে কিছুই নেই। আপনিই শেষ। আপনার পরে আর কিছু নেই। আপনি প্রকাশ্য। আপনার ওপর কেউ নেই। আপনি গোপন। আপনি ব্যতীত আর কেউ নেই।[৫]

---

১. সুরা রাদ, ১৩:১৬
২. সুরা যুমার, ৩৯:৪
৩. সুরা হাদিদ, ৫৭:৩
৪. সুরা কাসাস, ২৮:৮৮
৫. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৭১৩

এ সকল আয়াত ও হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা চিরকাল ছিলেন এবং চিরকাল থাকবেন।

আল্লাহ তাআলার সত্তা কখনো নিঃশেষ হবে না এবং না তাঁর মৃত্যু হবে

আল্লাহর সত্তা নিঃশেষ হওয়া থেকে পবিত্র। এর প্রমাণ এই আয়াত—

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

তাঁর চেহারা (সত্তা) ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল।[৬]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾

আর তুমি ভরসা কর এমন চিরঞ্জীব সত্তার ওপর যিনি মরবেন না।[৭]

এ সকল আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার সত্তা নিঃশেষ হওয়া এবং মৃত্যু থেকে পবিত্র।

হায়াত চার প্রকার

ক. এক আল্লাহ তাআলার হায়াত; এতে না নিঃশেষ আছে, না মৃত্যু। তিনি চিরকাল থেকে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন।

খ. দুনিয়ার হায়াত; এটা হলো মানুষ এবং জীবজন্তুর হায়াত। এদের হায়াত একটা সময় ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করার দ্বারা (এদের অস্তিত্ব) হয়েছে এবং পুনরায় নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং মৃত্যু বাস্তবায়ন হয়ে যাবে।

গ. কবরের হায়াত; এই হায়াতকে হায়াতে বরযখি বা কবরের হায়াত বলে। এটা শুরু হবে মৃত্যুর পরে এবং চলবে কেয়ামত পর্যন্ত।

ঘ. জান্নাত এবং জাহান্নামের হায়াত; এই হায়াত জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশের পর শুরু হবে এবং এরপর থেকে চিরকাল থাকবে।

এ সবগুলোকে হায়াত বলা হয় কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটির অবস্থার মধ্যে অনেক ভিন্নতা রয়েছে।

---

৬. সুরা কাসাস, ২৮: ৮৮

৭. সুরা ফুরকান, ২৫: ৫৮

আল্লাহ তাআলার মতো কোনো বস্তু নেই

জমিন এবং আসমানে যত বস্তু রয়েছে, তার মধ্যে কোনো বস্তুই আল্লাহ তাআলার সত্তা কিংবা গুণাবলির মতো নেই। কেননা, আল্লাহ তাআলার সত্তা হলো 'ওয়াজিবুল ওজুদ' তথা অত্যাবশ্যকীয় সত্তা। আর দুনিয়ার সকল বস্তু হলো অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। তাঁর সত্তা ও গুণাবলির মতো কোনো বস্তু হতে পারে না। আল্লাহ তাআলার মতো কোনো বস্তু নেই। এর প্রমাণ হলো কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তাঁর মতো কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"[৮]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

"আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই।"[৯]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

﴿إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا﴾

"যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সমকক্ষ স্থির করি।"[১০]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"সুতরাং তোমরা জেনেবুঝে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।"[১১]

এ সকল আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার মতো কেউ নেই।

আল্লাহ তাআলা কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং না কেউ তাঁর সমকক্ষ আছে

এজন্য কাউকে আল্লাহ তাআলার সমকক্ষ মনে করা শিরক। এর থেকে খুব বেঁচে থাকা চাই। খ্রিষ্টানরা মনে করে হজরত ঈসা আ. আল্লাহর পুত্র। মক্কার

---

[৮]. সুরা শুরা, ৪২:১১
[৯]. সুরা ইখলাস, ১১২:৪
[১০]. সুরা সাবা, ৩৪:৩৩
[১১]. সুরা বাকারা, ২:২২

মুশরিকরা বলত যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। কিন্তু কুরআনুল কারিম বলছে—আল্লাহ তাআলা কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। তিনি অমুখাপেক্ষী। যেমন, তিনি কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন—

﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

"বলো, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই।"[১২]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾

"তিনি পবিত্র মহান এ থেকে যে, তাঁর কোনো সন্তান হবে। আসমানসমূহে যা রয়েছে এবং যা রয়েছে জমিনে, তা আল্লাহরই।"[১৩]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾

"তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান। তিনি অমুখাপেক্ষী। আসমানসমূহ ও জমিনে যা রয়েছে তা তাঁরই।"[১৪]

এ সকল আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং না তাঁর কোনো উপমা আছে।

আল্লাহ তাআলার ঘুম আসে না এবং ঘুম তাঁর উপযোগীও নয়

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾

"আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সবকিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।"[১৫]

---

[১২]. সুরা ইখলাস, ১১২:১-৪
[১৩]. সুরা নিসা, ৪:১৭১
[১৪]. সুরা ইউনুস, ১০:৬৮
[১৫]. সুরা বাকারা, ২:২৫৫

হাদিস শরিফে এসেছে—

«إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ»

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঘুমান না এবং ঘুম তাঁর উপযোগীও নয়।"[১৬]

উপর্যুক্ত আয়াত এবং হাদিস থেকে বুঝা গেল আল্লাহ তাআলা ঘুমান না এবং ঘুম তাঁর উপযোগীও নয়।

আল্লাহ তাআলা সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"[১৭]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"আসমানসমূহ ও জমিন এবং তাদের মধ্যে যা-কিছু আছে তার রাজত্ব আল্লাহরই এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"[১৮]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"অতঃপর তিনি যাকে চান ক্ষমা করবেন, আর যাকে চান আজাব দেবেন। আর আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"[১৯]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"আর আসমানসমূহে যা-কিছু আছে ও জমিনে যা আছে, তাও তিনি জানেন। আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"[২০]

---

[১৬]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৭৯; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৯৫
[১৭]. সুরা বাকারা, ২:১০৬
[১৮]. সুরা মায়িদা, ৫:১২০
[১৯]. সুরা বাকারা, ২:২৮৪
[২০]. সুরা আলে ইমরান, ৩:২৯

আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"আর আল্লাহর জন্যই আসমান ও জমিনের রাজত্ব। আর আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"[২১]

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিকর্তা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ﴾

"তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করো।"[২২]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

"বলো, আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, একচ্ছত্র ক্ষমতাধর।"[২৩]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾

"তিনি আল্লাহ, তোমাদের রব; সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই।"[২৪]

আল্লাহ তাআলাই প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। এজন্য তাঁর নিকটই সন্তান কামনা করা উচিত। কোনো পির-ফকিরের কাছে সন্তান কামনা করা উচিত নয়। এটা শিরক। এতে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন।

আল্লাহ তাআলা গোটা জগতের মালিক

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

---

২১. প্রাগুক্ত, ১৮৯

২২. সুরা আনআম, ৬:১০২

২৩. সুরা রাদ, ১৩:১৬

২৪. সুরা গাফির, ৪০:৬২

“আর আল্লাহর জন্যই আসমান ও জমিনের রাজত্ব। আর আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।”[২৫]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾

“আর আসমানসমূহ, জমিন ও তাদের মধ্যবর্তী যা রয়েছে, তার রাজত্ব আল্লাহর জন্যই।”[২৬]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾

“আর আসমানসমূহ, জমিন ও তাদের মধ্যবর্তী যা আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহর এবং তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন।”[২৭]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

“অতএব পবিত্র মহান তিনি, যার হাতে রয়েছে সবকিছুর রাজত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।”[২৮]

এ সকল আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলা সকল বস্তুর মালিক।

হাশরের দিন অনেক বড় দিন, আর সেদিনের মালিক হলেন আল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾

“বিচার দিবসের মালিক।”[২৯]

---

[২৫]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৮৯
[২৬]. সুরা মায়িদা, ৫: ১৭
[২৭]. প্রাগুক্ত, ১৮
[২৮]. সুরা ইয়াসিন, ৩৬: ৮৩
[২৯]. সুরা ফাতিহা, ১: ৪

আরও ইরশাদ করেন—

﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ﴾

"তাঁর কথাই যথার্থ। আর তাঁর জন্যই রয়েছে সেদিনের রাজত্ব, যেদিন শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে।"[৩০]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল যে, কেয়ামতের দিনের মালিক হলেন আল্লাহ তাআলা।

দেহ, আকৃতি, প্রকৃতি, ধরন ও সকল প্রকার ধ্বংসশীল বস্তু থেকে পবিত্র

আল্লাহ তাআলা দেহ, আকৃতি, প্রকৃতি ও ধরন থেকে পবিত্র। কেননা, এ সকল বিষয় মাখলুকের বৈশিষ্ট্য। আর আল্লাহ তাআলা হলেন 'ওয়াজিবুল ওজুদ' তথা অত্যাবশ্যকীয় সত্তা। এজন্য এসব গুণাবলি থেকে তিনি পবিত্র। যেমন, কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তাঁর মতো কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"[৩১]

এই আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার মতো কোনো বস্তু নেই।

আল্লাহ তাআলা দিক বা প্রান্ত এবং স্থান থেকে পবিত্র

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾

"জেনে রাখো, নিশ্চয় তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।"[৩২]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾

"আর আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী।"[৩৩]

---

৩০. সুরা আনআম, ৬: ৭৩
৩১. সুরা শুরা, ৪২: ১১
৩২. সুরা ফুসসিলাত বা হামীম-সাজদাহ, ৪১: ৫৪
৩৩. সুরা নিসা, ৪: ১২৬

উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন। সুতরাং তিনি দিক বা প্রান্তকেও বেষ্টন করে আছেন। এজন্য আল্লাহ তাআলার জন্য কোনো দিক বা প্রান্ত নেই।

আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রকার প্রশংসার উপযুক্ত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾

"সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমানসমূহে যা-কিছু আছে ও জমিনে যা-কিছু আছে তার মালিক। আর আখেরাতেও সকল প্রশংসা তাঁরই এবং প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবগত।"[৩৪]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

"আসমানসমূহ ও জমিনে যা-কিছু আছে, সব তাঁরই। আর নিশ্চয় আল্লাহই তো অভাবমুক্ত, সকল প্রশংসার অধিকারী।"[৩৫]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾

"আর জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।"[৩৬]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

"আসমানসমূহ ও জমিনে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহর; নিশ্চয় আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।"[৩৭]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের ভাষ্য অনুযায়ী সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই জন্য।

---

[৩৪]. সুরা সাবা, ৩৪: ১
[৩৫]. সুরা হাজ্জ, ২২: ৬৪
[৩৬]. সুরা বাকারা, ২: ২৬৭
[৩৭]. সুরা লুকমান, ৩১: ২৬

আল্লাহ তাআলা মিথ্যা বলা থেকে পবিত্র

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا﴾

"আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে?"[৩৮]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيثًا﴾

"আর কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে?"[৩৯]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা নিশ্চিত সত্যবাদী। তাতে মিথ্যার কোনো প্রকার লেশমাত্র নেই।

কিছু লোক মানতেকের (তর্কশাস্ত্রের) আলোচনা উল্লেখ করে বলেন, মিথ্যা বলাও একটি বস্তু। আর আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। তাহলে কি আল্লাহ তাআলা মিথ্যার ওপরও ক্ষমতাবান? আবার কোনো কোনো লোক মনে করে যে, এটাও একটি বস্তু। এজন্য তাদের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলা মিথ্যার ওপরও ক্ষমতাবান কিন্তু তিনি মিথ্যা বলেন না। তবে এই আলোচনাগুলো মানতেকের (তর্কশাস্ত্রের) আলোচনা। এবং এর হওয়ারও মানতেকের আলোকে হয়ে থাকে। সঠিক কথা হলো যে, আল্লাহ তাআলার সত্তা হলো এমন যে, তাতে কোনো প্রকার খুঁত বা ত্রুটির লেশমাত্র নেই। এজন্য মিথ্যা কিংবা খুঁত বা ত্রুটি ও এ জাতীয় অন্য কোনো বিশেষণ থেকে আল্লাহ পবিত্র। এগুলো তো হলো মানুষ এবং জিনদের বৈশিষ্ট্য যে, তাদের মধ্যে ভালোও রয়েছে, মন্দও রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত এমন কোনো সত্তা নেই যিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী। হিন্দুদের বিশ্বাস হলো, তাদের মূর্তি তাদের দুআ শোনেন এবং তাদের অবস্থা জানেন। এজন্য তারা মূর্তির সামনে নিজেদের প্রয়োজন ব্যক্ত করেন এবং এদের নিকট অভাব পূরণের আবেদন করেন। মুসলমানদের জন্য এমনটি করা মোটেও উচিত নয়। এ ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক। যেমন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

---

[৩৮]. সুরা নিসা, ৪: ১২২

[৩৯]. প্রাগুক্ত, ৮৭

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

"হে আমাদের রব, আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।"[৪০]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

"বলো, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করবে, যা তোমাদের জন্য কোনো ক্ষতি ও উপকারের ক্ষমতা রাখে না? আর আল্লাহ, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৪১]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

"সে (রাসুল) বলল, আমার রব আসমান ও জমিনের সমস্ত কথাই জানেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৪২]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তাঁকে বাদ দিয়ে তারা যাদের ডাকে তারা কোনো কিছুর ফায়সালা করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[৪৩]

আল্লাহ তাআলার সত্তা সর্বোচ্চ সুমহান

আল্লাহ তাআলার সত্তা সর্বোচ্চ ও সুমহান। আমরা তাঁর বড়ত্বের কল্পনাও করতে অক্ষম। এই বিশ্বাসই পোষণ করা উচিত। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

"এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয় না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান।"[৪৪]

---

[৪০]. সুরা বাকারা, ২: ১২৭
[৪১]. সুরা মায়িদা, ৫: ৭৬
[৪২]. সুরা আম্বিয়া, ২১: ৪
[৪৩]. সুরা গাফির, ৪০: ২০
[৪৪]. সুরা বাকারা, ২: ২৫৫

আরও ইরশাদ করেন—

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

“আসমানসমূহে যা-কিছু আছে এবং জমিনে যা-কিছু আছে সব তাঁরই। তিনিই সমুন্নত, সুমহান।”[৪৫]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

“নিশ্চয় আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, অবশ্যই তা বাতিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ তো সমুচ্চ, সুমহান।”[৪৬]

এ সকল আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার সত্তা সর্বোচ্চ সুমহান। এজন্য একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই প্রার্থনা করা উচিত এবং তাঁরই ইবাদত করা উচিত।

আল্লাহ তাআলাই একমাত্র রিজিকদাতা

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও নিকট জীবিকা কামনা করা উচিত নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

“নিশ্চয় আল্লাহই রিজিকদাতা, তিনি শক্তিধর, পরাক্রমশালী।”[৪৭]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾

“আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন রিজিক বাড়িয়ে দেন এবং সংকুচিত করেন।”[৪৮]

এ আয়াতগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলাই একমাত্র রিজিকদাতা। অন্য কারও এই ক্ষমতা নেই। এজন্য আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও নিকট জীবিকা কামনা করা উচিত নয়।

---

[৪৫]. সুরা শুরা, ৪২: ৪
[৪৬]. সুরা হাজ্জ, ২২: ৬২
[৪৭]. সুরা যারিয়াত, ৫১: ৫৮
[৪৮]. সুরা রাদ, ১৩: ২৬

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও নিকট জীবিকা কামনা করা উচিত নয়

কোনো কোনো অমুসলিমদের বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তাআলা কোনো কোনো সৃষ্টজীবকে জীবিকার মালিক বানিয়েছেন। এজন্য তারা এর পূজা করে এবং তার নিকট জীবিকা কামনা করে এবং নিজের প্রয়োজন পূরণের আবেদন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'জীবিকার মালিক স্বয়ং আমি। আমি কাউকে জীবিকার মালিক বানাইনি। এজন্য আমার কাছেই জীবিকা কামনা করা উচিত।' যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾

"নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করো তারা তোমাদের রিজিকের মালিক নয়। তাই আল্লাহর কাছে রিজিক তালাশ করো এবং তাঁর ইবাদত করো।"[৪৯]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾

"আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে, যারা আসমানসমূহ ও জমিনে তাদের কোনো রিজিকের মালিক নয় এবং হতেও পারবে না।"[৫০]

এ আয়াতগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী জমিন ও আসমানে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কেউ জীবিকা দেওয়ার মালিক নেই এবং না কেউ জীবিকা দিতে পারে। এজন্য আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো ওলি কিংবা নবি অথবা কোনো পির-ফকিরের নিকট জীবিকা কামনা করা উচিত নয়।

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কেউ কোনো বিপদ-আপদ দূর করার ক্ষমতা নেই

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾

"আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী কেউ নেই।"[৫১]

৪৯. আনকাবুত, ২৯: ১৭
৫০. নাহল, ১৬: ৭৩
৫১. সুরা আনআম, ৬: ১৭

আরও ইরশাদ করেন—

﴿فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾

"তারা তো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না।"[৫২]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

"বলো, আমি আমার নিজের কোনো উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান।"[৫৩]

আরেক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

"বলো, আমি নিজের ক্ষতি বা উপকারের অধিকার রাখি না, তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন।"[৫৪]

যেখানে স্বয়ং নবিকেও নিজের উপকার এবং ক্ষতির কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, তাহলে অন্যদের আর কি ক্ষমতা হবে।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾

"আর তোমাদের কাছে যেসব নেয়ামত আছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতঃপর দুঃখ-দুর্দশা যখন তোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা শুধু তার কাছেই ফরিয়াদ করো।"[৫৫]

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কেউ বিপদ-আপদ দূর করতে পারে না। এজন্য অন্য কারও নিকট দুঃখ-দুর্দশা দূর করার আবেদন করা উচিত নয়।

---

[৫২]. সুরা বনি ইসরাইল, ১৭: ৫৬
[৫৩]. সুরা আরাফ, ৭: ১৮৮
[৫৪]. সুরা ইউনুস, ১০: ৪৯
[৫৫]. সুরা নাহল, ১৬: ৫৩

একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সন্তান দানকারী

সন্তান দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে। এজন্য অন্য কারও নিকট সন্তান কামনা করা উচিত নয়। কোনো কবর, পির-ফকির কিংবা দেব-দেবতার নিকট সন্তান চাইতে যাওয়া উচিত নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾

"আসমানসমূহ ও জমিনে রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"[৫৬]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۚ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾

"অতঃপর যখন সে ভারী হলো, তখন উভয়ে তাদের রব আল্লাহকে ডাকল, যদি আপনি আমাদেরকে সুসন্তান দান করেন তবে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে এক সুসন্তান দান করলেন, তখন তাদেরকে তিনি যা প্রদান করেছেন সে বিষয়ে তারা তাঁর বহু শরিক নির্ধারণ করল। বস্তুত তারা যাদের শরিক করে তাদের থেকে আল্লাহ অনেক ঊর্ধ্বে। তারা কি এমন কিছুকে শরিক করে, যারা কোনো কিছু সৃষ্টি করে না; বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়? আর তারা তাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারে না এবং তারা নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না।"[৫৭]

এই আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সন্তান দেন কিন্তু আফসোস! যখন বাচ্চা জন্ম হয়ে যায়, তখন মানুষ মনে করে যে, দেব-দেবতা কিংবা পির-ফকির সন্তান দিয়েছে এবং তাদের পূজা-উপাসনা করতে

---

৫৬. সুরা শুরা, ৪২: ৪৯-৫০

৫৭. সুরা আরাফ, ৭: ১৮৯-১৯২

শুরু করে এবং তাদেরকে (আল্লাহর) শরিক সাব্যস্ত করে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"তিনিই মাতৃগর্ভে তোমাদেরকে আকৃতি দান করেন যেভাবে তিনি চান। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৫৮]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তাঁকে বাদ দিয়ে তারা যাদের ডাকে তারা কোনো কিছুর ফায়সালা করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[৫৯]

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলাই দুআ কবুল করেন এবং আল্লাহ তাআলাই সন্তান দানকারী। কোনো কোনো মহিলারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সন্তান চায়। এটা ঠিক নয়। এই মহিলাকেও আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ তাআলাই সন্তান দেবেন। সুতরাং সন্তান তাঁর নিকটই চাইতে হবে। অনেক সাধারণ মানুষই এ ক্ষেত্রে শিরক করে ফেলে এবং গাইরুল্লাহর উপাসনা করে ফেলে। এগুলো থেকে বাঁচা জরুরি।

আল্লাহ তাআলাই আরোগ্য দান করেন

মানুষ চিকিৎসা করতে পারে কিন্তু আরোগ্য দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার। এজন্য একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই আরোগ্য কামনা করা। কোনো ওলি কিংবা পির-ফকিরের আরোগ্য দান করার কোনো ক্ষমতা নেই। এজন্য তাদের নিকট আরোগ্য কামনা করা উচিত নয়। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾

"আর যখন আমি অসুস্থ হই, তখন যিনি আরোগ্য করেন।"[৬০]

---

৫৮. সুরা আলে ইমরান, ৩: ৬

৫৯. সুরা গাফির, ৪০: ২০

৬০. সুরা শুআরা, ২৬: ৮০

আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾

"আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী কেউ নেই।"[৬১]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾

"তারা তো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না।"[৬২]

হাদিস শরিফে নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যখন আমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হতো নবিজি ﷺ তখন তাঁর ডান হাত দ্বারা অসুস্থ ব্যক্তির শরীর মাসেহ করতেন আর এই দুআ পাঠ করতেন—

أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

হে মানুষের রব! তুমি রোগ দূর করে দাও এবং আরোগ্য দান করো। তুমিই তো আরোগ্যদানকারী, তোমার আরোগ্য ভিন্ন আর কোনো আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য দাও, যার পর কোনো রোগ থাকে না।"[৬৩]

অন্য এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنَسٌ: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

---

৬১. সুরা আনআম, ৬:১৭

৬২. সুরা বনি ইসরাইল, ১৭:৫৬

৬৩. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৫৭৫০; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২১৯১; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩৮৮৩; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৬১৯; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৫৬৫

"হজরত আবদুল আজিজ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং হজরত সাবিত রা. হজরত আনাস ইবনে মালেক রা.-এর নিকট গেলাম। তখন হজরত সাবিত রা. বললেন, হে আবু হামজা! (এটা হজরত আনাস ইবনে মালেক রা.-এর উপনাম) আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তখন হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বললেন, আমি কি তোমাকে নবিজি ﷺ যা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করেছিলেন তা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করে দেবো? হজরত সাবিত রা. বললেন, হ্যাঁ! অবশ্যই করুন। তখন হজরত আনাস রা. এই দুআ পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করলেন—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

হে আল্লাহ, তুমি মানুষের রব, রোগ নিরাময়কারী, আরোগ্য দান করো, তুমি আরোগ্য দানকারী। তুমি ব্যতীত আর কেউ আরোগ্য দানকারী নেই। এমন আরোগ্য দাও, যা কোনো রোগ অবশিষ্ট রাখে না।"[৬৪]

উক্ত দুটি হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী আরোগ্যদাতা সত্তা একমাত্র আল্লাহ। এ ছাড়া অন্য কারও কাছে আরোগ্য কামনা করা উচিত নয়।

বর্তমানে বহু লোক দেব-দেবী এবং জানা নেই আরও কত লোকের নিকট যায়। আর তারা চমক দেখিয়ে অর্থও হাতিয়ে নেয় এবং ঈমানও নষ্ট করে। এগুলো থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

---

৬৪. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৫৭৪২
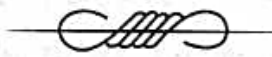
দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহ তাআলার ওপর প্রতিদান কিংবা শাস্তি দেওয়া ওয়াজিব নয়

এ আকিদা সম্পর্কে ১৫টি আয়াত রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

মুতাজিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলার ওপর প্রতিদান দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মত হলো, আল্লাহ তাআলার ওপর কোনো বস্তু ওয়াজিব নয়। সকল বস্তু তাঁর ইচ্ছাধীন। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

“অতঃপর তিনি যাকে চান ক্ষমা করবেন, আর যাকে চান আজাব দেবেন। আর আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।”[৬৫]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

“সুতরাং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”[৬৬]

তিনি আরও ইরশাদ করেন—

﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

“নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।”[৬৭]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾

---

[৬৫]. সুরা বাকারা, ২: ২৮৪

[৬৬]. সুরা ইবরাহিম, ১৪: ৪

[৬৭]. সুরা হাজ্জ, ২২: ১৪

"এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।"[৬৮]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা গেল, আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা তা-ই করেন। তাঁর ওপর কোনো কিছু করা ওয়াজিব নয়।

আল্লাহ তাআলা যা-কিছু দান করেন এটা তাঁর অনুগ্রহ

কোনো বস্তু দান করা আল্লাহ তাআলার ওপর ওয়াজিব নয়। তিনি যাকে যা দান করেন সেটা তাঁর অনুগ্রহ। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ﴾

"এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।"[৬৯]

অপর এক আয়াতেও হুবহু ইরশাদ করেন—

﴿ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ﴾

"এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।"[৭০]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ﴾

"আর নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহর হাতেই, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।"[৭১]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা গেল, আল্লাহ তাআলা যা-কিছু করেন, এটা তাঁর অনুগ্রহ। তাঁর ওপর কোনো কিছু ওয়াজিব নয়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো, ভালো-মন্দ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তাই আল্লাহ তাআলা

অতীতে কিছু লোকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—মন্দ কাজ ভালো নয়। এজন্য তারা মন্দের সৃষ্টির সম্বোধন আল্লাহ তাআলার দিকে করা ঠিক মনে করত না। তারা বলত যে, মন্দের সৃষ্টিকর্তা হলো শয়তান।

---

৬৮. সুরা ইবরাহিম, ১৪: ২৭
৬৯. সুরা হাদীদ, ৫৭: ২১
৭০. সুরা জুমুআহ, ৬২: ৪
৭১. সুরা হাদীদ, ৫৭: ২৯

কিন্তু যেহেতু পবিত্র কুরআনুল কারিমের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত—সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা, তাই এ আকিদাই সঠিক যে, ভালো এবং মন্দ উভয়টির সৃষ্টিকর্তাই আল্লাহ তাআলা এবং বান্দার যে সাওয়াব অথবা শাস্তি হয়, তা তাদের অর্জিত। অর্থাৎ উক্ত কাজ করার কারণে হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

"আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক।"[৭২]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾

"তিনি আল্লাহ, তোমাদের রব; সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই।"[৭৩]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللهِ﴾

"বলো, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে।"[৭৪]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা গেল, প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা।

মন্দ কাজ করলে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন আর ভালো কাজ করলে সন্তুষ্ট হন

সকল কাজ আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। তবে নেক কাজ করলে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন এবং মন্দ কাজ করলে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾

"আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরি পছন্দ করেন না।"[৭৫]

এই আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলা কুফরিকে পছন্দ করেন না।

---

[৭২]. সুরা যুমার, ৩৯: ৬২
[৭৩]. সুরা গাফির, ৪০: ৬২
[৭৪]. সুরা নিসা, ৪: ৭৮
[৭৫]. সুরা যুমার, ৩৯: ৭

আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾

"আর আমি যাতে এমন সৎকাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ করো।"[৭৬]
এই আয়াত থেকে বুঝা গেল, নেক আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন।

আল্লাহ তাআলার সকল গুণাবলি অনাদি এবং চিরস্থায়ী

অতীত যুগে একটি বিতর্ক ছিল যে, সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাআলা 'খালিক' তথা সৃষ্টিকর্তা ছিল কি না? এর উত্তর হলো, আল্লাহ তাআলার সকল গুণাবলি অনাদি এবং চিরস্থায়ী। অর্থাৎ যখন এই জগৎ সৃষ্টি করেননি, তখনো আল্লাহ তাআলা 'খালিকিয়াত' তথা সৃষ্টিকর্তার এবং 'রাযিকিয়াত' তথা রিজিকদাতার গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং সৃষ্টি করার পরেও তিনি উক্ত গুণে গুণান্বিত। এতে কোনো প্রকার কম-বেশ নেই। আবার যখন এই জগৎকে ধ্বংস করে দেবেন, তখনো আল্লাহ তাআলা খালিক তথা সৃষ্টিকর্তা থাকবেন। এতেও কোনো প্রকার কম-বেশ নেই। কেননা, সকল গুণাবলি অনাদি এবং চিরস্থায়ী। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"নিশ্চয় এভাবেই তিনি মৃতদের জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।"[৭৭]

আল্লাহ তাআলা এখনো মৃত্যুকে জীবিত করেননি; বরং কিয়ামতের দিন জীবিত করবেন। তারপরও এখন থেকেই আল্লাহ তাআলাকে মৃত্যুকে জীবিতকারী বলা হয়। যা থেকে বুঝা গেল, জীবিত করার পূর্বেও তিনি জীবিত করার গুণে গুণান্বিত। ঠিক এমনইভাবে তাঁর সকল গুণাবলির একই অবস্থা।

[৭৬]. সুরা নামাল, ২৭: ১৯; সুরা আহকাফ, ৪৬:১৫
[৭৭]. সুরা রুম, ৩০: ৫০

‘দাহরিয়া’দের আল্লাহ তাআলাকে মেনে নেওয়া উচিত

এ আকিদা সম্পর্কে ৭টি দলিল রয়েছে। আসুন এগুলো বিস্তারিত পাঠ করি।

কিছু লোকের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব নেই। এই জগৎ নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে এবং নিজে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এর কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। তাদেরকে নাস্তিক বলা হয়। তাদের দলিল হলো, আমরা আল্লাহকে দেখিনি। তাই তাঁর অস্তিত্ব নেই।

এর জবাব হলো, এই চোখ দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পারবে না। তিনি ‘ওয়াজিবুল ওজুদ’ তথা অত্যাবশ্যকীয় সত্তা। তিনি দুনিয়ার বস্তুর মতো নন যে, আমরা এই চোখে তাঁকে দেখতে পারব। তবে হ্যাঁ! পরকালে মুমিনদের জন্য এমন চোখ সৃষ্টি করে দেওয়া হবে, যা দিয়ে তারা আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পারবে। দুনিয়াতে এটা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলার সত্তা ৭০ হাজার নুরের পর্দার ভেতরে অবস্থিত। তাই তাঁকে কীভাবে দেখতে পাবে![৭৮] স্বয়ং নবিজি ﷺ মিরাজের রাত সম্পর্কে বলেন, ...نُورٌ أَنَّى অর্থাৎ তিনি তো হলেন নুর। (অর্থাৎ তিনি হলেন নুরের পর্দা দ্বারা আবৃত, তাকে কীভাবে দেখা যাবে?) তাকে কীভাবে দেখা যাবে?

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ

“হজরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবিজি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? নবিজি ﷺ তখন বললেন, তিনি তো নুর। তাকে কীভাবে দেখব?”[৭৯]

---

[৭৮]. এরা মূলত নাস্তিক। এরা স্রষ্টায় অবিশ্বাসী। কিয়ামত দিবসকেও ‘দাহরিয়া’রা অস্বীকার করে থাকে। এরা জাহেলি যুগের মুলহিদ ছিল। জামানার বিবর্তনে এরা এখন নাস্তিক হিসেবে খ্যাত।

[৭৯]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৭৮; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২১৩৯২

দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি করা সূর্যকে দুপুরে দেখা যায় না। যাতে সামান্য নুর রয়েছে। তাহলে আল্লাহ তাআলার সত্তা যা শুধু নুরই নুর। তাকে কীভাবে দেখবে?

আল্লাহ তাআলার সত্তাকে আমরা কেন মানব?

দুনিয়াতে কোটি কোটি মানুষ আছে। প্রত্যেকের চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। বরং একই বাবা-মায়ের দুটি সন্তান। দুজনের চেহারাই সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্ন ভিন্ন চেহারা কোন সত্তার কারণে? যে সত্তার কারণে এই ভিন্ন ভিন্ন চেহারা, সেই সত্তার নামই হলো আল্লাহ। পবিত্র কুরআনুল কারিমে তাকেই রাব্বুল আলামিন বলা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টিকুলের রব।"[৮০]

এই আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলাই গোটা দুনিয়ার পালনকর্তা।

এ কথা যখন সিদ্ধান্ত হলো যে, প্রত্যেকের চেহারা আলাদা। তাহলে এটাও মানতে হবে যে, এই চেহারাগুলো ভিন্ন ভিন্ন করেছেন যে সত্তা, সে সত্তাকেই আল্লাহ বলা হয়।

আপনি নিজে নিজে মৃত্যুবরণ করে দেখান তো!

নাস্তিকরা বলে যে, আমরা নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছি। বিষয়টি যদি এমনই হয় যে, আপনি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছেন, তাহলে আপনি একটু নিজে নিজে মৃত্যুবরণ করে দেখান তো! মৃত্যু যদি আপনার ইচ্ছাধীনও থাকে তারপরও আপনি মরতে পারবেন না। তাহলে আপনি নিজে নিজে সৃষ্টি হলেন কীভাবে? (যে সত্তা আপনাকে মৃত্যু দান করেন সে সত্তাকেই বলা হয় আল্লাহ)।

আপনি যুবক থেকে দেখান তো!

নাস্তিকরা নিজেরাও এটা চায় যে, আমি যুবক থাকব। আর এটার জন্য তারা অনেক কিছু ব্যবহারও করে থাকে। কিন্তু তারপরও যে সত্তা তাদেরকে বৃদ্ধ করে দেয় এবং হাত-পা দুর্বল করে দেয়, সেই সত্তার নামই হলো আল্লাহ। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾

---

[৮০]. সুরা ফাতিহা, ১:১

"তোমাদের অনেকে এমনও আছে, যাকে একেবারে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত করা হয়, যাতে সে জ্ঞান লাভের পরেও সবকিছু অজানা হয়ে যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"[৮১]

> তুমি যদি নিজেই সৃষ্টি হয়ে থাকো, তাহলে ৯০ বছর পর্যন্ত যুবক থেকে দেখাও তো! আর যদি এটা করতে না পারো, তাহলে যে সত্তা তোমাকে বৃদ্ধ করেছেন, সেই সত্তার নামই হলো আল্লাহ। এজন্য আল্লাহকে মেনে নাও।

আপনি শত বছর জীবিত থেকে দেখান তো!

নাস্তিকরাই অধিকাংশ জীবিত থাকতে চায়। তারা যদি নিজেই সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে শত বছর জীবিত বেঁচে থাকুক তো! এরা যদি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে তো নিজে নিজে জীবিতও থাকা উচিত। কিন্তু যে সত্তা তাদেরকে মৃত্যু দান করেন, সেই সত্তার নামই হলো আল্লাহ। যেমন, হজরত ইবরাহিম আ. আল্লাহ তাআলার সত্তাকে পরিচয় করানোর জন্য বলেছিলেন,

﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾

"যখন ইবরাহিম বলল, আমার রব তিনিই যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।"[৮২]

সুতরাং যে সত্তা আপনাকে মৃত্যু দেন, সেই সত্তার নামই আল্লাহ। আর সেই সত্তা আপনাকে সৃষ্টিও করেছেন।

যে সত্তা মৃত্যু দেন, তাঁর নামই আল্লাহ

কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা তো আছেই। কিন্তু আমরা যে আল্লাহ মানি, তা এজন্য মানি যে, তিনি একদিন আমাদেরকে মৃত্যু দেবেন। আর যে সত্তা মৃত্যুদাতা, তিনি সৃষ্টিকর্তাও বটে। আর যখন উভয় বিষয়টিই একদম সামনে, যা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না, তাহলে এর থেকে এটাও বিশ্বাস হয় যে, কিয়ামতও সত্য এবং জান্নাত-জাহান্নামও সত্য। এর জন্য দীর্ঘ ও বিস্তারিত দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

---

[৮১]. সুরা নাহল, ১৬:৭০

[৮২]. সুরা বাকারা, ২:২৫৮

আপনি মেনে নিন যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ!

এজন্য মেনে নিন যে, আপনার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। আর তাঁর সামনে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন যে, হে মৃত্যুদানকারী আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাকে জান্নাত দিয়ে দিন। যদি মন থেকে এটা বলেন আর এর ওপর আপনার মৃত্যু হয়, তাহলে হতে পারে আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন।
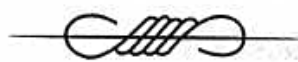
আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ, আল্লাহকে দেখা

এ আকিদা সম্পর্কে ৫টি আয়াত এবং ১০টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

মিরাজের রাতে নবিজি ﷺ আল্লাহ তাআলাকে দেখেছেন কি না—এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে।

এক দলের বক্তব্য হলো, নবিজি ﷺ আল্লাহ তাআলাকে দেখেছেন।

দ্বিতীয় দলের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলাকে দেখেননি। তবে আল্লাহ তাআলার নুরকে দেখেছেন। মোটকথা দেখেছেন তো অবশ্যই। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতও এটাই।

তৃতীয় দলের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলাকে ওপর থেকে বাহ্যিকভাবে সরাসরিই দেখেছেন। তবে ভেতরের অবস্থা দেখেননি। আর তা দেখাও সম্ভব নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলার সত্তা হলো অসীম।

চতুর্থ দলের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলাকে অন্তর দিয়ে দেখেছেন। তবে এ কথায় সকলে একমত যে, পরকালে মুমিনরা আল্লাহ তাআলাকে স্বচক্ষে দেখবে।

প্রথম দলের দলিল হলো, হজরত মুসা আ. আল্লাহ তাআলাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন যে, ওই পাহাড় দেখো। অর্থাৎ তুর পাহাড় দেখো। যদি তা নিজ জায়গায় স্থির থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পারবে। আর যদি নিজ জায়গায় স্থির না থাকে, তাহলে তুমি দুনিয়াতে আমাকে দেখতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা যখন পাহাড়ের ওপর নিজ জ্যোতি প্রদান করলেন, তখন পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং হজরত মুসা আ. বেহুঁশ হয়ে গেলেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলাকে দেখা সম্ভব নয়। কেননা দুনিয়াতে আমাদের

দৃষ্টি এমন নয়, যা আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পারে। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرۡ إِلَيۡكَۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَٰكِنِ ٱنظُرۡ إِلَى ٱلۡجَبَلِ فَإِنِ ٱسۡتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوۡفَ تَرَىٰنِيۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلۡجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكّٗا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقٗا﴾

“সে বলল, হে আমার রব, আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখব। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কখনো দেখবে না। বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, অতঃপর তা যদি নিজ স্থানে স্থির থাকে তবে তুমি অচিরেই আমাকে দেখবে। অতঃপর যখন তার রব পাহাড়ের ওপর নুর প্রকাশ করলেন, তখন তা তাকে চূর্ণ করে দিলো এবং মুসা বেহুঁশ হয়ে পড়ল।”[৮৩]

এই আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী হজরত মুসা আ. আল্লাহ তাআলাকে দেখেননি। সুতরাং বুঝা গেল দুনিয়ার এই চোখ দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে দেখা সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ! পরকালে অবশ্যই ‘দিদার’ তথা সাক্ষাৎ হবে। যেমন ইরশাদ হয়েছে—

﴿لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَهُوَ يُدۡرِكُ ٱلۡأَبۡصَٰرَۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ﴾

“চক্ষুসমূহ তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। আর তিনি চক্ষুসমূহকে আয়ত্ত করেন। আর তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।”[৮৪]

এই আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী (দুনিয়ার) এই চক্ষু আল্লাহ তাআলাকে আয়ত্ত করতে পারে না। এজন্য আল্লাহ তাআলার সত্তাকে দেখতে পারে না।

আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحۡيًا أَوۡ مِن وَرَآيِٕ حِجَابٍ﴾

“কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন, ওহির মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়াল ছাড়া।”[৮৫]

এই আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা গেল আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে কোনো মানুষের সঙ্গে ওহির মাধ্যমে কিংবা পর্দার আড়াল ব্যতীত কথা বলেন না।

---

৮৩. সুরা আরাফ, ৭: ১৪৩
৮৪. সুরা আনআম, ৬: ১০৩
৮৫. সুরা শুরা, ৪২: ৫১

এজন্য কোনো কোনো উলামায়ে কেরামের বক্তব্য হলো, মিরাজের রাতে নবিজি ﷺ পর্দার আড়াল থেকেই আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথা বলেছেন। আল্লাহ তাআলাকে চোখে দেখেননি।

হজরত আয়েশা রা.-এর অভিমত হলো দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়

হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: يَا أُمَّتَاهْ، هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي مِمَّا قُلْتَ، أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ، مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ.

"হজরত মাসরুক রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আম্মাজান, নবিজি ﷺ কি মিরাজের রাতে তাঁর রবকে দেখেছিলেন? আয়েশা রা. তখন বললেন, তোমার কথায় আমার গায়ের পশম (অর্থাৎ আমি শিহরিত হয়ে গিয়েছি) খাড়া হয়ে গেছে। তিনটি কথা সম্পর্কে তুমি কি জানো না (!) যে তোমাকে এ তিনটি কথা বলবে সে মিথ্যা বলবে। যদি কেউ তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন, তাহলে সে মিথ্যাচারী। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

"তিনি দৃষ্টিশক্তির অধিগাম্য নন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত; এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী সম্যক পরিজ্ঞাত।"[৮৬]

এই হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী নবিজি ﷺ আল্লাহ তাআলাকে স্বচক্ষে দেখেননি।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে—

عَنْ مَسْرُوقٍ،.... يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْظِرِينِي وَلَا تَعْجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، فَقَالَتْ: أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الأُمَّةِ، سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ، لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا، غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ، سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ.

---

৮৬. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪৮৫৫

"হজরত মাসরুক বলেন, উম্মুল মুমিনিন আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। কোনো প্রকার তাড়াহুড়ো করেননি। আল্লাহ তাআলা কি বলেননি—

﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾

"আর তিনি (মুহাম্মাদ ﷺ) তাকে (হজরত জিবরাইল আ.) সুস্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে।"[৮৭]

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾

"আর তিনি তো (মুহাম্মাদ ﷺ) তাকে (হজরত জিবরাইল আ.) আরেকবার দেখেছিলেন।"[৮৮]

হজরত আয়েশা রা. বলেন, আমিই এই উম্মতের প্রথম ব্যক্তি, যে নবিজি ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। নবিজি ﷺ তখন বললেন, তিনি হজরত জিবরাইল আ.-কে দেখেছেন। এই দুইবার ব্যতীত আমি জিবরাইল আ.-কে তার আসল আকৃতিতে কখনো দেখিনি। আমি তাকে দেখলাম যে, সে আসমান থেকে অবতরণ করছে। আর তার ডানাসমূহ আসমান এবং জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে ভরে ফেলেছে।"[৮৯]

হজরত আয়েশা রা. বলেন, উপর্যুক্ত দুই আয়াতে যে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হজরত জিবরাইল আ.-কে তার আসল আকৃতিতে দেখার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাকে দেখা নয়। বরং নবিজি ﷺ হজরত জিবরাইল আ.-কে তার আসল আকৃতিতে দুইবার দেখেছেন, সে কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এই হাদিস দিয়েও প্রমাণিত হলো, নবিজি ﷺ দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলাকে দেখেননি।

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ

"হজরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবিজি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? নবিজি ﷺ তখন বললেন, তিনি তো নুর। তাকে কীভাবে দেখব?"[৯০]

---

[৮৭]. সুরা তাকভীর, ৮১: ২৩
[৮৮]. সুরা নাজম, ৫৩: ১৩
[৮৯]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৭৭
[৯০]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৭৮; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২১৩৯২

অন্য আরেক হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ،... حِجَابُهُ النُّورُ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: اَلنَّارُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ، مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ.

"হজরত আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ দাঁড়িয়ে আমাদেরকে পাঁচটি বাক্য শুনালেন। তন্মধ্যে একটি হলো, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলার পর্দা হলো নুর বা জ্যোতি। আবু বকরের বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তাআলার পর্দা হলো নার বা আগুন। তা যদি মানুষের সামনে খুলে দেওয়া হয়, তাহলে তাঁর চেহারার আলোতে যে পর্যন্ত দৃষ্টি যাবে সব জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।"[৯১]

উপর্যুক্ত তিনটি হাদিস থেকেই বুঝা গেল, আল্লাহ তাআলার ওপর নুর বা জ্যোতির পর্দা রয়েছে। এজন্য দুনিয়াতে তাঁকে দেখা যাবে না।

দ্বিতীয় দলের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলাকে দেখেননি। তবে আল্লাহ তাআলার নুরকে দেখেছেন। মোটকথা দেখেছেন তো অবশ্যই। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতও এটাই।

তাদের দলিল হলো, হাদিস শরিফে এসেছে—

قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ... قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُهُ، هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: قَدْ سَأَلْتُ، فَقَالَ: رَأَيْتُ نُورًا

"হজরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবিজি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? নবিজি ﷺ তখন বললেন, আমি নুর বা জ্যোতি দেখেছি।"[৯২]

তৃতীয় দলের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলাকে ওপর থেকে বাহ্যিকভাবে সরাসরিই দেখেছেন। তবে ভেতরের অবস্থা দেখেননি। আর তা দেখাও সম্ভব নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলার সত্তা হলো অসীম।

তাদের দলিল হলো, হাদিস শরিফে এসেছে—

قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اِبْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَنَّ مُحَمَّدً ﷺ رَاٰى رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

---

[৯১]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৭৯

[৯২]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৭৮; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২১৩৯২

"হজরত ইকরিমা বলেন, আমি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে বলতে শুনেছি—মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন।"[৯৩]

কিন্তু যেহেতু কুরআনুল কারিমের আয়াতে এসেছে—﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ "চক্ষুসমূহ তাকে আয়ত্ত করতে পারে না।" এজন্য এটা বলা যায় যে, আল্লাহ তাআলাকে বাহ্যিকভাবে দেখেননি।

চতুর্থ দলের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলাকে অন্তর দিয়ে দেখেছেন।

তাদের দলিল হলো, হাদিসে শরিফে এসেছে—

عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ) قَالَ رَأَىٰ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِفُؤَادِهِ.

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এই আয়াত সম্পর্কে বলেন,

﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾

"সে যা দেখেছে, অন্তকরণ সে সম্পর্কে মিথ্যা বলেনি।"[৯৪]

নবিজি ﷺ তাঁর রবকে অন্তর দিয়ে দেখেছেন।"[৯৫]

মুমিনগণ পরকালে আল্লাহ তাআলাকে দেখবেন

অতীতে জাহমিয়া সম্প্রদায় পরকালেও আল্লাহ তাআলাকে দেখার বিষয়টি অস্বীকার করেছিল। সে সময়ে এর ওপর ঐকমত্য হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ হবে। পরকালে আল্লাহ তাআলা এমন চক্ষু সৃষ্টি করে দেবেন যে, মুমিনরা আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

"সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে হাস্যোজ্জ্বল। তাদের রবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপকারী।"[৯৬]

---

[৯৩]. *সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ি*, ১০/২৭৬ হাদিস নং ১১৪৭৩

[৯৪]. সুরা নাজম, ৫৩: ১১

[৯৫]. *মুজামুল কাবির*, তাবারানি, ১২/২১৯ হাদিস নং ১৬৯৪১। হাদিসটি সহিহ।

[৯৬]. সুরা কিয়ামাহ, ৭৫:২২-২৩

হাদিস শরিফে এসেছে—

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَاسًا، قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوْا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ.

"কিছু সাহাবায়ে কেরাম নবিজি ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখব? নবিজি ﷺ তখন বললেন, মেঘ না থাকলে সূর্যকে দেখতে কোনো অসুবিধা হয়? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, জি না হে আল্লাহর রাসুল। নবিজি ﷺ তখন বললেন, ব্যস! এমনই তোমরা বিনা অসুবিধায় আল্লাহ তাআলাকে দেখবে।"[৯৭]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী জান্নাতে জান্নাতিরা আল্লাহ তাআলার দিদার তথা সরাসরি সাক্ষাৎ লাভ করবে।

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، وَقَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، نَادَى مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ، فَيَقُولُونَ: وَمَا هُوَ أَلَمْ يُثَقِّلِ اللهُ مَوَازِينَنَا، وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ، وَلَا أَقَرَّ لِأَعْيُنِهِمْ.

"হজরত সুহাইব রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন—

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾

"যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম (জান্নাত) এবং আরও বেশি।"[৯৮]

---

[৯৭]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৮২

[৯৮]. সুরা ইউনুস, ১০:২৬

এ আয়াতের তাফসিরে নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামিরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে জান্নাতিরা! নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে। যা তিনি এখন পূর্ণ করবেন। জান্নাতিরা তখন বলবে, কীসের প্রতিশ্রুতি? আল্লাহ তাআলা কি আমাদের (সৎকর্মের) পাল্লা ভারী করেননি, আমাদের চেহারাগুলো আলোকিত করেননি, আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করেননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? নবিজি ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ তাআলা আবরণ উন্মুক্ত করবেন এবং তারা তাঁর দিকে তাকাবে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাঁর দিদারে চেয়ে অধিক নয়নপ্রীতিকর আর কিছু দান করেননি।"[৯৯]

অন্য এক হাদিসে এসেছে—

قَالَ: فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ.

"নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোনো সন্দেহ আছে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না। তখন নবিজি ﷺ বললেন, নিঃসন্দেহে তোমরাও আল্লাহ তাআলাকে তেমনইভাবে দেখতে পাবে।"[১০০]

জাহমিয়া সম্প্রদায়ের বক্তব্য, পরকালেও আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ হবে না

জাহমিয়া সম্প্রদায়ের বক্তব্য ছিল, পরকালেও আল্লাহ তাআলার দিদার তথা সাক্ষাৎ হবে না। তাদের দলিল হলো, পবিত্র কুরআনের সেই আয়াত—

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

"চক্ষুসমূহ তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। আর তিনি চক্ষুসমূহকে আয়ত্ত করেন। আর তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।"[১০১]

এই আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এই চক্ষু আল্লাহ তাআলাকে আয়ত্ত করতে পারে না। যা দিয়ে তারা দলিল দিয়েছেন যে, আমরা পরকালেও আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পারব না।

---

৯৯. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৮১; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৮৭

১০০. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৮০৬

১০১. সুরা আনআম, ৬:১০৩

জামহুর তথা অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এই আয়াতের জবাব দিয়েছেন—
إدراك শব্দের অর্থ হলো পুরোপুরি বেষ্টন করা। আমাদের দৃষ্টি আল্লাহ তাআলার সত্তাকে বেষ্টন করতে পারে না। শুধু দেখতে পারে। আর এই আয়াতে এটাই বলা হয়েছে যে, জান্নাতেও আমরা আল্লাহ তাআলাকে দেখব। কিন্তু তাঁকে বেষ্টন করতে পারব না। কেননা তা অসম্ভব। এই আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমরা আল্লাহ তাআলাকে পরকালে দেখতে পারব না।

নবিজি ﷺ-এর বড় বড় ১০টি ফজিলত

এ আকিদা সম্পর্কে ১২টি আয়াত এবং ১৬টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলো বিস্তারিত পাঠ করি।

নবিজি ﷺ-এর ফজিলত তো অনেক। যা অন্য আর কোনো নবি ও রাসুলকে প্রদান করা হয়নি। কিন্তু নিম্নে আমরা ১০টি বড় বড় ফজিলত উল্লেখ করছি। যেন এটা অনুমান করা যায় যে, নবিজি ﷺ-এর মর্যাদা কী। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাঁর ফজিলত সবচেয়ে বেশি এবং আল্লাহ তাআলার পরে সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব তাঁরই। যেমন জনৈক কবি বলেন,

"সংক্ষেপ কথা হলো আল্লাহ তাআলার পরেই আপনার মর্যাদা।"

ইরানের প্রসিদ্ধ কবি শেখ সাদি রহ. তাঁর গুলিস্তার ভূমিকায় লিখেন—

بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهِ ☆ كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهِ

حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهِ ☆ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَآلِهِ

সুউচ্চ শিখরে সমাসীন তিনি নিজ মহিমায়
তিমির-তমসা কাটিল তার রূপের প্রভায়।
সুন্দর অতি সুন্দর তার স্বভাব-চরিত্র তামাম
জানাও তাঁর ও তাঁর বংশের পরে দরুদ ও সালাম।

কোনো কোনো সময় (সাধারণ) মানুষের নবিজি ﷺ-এর মর্যাদার ব্যাপারে জ্ঞান থাকে না। তখন তাঁর শানে বেয়াদবি করে ফেলে। আর কোনো কোনো সময় নবিজির খতমে নবুয়তকে অস্বীকার করে বসে। যার ফলে সে কাফের হয়ে যায়। এজন্য আমি এ সকল ফজিলত উল্লেখ করছি, যেন নবিজি ﷺ-এর মহব্বত ও ভালোবাসা মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং তারা তাঁর মহব্বত নিয়ে দুনিয়া থেকে যেতে পারে। ফজিলত ১০টি হলো :

১. নবিজি ﷺ-কে শাফাআতে কুবরা তথা সুপারিশ করার বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হবে

হাশরের ময়দানে যখন হিসাব-নিকাশ হবে না, তখন মানুষ অনেক পেরেশান হয়ে যাবে এবং সকলে চাইবে যে, কমপক্ষে হিসাবটা হয়ে যাক। এজন্য মানুষ অনেক নবিদের নিকট যাবে। কিন্তু তারা সকলেই অস্বীকার করে বলবে, আমি সুপারিশের উপযুক্ত নই। এজন্য তোমরা সকলে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট যাও। তখন সকল মানুষ মিলে নবিজি ﷺ-এর নিকট আসবে। অতঃপর নবিজি ﷺ সুপারিশ করবেন। এটাকেই বলা হয় শাফাআতে কুবরা। যা একমাত্র নবিজি ﷺ-এর জন্যই নির্ধারিত।

গুনাহগারদের কিংবা নিজের উম্মতদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর সুপারিশ অন্যান্য নবি এবং নেককারগণও করবেন; তাকে শাফাআতে সুগরা বা ছোট সুপারিশ বলা হয়। কিন্তু আমাদের নবিজি ﷺ-কে শাফাআতে কুবরা বা বড় সুপারিশ করার বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হবে। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وَيَقُولُ: ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلًا، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا عِيسَى، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ، فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ، فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، حَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ، إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ.

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন

তারা বলবে, আমাদের জন্য আমাদের রবের নিকট কেউ যদি শাফাআত করত, যা এ সংকট থেকে আমাদের উদ্ধার করত। তখন তারা সকলেই হজরত আদম আ.-এর কাছে এসে বলবে, আপনি ওই ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে নিজ থেকে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেছেন; তাঁরা আপনাকে সিজদা করেছে। আপনি আমাদের জন্য আমাদের রবের নিকট শাফাআত করুন। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযুক্ত নই এবং নিজ অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, তোমরা হজরত নুহ আ.-এর নিকট যাও, যাকে আল্লাহ তাআলা প্রথম রাসুল হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। তখন তারা তাঁর নিকট আসবে। তিনিও নিজ অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, আমি তোমাদের জন্য এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা হজরত ইবরাহিম আ.-এর নিকট যাও, যাকে আল্লাহ তাআলা নিজের খলিলরূপে গ্রহণ করেছেন। তখন তারা তাঁর নিকট আসবে। তিনিও নিজ অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, আমি তোমাদের জন্য এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা হজরত মুসা আ.-এর নিকট যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন। তখন তারা তাঁর নিকট আসবে। তিনিও নিজ অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, আমি তোমাদের জন্য এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা হজরত ঈসা আ.-এর নিকট যাও। তখন তারা তাঁর নিকট আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের জন্য এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট যাও। তাঁর অগ্র-পশ্চাতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তখন তারা সকলেই আমার নিকট আসবে। তখন আমি আমার রবের নিকট অনুমতি চাইব। যখনই আমি আল্লাহকে দেখতে পাব তখন সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। এরপর আমাকে বলা হবে তোমার মাথা উঠাও। চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উঠাব এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে যে প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে আমার রবের প্রশংসা করব। এরপর আমি সুপারিশ করব, তখন আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। অতঃপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। এরপর আমি আগের মতো করব। অতঃপর তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার সিজদায় পড়ে

যাব। অবশেষে কুরআনের বাণী মোতাবেক যারা অবধারিত জাহান্নামি তাদের ব্যতীত আর কেউই জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে না।"[১০২]

এই হাদিসে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যথা :

ক. নবিজি ﷺ-কে শাফাআতে কুবরা তথা সুপারিশ করার বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

খ. কিয়ামতের দিনও আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করবেন এবং আল্লাহ তাআলা প্রার্থনা কবুলও করবেন।

গ. যতগুলো বান্দাকে জাহান্নাম থেকে বের করার অনুমতি মিলবে, ততগুলো বান্দাকেই জাহান্নাম থেকে বের করবেন।

২. নবিজি ﷺ-কে হাউজে কাউসার প্রদান করা হবে, যা অন্য আর কাউকে দেওয়া হয়নি

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

"নিশ্চয় আমি তোমাকে আল-কাউসার দান করেছি। অতএব, তোমার রবের উদ্দেশ্যেই সালাত পড়ো এবং নহর (কুরবানী) করো।"[১০৩]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, নবিজি ﷺ-কে হাউজে কাউসার প্রদান করেছেন।

হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا.

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আমার হাউজের প্রশস্ততা এক মাসের পথের সমান। তার পানি দুধের চেয়ে সাদা, তার ঘ্রাণ মিশ্‌কের চেয়ে বেশি সুগন্ধযুক্ত এবং তার পানপাত্রগুলো হবে আকাশের তারকার মতো অধিক। তা থেকে যে পান করবে সে আর কক্ষনো পিপাসার্ত হবে না।"[১০৪]

---

[১০২]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬৫৬৫

[১০৩]. সুরা কাউসার, ১০৮: ১-২

[১০৪]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬৫৭৯

অপর এক হাদিসে এসেছে—

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ... فَقَالَ: إِنَّهُ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ، فَقَرَأَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ حَتَّى خَتَمَهَا، فَلَمَّا قَرَأَهَا، قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ الْكَوَاكِبِ.

"হজরত আনাস রা. বলেন, ... নবিজি ﷺ বলেন, এইমাত্র আমার ওপর একটি সুরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি পাঠ করতে লাগলেন—

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে। "নিশ্চয় আমি আপনাকে আল-কাউসার দান করেছি"। এভাবে তিনি সুরাটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে বললেন, তোমরা কি জানো কাউসার কী? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। নবিজি ﷺ তখন বললেন, তা এমন একটি পানির ঝরনা যা আমার রব জান্নাতে সৃষ্টি করে রেখেছেন। তাতে অসংখ্য কল্যাণ বিদ্যমান। তাতে হাউজে কাউসারও রয়েছে। যেখানে কিয়ামতের দিন আমার উম্মত (পান করার জন্য) উপস্থিত হবে। এর পানপাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমপরিমাণ।"[১০৫]

উপর্যুক্ত আয়াত এবং হাদিস থেকে বুঝা গেল যে, নবিজি ﷺ-কে হাউজে কাউসার প্রদান করা হয়েছে। যা অন্য আর কাউকে দেওয়া হয়নি।

৩. অসিলা অনেক বড় একটি মর্যাদা। যা শুধু নবিজি ﷺ-কেই প্রদান করা হয়েছে।

হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ... ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، وَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ.

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বলেন, তারা নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছেন... অতঃপর আমার জন্য তোমরা আল্লাহ তাআলার নিকট অসিলা প্রার্থনা করো। কেননা, অসিলা হলো জান্নাতের এমন একটি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ জায়গা যা আল্লাহ তাআলার বান্দাদের মাঝে শুধু একজনই অর্জন

---

১০৫. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৭৪৭। সনদ সহিহ।

করবে। আশা করি আমিই হব সেই বান্দা। আর যে ব্যক্তি আমার জন্য (আল্লাহ তাআলার নিকট) অসিলার প্রার্থনা করল, তার জন্য আমার শাফাআত তথা সুপারিশ হালাল অবধারিত হলো।"[১০৬]

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ، اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আজান শুনে এই দুআ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফাআত লাভ করবে। দুআটি হলো—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ.

হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের রব। মুহাম্মাদ ﷺ-কে অসিলা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন এবং তাঁকে মাকামে মাহমুদ তথা প্রশংসিত স্থানে পৌঁছে দিন, যার অঙ্গীকার আপনি করেছেন।"[১০৭]

উপর্যুক্ত দুটি হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী অসিলা অনেক বড় একটি মর্যাদা। যা শুধু একজন বান্দাকেই দেওয়া হবে। আর তা কেবল নবিজি ﷺ-এর জন্যই হবে।

৪. নবিজি ﷺ-কে প্রশংসার ঝান্ডা প্রদান করা হবে, যা অন্য আর কাউকে দেওয়া হবে না

কিয়ামতের দিন নবিজি ﷺ আল্লাহ তাআলার এমন প্রশংসা করবেন, যা আর কেউ করেনি। এজন্য এটাকে প্রশংসার ঝান্ডা বলা হয়। এটা একমাত্র নবিজি ﷺ-কেই প্রদান করা হবে।

যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوْجًا إِذَا بُعِثُوا، وَأَنَا خَطِيْبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا، لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَخْرَ.

---

১০৬. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৩৮৪; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৬১৪

১০৭. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬১৪

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, যেদিন লোকদেরকে উঠানো হবে (কবর হতে কিয়ামতের মাঠে) সেদিন আমিই প্রথম আত্মপ্রকাশকারী হব। যখন সকল মানুষ আল্লাহ তাআলার আদালতে একত্র হবে, তখন আমি তাদের ব্যাপারে বক্তব্য উত্থাপন করব। তারা যখন নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হবে তখন আমিই তাদের সুখবর প্রদানকারী হব। সে দিন প্রশংসার পতাকা আমার হাতেই থাকবে। আমার রবের নিকট আদমসন্তানদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে সম্মানিত, এতে গর্বের কিছু নেই।"[১০৮]

এই হাদিস থেকে জানা গেল যে, কিয়ামতের দিন নবিজি ﷺ-এর হাতে প্রশংসার ঝান্ডা থাকবে। যা আর কারও হাতে থাকবে না।

৫. নবিজি ﷺ খাতামুন নাবিয়্যিন তথা সর্বশেষ নবি, তাঁর পরে আর কোনো নবি নেই

পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾

"মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসুল ও সর্বশেষ নবি।"[১০৯]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবিগণের অবস্থা এমন, এক ব্যক্তি যেন একটি ঘর নির্মাণ করল; তাকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করল, কিন্তু একপাশে একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেল। অতঃপর লোকজন এর চারপাশে ঘুরে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল—ওই শূন্যস্থানের ইটটি লাগানো হলো না কেন?। নবিজি ﷺ বলেন, আমিই হলাম সেই ইট। আর আমিই হলাম সর্বশেষ নবি।"[১১০]

---

১০৮. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৬১০। সনদ সহিহ।

১০৯. সুরা আহযাব, ৩৩: ৪০

১১০. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৫৩৫; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪২৫২

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী নবিজি ﷺ সর্বশেষ নবি এবং তাঁর পরে আর কোনো নবি আসবে না। এজন্য তাঁর পরে যে নবুয়তের দাবি করবে, সে মিথ্যাবাদী। তাকে কখনো নবি মানা উচিত নয়।

৬. নবিজি ﷺ গোটা মানবতার নবি

পূর্বে যত নবিগণ এসেছেন, তারা সকলে নির্দিষ্ট জাতি-গোত্র ও নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু আমাদের নবিজি ﷺ গোটা মানবজাতি ও জিনজাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত নবি ও রাসুল হয়ে এসেছেন। এজন্য তাঁর ফজিলত অন্য সকল নবি-রাসুলদের চেয়ে বেশি। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾

"আর আমি তো কেবল তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।"[১১১]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

"বলো, হে মানুষ, আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসুল।"[১১২]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

"আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।"[১১৩]

আরেক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।"[১১৪]

---

[১১১]. সুরা সাবা, ৩৪: ২৮

[১১২]. সুরা আরাফ, ৭: ১৫৮

[১১৩]. সুরা আম্বিয়া, ২১: ১০৭

[১১৪]. সুরা মায়িদা, ৫: ৩

অন্য আরেক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾

"হে জিন ও মানুষের দল, তোমাদের মধ্য থেকে কি তোমাদের নিকট রাসুলগণ আসেনি, যারা তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করত এবং তোমাদের এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক করত?"[১১৫]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা গেল নবিজি ﷺ মানুষ ও জিন সকলের নবি।

৭. নবিজি ﷺ-কে মিরাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বড় বড় নিদর্শনাবলি দেখানো হয়েছে

নবিজি ﷺ-কে মিরাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বড় বড় নিদর্শনাবলি প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। এই ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য একমাত্র নবিজি ﷺ-এর। অন্য কোনো নবি-রাসুলের এই ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য নেই। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন আল মাসজিদুল হারাম থেকে আল মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[১১৬]

অপর আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾

"নিশ্চয় সে তার রবের বড় বড় নিদর্শনসমূহ থেকে দেখেছে।"[১১৭]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ، وَرُبَّمَا قَالَ: فِي الْحِجْرِ، مُضْطَجِعًا إِذْ أَتَانِي آتٍ... فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ... ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ الخ.

---

[১১৫]. সুরা আনআম, ৬: ১৩০
[১১৬]. সুরা বনি ইসরাইল, ১৭: ১
[১১৭]. সুরা নাজম, ৫৩: ১৮

"হজরত মালেক ইবনে সা'সা রা. বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে নবিজি ﷺ মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন—আমি হাতিমে শুয়ে ছিলাম। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আমি হিজরে শুয়েছিলাম। হঠাৎ একজন আগন্তুক (হজরত জিবরাইল আ.) আমার নিকট এলেন। এসে আমাকে দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং দরজা খুলালেন... অতঃপর আমাকে বাইতুল মামুর[১১৮] পর্যন্ত নিয়ে গেলেন।"[১১৯]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে জানা গেল যে, নবিজি ﷺ-কে মিরাজে নিয়ে গিয়েছেন এবং বিভিন্ন নিদর্শনাবলি দেখানো হয়েছে।

৮. নবিজি ﷺ-এর ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা অন্য আর কারও ওপর অবতীর্ণ হয়নি

অন্যান্য নবিদের ওপর ছোট ছোট গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে কিন্তু নবিজি ﷺ-এর ওপর কুরআনুল কারিমের মতো মহান পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾

"নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি পর্যায়ক্রমে আল-কুরআন নাজিল করেছি।"[১২০]

৯. নবিজি ﷺ আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিত্ব

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ الْمَكِّى اَلْهِلَالِي عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي شَكَاتُهُ الَّذِى قَبَضَ فِيْهَا... اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَاَكْرَمُ النَّبِيِّيْنَ عَلَى اللهِ وَاحِبُ الْمَخْلُوْقِيْنَ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"হজরত আলি ইবনে আলি আল-মাক্কি আল-হেলালি রহ. বলেন, যে অসুস্থতায় নবিজি ﷺ-এর ইন্তেকাল হলো, আমি সে সময় নবিজি ﷺ-এর নিকট... নবিজি ﷺ তখন ইরশাদ করেন, আমি হলাম শেষ নবি এবং আল্লাহ

---

[১১৮] ৭ম আসমানে দুনিয়ার কাবা বরাবর অবস্থিত ফেরেশতাদের কাবাকে বাইতুল মামুর বলা হয়। এখানে ফেরেশতারা ইবাদত ও তাওয়াফ করে থাকে। প্রতিদিন ৭০ হাজার ফেরেশতারা এতে ইবাদত ও তাওয়াফ করে যারা পরবর্তী সময়ে আর সুযোগ পায় না। প্রতিদিন নতুন ফেরেশতাদের পালা আসে। *সহিহ বুখারি*, ৩২০৭; *সহিহ মুসলিম*, ১৬২

[১১৯]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৮৮৭

[১২০]. সুরা ইনসান, ৭৬: ২৩

তাআলার নিকট সবচেয়ে সম্মানী এবং সকল মাখলুকের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।"[১২১]

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا، لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَخْرَ.

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, যেদিন লোকদেরকে উঠানো হবে (কবর হতে কিয়ামতের মাঠে) সেদিন আমিই প্রথম আত্মপ্রকাশকারী হব। যখন সকল মানুষ আল্লাহ তাআলার আদালতে একত্র হবে, তখন আমি তাদের ব্যাপারে বক্তব্য উত্থাপন করব। তারা যখন নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হবে তখন আমিই তাদের সুখবর প্রদানকারী হব। সে দিন প্রশংসার পতাকা আমার হাতেই থাকবে। আমার রবের নিকট আদমসন্তানদের মধ্যে আমিই সবচাইতে সম্মানিত, এতে গর্বের কিছু নেই।"[১২২]

উপর্যুক্ত হাদিস থেকে জানা গেল, নবিজি ﷺ সকল মাখলুকের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।

১০. নবিজি ﷺ পূর্বের ও পরের তথা গোটা মানবজাতির সরদার, অন্য কেউ নয়

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي دَعْوَةٍ... وَقَالَ: أَنَا سَيِّدُ الْقَوْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে একটি খানার দাওয়াতে উপস্থিত ছিলাম... অতঃপর নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আমি কিয়ামতের দিন সমগ্র মানবজাতির সরদার হব।"[১২৩]

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ.

---

[১২১]. *তাবরানি কাবির*, ৩/৫৭ পৃষ্ঠা হাদিস নং ২৬৭৫; *দালায়েলুন নবুওয়াহ*, ২/৬৭২ পৃষ্ঠা হাদিস নং ৪২২৮। সনদ হাসান।

[১২২]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৬১০। সনদ সহিহ।

[১২৩]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৩৪০

"হজরত আবু হুরাইরা রা.বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আমি সমগ্র মানবজাতির সরদার এবং আমিই হলাম ওই ব্যক্তি যে প্রথম কবর থেকে বের হয়ে আসব। আমিই প্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশই প্রথম কবুল করা হবে।"[১২৪]

উপর্যুক্ত ১০টি আয়াত ও ১২টি হাদিসে নবিজি ﷺ-এর ফজিলত ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয়েছে। এজন্য আমাদেরকে নবিজি ﷺ-এর অনুসরণ করতে হবে। কখনো তাঁর অবাধ্যতা কিংবা তাঁর সঙ্গে বেয়াদবি করা যাবে না এবং এমন বাক্য ব্যবহার করা যাবে না, যার দ্বারা তাঁর অবাধ্যতা হয়। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, তাঁকে খ্রিষ্টানদের মতো এত উচ্চ মর্যাদাও দেওয়া যাবে না, যা তাঁকে আল্লাহ তাআলার মর্যাদায় উপনীত করে। এটাও নবিজি ﷺ নিষেধ করেছেন।

নবিজি ﷺ-এর যতটুকু মর্যাদা ও ফজিলত ঠিক ততটুকুর মধ্যেই নিবৃত থাকা, এর চেয়ে অধিক বাড়াবাড়ি ঠিক নয়

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ﴾

"বলো, হে কিতাবিরা! সত্য ছাড়া তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না।"[১২৫]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾

"হে কিতাবিগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর ওপর সত্য ছাড়া ভিন্ন বলো না।"[১২৬]

নবিজি ﷺ-এর যতটুকু ফজিলত কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তার ওপর নিবৃত থাকাই উত্তম। এর চেয়ে বাড়া ঠিক নয়। হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ.

---

[১২৪]. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৬৭৩। সনদ সহিহ।
[১২৫]. সুরা মায়িদা, ৫: ৭৭
[১২৬]. সুরা নিসা, ৪: ১৭১

"হজরত ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি উমর রা.-কে মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। যেমনটি হজরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ.-এর সম্পর্কে নাসারা (খ্রিষ্টানরা) বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুলই বলবে।"[১২৭]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যেভাবে খ্রিষ্টানরা হজরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. সম্পর্কে অনেক বাড়াবাড়ি করেছে, এমনকি আল্লাহর পুত্র পর্যন্ত বানিয়ে ফেলেছে, তোমরাও আমার ক্ষেত্রে এমনটি করো না। আমাকে শুধু আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুলই বলবে।

অন্য এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ.

"হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা নবিগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করো না।"[১২৮]

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা আমাকে অন্য নবিদের ওপর মর্যাদা দিয়ো না। এজন্য কুরআন ও হাদিসে নবিজি ﷺ-এর জন্য যতটুকু মর্যাদা প্রমাণিত, ততটুকু মর্যাদাই বর্ণনা করা উচিত। এর থেকে অধিক বর্ণনা করা গোমরাহি বা পথভ্রষ্টতা।

যতটুকু মর্যাদা প্রমাণিত, তার চেয়ে অধিক মর্যাদা বর্ণনা করা বিদআত। আর বিদআতের পরিণাম হলো গোমরাহি বা পথভ্রষ্টতা। এজন্য এ কাজটি করা উচিত নয়। কেননা হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ... وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"হজরত আবদুর রহমান ইবনে আমর সুলাইমি ও হুজর ইবনু হুজর রা. থেকে বর্ণিত... নবিজি ﷺ একদিন অসিয়ত করেছেন... সাবধান! দ্বীনের মধ্যে নব আবিষ্কৃত কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, দ্বীনের মধ্যে নব আবিষ্কৃত

---

১২৭. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৪৪৫

১২৮. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৬৬৮

প্রতিটি কাজই হলো বিদআত। আর সকল বিদআতই গোমরাহি বা পথভ্রষ্টতা।"[১২৯]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে বুঝা গেল, কুরআন ও হাদিসে যতটুকু ফজিলত ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে, তার থেকে অধিক বর্ণনা করা ঠিক নয়। বরং তা গোমরাহি বা পথভ্রষ্টতা।

[১২৯]. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৮৬৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৬০৭

নবিজি ﷺ মানুষ তবে আল্লাহ তাআলার পরে গোটা সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম সৃষ্টি

এ আকিদা সম্পর্কে ২৮টি আয়াত এবং ৮টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

নবিজি ﷺ-এর ওপর যে-সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রত্যেকটি নুর বা জ্যোতি। নবিজি ﷺ-এর রিসালাত একটি নুর বা জ্যোতি। নবিজি ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ কুরআন একটি নুর বা জ্যোতি। ঈমান একটি নুর বা জ্যোতি। আর এ সকল গুণাবলি নবিজি ﷺ-এর মধ্যে পরিপূর্ণ মর্যাদায় বিদ্যমান ছিল। এজন্য নবিজি ﷺ গুণের দিক থেকে নুরি বা জ্যোতিময়। কিন্তু সত্তাগতভাবে মানুষ। কেননা, নবিজি ﷺ-কে মানুষের মধ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি খাওয়া-দাওয়া করেন। তিনি পান করেন। তিনি বিয়ে-শাদি করেছেন এবং মানুষের মতোই জীবনযাপন করেছেন। যেমন জনৈক কবি বলেন,

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

"সংক্ষেপ কথা হলো আল্লাহ তাআলার পরেই আপনার মর্যাদা।"

ইরানের প্রসিদ্ধ কবি শেখ সাদি রহ. তাঁর গুলিস্তার ভূমিকায় লিখেন,

بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهٖ - كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهٖ

حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ - صَلُّوْا عَلَيْهِ وَآلِهٖ

সুউচ্চ শিখরে সমাসীন তিনি নিজ মহিমায়
তিমির-তমসা কাটিল তার রূপের প্রভায়।
সুন্দর অতি সুন্দর তার স্বভাব-চরিত্র তামাম
জানাও তাঁর ও তাঁর বংশের পরে দরুদ ও সালাম।

নবিজি গোটা সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিত্ব

হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ... فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَسَكَنَ.

"হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন... আল্লাহ তাআলা হজরত ঈসা আ.-এর নিকট ওহি প্রেরণ করেছেন... আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যদি মুহাম্মাদ না হতো, তাহলে আমি হজরত আদমকে সৃষ্টি করতাম না। যদি মুহাম্মাদ না হতো, তাহলে আমি জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করতাম না। আমি যখন আরশকে সৃষ্টি করেছি, তখন তা দুলতে লাগল। তখন আমি আরশের ওপর যখন— لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللهِ লিখেছি, তখন তা স্থির হয়ে গেছে।"[১৩০]

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ ... فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ؛ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، فَقَالَ اللهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ، إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، ادْعُنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ.

"হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, হজরত আদম আ. যখন ভুল করেছে... অতঃপর আমি আরশের পায়ার মধ্যে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ লেখা দেখেছি। তখন আমি বুঝে গেছি যে, আল্লাহ তাআলা নিজের নামের সঙ্গে একমাত্র মাহবুব তথা প্রিয়জনের নামই একসঙ্গে করতে পারেন। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, তুমি সত্য বলেছ। হজরত মুহাম্মাদ মাখলুকের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয়। তুমি তাঁর অসিলা নিয়ে দুআ করেছ, তাই আমি মাফ করে দিয়েছি। যদি মুহাম্মাদ না হতো, তাহলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।"[১৩১]

---

১৩০. মুস্তাদরাকে হাকেম, *দালায়েলুন নবুওয়্যাহ*, ২/৬৭২ হাদিস নং ৪২২৭। ইমাম হাকেম রহ.-এর সনদকে সহিহ বললেও এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

১৩১. মুস্তাদরাকে হাকেম; *দালায়েলুন নবুওয়্যাহ*, ২/৬৭২ হাদিস নং ৪২২৮। ইমাম বাইহাকি তার 'দালায়েল'-এ এই হাদিস উল্লেখ করে বলেন, এই হাদিসের সনদটি আবদুর রহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম থেকে একক

উপর্যুক্ত দুটি হাদিস থেকে জানা গেল, নবিজি ﷺ গোটা সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম।

> নোট: উপর্যুক্ত হাদিস দুটি সিহাহ সিত্তাহ তথা বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস গ্রন্থে কিংবা তার ওপরের কোনো গ্রন্থে আমি পাইনি। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ লিখেছেন, আমার ধারণা হলো এই হাদিসগুলো মাওজু। কিন্তু যেহেতু হাদিসগুলো (এবং হাদিসগুলোর সনদ সহিহ না হলেও এটি ধ্রুব সত্য যে, নবিজি আল্লাহর সৃষ্টির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর সর্বাধিক প্রিয়।) ফজিলতের (কোনো বিধানের হাদিস নয়) তাই অধম তা উল্লেখ করেছি।

নবিজিকে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমি মানুষ

নিম্নের তিনটি আয়াতে হসর এবং তাকিদ তথা একমাত্র এবং গুরুত্বের অর্থ প্রদান করে নবিজি ﷺ-কে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—নবিজি ﷺ অবশ্যই মানুষ। তবে তাঁর ওপর ওহি আসে। যা অনেক বড় ফজিলত ও মর্যাদার বিষয়। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾

"বলো, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহি প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ।"[১৩২]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا﴾

"বলো, পবিত্র মহান আমার রব! আমি তো একজন মানব-রাসুল ছাড়া কিছুই নই?"[১৩৩]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾

"আর তোমার পূর্বে কোনো মানুষকে আমি স্থায়ী জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা অনন্ত জীবনসম্পন্ন হয়ে থাকবে?"[১৩৪]

সূত্রে বর্ণিত। আর তিনি যইফ রাবি। আর ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. সকলের ঐকমত্যে তাকে যইফ বলেছেন। *আত-তাওয়াসসুল*, পৃ. ১৬৬

[১৩২]. সুরা কাহাফ, ১৮: ১১০

[১৩৩]. সুরা বনি ইসরাইল, ১৭: ৯৩

আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾

“তাদেরকে তাদের রাসুলগণ বলল, আমরা তো কেবল তোমাদের মতোই মানুষ।”[১৩৫]

অন্য আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ﴾

“কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন, ওহির মাধ্যম কিংবা পর্দার আড়াল ব্যতীত।”[১৩৬]

নবিজি নিজেই ঘোষণা করেছেন—আমি মানুষ

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

قَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ... قَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي.

“হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ সালাত আদায় করলেন... অতঃপর বললেন, যদি সালাত সম্পর্কে নতুন কিছু হতো, তাহলে অবশ্যই তোমাদের তা জানিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল করে থাকো, আমিও তোমাদের মতো ভুলে যাই। সুতরাং আমি কোনো সময় ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।”[১৩৭]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ... فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ.

“আম্মাজান হজরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন... নবিজি ﷺ ঝগড়াকারীদের নিকট এসে বললেন, আমি তো একজন মানুষ। আমার

---

[১৩৪]. সুরা আম্বিয়া, ২১: ৩৪

[১৩৫]. সুরা ইবরাহিম, ১৪: ১১

[১৩৬]. সুরা শুরা, ৪২: ৫১

[১৩৭]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪০১; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৫৭২

নিকট (কোনো কোনো সময়) ঝগড়াকারীরা (বিচারের জন্য) আসে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের চেয়ে অধিক বাকপটু। তখন আমি মনে করি যে, সে সত্য বলেছে। তাই আমি তার পক্ষে রায় দিই। বিচারে যদি আমি ভুলবশত অন্য কোনো মুসলমানের হক তাকে দিয়ে থাকি, তবে তা জাহান্নামের টুকরা।"[১৩৮]

অন্য আরেক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي نَخْلٍ... فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ الظَّنُّ، إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئًا فَاصْنَعُوهُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ.

"হজরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে একটি খেজুর বাগান অতিক্রম করছিলাম... অতঃপর নবিজি ﷺ-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছল যে, এ বছর খেজুরের ফলন কম হয়েছে। নবিজি ﷺ তখন ইরশাদ করেন, এটা তো ছিল একটি ধারণাম প্রসূত মতামত। ওই প্রক্রিয়ায় কোনো উপকার হলে তোমরা তা করো। আমি (এ বিষয়ে) তোমাদের মতোই একজন মানুষ। ধারণা তো কখনো ভুল হয় আবার কখনো সঠিকও হয়।"[১৩৯]

উপর্যুক্ত আয়াত এবং হাদিসসমূহে বারবার নবিজি ﷺ ঘোষণা করেছেন—আমি মানুষ। আর এমনিতেও নবিজি ﷺ মানববংশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। মানববংশেই বিয়েশাদি করেছেন। তারপরও নবিজি ﷺ নুর কীভাবে হয়!

মানুষ ফেরেশতার চেয়েও উত্তম

মানুষ ফেরেশতার চেয়েও উত্তম। এজন্য তাকে ফেরেশতাদের কিংবা নুরি মাখলুক তথা আলোকিত সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। যেমন আকিদাবিষয়ক প্রসিদ্ধ *শরহুল আকাইদ* গ্রন্থে এসেছে—

رُسُلُ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنَ الرُّسُلِ الْمَلَائِكَةِ؛ وَرُسُلُ الْمَلَائِكَةِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْبَشَرِ؛ وَعَامَّةِ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْمَلَائِكَةِ.

---

১৩৮. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ২৪৫৮

১৩৯. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২৪৭০। সনদ সহিহ।

"মানুষের রাসুল ফেরেশতাদের রাসুল থেকে উত্তম। আর ফেরেশতাদের রাসুল সাধারণ মানুষ থেকে উত্তম। আর সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতাদের থেকে উত্তম।"[১৪০]

শরহুল আকাইদ-এর উপর্যুক্ত পাঠ থেকে তিনটি বিষয় জানা গেল। যথা :

ক. সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতা থেকে উত্তম।

খ. বড় ফেরেশতা (যাদেরকে ফেরেশতাদের রাসুল বলা হয়) সাধারণ মানুষ থেকে উত্তম।

গ. ফেরেশতাদের রাসুলদের থেকে মানুষের রাসুল উত্তম।

এজন্য নবিজি ﷺ মানুষ হওয়ার কারণে সকল ফেরেশতাদের থেকে উত্তম। সুতরাং নবিজি ﷺ-কে নুরি মাখলুক তথা আলোকিত সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করা নবিজি ﷺ-এর মর্যাদাহানী করার শামিল।

আল্লাহ তাআলার পরে (সৃষ্টির মাঝে) নবিজিই সর্বোত্তম

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা হলো, আল্লাহ তাআলার পরে (সৃষ্টির মাঝে) নবিজিই সর্বোত্তম। গোটা সৃষ্টির ওপরে নবিজি ﷺ-এর সাতটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা :

১. নবিজি ﷺ খাতামুর রাসুল তথা সর্বশেষ রাসুল।

২. তাঁর নিচে সকল রাসুলগণ।

৩. তাঁর নিচে সকল নবিগণ।

৪. তাঁর নিচে বড় ফেরেশতাগণ।

৫. তাঁর নিচে সাধারণ মানুষ।

৬. তাঁর নিচে সাধারণ ফেরেশতাগণ।

৭. তাঁর নিচে বাকি সৃষ্টি।

যে-সকল আয়াতে মানুষকে ফেরেশতাদের থেকে উত্তম সাব্যস্ত করা হয়েছে

সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম। যেমন কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾

---

১৪০. *শরহুল আকাইদ আন-নাসাফি*, ১৭৬ পৃষ্ঠা

"আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদের আকৃতি দিয়েছি। তারপর ফেরেশতাদেরকে বলেছি, তোমরা আদমকে সিজদা করো। অতঃপর তারা সিজদা করেছে, ইবলিস ছাড়া।"[১৪১]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾

"অতঃপর, ফেরেশতারা সকলেই (আদমকে) সিজদা করল।"[১৪২]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾

"অতঃপর, ফেরেশতারা সকলেই (আদমকে) সিজদা করল।"[১৪৩]

উপর্যুক্ত তিনটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, সকল ফেরেশতাকে দিয়ে মানুষকে তাযিমি তথা সিজদা করানো হয়েছে। যার দ্বারা বুঝা গেল, সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম।

আরেক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾

"আর আমি তো আদমসন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি।"[১৪৪]

অন্য এক জায়গায় ইরশাদ করেন—

﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

"কসম 'তীন ও যায়তুন' এর। কসম 'সিনাই' পর্বতের, কসম এই নিরাপদ নগরীর। অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে।"[১৪৫]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা চারটি কসম খেয়ে বলছেন, আমি মানুষকে অনেক উত্তমভাবে সৃষ্টি করেছি।

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

---

[১৪১]. সুরা আরাফ, ৭: ১১
[১৪২]. সুরা হিজর, ১৫: ৩০
[১৪৩]. সুরা সোয়াদ, ৩৮: ৭৩
[১৪৪]. সুরা বনি ইসরাইল, ১৭: ৭০
[১৪৫]. সুরা ত্বীন, ৯৫: ১-৪

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

"আর তিনি আদমকে নামসমূহ সব শিক্ষা দিলেন তারপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। সুতরাং বললেন, তোমরা আমাকে এগুলোর নাম জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল, আপনি পবিত্র মহান। আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তিনি বললেন, হে আদম, এগুলোর নাম তাদেরকে জানাও। অতঃপর যখন সে এগুলোর নাম তাদেরকে জানাল, তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, নিশ্চয় আমি আসমানসমূহ ও জমিনের গায়েব জানি।"[১৪৬]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা গেল, সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতাদের থেকে উত্তম। এজন্যই মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব বলা হয় এবং মানব-রাসুল ফেরেশতাদের রাসুল থেকে উত্তম। কেননা সবচেয়ে বড় এবং উত্তম ফেরেশতা হলো হজরত জিবরাইল আ.। আর জিবরাইল আ. সকল রাসুলদের নিকট বার্তা পৌছাতেন। যা থেকে বুঝা গেল যে, মানব-রাসুল বড় ফেরেশতাদের থেকে উত্তম।

মিরাজের রাতে হজরত জিবরাইল আ. নবিজি ﷺ-এর খাদেম হয়ে নবিজিকে আসমানের ওপর নিয়ে গিয়েছিলেন। এর থেকেও বুঝা যায় যে, নবিজি ﷺ সকল ফেরেশতা থেকে উত্তম। যেমন এ ব্যাপারে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ، وَرُبَّمَا قَالَ: فِي الْحِجْرِ، مُضْطَجِعًا إِذْ أَتَانِي آتٍ... فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ... ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ الخ

"হজরত মালেক ইবনে সা'সা রা. বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে নবিজি ﷺ মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন, আমি হাতিমে শুয়ে ছিলাম। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আমি হিজরে শুয়েছিলাম। হঠাৎ একজন আগন্তুক

---

[১৪৬]. সুরা বাকারা, ২: ৩১-৩৩

(হজরত জিবরাইল আ.) আমার নিকট এলেন। এসে আমাকে দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং দরজা খুলালেন... অতঃপর আমাকে বাইতুল মামুর পর্যন্ত নিয়ে গেলেন।”[১৪৭]

এই হাদিস থেকে জানা গেল, হজরত জিবরাইল আ. খাদেম হয়ে নবিজি ﷺ-কে মিরাজে নিয়ে গিয়েছেন। এজন্য নবিজি ﷺ সকল ফেরেশতা থেকেও উত্তম। সুতরাং উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ থেকে বুঝা গেল, মানুষ ফেরেশতাদের থেকে উত্তম। আর নবিজি ﷺ সবার চেয়ে উত্তম।

হিন্দুদের বিশ্বাস হলো, ভগবান দেব-দেবতার রূপ ধারণ করে আসে

হিন্দুদের বিশ্বাস হলো, ভগবান তথা আল্লাহ তাদের দেব-দেবতার রূপ ও আকৃতিতে এসেছিলেন এবং এখনো আসে। এজন্য তারা দেব-দেবতাদের পূজা করে। এগুলোর সামনে মাথা নত করে। এগুলোর নামে নজর-মানত মানে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করে।

মুসলমানদেরও যেন আবার এই আশঙ্কা না হয় যে, আল্লাহ তাআলা নবিজি ﷺ-এর আকৃতিতে এসেছেন এবং এটাও আল্লাহ তাআলার নুর বা জ্যোতির অংশ। এজন্য পেছনের ছয়টি আয়াতে স্বয়ং নবিজি ﷺ-কে দিয়েই অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ঘোষণা করানো হয়েছে যে, আমি মানুষ। আমি মানব। আমি নুরি মাখলুক তথা আলোকিত সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা আমার রূপ বা আকৃতিতে আসেনি। এজন্য আমার ইবাদত করো না এবং আমার নিকট তোমাদের প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনাও করো না। আমি নিজেও আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি। সুতরাং তোমরাও তাঁর নিকটই প্রার্থনা করো। এই শিক্ষা দেওয়ার জন্যই নবিজি ﷺ-কে প্রেরণ করা হয়েছে। আর এটাই দ্বীন ইসলাম।

ওই সকল আয়াত ও হাদিসসমূহ যেগুলোর দ্বারা নবিজি ﷺ-এর নুর বা জ্যোতি হওয়ার আশঙ্কা হয়

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

---

[১৪৭]. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩৮৮৭

“হে কিতাবিগণ, তোমাদের নিকট আমার রাসুল এসেছে, কিতাব থেকে যা তোমরা গোপন করতে, তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট সে প্রকাশ করছে এবং অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করেন।”[১৪৮]

এই আয়াতে নুর শব্দটি দ্বারা নবিজি ﷺ-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এর কারণ হলো, তাফসিরে জালালাইনে নুরের তাফসিরে শুধু هُوَ النَّبِيُّ ﷺ বলেছেন। যা থেকে বুঝা গেল, নুর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুহাম্মাদ ﷺ।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসির হলো,

﴿قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللهِ نُوْرٌ﴾

এখানে নুরের তাফসির করেছেন প্রথমে রাসুল। তারপর মুহাম্মাদ। যার উদ্দেশ্য হলো, নবিজি ﷺ-এর রিসালাত হলো নুর। নবিজি ﷺ-এর নিজ জাত বা সত্তা নুর নয় এবং এটা কীভাবে সম্ভব? কেননা পূর্বের কয়েকটি আয়াতে এটা ঘোষণা করানো হয়েছে যে, তিনি মানুষ।

দ্বিতীয়ত নুর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈমান। যেমন এক তাফসিরে এসেছে—

﴿وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهِ أَيْ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِيْمَانِ﴾

“এবং তাঁর অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। অর্থাৎ কুফর থেকে ঈমানের দিকে বের করে আনেন।”[১৪৯]

এখানে নুরের অর্থ করা হয়েছে ঈমান। তাহলে বুঝা গেল নুরের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে।

তৃতীয় দলিল হলো, এই আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে—

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا﴾

---

১৪৮. সুরা মায়িদা, ৫: ১৫-১৬

১৪৯. *তানবিরুল মিকইয়াস মিন তাফসিরে ইবনি আব্বাস*, ১১৯ পৃষ্ঠা, সুরা মায়িদার ১৫-১৬ নং আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য, মুহাক্কিক আলেমদের নিকট এই তাফসিরগ্রন্থটি ইবনু আব্বাস রাদি. থেকে প্রমাণিত নয়।

এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কিতাবিদেরকে এটা জানানো যে, তোমাদের নিকট আমাদের রাসুল এসে গেছে। এর থেকেও বুঝা যায় যে, এখানে নুর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নবিজি ﷺ-এর রিসালাত। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নবিজি ﷺ-এর দ্বীন, নবিজি ﷺ-এর রিসালাত এবং নবিজি ﷺ-এর হিদায়াত হলো নুর বা জ্যোতি। এমন নুর বা জ্যোতি যা চন্দ্র-সূর্যের আলো থেকেও অধিক আলোকিত।

কোনো কোনো মুফাসসিরগণ নুরের তাফসির করেছেন শুধু মুহাম্মাদ ﷺ। যার ফলে কেউ কেউ মনে করেন নবিজি ﷺ-এর জাত তথা সত্তা নুর বা জ্যোতি। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর মূল তাফসির দেখলে বুঝা যায় যে, এখানে নুর দ্বারা নবিজি ﷺ-এর রিসালাতই উদ্দেশ্য। আর না হয় নুর শব্দটি আছে এমন আরও ১০টি আয়াতের সঙ্গে বৈপরীত্ব দেখা দেয়।

নুর শব্দের অর্থ কোথাও নুরে নবুয়ত, কোথাও কুরআন এবং কোথাও হিদায়াত। এজন্য একটি অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা নবিজি ﷺ-কে নুর প্রমাণ করা কঠিন। এটাই ওই আয়াত যার দ্বারা কেউ কেউ নবিজি ﷺ-কে নুর প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকে।

নিম্নের আয়াতটি দিয়েও কেউ কেউ নবিজি ﷺ-কে নুর প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আয়াতটি হলো—

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾

"হে নবি, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও আলোকদীপ্ত প্রদীপ হিসেবে।"[১৫০]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসিরে এসেছে— এই আয়াতে ﴿سِرَاجًا مُنِيرًا﴾ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন আলো যার অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ নবিজি ﷺ-এর হিদায়াত ও নবুয়ত।

এই তাফসিরে ﴿سِرَاجًا﴾ দ্বারা বাতি উদ্দেশ্য নয়; বরং নবিজি ﷺ-এর নবুয়তের আলো। মানুষ যার অনুসরণ করে।

---

১৫০. সুরা আহযাব, ৩৩: ৪৫-৪৬

কুরআনে নুর শব্দটি ৫টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে

কুরআনুল কারিমে নুর শব্দটি ৫টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো রিসালাত অর্থে। কখনো ঈমান অর্থে। কখনো আহকাম বা বিধান অর্থে এবং কখনো দ্বীন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এজন্য কুরআনের সুরা মায়িদার ১৫ নং আয়াত—

﴿قَدْ جَآءَكُم مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ﴾

এখানে নুর দ্বারা নবিজি ﷺ-কেই উদ্দেশ্য করা জরুরি নয়। তা থেকে তাঁর রিসালাতও উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমনটি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসিরে নুর দ্বারা নবিজি ﷺ-এর রিসালাত উদ্দেশ্য করেছেন। আর যদি এর দ্বারা নবিজি ﷺ-এর জাত বা সত্তা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তাহলে এই আয়াতটি পেছনের ১২টি আয়াতের সঙ্গে বৈপরীত্ব হয়ে যায়। যেখানে হসর এবং তাকিদ তথা একমাত্র এবং গুরুত্বের অর্থ প্রদান করে নবিজি ﷺ-কে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমি মানুষ। প্রিয় পাঠক, এখন আপনিই ভাবুন।

কুরআনুল কারিমে নুর শব্দটি ৫টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তা হলো,

ক. নিম্নের দুটি আয়াতে নুর শব্দটি কুরআন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

﴿وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْ أُنْزِلَ مَعَهٗ ۙ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

"এবং তার সঙ্গে যে নুর নাজিল করা হয়েছে তা অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।"[১৫১]

﴿مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾

"তুমি জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী? কিন্তু আমি একে নুর বা আলো বানিয়েছি, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি।"[১৫২]

---

[১৫১]. সুরা আরাফ, ৭: ১৫৭

[১৫২]. সুরা শুরা, ৪২: ৫২

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসিরে এই দুই আয়াতে وَاتَّبَعُوا النُّورَ এবং وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا উভয় স্থানে নুর শব্দটি কুরআন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

খ. নিম্নের দুটি আয়াতে নুর শব্দটি ঈমান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

﴿وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ﴾

"এবং তাঁর অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন।"[১৫৩]

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾

"তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা তোমাদের জন্য দুআ করে, তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনার জন্য; আর তিনি মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।"[১৫৪]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসিরে এই দুই আয়াতে—নুর শব্দটি ঈমান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

গ. নিম্নের আয়াতে নুর শব্দটি আহকাম বা বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾

"নিশ্চয় আমি তাওরাত নাজিল করেছি, তাতে ছিল হিদায়াত ও আলো।"[১৫৫]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসিরে এই আয়াতে 'নুর' শব্দটি আহকাম বা বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ঘ. নিম্নের দুটি আয়াতে নুর শব্দটি দ্বীন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

"তারা আল্লাহর নুরকে নির্বাপিত করতে চায় তাদের মুখের (ফুঁক) দ্বারা, কিন্তু আল্লাহ তো তাঁর নুর পরিপূর্ণ করা ছাড়া অন্য কিছু চান না, যদিও কাফিররা অপছন্দ করে।"[১৫৬]

---

[১৫৩]. সুরা মায়িদা, ৫: ১৬
[১৫৪]. সুরা আহযাব, ৩৩: ৪৩
[১৫৫]. সুরা মায়িদা, ৫: ৪৪
[১৫৬]. সুরা তাওবা, ৯: ৩২

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

"তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নুরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নুরকে পূর্ণতাদানকারী। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।"[১৫৭]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসিরে এই দুই আয়াতে নুর শব্দটি আল্লাহর দ্বীন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ঘ. নিম্নের আয়াতে নুর শব্দটি আহকাম বা বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾

"অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে।"[১৫৮]

এখানে নুরের তাফসির করেছেন প্রথমে রাসুল। তারপর মুহাম্মাদ। যার উদ্দেশ্য হলো, নবিজি ﷺ-এর রিসালাত হলো নুর। নবিজি ﷺ-এর নিজ জাত বা সত্তা নুর নয়।

যেখানে কুরআনে নুর শব্দটি ৫টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাহলে সেখানে;

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾

এই আয়াতে নুরের অর্থ নবিজি ﷺ-এর নিজ জাত বা সত্তা উদ্দেশ্য নেওয়া হবে কেন? যেখানে পূর্বের কয়েকটি আয়াতে এটা ঘোষণা করানো হয়েছে যে, তিনি মানুষ। এজন্য উত্তম হলো এটা বলা– নবিজি ﷺ মানুষ ছিলেন কিন্তু তাঁর মধ্যে ঈমান, রিসালাত, কুরআন, দ্বীন এবং আহকাম বা বিধান ইত্যাদি গুণাবলি পরিপূর্ণভাবে ছিল, যা নুর বা জ্যোতি। সুতরাং তিনি গুণাবলির দিক থেকে নুর বা জ্যোতি ছিলেন।

অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করে নবিজিকে মানুষ বলা ঠিক নয়

রাসুল মানুষ। কিন্তু তাঁকে হীন এবং ছোট করার জন্য অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের স্বরে এভাবে বলা– তিনি আমাদের মতোই মানুষ এবং এই হুমকি দেওয়া যে, আমাদের নিকট ওহি আসে না। এজন্য তাঁর নিকটও ওহি আসে না। সুতরাং আপনি আমাদেরকে নসিহত করবেন না। আমরা আপনার ওপর ঈমান আনতে বাধ্য নই। এভাবে বলা রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে বেয়াদবি এবং তাঁর ওপর

---

[১৫৭]. সুরা সফ, ৬১: ৮
[১৫৮]. সুরা মায়িদা, ৫: ১৫

ঈমান না আনার শামিল। এজন্য এভাবে হীন এবং ছোট করার জন্য অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের স্বরে মানুষ বলা উচিত নয়। এতে ঈমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া প্রমাণিত হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾

"তুমি তো কেবল আমাদের মতো মানুষ, সুতরাং তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে কোনো নিদর্শন নিয়ে এসো।"[১৫৯]

অপর আয়াতে ইরশাদ করেন–

﴿وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾

"তুমি তো কেবল আমাদের মতো মানুষ, আর আমরা তোমাকে অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি।"[১৬০]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেন–

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾

"অতঃপর তার কওমের নেতৃস্থানীয়রা যারা কুফরি করেছিল, তারা বলল, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু দেখছি না এবং আমরা দেখছি যে, কেবল আমাদের নীচু শ্রেণির লোকেরাই বিবেচনাহীনভাবে তোমার অনুসরণ করেছে। আর আমাদের ওপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব আমরা দেখছি না; বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করছি।"[১৬১]

এই তিন আয়াতে কাফিররা রাসুলদেরকে নিজেদের মতোই রাসুল বলেছে এবং বলেছে যে, তাদের নিকট ওহি আসে না এবং তাদের অনুসরণ করো না। এভাবে রাসুলকে মানুষ বলা তাঁর সঙ্গে বেয়াদবি। এর থেকে প্রত্যেকের বিরত থাকা উচিত।

নবিজি নিজেই বলেছেন, আমার সম্পর্কে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করো না

খ্রিষ্টানরা হজরত ঈসা আ.-এর ব্যাপারে অনেক অতিরঞ্জিত করেছে এবং তাঁকে আল্লাহর পুত্র পর্যন্ত বলেছে। আর এটা তাঁর সম্মানার্থেই করেছে। কিন্তু

---

[১৫৯]. সুরা শুআরা, ২৬: ১৫৪
[১৬০]. প্রাগুক্ত : ১৮৬
[১৬১]. সুরা হুদ, ১১: ২৭

এ কথাটি ঠিক নয়। এজন্য কুরআনুল কারিমে নিষেধ করা হয়েছে যে, নবির সম্মান এতটুকুই করো যতটুকু তাঁর প্রাপ্য। তা থেকে অধিক করাটা বাড়াবাড়ি। যা মোটেও ঠিক নয়।

তাইতো নবিজি ﷺ নিজের উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমার সম্পর্কেও বাড়াবাড়ি করো না। এজন্য নবিজি ﷺ যদি মানুষ হন (অবশ্যই তিনি মানুষ) তাহলে নবিজি ﷺ-কে মানুষ করাই উত্তম এবং এটাতেই তাঁর সম্মান। এজন্যই হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ.

“হজরত ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিন উমর রা.-কে মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। যেমনটি হজরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ.-এর সম্পর্কে নাসারা (খ্রিষ্টানরা) বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুলই বলবে।”[১৬২]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যেভাবে খ্রিষ্টানরা হজরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ.-এর ক্ষেত্রে অনেক বাড়াবাড়ি করেছে, এমনকি আল্লাহর পুত্র বানিয়ে ফেলেছে, তোমরাও আমার ক্ষেত্রে এমনটি করো না।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾

“তোমরা তোমাদের দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর ওপর সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলো না।”[১৬৩]

আরও ইরশাদ হয়েছে–

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ﴾

“বলো, হে কিতাবিরা! সত্য ছাড়া তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না।”[১৬৪]
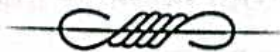
[১৬২]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৪৪৫
[১৬৩]. সুরা নিসা, ৪: ১৭১

সপ্তম অধ্যায়

নবিজি ﷺ কবরে জীবিত

এই জীবন দুনিয়ার জীবন থেকে ঊর্ধ্বে

নবিজির পবিত্র দেহ পুরোপুরি সংরক্ষিত

এ আকিদা সম্পর্কে ১১টি আয়াত এবং ২০টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

নবিজি ﷺ কবরে জীবিত এবং এটা কবরের জীবন। আর এই জীবন দুনিয়ার জীবন থেকে উত্তম এবং নবিজি ﷺ-এর দেহ মাটি খায়নি। তাঁর দেহ মুবারক কবরে পুরোপুরি সংরক্ষিত। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، قَالَ: قُلْتُ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ.

"হজরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—জুমার দিনে আমার ওপর অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ করবে। কেননা তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়, ফেরেশতাগণ তা পৌঁছে দেন। যে ব্যক্তিই আমার ওপর দরুদ পাঠ করে তা থেকে সে বিরত না হওয়া পর্যন্ত তা আমার নিকট পৌঁছতে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম আপনার মৃত্যুর পরেও? নবিজি ﷺ বললেন হ্যাঁ! আমার মৃত্যুর পরেও। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জমিনের ওপর নবিদের দেহকে ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন। নবিজি ﷺ জীবিত এবং তাঁকে রিজিক দেওয়া হয়।"[১৬৫]

---

[১৬৪]. সুরা মায়িদা, ৫: ৭৭

[১৬৫]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৬৩৭, হাদিসটি সহিহ।

এই হাদিস থেকে তিনটি বিষয় জানা গেল। এক হলো নবিদের দেহ মাটি খায় না। দ্বিতীয়ত হলো নবিগণ কবরে জীবিত এবং তাদেরকে রিজিক দেওয়া হয়। তৃতীয়ত হলো নবিজি ﷺ-এর নিকট দরুদ ও সালাম পেশ করা হয়।

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ، قَالَ: يَقُولُونَ: بَلِيتَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.

"হজরত আউস ইবনে আউস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—তোমাদের সর্বোত্তম দিন হলো জুমার দিন। সুতরাং এই দিন তোমরা আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ করবে। কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পেশ করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের দরুদ আপনার নিকট কীভাবে পেশ করা হবে অথচ আপনি তো মাটির সঙ্গে মিশে যাবেন? বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনি তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। নবিজি ﷺ বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নবিদের দেহকে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।"[১৬৬]

এই হাদিস থেকে দুটি বিষয় জানা গেল। এক হলো নবিজি ﷺ-এর নিকট দরুদ ও সালাম পেশ করা হয়। দ্বিতীয়ত হলো নবিদের দেহকে জমিনের ওপর হারাম করে দিয়েছেন।

অন্য এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا اَبْلَغْتُهُ.

---

[১৬৬]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ১৫৩১; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১০৮৫। বর্তমানে কিছু মুহাক্কিক মুহাদ্দিস হাদিসটির সনদকে যইফ বললেও ইমাম হাকেম, যাহাবি, নববি, ইবনু হাজার আসকালানি, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনু কাসির, ইবনু আবদিল হাদি, শুয়াইব আরনাউত্ব, ড. মুসতফা আযমি, শাওকানি-সহ বহু মুহাদ্দিস (রহিমাহুমুল্লাহ) একে সহিহ বলেছেন। এবং ইবনুল কাইয়্যিমের ওপর যেসব আপত্তি তোলা হয়েছে তার জবাবও দিয়েছেন।

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, যে আমার কবরের নিকট এসে দরুদ পাঠ করে, আমি নিজ কানে তা শুনতে পাই। আর যে দূর থেকে আমার ওপর দরুদ পাঠ করে, উক্ত দরুদ আমার নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়।"[১৬৭]

আরেক হাদিসে এসেছে—

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَيَاتِيْ خَيْرٌ لَّكُمْ تُحَدِّثُوْنَ وَ نُحَدِّثُ لَكُمْ؛ وَوَفَاتِيْ خَيْرٌ لَّكُمْ تَعْرُضُ عَلَى أَعْمَالِكُمْ فَمَا رَأَيْتَ خَيْرًا حَمِدْتُ اللهَ وَمَا رَأَيْتُ شَرًّا اِسْتَغْفَرْتُ اللهَ لَكُمْ.

"নবিজি ﷺ ইরশাদ ইরশাদ করেন, আমার জীবন তোমাদের জন্য উত্তম। তোমরা আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছ এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। আমার মৃত্যুও তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা তোমাদের আমল আমার নিকট পেশ করা হবে। যখন আমি তাতে কোনো ভালো কাজ দেখব, তখন আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করব। আর যখন তাতে কোনো মন্দ কাজ দৃষ্টিগোচর হবে, তখন তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ইস্তিগফার করব।"[১৬৮]

এই হাদিস থেকে বুঝা গেল, নবিজি ﷺ কবরে জীবিত এবং তাঁর নিকট উম্মতের আমল পেশ করা হয়। এটাও জানা গেল যে, নবিজি ﷺ হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা নয়। আর না হয় আমল পেশ করার প্রয়োজন হতো না।

আরেক হাদিসে এসেছে—

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ.

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলার একদল ফেরেশতা জমিনে ঘুরাফেরা করে। তারা আমার উম্মতের দরুদ ও সালাম আমার নিকট পৌঁছে দেয়।"[১৬৯]

---

[১৬৭]. *বায়হাকি ফি শুআবুল ঈমান*, ২১৮ পৃষ্ঠা, হাদিস নং ১৫৮৩। সনদ হাসান।

[১৬৮]. *মুসনাদুল বায়যার*, ৫/৩০৮। হাদিসটি কয়েকটি সনদ ও মতনে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইরাকি-সহ কতিপয় মুহাদ্দিস এর সনদকে হাসান বলেছেন।

[১৬৯]. *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ১২৮৩। ইমাম হাকেম, যাহাবি, ইবনুল কাইয়্যিম এবং শুয়াইব আরনাউত্ব রহ.-এর সনদকে সহিহ বলেছেন।

আরেকটি হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—কেউ আমার ওপর সালাম পেশ করলে আল্লাহ তাআলা আমার রুহ ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দিই।"[১৭০]

এই হাদিস থেকে জানা গেল, সালামের জবাব দেওয়ার জন্য নবিজি ﷺ-কে জীবিত করা হয়।

অন্য আরেকটি হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: أَتَيْتُ، وَفِي رِوَايَةِ هَدَّابٍ: مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ.

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—মিরাজের রাতে আমি মরুভূমির লাল রেখার নিকট হজরত মুসা আ.-এর কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, তিনি তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে সালাত পড়ছেন।"[১৭১]

এই হাদিসের বর্ণনা মতে হজরত মুসা আ. তাঁর কবরে সালাত পড়ছেন। যার অর্থ হলো, তিনি নিজের কবরে জীবিত।[১৭২]

---

[১৭০]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২০৪১। এর সনদ হাসান ও গ্রহণযোগ্য। ইমাম নববি ও সাখাবি রহ. এই হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন।

[১৭১]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৩৭৫

[১৭২]. নবি ﷺ-সহ অন্যান্য নবিরা তাদের কবরে জীবিত হওয়ার বিষয়ে অনেক সুস্পষ্ট হাদিস রয়েছে। হাদিস বিশারদদের দাবি অনুযায়ী এ বিষয়ক হাদিস 'মুতাওয়াতির'-এর পর্যায়ভুক্ত। আল্লামা সুয়ুতি রহ. বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সা. ও সমস্ত নবিগণ কবরে জীবিত হওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত। ... এ বিষয়ক হাদিস মুতাওয়াতির পর্যায়ের।" [ইম্বাউল আযকিয়া বিহায়াতিল আম্বিয়, আল-হাবি, পৃ. ৫৫৪; মিরকাতুছ ছাউদ-লিস সুয়ুতি; নাজমুল-মুতানাসির ফিল আহাদিসিল মুতাওয়াতির, মুহাম্মদ ইবনে জাফর আল-কাত্তানি, হাদিস ১১৫; সুবুলুল হুদা ওয়ার- রাশাদ, ১১/৩৫৫]

এ বিষয়ে সবচেয়ে স্পষ্ট হাদিসটি হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

اَلْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ.

'নবিগণ কবরে জীবিত, নামায আদায় করেন'। [*মুসনাদে আবু ইয়ালা*, ৩৪২৫; *হায়াতুল আম্বিয়া লিল বাইহাকি*, ১-৪; *মুসনাদুল বাজ্জার*, হাদিস নং ৬৮৮৮; *সহিহ কুনুযুস সুন্নাতির নববিয়্যাহ*, হাদিস নং ২২] এই হাদিসটিকে ইমাম বাইহাকি, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি, হাফেজ ইবনুল মুলাক্কিন, হাফেজ নুরুদ্দীন হাইসামি, জালালুদ্দীন সুয়ুতি, মুনাবি, শাওকানি এবং শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি (রহিমাহুমুল্লাহ)-সহ অন্যরা সহিহ বলেছেন। [*হায়াতুল আম্বিয়া*, পৃ. ৫; *ফাতহুল বারি*, ৬/৬০৫; *আল-বাদরুল মুনির*, ৫/২৮৫;

শহিদরা জীবিত, নবিদের মর্যাদা শহিদদের চেয়েও উর্ধ্বে, সুতরাং তারাও জীবিত

পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/২১১, হাদিস নং ১৩৮১২; ইম্বাউল আযকিয়া বিহায়াতিল আম্বিয়া, আল-হাবি, পৃ. ৫৫৫; ফায়জুল কাদির, হাদিস নং ৩০৮৯; তুহফাতুয যাকিরিন, পৃ. ২৮; *নাইলুল আওতার*, ৩/২৪৭; *সিলসিলাতুস সহিহা*, হাদিস নং ৬২১; *সহিহুল জামিইস সাগির*, হাদিস নং ২৭৯০; *আহকামুল জানাইয*, পৃ. ২৭২; আত-*তাওয়াসসুল*, হাদিস নং ৫৯]

উল্লেখ্য যে, এ হাদিসকে কোনো মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। হাদিসটির একজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে ইমাম যাহাবি রহ.-এর যে বক্তব্য রয়েছে তার ভিত্তি ছিল ভুল ধারণার ওপর। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. 'লিসানুল মিযান' গ্রন্থে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং হাদিসটি সর্বসম্মতিক্রমে সহিহ। এমন হাদিসকে সহিহ বলতে অস্বীকার করা মূর্খতা ও হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকিদা হলো, মৃত্যুর পর সকল নবিদের কবরে পুনরায় বিশেষ জীবন দান করা হয়েছে। ইমাম বাইহাকি রহ. তার 'আল ইতিকাদ' গ্রন্থে বলেন,

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء.

"সকল নবির রুহ কবজ করার পর তা আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই তারা শহিদদের ন্যায় তাদের রবের কাছে জীবিত"। [*আল ইতিকাদ*, পৃ. ৪১৫ (দারুল ফযিলাহ, রিয়াদ); *আত-তালখিছুল হাবির*, ২/২৫৪; *আল বাদরুল মুনির*, ৫/২৯২]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন,

وقد تمسك به من أنكر الحياة في القبر، وأجيب عن أهل السنة المثبتين لذلك بأن المراد نفي الموت اللازم من الذي أثبته عمر بقوله: "وليبعثه الله في الدنيا ليقطع أيدي القائلين بموته "وليس فيه تعرض لما يقع في البرزخ، وأحسن من هذا الجواب أن يقال :إن حياته صلى الله عليه وسلم في القبر لا يعقبها موت بل يستمر حيا، والأنبياء أحياء في قبورهم، ولعل هذا هو الحكمة في تعريف الموتتين حيث قال: لا يذيقك الله الموتتين أي المعروفتين المشهورتين الواقعتين لكل أحد غير الأنبياء. (فتح الباري، باب لو كنت متخذا خليلا لتخذت أبا بكر خليلا)

"যারা নবি সা.-এর কবরে জীবিত থাকাকে অস্বীকার করে তারা হজরত আবু বকর রা.-এর এ বক্তব্য দিয়ে দলিল পেশ করতে চায়—'আল্লাহ আপনাকে দুইবার মৃত্যু দেবেন না'। আর আহলুস সুন্নাহ—যারা নবির কবরে জীবিত থাকায় বিশ্বাস রাখেন, এদের পক্ষ থেকে এর জবাব দেওয়া হয়েছে যে, হজরত আবু বকর রা.-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল উমর রাদি-এর ভুল ধারণার খণ্ডন করা। উমর রা. বলেছিলেন, 'আল্লাহ তাআলা নবিজিকে আবার দুনিয়াতে জীবিত করবেন'। এ কথার মধ্যে বারযাখে কী হবে এ বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। অবশ্য হজরত আবু বকর রা-এর এ কথার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো, কবরে নবিজি ﷺ যে জীবন পেয়েছেন তারপর আর কোনো মৃত্যু আসবে না। বরং তিনি বরাবরই কবরে জীবিত থাকবেন, আর নবিগণ কবরে জীবিত।" [*ফাতহুল বারি*, আবু বকরের ফযিলত অধ্যায়, ৭/৩৩]

হাফেজ সাখাবি রহ. বলেন, হায়াতুল আম্বিয়া বিষয়ের ওপর পুরো উম্মতের ইজমা রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার মাক্কি আল-হাইতামি রহ.ও তাই বলেছেন। [*আল-কাওলুল বাদি*, পৃ. ৩৪৯; *আল-ফাতাওয়াল কুবরা লিল হাইতামি*, ২/১৩৫]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك .فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتخاذ قبورهم مساجد، مع أنهم مدفونون فيها، وهم أحياء في قبورهم، ويستحب إتيان قبورهم للسلام عليهم.

"এ ধরনের হাদিসের সুস্পষ্ট উক্তি দ্বারা নবিদের কবরকে মসজিদ বানানো হারাম সাব্যস্ত হয়। তবে এ কথা সত্য যে, তারা তাতে সমাহিত আছেন এবং তারা তাদের কবরে জীবিত। তাদের কবরে সালাম দেওয়ার জন্য উপস্থিত হওয়া মুস্তাহাব।" [*মাজমুউল ফাতাওয়া*, ২৭/৫০২]

"যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পারো না।"[১৭৩]

এই আয়াত থেকে জানা গেল, শহিদরা জীবিত কিন্তু তাদের জীবন কেমন, তোমরা তা অনুভব করতে পারবে না। যা থেকে বুঝা গেল যে, এটা হায়াতে বরযখি তথা কবরের জীবন। আমাদের যেহেতু কবরের জীবন সম্পর্কে তেমন উপলব্ধি নেই, তাই আমাদের এ সম্পর্কে খুব বেশি গবেষণার পেছনে পড়ার প্রয়োজন নেই।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

"আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না; বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত। তাদেরকে রিজিক দেওয়া হয়। আল্লাহ তাদেরকে যে অনুগ্রহ করেছেন, তাতে তারা খুশি। আর তারা উৎফুল্ল হয়, পরবর্তীদের থেকে যারা এখনো তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি তাদের বিষয়ে। এজন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভে খুশি হয়। আর নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।"[১৭৪]

এই আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী শহিদরা জীবিত এবং তাদেরকে রিজিক দেওয়া হয়। তাহলে নবিগণ তো আরও আগেই কবরে জীবিত এবং রিজিকপ্রাপ্ত হবেন।

হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ.

---

১৭৩. সুরা বাকারা, ২:১৫৪

১৭৪. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৬৯-১৭১

"হজরত মাসরুক রাহি বলেন, আমি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে নিম্নের এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

"আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না; বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত। তাদেরকে রিজিক দেওয়া হয়।"[১৭৫]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, আমি এই আয়াতটি সম্পর্কে নবিজি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। নবিজি ﷺ তখন ইরশাদ করেন, শহিদদের রুহ সবুজ পাখির মধ্যে ঝাড়বাতির ভেতরে রয়েছে। যা আরশের সঙ্গে ঝুলে আছে। তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ায়। তারপর আবার এ সকল ঝাড়বাতির মধ্যে ফিরে আসে।"[১৭৬]

চার বস্তুর হিসেবে নবিজি ﷺ দুনিয়াতে জীবিত

নবিজি ﷺ-এর বাহ্যিকভাবে মৃত্যু হয়েছে। তবে কবরের জীবনে তিনি জীবিত। যেখানে নবিজি ﷺ-কে রিজিক প্রদান করা হয়। তবে চারটি বস্তুর হিসেবে নবিজি ﷺ দুনিয়াতে জীবিত গণ্য করা হয়। যথা :

ক. নবিজি ﷺ-এর সম্মানিতা স্ত্রীদের বিবাহ হবে না। কেননা, নবিজি ﷺ-এর এখনো জীবিত।

খ. তাঁর উত্তরাধিকার বণ্টন হবে না।

গ. মাটি তাঁর শরীরকে খাবে না।

ঘ. নবিজি ﷺ-এর জীবন এতটা শক্তিশালী যে, তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবি আসবে না। তিনি খাতামুন নাবিয়্যিন তথা সর্বশেষ নবি।

সাধারণ মানুষও কবরে জীবিত

সাধারণ মানুষও কবরে জীবিত। আর এই জীবন হলো হায়াতে বরযখি তথা কবরের জীবন। তাতে তাদের আজাব এবং সাওয়াবও হয়ে থাকে। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে আর নবি ও শহিদদের মধ্যে পার্থক্য হলো, সাধারণ লোকদের শরীর মাটি খেয়ে ফেলে। তাদের দেহ পচে-গলে যায়। আর নবি

---

[১৭৫]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৬৯

[১৭৬]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৮৮৭

ও শহিদদের দেহ ওইভাবেই জমিনে অবশিষ্ট থাকে যেমনটি দাফনের সময় ছিল। তাদেরকে খাদ্য-পানি দেওয়া হয় এবং তাদের এই জীবন দুনিয়ার জীবন থেকে অনেক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু যেহেতু কুরআনুল কারিমে এই জীবন সম্পর্কে—﴿وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾ "কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না।"[১৭৭] বলা হয়েছে, এজন্য এ সম্পর্কে বেশি তর্ক-বিতর্ক করা উচিত নয়। ব্যস! কুরআন-হাদিসে যতটুকু আছে, ততটুকুর মধ্যেই ক্ষান্ত থাকা চাই। সাধারণ মানুষও যে কবরে জীবিত, এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ , قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا.

"হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সূর্য ডুবে যাওয়ার পর নবিজি ﷺ বের হলেন। তখন নবিজি ﷺ একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন, ইহুদিদের কবরে আজাব হচ্ছে।"[১৭৮]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—ইহুদিদের কবরে আজাব হচ্ছে। যার দ্বারা বুঝা গেল, এটা হায়াতে বরযখি তথা কবরের জীবন।

অপর এক হাদিসে এসেছে—

حَدَّثَتْنِي ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

"খালিদ ইবনে সাইদ ইবনে আসের কন্যা উম্মে খালিদ থেকে বর্ণিত, তিনি নবিজি ﷺ-কে কবরের আজাব থেকে আশ্রয় চাইতে শুনেছেন।"[১৭৯]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি ﷺ কবরের আজাব থেকে আশ্রয় চাইতেন। যার দ্বারা বুঝা গেল, এটা হায়াতে বরযখি তথা কবরের জীবন।

কবরে রুহ এবং দেহ উভয়েরই আজাব কিংবা সাওয়াব হয়ে থাকে

হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ... قَالَ فَتُعَادُ رُوْحِهِ فِيْ جَسَدِهِ؛ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ

---

[১৭৭]. সুরা বাকারা, ২: ১৫৪

[১৭৮]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১৩৭৫

[১৭৯]. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৩৭৬

اللهُ... تُعَادُ رُوحُهُ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي.

"হজরত বারা ইবনে আজেব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে আনসার গোত্রের এক ব্যক্তির জানাজায় শরিক হওয়ার জন্য রওনা হয়ে কবরের নিকট গেলাম... নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, মৃতব্যক্তির শরীরে রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসে। এসে উভয় ফেরেশতা মৃতব্যক্তিকে বসায়। বসিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার রব কে? সে তখন বলে, আমার রব আল্লাহ...

মৃতব্যক্তির শরীরে রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসে। এসে উভয় ফেরেশতা মৃতব্যক্তিকে বসায়। বসিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার রব কে? সে তখন বলে, হায়! আমার তো জানা নেই।"[১৮০]

এই হাদিস থেকে জানা গেল, কবরে প্রত্যেক ব্যক্তির রুহ তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং ফেরেশতারা তাকে প্রশ্ন করে। এই হাদিস থেকে এটাও জানা গেল, দেহ এবং রুহ উভয়টিরই আজাব কিংবা সাওয়াব হয়ে থাকে। শুধু রুহ কিংবা শুধু দেহের নয়।

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ. وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ মারা গেলে অবশ্যই তার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তার অবস্থান স্থল উপস্থাপন করা হয়। যদি সে জান্নাতি হয়, তাহলে (অবস্থান স্থল) জান্নাতিদের মধ্যে দেখানো হয়। আর সে জাহান্নামি হলে, তাকে জাহান্নামিদের (অবস্থান স্থল দেখানো হয়) আর তাকে বলা হয়, এ হচ্ছে তোমার অবস্থান স্থল, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা তোমাকে পুনরুত্থিত করা অবধি।"[১৮১]

---

[১৮০]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৭৫৩; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৮০৬৩। হাদিসটি সহিহ।
[১৮১]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১৩৭৯

এই হাদিস থেকেও জানা গেল, সে কবরে জীবিত।

আরেক হাদিসে এসেছে—

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً, قَالَتْ: قَدِّمُونِي، قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ, قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ.

"হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, মৃতব্যক্তিকে খাটিয়ায় রেখে লোকেরা যখন কাঁধে বহন করে নিয়ে যায়, তখন সে নেককার হলে বলতে থাকে, আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলো, আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলো; আর সে নেককার না হলে বলতে থাকে হায় আফসোস! এটাকে নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ? মানুষ ব্যতীত সবকিছুই তার এ আওয়াজ শুনতে পায়। মানুষেরা তা শুনতে পেলে অবশ্যই অজ্ঞান হয়ে পড়ত।"[১৮২]

এই হাদিস থেকেও জানা গেল, সাধারণ মানুষও কবরে জীবিত এবং এটা হায়াতে বরযখি তথা কবরের জীবন। দুনিয়াবি জীবন নয়।

আরেক হাদিসে এসেছে—

سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى أَقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنَ الْأَمْوَاتِ؛ فَأَنْ كَانَ خَيْرًا اسْتَبْشِرُوا بِهِ؛ وَأَنْ كَانَ غَيْرَ ذَالِكَ قَالُوْا: اَللّٰهُمَّ لَا تُمِتْهُمْ حَتّٰى تَهْدِيَهُمْ كَمَا هَدَيْتَنَا.

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের আমল তোমাদের মৃত আত্মীয়স্বজনদের নিকট পেশ করা হয়। আমল যদি ভালো হয়, তাহলে তারা খুশি হয়। আর যদি আমল ভালো না হয়, তাহলে তারা বলে—হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে আমাকে হিদায়াত দিয়েছেন, ঠিক তাকেও সেভাবে হিদায়াত দেওয়ার পূর্বে মৃত্যু দেবেন না।"[১৮৩]

এই হাদিস থেকে জানা গেল, মৃত আত্মীয়স্বজনদের নিকট আমাদের আমল পেশ করা হয়।

---

[১৮২]. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৩৮০

[১৮৩]. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১২৬৮৩। হাদিসটি একাধিক সূত্রে ও মতনে বর্ণিত। তবে উসুলে হাদিসের উসুল বিবেচনায় এর সনদকে হাসান লি-গাইরিহি বলা যায়।

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হলো, নবিজি ﷺ কবরে জীবিত। এটাও জানা গেল যে, তাঁর দেহ মুবারকও সংরক্ষিত। তা মাটি খায়নি এবং খাবেও না।

এটা হায়াতে বরযখি তথা কবরের জীবন কিন্তু দুনিয়া থেকে অনেক উর্ধ্বে

এটা হায়াতে বরযখি তথা কবরের জীবন। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

"যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ।"[১৮৪]

এই আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী মৃত্যু ব্যক্তিরা বরযখে রয়েছে এবং গুনাহগার লোকেরা দুনিয়াতে ফেরত আসার আবেদন করবে। কিন্তু তাদেরকে আর এখানে আসতে দেওয়া হবে না।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

"আর ফিরাউনের অনুসারীদেরকে ঘিরে ফেলল কঠিন আজাব। আগুন, তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় তার সামনে উপস্থিত করা হয়, আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন ঘোষণা করা হবে) ফিরআনের অনুসারীদেরকে কঠোরতম আজাবে প্রবেশ করাও।"[১৮৫]

এই আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী আজাবের ব্যাপারটি আলমে বরযখ তথা কবরজগতে হবে। এজন্য এটা হায়াতে বরযখি তথা কবরের জীবন।

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾

---

১৮৪. সুরা মুমিনুন, ২৩: ১০০

১৮৫. সুরা গাফির, ৪০: ৪৫-৪৬

"আর যদি তুমি দেখতে, যখন জালিমরা মৃত্যু কষ্টে থাকে, এমতাবস্থায় ফেরেশতারা তাদের হাত প্রসারিত করে আছে (তারা বলে) তোমাদের জান বের করো। আজ তোমাদের প্রতিদান দেওয়া হবে লাঞ্ছনার আজাব, কারণ তোমরা আল্লাহর ওপর অসত্য বলতে।"[১৮৬]

আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾

"এবং মদিনাবাসীদের মধ্যেও কিছু লোক অতি মাত্রায় মুনাফিকিতে লিপ্ত আছে। তুমি তাদেরকে জানো না। আমি তাদেরকে জানি। অচিরে আমি তাদেরকে দুবার আজাব দেবো তারপর তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে মহাআযাবের দিকে।"[১৮৭]

আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾

"আল্লাহ অবিচল রাখেন ঈমানদারদেরকে সুদৃঢ় বাণী দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে (কবরে)। আর আল্লাহ জালিমদের পথভ্রষ্ট করেন এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।"[১৮৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾

"নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণরা থাকবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে। আর নিশ্চয় অন্যায়কারীরা থাকবে প্রজ্বলিত আগুনে।"[১৮৯]

উপর্যুক্ত ছয়টি আয়াত ও পূর্বে বর্ণিত হাদিসসমূহ থেকে বুঝা গেল, মানুষ কবরে জীবিত। অতঃপর তাকে শাস্তি দেওয়া হয় কিংবা নিয়ামত দেওয়া হয়।

---

[১৮৬]. সুরা আনআম, ৬: ৯৩
[১৮৭]. সুরা তাওবা, ৯: ১০১
[১৮৮]. সুরা ইবরাহিম, ১৪: ২৭
[১৮৯]. সুরা ইনফিতার, ৮২: ১৩-১৪

দুনিয়ার হিসেবে নবিজির ইন্তেকাল হয়েছে

দুনিয়ার হিসেবে নবিজি ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়েছে। তবে তিনি কবরে স্বশরীরে জীবিত আছেন। যা দুনিয়াবি হায়াত থেকেও উচ্চ পর্যায়ের। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে—

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ... فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ إِلى الشَّاكِرِينَ.

"আম্মাজান হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত আবু বকর রা.বাহির থেকে তাশরিফ আনলেন...

অতঃপর বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইবাদত করো, তোমরা ভালো করে শুনে রাখো যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়ে গেছে। আর যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করো, তারা শুনে রাখো যে, আল্লাহ তাআলা জীবিত। তাঁর কখনো মৃত্যু হবে না। তারপর সুরা আলে ইমরানের ১৪৪ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। যার অর্থ হলো, আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসুল। তার পূর্বে নিশ্চয় অনেক রাসুল বিগত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।"[১৯০]

এই হাদিস এবং আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী নবিজি ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়েছে। হজরত আবু বকর রা.-ও সে অনুযায়ীই লোকদেরকে সম্বোধন করেছেন।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾

"নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।"[১৯১]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবিজি ﷺ-কে বলেন, আপনারও ইন্তেকাল হয়ে যাবে এবং ওই কাফিররাও মরবে।

---

[১৯০]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১২৪১; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৬২৭

[১৯১]. সুরা যুমার, ৩৯: ৩০

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ﴾

"এরপর অবশ্যই তোমরা মরবে।"[১৯২]

হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ.

"হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ-এর ওফাতের পর আবু বকর রা.-এর নিকট (নবিজি ﷺ-এর নিযুক্ত বাহরাইনের গভর্নর) আলা ইবনে হাদরামি রা.-এর পক্ষ হতে মালপত্র এসে পৌছল।"[১৯৩]

অন্য এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي.

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবিজি ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়, তখন তিনি আমার বুক ও থুতনির মাঝে ছিলেন।"[১৯৪]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ থেকে প্রমাণিত হলো, দুনিয়াবি হিসেবে নবিজি ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়েছে। আর বাহ্যিকভাবে যেহেতু ইন্তেকাল হয়ে গেছে, তাই তাকে দাফন করা হয়েছে। তিনি যদি দুনিয়ায় থাকতেন, তাহলে দাফন করা হতো না।

কারও কারও মতে মুমিনের রুহ দুনিয়াতেও ঘুরাফেরা করে

কারও কারও মতে মুমিনের রুহ দুনিয়াতেও ঘুরাফেরা করে। তাদের দলিল হলো, হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ؛ فَإِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يُخَلَّى بِهِ يَسْرَحُ حَيْثُ شَاءَ.

---

১৯২. সুরা মুমিন, ২৩: ১৫

১৯৩. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২৬৮৩

১৯৪. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৪৪৪৬

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বলেন, দুনিয়া হলো মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাত। সুতরাং মুমিন যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন সে স্বাধীন হয় এবং যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়।"[১৯৫]

এটা একজন সাহাবির বাণী— يَسْرحُ حَيْثُ شَاءَ যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াবে। যার দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন যে, সে দুনিয়াতেও এদিক-সেদিক যায়। কিন্তু এই বাণীটিতে তিনটি দুর্বলতা রয়েছে। যথা :

ক. এটা একজন সাহাবির বাণী। এটা কোনো হাদিস নয়। এজন্য এর দ্বারা আকিদা প্রমাণ করা যাবে না।

খ. এই বাণীটিতে الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ তথা "দুনিয়া হলো মুমিনের জন্য জেলখানা" বাক্যটি রয়েছে। সুতরাং দুনিয়া যেহেতু জেলখানা, তাহলে সে এখানে এসে পুনরায় জেলখানায় কেন আসবে? এজন্য حَيْثُ شَاءَ তথা "যেখানে ইচ্ছা" এর অর্থ এই নয় যে, সে দুনিয়াতে ঘুরে বেড়ায়। বরং এর অর্থ হলো সে জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ায়। কেননা, সাহাবির এই বাণীটিতে দুনিয়াতে ঘুরে বেড়ানোর কথা নেই।

গ. অপর একটি হাদিসে হজরত জাফর শহিদ রা.-এর সম্পর্কে এসেছে—সে জান্নাতের যেখানে খুশি সেখানে ঘুরে বেড়ায়। এজন্য সাহাবির এই বাণীর দ্বারা রুহ দুনিয়াতে ঘুরে বেড়ানো প্রমাণিত হয় না।

জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ানোর হাদিসটি হলো—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رَأَيْتُ جَعْفَرًا يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আমি (স্বপ্নে) জাফরকে (রা.) জান্নাতের মধ্যে ফেরেশতাদের সঙ্গে উড়ে বেড়াতে দেখেছি।"[১৯৬]

এই হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী হজরত জাফর রা. জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ান। এজন্য হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.-এর বাণীর অর্থও এটাই হবে—মুমিন মৃত্যুর পরে জান্নাতে ঘুরে বেড়ায়। দুনিয়াতে ঘুরে বেড়ানো প্রমাণিত হয় না।

---

১৯৫. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা*, ৭/৫৭ হাদিস নং ২৬৫৭। সনদ সহিহ।

১৯৬. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৭৬৩। সনদ সহিহ

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ.

"হজরত মাসরুক রাহি বলেন, আমি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে নিম্নের এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

"আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না; বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত। তাদেরকে রিজিক দেওয়া হয়।"[১৯৭]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, আমি এই আয়াতটি সম্পর্কে নবিজি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। নবিজি ﷺ তখন ইরশাদ করেন, শহিদদের রুহ সবুজ পাখির মধ্যে ঝাড়বাতির ভেতরে রয়েছে। যা আরশের সঙ্গে ঝুলে আছে। তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ায়। তারপর আবার এ সকল ঝাড়বাতির মধ্যে ফিরে আসে।"[১৯৮]

এই হাদিসের দ্বারাও জান্নাতে ঘুরে বেড়ানোর বিষয়টি প্রমাণিত হয়। দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ানোর বিষয়টি প্রমাণিত হয় না।

জাহান্নামিরা দুনিয়াতে আসার আবেদন করবে, তবে তাদেরকে দুনিয়াতে আসতে দেওয়া হবে না

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

"অবশেষে যখন তাদের কারও মৃত্যু আসে, সে বলে, হে আমার রব, আমাকে ফেরত পাঠান, যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে

১৯৭. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৬৯
১৯৮. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৮৮৭

দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ।"[১৯৯]

এই আয়াত থেকে জানা গেল, জাহান্নামিরা দুনিয়াতে আসার আবেদন করবে, তবে তাদেরকে দুনিয়াতে আসার অনুমতি দেওয়া হবে না। তাহলে মৃতব্যক্তির রুহ কীভাবে দুনিয়াতে এসে ঘুরাফেরা করবে?

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে বুঝা গেল, মৃতব্যক্তির রুহ জান্নাতে ঘুরাফেরা করে। দুনিয়াতে নয়।

হিন্দুদের বিশ্বাস হলো, তাদের দেব-দেবতা দুনিয়াতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ায়

হিন্দুদের বিশ্বাস হলো, তাদের দেব-দেবতার রুহ বা আত্মা দুনিয়াতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘরে বেড়ায়। সে মূর্তির ভেতরে আসে এবং পূজা অর্চনাকারীদের প্রয়োজনসমূহ শুনে এবং তাদেরকে সাহায্য করে। তাদের বিভিন্ন রকম মূর্তি রয়েছে এবং সেগুলো বিভিন্ন মন্দিরে এবং পাহাড়ে বসবাস করে। এজন্য তাদের পূজারিদেরকে ওই পাহাড়ের যাত্রা এবং তা দর্শন ও সাক্ষাৎ করার উপদেশ দেওয়া হয় যে। লোকেরা খুব ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে উক্ত দেব-দেবতার মহব্বতে সেখানে ভ্রমণে যায় এবং সেখানে সিজদা করে। পূজা অর্চনা করে এবং তাদের নিকট নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করে।

[১৯৯]. সুরা মুমিনুন, ২৩: ৯৯-১০০
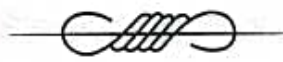
হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা

নবিজি সর্বত্র হাজির তথা উপস্থিত নয়!

এ আকিদা সম্পর্কে ৩৪টি আয়াত এবং ১৩টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

হাজির বা উপস্থিতি তিন প্রকার। যথা :

ক. জীবিত অবস্থায় নবিজি ﷺ অনেক জায়গাই হাজির ছিলেন।

খ. আখিরাতে অনেক জায়গায় হাজির থাকবেন।

গ. নবিজি ﷺ সর্বত্র হাজির এবং সর্বদ্রষ্টা তথা সবকিছু দেখছেন। যেমন, আজকে যায়েদ উপস্থিত। তার সকল অবস্থা নবিজি ﷺ দেখছেন এবং যায়েদের নিকট উপস্থিতও আছেন। এই গুণটি একমাত্র আল্লাহ তাআলার। নবিজি ﷺ-এর মধ্যে এই গুণ নেই।

সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তাআলার গুণ

আল্লাহ তাআলা তাঁর ইলম জ্ঞানগতভাবে সর্বত্র হাজির তথা বিরাজমান। যেমন, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

"আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।"[২০০]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾

"এর চেয়ে কম কিংবা বেশি হোক, তিনি (আল্লাহ) তো তাদের সঙ্গেই আছেন।"[২০১]

[২০০]. সুরা হাদিদ, ৫৭: ৪

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

"সে (নবিজি ﷺ) সঙ্গিকে (হজরত আবু বকর রা.-কে) বলল, তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।"[২০২]

আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾

"অতএব তোমরা হীনবল হয়ো না ও সন্ধির আহ্বান জানিও না এবং তোমরাই প্রবল। আর আল্লাহ তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন।"[২০৩]

আরেক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾

"আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী।"[২০৪]

আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

"এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আর আমি তার গলার ধমনী হতেও অধিক কাছে।"[২০৫]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের বর্ণনা মতে আল্লাহ তাআলা সর্বত্র আমাদের সঙ্গেই আছেন। সুতরাং হাজির-নাজির গুণটি একমাত্র আল্লাহ তাআলার।

আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বস্তুকে এবং প্রত্যেক বান্দার অবস্থার দ্রষ্টা

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾

"আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।"[২০৬]

---

২০১. সুরা মুজাদালাহ, ৫৮: ৭
২০২. সুরা তাওবা, ৯: ৪০
২০৩. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ৩৫
২০৪. সুরা বাকারা, ২: ১৮৬
২০৫. সুরা ক্বা-ফ, ৫০: ১৬

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾

"আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।"[২০৭]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।"[২০৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।"[২০৯]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।"[২১০]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।"[২১১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾

"আর তারা যা করে, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।"[২১২]

---

[২০৬]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৫
[২০৭]. প্রাগুক্ত, ৩: ২০
[২০৮]. সুরা বাকারা, ২: ১১০
[২০৯]. প্রাগুক্ত, ২: ২৩৩
[২১০]. প্রাগুক্ত, ২: ২৩৭
[২১১]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৫৬
[২১২]. প্রাগুক্ত, ৩: ১৬৩

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

"তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে সে বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।"[২১৩]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বস্তুর দ্রষ্টা। অর্থাৎ তিনি নাজির। সুতরাং হাজির-নাজিরের গুণ একমাত্র আল্লাহ তাআলার।

নোটঃ এই দেখার ধরন এবং হাজির তথা উপস্থিতির ধরন কী? এটাও একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। এটা তাঁর শান ও মর্যাদা অনুযায়ী।

কুরআনে বর্ণিত যে-সকল স্থানে নবিজি হাজির বা উপস্থিত ছিলেন না

কুরআনুল কারিমের নিম্নের আয়াতসমূহে রয়েছে যে, দুনিয়ার অমুক অমুক স্থানে নবিজি ﷺ হাজির বা উপস্থিত ছিলেন না। তবুও কীভাবে বলা যায় যে, নবিজি ﷺ হাজির-নাজির?

যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾

"আর (হে নবি) আমি যখন মুসাকে বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি (তুর পাহাড়ের) পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। আর তুমি প্রত্যক্ষদর্শীদের অন্তর্ভুক্তও ছিলে না।"[২১৪]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾

"আর যখন আমি (মুসাকে) ডেকেছিলাম তুখন তুমি তুর পর্বতের পাশে উপস্থিত ছিলে না।"[২১৫]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾

---

[২১৩]. সুরা আনফাল, ৮: ৩৯
[২১৪]. সুরা কাসাস, ২৮: ৪৪
[২১৫]. প্রাগুক্ত, ২৮: ৪৬

"আর তুমি তাদের নিকট ছিলে না, যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল, তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের দায়িত্ব নেবে? আর তুমি তাদের নিকট ছিলে না, যখন তারা বিতর্ক করছিল।"[২১৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾

"তুমি তো তাদের নিকট ছিলে না যখন তারা তাদের সিদ্ধান্তে একমত হয়েছিল অথচ তারা ষড়যন্ত্র করছিল।"[২১৭]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

"আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন তখন আপনি ছিলেন তাদের পর্যবেক্ষণকারী। আর আপনি সবকিছুর ওপর সাক্ষী।"[২১৮]

নোট: এই আয়াতটি যদিও হজরত ঈসা আ.-এর ব্যাপারে কিন্তু এক হাদিসে নবিজি ﷺ-ও অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন। এজন্য এই আয়াতটি নবিজি ﷺ-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর উক্ত হাদিসটি ইলমে গায়েবের আলোচনায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা গেল, নবিজি ﷺ উক্ত স্থানসমূহে উপস্থিত ছিলেন না। বরং নবিজি ﷺ আখিরাতেও স্বীকার করবেন যে, আমি মৃত্যুর পরে উক্ত উম্মতদের নিকট হাজির ছিলাম না। তাহলে তিনি সর্বত্র হাজির-নাজির কীভাবে হলেন?

নোট: এটা যেহেতু আকিদার মাসআলা। তাই নবিজি ﷺ-কে হাজির-নাজির প্রমাণ করার জন্য সুস্পষ্ট কোনো আয়াত কিংবা বিশুদ্ধ হাদিস আনতে হবে। যার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এটা প্রমাণ হয় যে, নবিজি ﷺ সর্বত্র হাজির-নাজির। অথবা কবরে থেকেও হাজির-নাজির। শুধু স্বপ্নের কথা কিংবা শাব্দিক বিতর্ক অথবা বুজুর্গদের বাণী দিয়ে আকিদা প্রমাণিত হয় না। এটাই সর্বসম্মত নিয়ম।

---

[২১৬]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ৪৪
[২১৭]. সুরা ইউসুফ, ১২: ১০২
[২১৮]. সুরা মায়িদা, ৫: ১১৭

হাদিসে বর্ণিত যে-সকল স্থানে নবিজি হাজির বা উপস্থিত ছিলেন না

নিম্নের হাদিসসমূহ দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, নবিজি ﷺ জীবদ্দশায় অনেক স্থানে উপস্থিত ছিলেন না এবং কিয়ামতের দিনও তা স্বীকার করবেন—আমি ইন্তেকালের পরে আমার উম্মতের মাঝে উপস্থিত ছিলাম না এবং তাদের অবস্থাও আমার জানা নেই। যার দ্বারা বুঝা যায় যে, নবিজি ﷺ হাজির-নাজির নয়। তবে হ্যাঁ! যে বিষয়ে তাঁকে অবগত করা হয়েছে, তা তিনি জানতেন। আর যে বিষয়সমূহ তাঁকে অবগত করা হয়েছে, তা পূর্বের ও পরের থেকে অধিক।

মিরাজের হাদিসেও রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে নবিজি ﷺ-এর সম্মুখে এনে দিয়েছেন। যার ফলে তা দেখে দেখে কুরাইশদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। যা থেকে জানা গেল, নবিজি ﷺ হাজির-নাজির নন। যদি নবিজি ﷺ হাজির-নাজির হতেন, তাহলে বাইতুল মুকাদ্দাসকে নবিজি ﷺ-এর সম্মুখে উপস্থিত করার প্রয়োজন হতো না। তিনি তো বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকট হাজির তথা উপস্থিতই আছেন এবং তিনি তা দেখছেন। হাদিস শরিফে এসেছে—

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَا اللهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ.

“হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন কুরাইশরা আমাকে আমাকে অস্বীকার করল, তখন আমি কাবার হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আল্লাহ তাআলা তখন আমার সামনে বাইতুল মুকাদ্দাসকে তুলে ধরলেন, যার কারণে আমি দেখে দেখে বাইতুল মুকাদ্দাসের নিদর্শনগুলো তাদের কাছে ব্যক্ত করছিলাম।”[২১৯]

নবিজি ﷺ-এর সম্মানিতা স্ত্রী আম্মাজান হজরত আয়েশা রা.-এর ওপর যখন মুনাফিকরা অপবাদ আরোপ করেছিল, যার ফলে প্রায় এক মাস পর্যন্ত নবিজি ﷺ পেরেশান ছিলেন। অতঃপর হজরত আয়েশা রা.-এর পবিত্রতা বর্ণনা করে আয়াত নাজিল হয়েছে। তারপর নবিজি ﷺ নিশ্চিন্ত হয়েছেন। নবিজি ﷺ যদি হাজির-নাজির হতেন, তাহলে এক মাস পর্যন্ত পেরেশান হওয়ার কি

[২১৯]. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩৮৮৬

প্রয়োজন ছিল? তাঁর তো জানার কথা যে, হজরত আয়েশা রা. পবিত্র। এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ قَالَ لَهَا: أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا... وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ، قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ: فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ،...فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ.

"আম্মাজান হজরত আয়েশা রা. থেকে একটি দীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—অপবাদ আরোপকারীরা যা-কিছু তাঁর নিকট বলেছে... নবিজি ﷺ এক মাস অপেক্ষা করার পরও আমার ব্যাপারে তাঁর নিকট কোনো ওহি আসেনি। আয়েশা রা. বলেন, বসার পর নবিজি ﷺ কালিমা শাহাদাত পড়লেন, এরপর বললেন, আয়েশা তোমার ব্যাপারে আমার নিকট অনেক কথাই পৌঁছেছে, তুমি যদি এর থেকে পবিত্র হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করবেন। আর যদি তুমি কোনো গুনাহ করে থাকো তাহলে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং তাওবা করো... অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমার পবিত্রতা বর্ণনা করে সুরা নুরের ১১ নং আয়াত থেকে পরবর্তী ১০টি আয়াত নাজিল করেন।"[২২০]

নবিজি ﷺ যদি হাজির-নাজির হতেন, তাহলে নিজের প্রিয় স্ত্রীর পবিত্রতার ব্যাপারে কেন জানতে পারলেন না?

অপর এক হাদিসে এসেছে—

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَيَاتِيْ خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدِّثُوْنَ وَ نُحَدِّثُ لَكُمْ؛ وَوَفَاتِيْ خَيْرٌ لَكُمْ تَعْرُضُ عَلَى أَعْمَالِكُمْ فَمَا رَأَيْتَ خَيْرًا حَمِدْتُ اللهَ وَمَا رَأَيْتُ شَرًّ اِسْتَغْفَرْتُ اللهَ لَكُمْ.

"নবিজি ﷺ ইরশাদ ইরশাদ করেন, আমার জীবন তোমাদের জন্য উত্তম। তোমরা আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছ এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। আমার মৃত্যুও তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা তোমাদের আমল আমার নিকট পেশ করা হবে। যখন আমি তাতে কোনো ভালো কাজ দেখব, তখন আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করব। আর যখন তাতে কোনো মন্দ

[২২০]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪১৪১; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৭৭০

কাজ দৃষ্টিগোচর হবে, তখন তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ইস্তিগফার করব।"[২২১]

এই হাদিস থেকে বুঝা গেল, নবিজি ﷺ কবরে জীবিত এবং তাঁর নিকট উম্মতের আমল পেশ করা হয়। এটাও জানা গেল যে, নবিজি ﷺ হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা নয়। আর না হয় আমল পেশ করার প্রয়োজন হতো না।

আরকে হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না (অর্থাৎ তাতে সালাত, তিলাওয়াত ও জিকির-আজকার না করা) এবং আমার কবরকে মেলা তথা উৎসবের স্থানে পরিণত করো না। তোমরা আমার ওপর দরুদ পাঠ করো। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌছানো হবে।"[২২২]

এই হাদিসের বর্ণনা মতে যেখানেই দরুদ পাঠ করা হোক উক্ত দরুদ নবিজি ﷺ-এর নিকট পৌছানো হয়। সুতরাং নবিজি ﷺ হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টাই হতেন, তাহলে ফেরেশতারা দরুদ পৌছানোর কী প্রয়োজন?

অপর এক হাদিসে এসেছে–

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.... أَلَا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُصحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، فَيُقَالُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ.

"হজরত ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন... নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা জেনে রাখো, আমার কিছু উম্মতের কতগুলো লোককে

---

[২২১]. *মুসনাদুল বাযযার*, ৫/৩০৮। এর সনদ হাসান।

[২২২]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২০৪২। হাদিসটি সহিহ।

হাজির করা হবে এবং তাদেরকে বাম দিকে অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে দেওয়া হবে। আমি তখন বলব, হে আমার রব! এরা তো আমার কতক সাহাবি, তখন বলা হবে যে, আপনার পর তারা কী নবোদ্ভাবিত কাজ করেছে তা আপনি জানেন না। এরপর পুণ্যবান বান্দা (হজরত ঈসা আ.) যেমন বলেছিলেন আমি তেমন বলব,

﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

"আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন তখন আপনি ছিলেন তাদের পর্যবেক্ষণকারী। আর আপনি সবকিছুর ওপর সাক্ষী।"

এরপর বলা হবে আপনি তাদেরকে ছেড়ে আসার পর থেকে তারা পেছনে ফিরে গিয়ে ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়ে গিয়েছিল।[২২৩]

নবিজি ﷺ হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টাই হতেন, তাহলে তিনি কেন জানবেন না যে, এরা তাঁর সাহাবি নন?

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ থেকে জানা গেল, নবিজি ﷺ হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা নন এবং গোটা জগৎকে নবিজি ﷺ-এর সামনে উন্মুক্ত করা হয়েছে যে, তিনি সকল বস্তুকে দেখে নেবেন। তবে হ্যাঁ! তিনি তাঁর কবরে স্বশরীরে জীবিত এবং যে-ই তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম পেশ করে, ফেরেশতারা তা তাঁর নিকট পৌঁছে দেন। এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং যেহেতু এটা আকিদার মাসআলা। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো আয়াত কিংবা বিশুদ্ধ কোনো হাদিস দ্বারা নবিজি ﷺ হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা প্রমাণিত না হবে, ততক্ষণ কোনো স্বপ্নের কথা কিংবা কোনো ব্যক্তির কথায় এত বড় বিষয় প্রমাণ করা যাবে না।

কিয়ামতের দিন সাক্ষী দেওয়ার জন্য উম্মতের কিংবা নবিজির সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা হওয়া জরুরি নয়

পূর্বে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসির অনুযায়ী তিনটি আয়াতে شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ হলো, নবিজি ﷺ কিয়ামতের দিন এই সাক্ষী দেবেন যে, আমি আমার উম্মতের নিকট রিসালাত পৌঁছে দিয়েছি এবং অন্যান্য উম্মতের জন্যও সাক্ষী দেবেন যে, তাদের নবিগণ নিজ নিজ

---

২২৩. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪৬২৫; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৫৯৯৬

উম্মতের নিকট রিসালাত পৌঁছে দিয়েছেন। এজন্য شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ হলো, সাক্ষী দেওয়া। হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা নয়। এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সাক্ষী দেওয়ার জন্য তো উম্মতের অবস্থা প্রত্যক্ষ করা জরুরি। উম্মতের অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেই না সাক্ষী দেওয়া সম্ভব। এজন্য নবিজি ﷺ সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এই প্রশ্নটি সঠিক নয়। বরং কুরআনুল কারিম বলেছে যে, সকল নবিগণ নিজ নিজ উম্মতের নিকট রিসালাত পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার এই সংবাদের ওপর ভিত্তি করে নবিজি ﷺ-ও সাক্ষী দেবেন এবং আল্লাহ তাআলার এই সংবাদের ওপর ভিত্তি করেই নবিজি ﷺ তাঁর উম্মতকে বলেছেন, সকল রাসুলগণ নিজ নিজ উম্মতের নিকট রিসালাত পৌঁছে দিয়েছেন। এত না নবিজি ﷺ-এর হাজির হওয়া জরুরি আর না ওই উম্মতের হাজির হওয়া জরুরি। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَجِيءُ النَّبِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ الرجل؛ يَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ؛ وَيَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الثَّلَاثَةُ؛ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُّ؛ فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ فَيُدْعَى قَوْمُهُ؛ فَيُقَالُ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: لَا؛ فَيُقَالُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ؛ فَتُدْعَى أُمَّةُ مُحَمَّدٍ؛ فَيُقَالُ: هَلْ بَلَّغَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ؛ فَيَقُولُ: وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا بِذَلِكَ؛ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوا فَصَدَّقْنَاهُ؛ قَالَ: فَذَلِكُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.

“হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন একজন নবি আসবেন, তাঁর সঙ্গে থাকবে একজন মাত্র অনুসারী। আবার কোনো নবির সঙ্গে থাকবে দুজন অনুসারী। আবার কোনো নবির সঙ্গে থাকবে তিনজন বা তার কম-বেশি অনুসারী। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তুমি কি তোমার জাতির নিকট আল্লাহ তাআলার বাণী পৌঁছিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হ্যাঁ! তখন তাঁর জাতিকে ডাকা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, তিনি কি তোমাদের নিকট আল্লাহ তাআলার বাণী পৌঁছিয়েছিলন? তারা বলবে, না। তাঁকে বলা হবে, তোমার সাক্ষী কারা? তিনি তখন বলবেন, আমার সাক্ষী হলো মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর উম্মত। তখন মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মতকে ডাকা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, নবি

কি (তাঁর উম্মতের নিকট আল্লাহ তাআলার বাণী) পৌছিয়েছিলেন? তারা বলবে, হ্যাঁ। তাদেরকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কীভাবে জানলে? তারা তখন উত্তরে বলবে, আমাদের নবি (ﷺ) আমাদেরকে অবহিত করেছিলেন যে, নিশ্চয় সকল রাসুলগণ আল্লাহ তাআলার বাণী পৌছে দিয়েছেন। আমরা তার কথা সত্য বলে স্বীকার করেছি। তোমাদের জন্য এ কথার প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর বাণী—

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হও এবং রাসুল সাক্ষী হন তোমাদের ওপর।"[২২৪]

এই হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী নবিজি ﷺ যে, উম্মতকে আল্লাহ তাআলার বাণী পৌছে দেওয়ার সংবাদ দিয়েছেন, এর ভিত্তিতেই এই উম্মত সাক্ষী দেবে। এজন্য নবিজি ﷺ হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা হওয়া জরুরি নয়।

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: هَلْ بَلَّغْتَ؟، فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ، فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟، فَيَقُولُونَ: لَا مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ، فَيَقُولُ: لِنُوحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟، فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ ﷺ وَأُمَّتُهُ فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.

"হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন হজরত নুহ আ. এবং তাঁর উম্মত আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজির হবেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি আমার বাণী পৌছিয়েছ? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, হে আমার রব! তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞেস করবেন, নুহ কি তোমাদের নিকট আমার বাণী পৌছিয়েছেন? তারা বলবে, না। আমাদের নিকট কোনো নবিই আসেননি। তখন আল্লাহ তাআলা নুহ আ.-কে বলবেন, তোমার জন্য সাক্ষ্য দেবে কে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মত। (নবিজি ﷺ বললেন)

[২২৪]. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪২৮৪। হাদিসটি সহিহ।

তখন আমরা সাক্ষ্য দেবো। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী পৌছিয়েছেন। আর এটিই আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে উল্লেখ করেছেন—

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হও এবং রাসুল সাক্ষী হন তোমাদের ওপর।"[২২৫]

যদি شَاهِدًا শাহিদ শব্দের দ্বারা নবিজি ﷺ-কে হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এই উম্মতকেও হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা মেনে নিতে হবে। কেননা, আয়াতের মধ্যে এদের সম্পর্কেও বলা হয়েছে— ﴿لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ "যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হও" এবং অন্যান্য উম্মতকেও হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা মেনে নিতে হবে। কেননা, তাদের সম্পর্কেও এসেছে—إِذَا ﴿جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾ তথা যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব।

মূল কথা হলো যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে—আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন যে, পূর্বের নবিগণ নিজ নিজ উম্মতদের নিকট আল্লাহ তাআলার বার্তা পৌছে দিয়েছেন এবং নিজেও সাক্ষী দেবেন যে, সকল নবিগণ আল্লাহ তাআলার বার্তা পৌছে দিয়েছেন। প্রতিটি জাতির নিকটই আল্লাহ তাআলা রাসুল প্রেরণ করেছেন। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

"আর রাসুলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌছে দেওয়া।"[২২৬]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

"আর রাসুলের ওপর দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌছানো।"[২২৭]

---

[২২৫]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৩৩৯

[২২৬]. সুরা নুর, ২৪: ৫৪

[২২৭]. সুরা আনকাবুত, ২৯: ১৮

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾

“বলো, সাক্ষ্য হিসেবে সবচেয়ে বড় বস্তু কী? বলো, আল্লাহ সাক্ষী আমার ও তোমাদের মধ্যে।”[২২৮]

এ সকল সংবাদের ওপর ভিত্তি করেই নবিজি ﷺ এবং তাঁর উম্মত কিয়ামতের দিন সাক্ষী দেবে যে, সকল নবিগণ নিজ নিজ বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। সুতরাং এই উম্মত এবং নবিজি ﷺ হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা নন।

কেউ কেউ নিম্নের আয়াতসমূহ দ্বারা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন

কেউ কেউ নিম্নের তিনটি আয়াত দ্বারা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। আর দলিল দিয়েছেন, অবস্থা দেখেই সাক্ষী দেওয়া হয়। আর নবিজি ﷺ যেহেতু পূর্বের নবিদের জন্য সাক্ষী দেবেন, সুতরাং অবশ্যই নবিজি ﷺ সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা।

কেউ কেউ شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ করেছেন হাজির। উক্ত তিনটি আয়াতের প্রথম আয়াতটি হলো,

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾

“নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ তোমাদের কাছে রাসুল পাঠিয়েছি যেমনইভাবে ফিরাউনের কাছে রাসুল পাঠিয়েছিলাম।”[২২৯]

এখানে شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার সাক্ষী।

ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসিরে شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ করা হয়েছে রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার সাক্ষী। কেননা, ফিরাউনের নিকট যে, হজরত মুসা আ.-কে পাঠিয়েছেন, তাও রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার জন্যই পাঠিয়েছিলেন।

---

[২২৮]. সুরা আনআম, ৬: ১৯
[২২৯]. সুরা মুযযাম্মিল, ৭৩: ১৫

দ্বিতীয় আয়াতটি হলো,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا﴾

"হে নবি, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও আলোকদীপ্ত প্রদীপ হিসেবে।"[২৩০]

এখানেও شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার সাক্ষী।

ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসিরে شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ করা হয়েছে রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার সাক্ষী। ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ﴾ তথা আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী। অংশটি থেকেও রিসালাত পৌঁছে দেওয়াই প্রমাণিত হয়। হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টার অর্থ নয়।

তৃতীয় আয়াতটি হলো,

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾

"নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।"[২৩১]

এখানেও شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার সাক্ষী।

ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসিরে شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ করা হয়েছে রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার সাক্ষী। তাহলে বুঝা গেল, شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার সাক্ষী। হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টার অর্থ নয়।

প্রত্যেক উম্মত থেকেই যেহেতু সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, তাহলে তো গোটা উম্মতকেই হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা মানতে হবে

شَاهِدًا শাহিদ শব্দের দ্বারা যদি নবিজি ﷺ-কে হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা প্রমাণ করা হয়, তাহলে কিয়ামতের দিন তো এই উম্মতও

---

২৩০. সুরা আহযাব, ৩৩: ৪৫-৪৬
২৩১. সুরা ফাতহ, ৪৮: ৮

অন্যান্য উম্মতের ওপর সাক্ষ্য প্রদান করবে। সুতরাং উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা মানতে হবে। কেননা, এই উম্মতও অন্যান্য উম্মতের ওপর সাক্ষী হবে।

এজন্য شَاهِدًا শাহিদ শব্দের দ্বারা যদি নবিজি ﷺ-কে হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা প্রমাণ করা সঠিক নয়। যেমন কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হও এবং রাসুল সাক্ষী হবেন তোমাদের ওপর।"[২৩২]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ﴾

"আর স্মরণ করো, যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে, তাদের থেকেই তাদের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী উত্থিত করব এবং তোমাকে তাদের ওপর সাক্ষীরূপে হাজির করব।"[২৩৩]

অন্য আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾

"অতএব, কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে উপস্থিত করব তাদের ওপর সাক্ষীরূপে।"[২৩৪]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾

"যাতে রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও।"[২৩৫]

---

[২৩২]. সুরা বাকারা, ২: ১৪৩
[২৩৩]. সুরা নাহল, ১৬: ৮৯
[২৩৪]. সুরা নিসা, ৪: ৪১
[২৩৫]. সুরা হজ, ২২: ৭৮

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾

"আর স্বরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে সাক্ষী উত্থিত করব।"[২৩৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾

"আর আমি প্রত্যেক জাতি থেকে একজন সাক্ষী বের করে নেব। অতঃপর আমি বলব, তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো।"[২৩৭]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে বর্ণনা অনুযায়ী প্রত্যেক উম্মত থেকেই সাক্ষ্য নেওয়া হবে। তাহলে উক্ত সকল উম্মতই হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা হয়ে যায়। শুধু রাসুল একা হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা থাকে না।

প্রিয় পাঠক দয়া করে বিষয়টি একটু ভেবে দেখার অনুরোধ রইল।

شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ ৩টি

شَاهِدًا শাহিদ শব্দের ৩টি অর্থ হয়। এজন্য আগে-পরে দেখে আয়াতের অর্থ করতে হবে। যেন অন্যান্য আয়াতের সঙ্গে বৈপরীত্ব সৃষ্টি না হয়। شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ ৩টি হলো :

১. সাক্ষ্য প্রদান করা।

২. উপস্থিত হওয়া এবং দেখা।

৩. সাক্ষীদের পরিশুদ্ধ করা তথা এ কথা বলা—এই সাক্ষীরা সত্য বলেছে।

১. شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ যে সাক্ষী দেওয়া এর প্রমাণ হলো, এই আয়াত—

﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾

"আর মহিলার (জুলাইখার) পরিবার থেকে এক সাক্ষ্যদাতা সাক্ষ্য প্রদান করল।"[২৩৮]

---

[২৩৬]. সুরা নাহল, ১৬: ৮৪

[২৩৭]. সুরা কাসাস, ২৮: ৭৫

এই আয়াতে شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ হলো শুধু সাক্ষ্য প্রদান করা। কেননা শিশুটি হজরত ইউসুফ আ.-কে জুলাইখার কক্ষে দেখেনি। এজন্য এই আয়াতে شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ হলো শুধু সাক্ষ্য প্রদান করা।

২. شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ যে উপস্থিত হওয়া এবং দেখা, এর প্রমাণ হলো, এই আয়াত—

﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾

"আর (হে নবি) আমি যখন মুসাকে বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি (তুর পাহাড়ের) পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। আর তুমি প্রত্যক্ষদর্শীদের অন্তর্ভুক্তও ছিলে না।"[২৩৯]

এই আয়াতে شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ হলো, নবিজি ﷺ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

৩. شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ যে সাক্ষীদের পরিশুদ্ধ করা তথা এ কথা বলা—এই সাক্ষীরা সত্য বলেছে, এর প্রমাণ হলো এই আয়াত—

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾

"অতএব, কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে উপস্থিত করব তাদের ওপর সাক্ষীরূপে।"[২৪০]

ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসিরে شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ করা হয়েছে সাক্ষীদের পরিশুদ্ধ করা তথা এ কথা বলা—এই সাক্ষীরা সত্য বলেছে। অর্থাৎ উম্মত যে সাক্ষ্য দিয়েছে, নবিজি ﷺ তার সত্যায়ন করবেন—আমার উম্মত যে সাক্ষ্য দিয়েছে, তা সত্য এবং সঠিক।

شَاهِدًا শাহিদ শব্দের অর্থ যেহেতু ৩টি। সুতরাং আগে-পরে দেখেই অর্থ করতে হবে। যেন এই অর্থ অন্যান্য আয়াতের সঙ্গে বৈপরীত্ব সৃষ্টি না হয়।

---

[২৩৮]. সুরা ইউসুফ, ১২: ২৬
[২৩৯]. সুরা কাসাস, ২৮: ৪৪
[২৪০]. সুরা নিসা, ৪: ৪১

নিম্নের হাদিসসমূহ থেকে নবিজি বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা হওয়ার আশঙ্কা হয় যেমন হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا.

"হজরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা জমিনকে আমার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ পুরো জমিনকে একত্র করে আমার সম্মুখে নিয়ে এসেছেন) তাই আমি এর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত দেখে নিয়েছি এবং যে পর্যন্ত জমিন আমাকে দেখানো হয়েছে, সে পর্যন্ত আমার উম্মতের রাজত্ব পৌঁছে যাবে।"[২৪১]

এই হাদিসে নবিজি ﷺ-এর একটি মুজিযার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের জমিনকে নবিজি ﷺ-এর সম্মুখে উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং নবিজি ﷺ তা দেখে নিয়েছেন। এখানে زَوَى অতীতকাল বাচক ক্রিয়া। যার অর্থ হলো, মাত্র একবারই এমন করা হয়েছে। আর না হয় যদি নবিজি ﷺ সর্বদা সব জায়গায় হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টাই হতেন, তাহলে নবিজি ﷺ-এর সম্মুখে জমিনকে নিয়ে আসার অর্থ কী? তা তো সর্বদা নবিজি ﷺ-এর সম্মুখেই আছে। সুতরাং বুঝা গেল, এই হাদিস দ্বারা হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা প্রমাণিত হয় না। এটা নবিজি ﷺ-এর জীবনের একটি মুজিযা। যা এই হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত হলো, এই হাদিসে শুধু জমিনকে নবিজি ﷺ-এর সামনে আনা হয়েছে। গোটা সৃষ্টিকে নয়।

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ؛ فَإِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يُخَلَّى بِهِ يَسْرَحُ حَيْثُ شَاءَ.

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বলেন, দুনিয়া হলো মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাত। সুতরাং মুমিন যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন সে স্বাধীন হয় এবং যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়।"[২৪২]

---

২৪১. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৮৮৯

২৪২. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা*, ৭/৫৭ হাদিস নং ২৬৫৭। সনদ সহিহ।

এটা একজন সাহাবির বাণী—يَسْرِحُ حَيْثُ شَاءَ যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াবে। যার দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন যে, সে দুনিয়াতেও এদিক-সেদিক যায়। আর এর ওপর কিয়াস করে নবিজি ﷺ-ও হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা প্রমাণিত হয় না। তথাপিও এই বাণীটিতে তিনটি দুর্বলতা রয়েছে। যথা :

ক. এটি একজন সাহাবির বাণী। কোন মারফু হাদিস নয়। এজন্য এর দ্বারা আকিদা প্রমাণ করা যাবে না।

খ. এই বাণীটিতে الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ তথা "দুনিয়া হলো মুমিনের জন্য জেলখানা" বাক্যটি রয়েছে। সুতরাং দুনিয়া যেহেতু জেলখানা, তাহলে সে এখানে এসে পুনরায় জেলখানায় কেন আসবে? এজন্য حَيْثُ شَاءَ তথা "যেখানে ইচ্ছা" এর অর্থ এই নয় যে, সে দুনিয়াতে ঘুরে বেড়ায়। বরং এর অর্থ হলো, সে জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ায়। কেননা সাহাবির এই বাণীটিতে দুনিয়াতে ঘুরে বেড়ানোর কথা নেই।

গ. অপর একটি হাদিসে হজরত জাফর শহিদ রা.-এর সম্পর্কে এসেছে—সে জান্নাতের যেখানে খুশি সেখানে ঘুরে বেড়ায়। এজন্য সাহাবির এই বাণীর দ্বারা রুহ দুনিয়াতে ঘুরে বেড়ানো প্রমাণিত হয় না।

জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ানোর হাদিসটি হলো—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رَأَيْتُ جَعْفَرًا يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আমি (স্বপ্নে) জাফরকে (রা.) জান্নাতের মধ্যে ফেরেশতাদের সঙ্গে উড়ে বেড়াতে দেখেছি।"[২৪৩]

এই হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী হজরত জাফর রা.জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ান। এজন্য "হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.-এর বাণীর অর্থও এটাই হবে—মুমিন মৃত্যুর পরে জান্নাতে ঘুরে বেড়ায়। দুনিয়াতে ঘুরে বেড়ানো প্রমাণিত হয় না।

---

[২৪৩]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৭৬৩। এই হাদিসটি বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণিত এবং এর এই সনদ সহিহ।

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ.

"হজরত মাসরুক রাহি বলেন, আমি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে নিম্নের এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

"আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত। তাদেরকে রিজিক দেওয়া হয়।"[২৪৪]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, আমি এই আয়াতটি সম্পর্কে নবিজি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। নবিজি ﷺ তখন ইরশাদ করেন, শহিদদের রুহ সবুজ পাখির মধ্যে ঝাড়বাতির ভেতরে রয়েছে। যা আরশের সঙ্গে ঝুলে আছে। তারা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ায়। তারপর আবার এ সকল ঝাড়বাতির মধ্যে ফিরে আসে।"[২৪৫]

এই হাদিসের দ্বারাও জান্নাতে ঘুরে বেড়ানোর বিষয়টি প্রমাণিত হয়। দুনিয়াতে ঘুরে বেড়ানোর বিষয়টি প্রমাণিত হয় না।

অন্য এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؛ قَالَ: إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلَقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يُبْعَثُ

"হজরত কাব রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, মুমিন ব্যক্তির রুহ একটি পাখির আকৃতিতে জান্নাতের বৃক্ষে যুক্ত থাকবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের সময় তা তার দেহে ফিরে আসবে।"[২৪৬]

---

[২৪৪]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৬৯

[২৪৫]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৮৮৭

[২৪৬]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৪২৭১; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৫৭৭৭। হাদিস সহিহ।

এই হাদিসের দ্বারাও মুমিনের রুহ জান্নাতে ঘুরে বেড়ানোর বিষয়টি প্রমাণিত হয়। দুনিয়াতে ঘুরে বেড়ানোর বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। মূলত এই আকিদাটি হলো হিন্দুদের। তাদের বিশ্বাস হলো, মরণের পরে মৃত্যুব্যক্তির রুহ দুনিয়াতে ঘুরাফেরা করে।

হিন্দুদের বিশ্বাস হলো তাদের দেব-দেবতা সর্বত্র হাজির এবং সবকিছু দেখে

হিন্দুদের বিশ্বাস হলো, তাদের ঋৃষি-মুনি তথা পুরাতন বুজুর্গ এবং দেব-দেবতাগণ সব জায়গায় হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা। এমনকি মূর্তির ভেতরেও তা উপস্থিত এবং নিজেদের পূজা অর্চনাকারীর সব কথা শুনে এবং তাদেরকে দেখেও এবং তাদের সাহায্যও করে। এজন্যই তারা এগুলোর মূর্তি বানিয়ে পূজা করে এবং এগুলোর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। আর না হয় তো এরাও জানে যে, এগুলো মাটির মূর্তি। এগুলোর কোনো প্রাণ নেই। কিন্তু তাদের বিশ্বাস হলো, তাদের ঋৃষি-মুনি তথা পুরাতন বুজুর্গরা তাতে হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা। এজন্য তারা মূর্তির সামনে সিজদা করে। তাদের পূজা-উপাসনা করে এবং তাদের জন্য নিজেদের নজর-মানত মানে। তাদের সামনে নিজের প্রয়োজন পূরণের আবেদন করে থাকে।
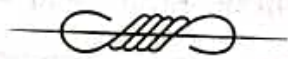
মুখতারে কুল (সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী) একমাত্র আল্লাহ তাআলা

এ আকিদা সম্পর্কে ৩৬টি আয়াত এবং ১০টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলার। তবে নবিজি ﷺ-কে দুনিয়াতে অনেক বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং আখিরাতেও অনেক বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হবে। যা পূর্বের এবং পরের ক্ষমতার মধ্যে সর্বাধিক। কিন্তু তা আংশিক ক্ষমতা, পুরোপুরি নয়।

কবির ভাষায়—

"সংক্ষেপ কথা হলো আল্লাহ তাআলার পরেই আপনার মর্যাদা।"

ইচ্ছা বা ক্ষমতা চার প্রকার

ইচ্ছা বা ক্ষমতা চার প্রকার। যথা :

১. সৃষ্টির সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা। এই ইচ্ছা বা ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই রয়েছে।

২. নবিজি ﷺ-এর জীবনে অনেক ইচ্ছা বা ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

৩. নবিজি ﷺ-কে কিয়ামতের দিন চারটি ইচ্ছা বা ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

৪. উপকার কিংবা ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা বা ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কারও নেই।

১. সৃষ্টির সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা। এই ইচ্ছা বা ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই রয়েছে।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

"আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক।"[২৪৭]

২৪৭. সূরা যুমার, ৩৯: ৬২

আরও ইরশাদ করেন—

﴿ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾

"তিনি আল্লাহ, তোমাদের রব; সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।"[২৪৮]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾

"নিশ্চয় তোমার রব তা-ই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন।"[২৪৯]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

"বলো, আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, একচ্ছত্র ক্ষমতাধর।"[২৫০]

উপর্যুক্ত আয়াত অনুযায়ী সৃষ্টির সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু করার পরিপূর্ণ ইচ্ছা বা ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার। এই ইচ্ছা বা ক্ষমতা অন্য আর কারও নেই।

২. নবিজির জীবনে অনেক ইচ্ছা বা ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে

খাওয়ার, পান করার, নিদ্রার ও জাগ্রত হওয়ার ইচ্ছা বা ক্ষমতা। আদেশ করার ও নিষেধ করার এবং বিধান বাস্তবায়নের ইচ্ছা বা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে নিম্নের চারটি কাজের জন্য নবিজি ﷺ-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। যেমন, পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

"তিনি উম্মিদের মাঝে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তিলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহিতে ছিল।"[২৫১]

---

[২৪৮]. সুরা গাফির, ৪০: ৬২
[২৪৯]. সুরা হুদ, ১১: ১০৭
[২৫০]. সুরা রাদ, ১৩: ১৬
[২৫১]. সুরা জুমুআ, ৬২: ২

আরও ইরশাদ করেন—

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করুন, যে তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে আর তাদের পবিত্র করবে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২৫২]

উপর্যুক্ত দুটি আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী নবিজি ﷺ-কে চারটি কাজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। যথা :

ক. কুরআনুল কারিমের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করা।

খ. কুরআনুল কারিম (তিলাওয়াত ও অর্থ এবং বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা) শিক্ষা দেওয়া।

গ. হিকমত তথা সুন্নাহ শিক্ষা দেওয়া।

ঘ. আত্মশুদ্ধি করা।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا﴾

"আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও আলোকদীপ্ত প্রদীপ হিসেবে।"[২৫৩]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾

"হে রাসুল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাজিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও।"[২৫৪]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾

---

[২৫২]. সুরা বাকারা, ২: ১২৯

[২৫৩]. সুরা আহযাব, ৩৩: ৪৬

[২৫৪]. সুরা মায়িদা, ৫: ৬৭

"এবং এসেছি তোমরা যে কতক বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত তা স্পষ্ট করে দিতে। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।"[২৫৫]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা গেল, নবিজি ﷺ-এর জীবনে দ্বীন ও দ্বীনের বিধান এবং শরিয়তের আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের ইচ্ছা বা ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর জীবনে অন্যান্য আরও অনেক ইচ্ছা বা ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

৩. নবিজিকে কিয়ামতের দিন চারটি ইচ্ছা বা ক্ষমতা প্রদান করা হবে

কিয়ামতের দিন নবিজি ﷺ-কে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে আরও অনেক ইচ্ছা বা ক্ষমতাই প্রদান করা হবে। তবে এই চারটি ইচ্ছা বা ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ। যথা :

১. শাফাআতে কুবরার ক্ষমতা।

২. শাফাআতে সুগরার ক্ষমতা।

৩. আল্লাহ তাআলার হামদ তথা প্রশংসা করার ক্ষমতা।

৪. হাউজে কাউসারের পানি পান করানোর ক্ষমতা।

১. শাফাআতে কুবরার ক্ষমতা

কিয়ামতের দিন হিসাব নেওয়ার জন্য যে শাফাআত বা সুপারিশ করা হবে, তাকে শাফাআতে কুবরা বলা হয়। কেননা, এই শাফাআত বা সুপারিশ অনেক কঠিন হবে এবং সুপারিশের অধিকার একমাত্র নবিজি ﷺ-কেই দেওয়া হবে। অন্য আর কারও এই অধিকার নেই। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا...ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ، فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، حَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ، إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ.

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন

---

২৫৫. সুরা যুখরুফ, ৪৩: ৬৩

তারা বলবে, আমাদের জন্য আমাদের রবের নিকট কেউ যদি শাফাআত করত, যা এ সংকট থেকে আমাদের উদ্ধার করত। তখন তারা সকলেই হজরত আদম আ.-এর কাছে এসে বলবে, আপনি ওই ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে নিজ থেকে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেছেন; তাঁরা আপনাকে সিজদা করেছে। আপনি আমাদের জন্য আমাদের রবের নিকট শাফাআত করুন। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযুক্ত নই এবং নিজ অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, তোমরা হজরত নুহ আ.-এর নিকট যাও, যাকে আল্লাহ তাআলা প্রথম রাসুল হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। তখন তারা তাঁর নিকট আসবে। তিনিও নিজ অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, আমি তোমাদের জন্য এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা হজরত ইবরাহিম আ.-এর নিকট যাও, যাকে আল্লাহ তাআলা নিজের খলিলরূপে গ্রহণ করেছেন। তখন তারা তাঁর নিকট আসবে। তিনিও নিজ অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, আমি তোমাদের জন্য এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা হজরত মুসা আ.-এর নিকট যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন। তখন তারা তাঁর নিকট আসবে। তিনিও নিজ অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, আমি তোমাদের জন্য এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা হজরত ঈসা আ.-এর নিকট যাও। তখন তারা তাঁর নিকট আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের জন্য এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট যাও। তাঁর অগ্র-পশ্চাতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তখন তারা সকলেই আমার নিকট আসবে। তখন আমি আমার রবের নিকট অনুমতি চাইব। যখনই আমি আল্লাহকে দেখতে পাব তখন সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। এরপর আমাকে বলা হবে তোমার মাথা উঠাও। চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উঠাব এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে যে প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে আমার রবের প্রশংসা করব। এরপর আমি সুপারিশ করব, তখন আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। অতঃপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। এরপর আমি আগের মতো করব। অতঃপর তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার সিজদায় পড়ে

যাব। অবশেষে কুরআনের বাণী মোতাবেক যারা অবধারিত জাহান্নামি তাদের ব্যতীত আর কেউই জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে না।"[২৫৬]

এই হাদিসে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যথা :

ক. শাফাআতে কুবরার ক্ষমতা।

খ. আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করার ক্ষমতা।

গ. শাফাআতে সুগরার ক্ষমতা।

২. শাফাআতে সুগরার ক্ষমতা

হাদিস শরিফে এসেছে—

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নবির জন্য একটি মাকবুল দুআ থাকে। যা তিনি নিজের উম্মতের জন্য করে থাকেন। আর আমি আমার উম্মতের জন্য একটি দুআ লুকিয়ে রেখেছি। আর তা হলো, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করব।"[২৫৭]

এই হাদিসে যে শাফাআতের উল্লেখ করা হয়েছে, তা শাফাআতে সুগরার কথা বলা হয়েছে। নবিজি ﷺ-কে যার ক্ষমতা প্রদান করা হবে। তবে এই শাফাআতও আল্লাহ তাআলার হুকুম ব্যতীত হবে না। যেমন কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

"কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?"[২৫৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾

"তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই।"[২৫৯]

---

[২৫৬]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬৫৬৫

[২৫৭]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২০০

[২৫৮]. সুরা বাকারা, ২: ২৫৫

[২৫৯]. সুরা ইউনুস, ১০: ৩

৩. আল্লাহ তাআলার হামদ তথা প্রশংসা করার ক্ষমতা

নবিজি ﷺ-কে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার এমন প্রশংসা করার ক্ষমতা প্রদান করা হবে, যা অন্য আর কাউকে দেওয়া হবে না। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا....ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي.

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন তারা বলবে, আমাদের জন্য আমাদের রবের নিকট কেউ যদি শাফাআত করত, যা এ সংকট থেকে আমাদের উদ্ধার করত... এরপর আমাকে বলা হবে তোমার মাথা উঠাও। চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উঠাব এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে যে প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে আমার রবের প্রশংসা করব।"[২৬০]

৪. হাউজে কাউসারের পানি পান করানোর ক্ষমতা

হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا.

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আমার হাউজের প্রশস্ততা এক মাসের পথের সমান। তার পানি দুধের চেয়ে সাদা, তার ঘ্রাণ মিশ্‌কের চেয়ে বেশি সুগন্ধযুক্ত এবং তার পানপাত্রগুলো হবে আকাশের তারকার মতো অধিক। তাথেকে যে পান করবে সে আর কক্ষনো পিপাসার্ত হবে না।"[২৬১]

উপর্যুক্ত চারটি হাদিস থেকে জানা গেল, নবিজি ﷺ-কে কিয়ামতের দিন চারটি বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হব।

---

[২৬০]. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬৫৬৫

[২৬১]. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬৫৭৯

৪. উপকার কিংবা ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা বা ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কারও নেই

কারও উপকার কিংবা ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা, কাউকে সন্তান দেওয়া, কাউকে আরোগ্য প্রদান, কাউকে জীবিকা প্রদান করা, কাউকে মৃত্যু দান করা, কাউকে জীবন দান করা, বৃষ্টি বর্ষণ করা, অভাব-অনটন দেওয়া—এ সকল ক্ষমতা নবিজি ﷺ-এর কিংবা অন্য কারোরই নেই। এই ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার। যেমন কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

"বলো, আমি রাসুলদের মধ্যে নতুন নই। আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমার প্রতি যা ওহি করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি।"[২৬২]

এই আয়াতে যেহেতু উল্লেখ সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে

﴿وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾

"আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে।"

তাহলে এগুলোর ক্ষমতা নবিজি ﷺ-এর কীভাবে হয়?

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾

"বলো, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য না কোনো অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখি এবং না কোনো কল্যাণ করার। বলো, নিশ্চয় আল্লাহর কাছ থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ছাড়া কখনো আমি কোনো আশ্রয়ও পাব না।"[২৬৩]

এজন্য এই চতুর্থ প্রকারের ইচ্ছা বা ক্ষমতাও নবিজি ﷺ-এর নেই।

সুপ্রিয় পাঠক! আপনি নিজেই উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের ওপর একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন।

---

[২৬২]. সুরা আহকাফ, ৪৬: ৯

[২৬৩]. সুরা জিন, ৭২: ২১-২২

স্বয়ং নবিজিকে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমার হাতে কোনো উপকার বা ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা নেই

যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

"বলো, আমি আমার নিজের কোনো উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান।"[২৬৪]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

"বলো, আমি নিজের ক্ষতি বা উপকারের অধিকার রাখি না, তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন।"[২৬৫]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾

"বলো, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য না কোনো অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখি এবং না কোনো কল্যাণ করার।"[২৬৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾

"বলো, নিশ্চয় আল্লাহর কাছ থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ছাড়া কখনো আমি কোনো আশ্রয়ও পাব না।"[২৬৭]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

"বলো, আমি রাসুলদের মধ্যে নতুন নই। আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমার প্রতি যা ওহি করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি।"[২৬৮]

---

[২৬৪]. সুরা আরাফ, ৭: ১৮৮
[২৬৫]. সুরা ইউনুস, ১০: ৪৯
[২৬৬]. সুরা জিন, ৭২: ২১
[২৬৭]. প্রাগুক্ত, ২২

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে স্বয়ং নবিজি ﷺ-কে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমার হাতে কোনো উপকার বা ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা নেই। তাহলে নবিজি ﷺ-কে কীভাবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলা সঠিক হয় কীভাবে?

অনেক ক্ষমতাই নবিজিকে প্রদান করা হয়নি

যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾

"তাদেরকে হিদায়াত করার দায়িত্ব তোমার নয়, কিন্তু আল্লাহ যাকে চান হিদায়াত করেন।"[২৬৯]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

"নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাস তাকে তুমি হিদায়াত দিতে পারবে না; বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন। আর হিদায়াতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনি ভালো জানেন।"[২৭০]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾

"আর কোনো কিছুর ব্যাপারে তুমি মোটেই বলবে না যে, নিশ্চয় আমি তা আগামীকাল করব, তবে আল্লাহ যদি চান।"[২৭১]

আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾

"এ বিষয়ে তোমার কোনো অধিকার নেই—হয়তো তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা তিনি তাদেরকে আজাব দেবেন। কারণ নিশ্চয় তারা জালিম।"[২৭২]

---

[২৬৮]. সুরা আহকাফ, ৪৬: ৯
[২৬৯]. সুরা বাকারা, ২: ২৭২
[২৭০]. সুরা কাসাস, ২৮: ৫৬
[২৭১]. সুরা কাহাফ, ১৮: ২৩-২৪
[২৭২]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১২৮

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ﴾

"সেদিন কোনো মানুষ অন্য মানুষের জন্য কোনো কিছুর ক্ষমতা রাখবে না। আর সেদিন সকল বিষয় হবে আল্লাহর কর্তৃত্বে।"[২৭৩]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾

"নবি ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবে। যদিও তারা আত্মীয় হয়। তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয় তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী।"[২৭৪]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

"আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন নিয়ে আসা কোনো রাসুলের উচিত নয়।"[২৭৫]

সুপ্রিয় পাঠক! উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের ওপর লক্ষ করুন—অনেক ক্ষমতাই নবিজি ﷺ-কে প্রদান করা হয়নি। তাহলে নবিজি ﷺ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কীভাবে হয়?

আল্লাহ তাআলার অনুমতি ব্যতীত নবিজি ﷺ-এর নিজের পক্ষ থেকে কোনো মাসআলা বর্ণনা করারও অধিকার নেই

যেমন পবিত্র কুরআনুল করিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾

"হে নবি, আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনায় তুমি কেন তা হারাম করছ?"[২৭৬]

---

[২৭৩]. সুরা ইনফিতার, ৮২: ১৯
[২৭৪]. সুরা তাওবা, ৯: ১১৩
[২৭৫]. সুরা গাফির, ৪০: ৭৮
[২৭৬]. সুরা তাহরিম, ৬৬: ১

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾

"কোনো নবির জন্য সংগত নয় যে, তার নিকট যুদ্ধবন্দি থাকবে (এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে তিনি তাদের মুক্ত করবেন) যতক্ষণ না তিনি জমিনে (তাদের) রক্ত প্রবাহিত করেন।"[২৭৭]

নবিজি ﷺ বদরের যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিপণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল না। তখন সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে বিরত রাখা হয়েছিল।

সুপ্রিয় পাঠক! উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের ওপর লক্ষ করুন—আল্লাহ তাআলার অনুমতি ব্যতীত নবিজি ﷺ নিজ ইচ্ছায় কোনো মাসআলা বর্ণনা করারও অধিকার নেই। তাহলে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তিনি কীভাবে হন?

নবিজি যা-কিছু করেছেন, তা আল্লাহর অনুমতি ও নির্দেশক্রমেই করেছেন

যেমন পবিত্র কুরআনুল করিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

"আর আমি যেকোনো রাসুল প্রেরণ করেছি তা কেবল এ জন্য, যেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের আনুগত্য করা হয়।"[২৭৮]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾

"আর কোনো রাসুলের জন্য এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন নিয়ে আসবে। প্রতিটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য রয়েছে লিপিবদ্ধ বিধান।"[২৭৯]

অন্য আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

"আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন নিয়ে আসা কোনো রাসুলের উচিত নয়।"[২৮০]

---

[২৭৭]. সুরা আনফাল, ৮: ৬৭
[২৭৮]. সুরা নিসা, ৪: ৬৪
[২৭৯]. সুরা রাদ, ১৩: ৩৮

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾

"এই কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাজিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনো।"[২৮১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا﴾

"আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও আলোকদীপ্ত প্রদীপ হিসেবে।"[২৮২]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের ভাষ্যমতে নবিজি ﷺ-কে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা সবই আল্লাহ তাআলার নির্দেশে।

আল্লাহর ক্ষমতা অসীম, সুতরাং তা নবিজির কীভাবে অর্জিত হবে?

আল্লাহ তাআলা ওয়াজিবুল ওজুদ তথা অত্যাবশ্যকীয় সত্তা। তাঁর ক্ষমতা অসীম। আর নবিজি ﷺ-এর সত্তা হলো সসীম। সুতরাং উক্ত সকল ক্ষমতা তা নবিজি ﷺ-এর কীভাবে অর্জিত হবে? এটা অসম্ভব। এজন্য নবিজি ﷺ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নন। তবে হ্যাঁ! দুনিয়া ও আখিরাতে কিছু বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। যার বিবরণ পেছনে বর্ণনা করা হয়েছে। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। যেমন পবিত্র কুরআনুল করিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾

"নিশ্চয় তোমার রব তা-ই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন।"[২৮৩]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾

"আরশের অধিপতি, মহান। তিনি তা-ই করেন যা চান।"[২৮৪]

---

[২৮০]. সুরা গাফির, ৪০: ৭৮

[২৮১]. সুরা ইবরাহিম, ১৪: ১

[২৮২]. সুরা আহযাব, ৩৩: ৪৬

[২৮৩]. সুরা হুদ, ১১: ১০৭

নবিজি ﷺ-এর এই ক্ষমতা নেই যে, যা ইচ্ছা তা-ই করবেন। এই ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার।

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হলো, নবিজি ﷺ-এর জীবনে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এবং কিয়ামতের দিনও অনেক ক্ষমতা দেওয়া হবে। আর এই ক্ষমতা পূর্বের ও পরের সকলের ক্ষমতার চেয়ে অধিক।

মোটকথা হলো, এ সবকিছু সত্ত্বেও নবিজি ﷺ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নন এবং নবিজি ﷺ কারও উপকার ও ক্ষতিসাধনেরও মালিক নন।

নবিজি মুখতারে কুল (সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী) নন হাদিস দ্বারা তার প্রমাণ

হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ... يَا أُمَّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ اشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا سَلَانِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمَا.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, হে যুবায়ের ইবনুল আওয়াম এর মা- আল্লাহর রাসুলের ফুফু! হে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কন্যা ফাতিমা! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করো। তোমাদের আজাব হতে বাঁচানোর সামান্যতম ক্ষমতাও আমার নাই। আর আমার ধনসম্পদ হতে তোমরা যা ইচ্ছা তা চেয়ে নিতে পারো।"[২৮৫]

অপর এক হাদিসে এসেছে—

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْذِرْعَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ... يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বলেন, যখন এই আয়াতটি নাজিল হলো,

﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

"আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করো।"[২৮৬]

---

২৮৪. সুরা বুরুজ, ৮৫: ১৫-১৬

২৮৫. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৫২৭

২৮৬. *সুরা শুআরা*, ২৬: ২১৪

নবিজি ﷺ তখন দাঁড়িয়ে গেলেন। দাঁড়িয়ে ইরশাদ করেন, হে রাসুলের ফুফু সাফিয়াহ রা.! আমি তোমার জন্য আল্লাহর দরবারে কোনো উপকার করার ক্ষমতা রাখি না। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা! আমার সম্পদ থেকে তোমার যা খুশি নিয়ে যেতে পারো। আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে কোনো উপকার করার ক্ষমতা রাখি না।"[২৮৭]

উপর্যুক্ত দুটি হাদিসে নবিজি ﷺ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের কোনো উপকার করার ক্ষমতা রাখি না। তবে হ্যাঁ! যদি ঈমান থাকে এবং আল্লাহ তাআলা সুপারিশ করার অনুমতি দেন তাহলে সুপারিশ করব।

আরেক হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا...ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ، فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، حَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ، إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ.

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন মানুষ বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের নিকট কারও সুপারিশ নিয়ে যেতে পারি, তাহলে মনে হয় অনেক উপকার হতে পারে। সম্ভবত আমরা এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারি।... অতঃপর বলবেন, আপনি মাথা উঠান এবং বলুন আপনি কি চান? আমি তা-ই দেবো। তখন আমি সুপারিশ করার অনুমতি করব। তখন সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তখন আমার রবের এমন হামদ ও সানা তথা প্রশংসা করব, যা আল্লাহ তাআলা আমাকে শিখিয়ে দেবেন। অতঃপর আমি সুপারিশ করব। আর তখন আমার জন্য সুপারিশের সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে এবং আমি মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ব। এভাবে তৃতীয় কিংবা চতুর্থবার জাহান্নামে শুধু ওই সকল লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে, যাদেরকে কুরআন বাধা দিয়েছে তথা যাদেরকে কুরআনুল কারিম চিরস্থায়ী

---

২৮৭. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ২৭৫৩

জাহান্নামি হওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে। অর্থাৎ শুধু কাফিররাই জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে।"[২৮৮]

এই হাদিসে বর্ণনামতে নবিজি ﷺ চাইবেন এবং আল্লাহ তাআলা দেবেন। অতঃপর এটাও বর্ণিত হয়েছে—সকল সুপারিশ একই সময়ে করবেন না। বরং প্রথমবার একটি সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। তারপর দ্বিতীয়বার আরেকটি সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। তারপর তৃতীয়বার আরেকটি সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। তারপর চতুর্থবার আরেকটি সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। এভাবে মোট চারবারে নবিজি ﷺ-এর সুপারিশ সম্পন্ন হবে। এজন্য নবিজি ﷺ কিয়ামতের দিনও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবেন না। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তো দূরের কথা বরং হাদিসে এটা বলতেও নিষেধ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা এবং মুহাম্মাদ ﷺ চেয়েছেন। বরং এটা বলতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন অতঃপর মুহাম্মাদ ﷺ চেয়েছেন। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে,

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ... تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَعْرِفُهَا لَكُمْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ.

"হজরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন... তোমরা বলে থাকো আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) যা ইচ্ছা করেন। অতঃপর সে স্বপ্নের কথাটি নবিজি ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করল। তখন নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহর কসম! শোনো, আমি তো তোমাদের এরূপ কিছু বলতে শিখাইনি। তোমরা বলবে আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করেন, এরপর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যা চান।"[২৮৯]

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—শুধু এটা বলো যে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। মাঝখানে নবিজি ﷺ-এর ইচ্ছার নামই নিয়ো না। যেমন হজরত আয়েশা রা.-এর ভাই রাবি বিন খেরাশ থেকে বর্ণিত—

إِنَّمَا كَانَ يَمْنَعُنِيْ أَنْ أَنْهَاكُمْ مِنْ ذَالِكَ الْحَيَاءُ، فَإِذَا قُلْتُمْ فَقُوْلُوْا مَاشَاءَ اللهُ وَحْدَهُ.

---

[২৮৮]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬৫৬৫

[২৮৯]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২১১৮; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২৩৩৩৯। এর সনদ সহিহ।

"আমি লজ্জার কারণে এ কথা বলতাম না যে, যখন তোমরা কোনো কথা বলো, তখন এটা বলো যে, শুধু আল্লাহ তাআলা যা চান তা-ই হবে।"[২৯০]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—শুধু এটা বলো যে, শুধু আল্লাহ তাআলা যা চান তা-ই হবে।

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ থেকে এটাই প্রমাণিত হলো, নবিজি ﷺ মুখতারে কুল (সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী) নন। আর যেখানে নবিজি ﷺ-ই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নয়, সেখানে অন্য কোনো নবি কিংবা সাহাবি অথবা কোনো ওলি-আওলিয়া ও পির-বুজুর্গ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

হিন্দুদের বিশ্বাস—তাদের দেব-দেবতা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী

হিন্দুদের বিশ্বাস—তাদের দেব-দেবতা এমনকি তাদের মূর্তিসমূহেরও উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রয়েছে। তাইতো তাদের কিছু দেব-দেবতা উপকার করার জন্য নির্ধারিত। কিছু দেব-দেবতা ক্ষতি করার জন্য নির্ধারিত। কিছু দেব-দেবতা বৃষ্টি বর্ষণের জন্য নির্ধারিত। এ কারণেই তারা দেব-দেবতাদের পূজা-উপাসনা করে। তাদের নিকট নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করে এবং তাদের মূর্তি বানিয়ে তার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে থাকে। যেহেতু এ সকল কর্মকাণ্ড শিরক, তাই আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে এর ওপর অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন এবং স্বয়ং নবিজি ﷺ-কে দিয়েও ঘোষণা করিয়েছেন—আমার হাতেও ক্ষতি করার ক্ষমতা না।
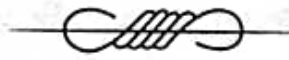
২৯০. মুজামুল কাবির, তাবারনী, ৮/৩২৫; হাদিস নং ৮২১৫। এই হাদিসটি আরও বিভিন্ন সনদ ও মতনে বর্ণিত হয়েছে। সর্বোপরি এর সনদ হাসান।

ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার

এ আকিদা সম্পর্কে ৫৫টি আয়াত এবং ১৭টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তবে হ্যাঁ! নবিজি ﷺ-কে গায়েব তথা অদৃশ্যের অনেক বিষয়েই ওহির মাধ্যমে অথবা মিরাজে নিয়ে কিংবা জান্নাত-জাহান্নামকে নবিজি ﷺ-এর সামনে উন্মুক্ত করে অবগত করা হয়েছে। যা গোটা সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক ইলম বা জ্ঞান। এজন্য এটা বলা যাবে যে, ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আর নবিজি ﷺ-কে সাতটি পদ্ধতিতে গায়েব তথা অদৃশ্যের অনেক বিষয়ই অবগত করা হয়েছে। যা গোটা সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক ইলম বা জ্ঞান। তবে এই ইলম বা জ্ঞান হলো আংশিক, সমস্ত ইলম বা জ্ঞান নয়। যেমনটি কবি বলেছেন—

"সংক্ষেপ কথা হলো আল্লাহ তাআলার পরেই আপনার মর্যাদা।"

সকল নবিদেরকেই ওহির মাধ্যমে গায়েব তথা অদৃশ্যের অনেক বিষয়ে অবগত করা হয়েছে। এজন্যই তাদেরকে নবি বলা হয়। অর্থাৎ (উম্মতকে) গায়েব তথা অদৃশ্যের বিষয় অবগতকারী। কিন্তু গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানের কারণে সে আলিমুল গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদদাতা হয়ে যায়নি। কেননা সে যদি গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানের কারণে আলিমুল গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদদাতা হয়ে যায়, তাহলে সকল নবিদেরকেই আলিমুল গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদদাতা মানতে হবে। আর এমনটি হলে শুধু নবিজি ﷺ একা আলিমুল গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদদাতা থাকেন না। তাই এ বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন।

ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান ৩ প্রকার

ইলমে গায়েব ৩ প্রকার। যথা :

১. সেই ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান যা সত্তাগত এবং প্রত্যেকটি বস্তু সর্বদার জন্য তার অন্তর্ভুক্ত। এই ইলম চিরকাল ছিল এবং চিরকাল থাকবে। এই ইলম সীমাহীন। তার কোনো সীমা নেই। এই প্রকারের ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা। অন্য আর কারও এই ইলম নেই। এতে কারও দ্বিমত নেই।

২. ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রকার হলো—ওই ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান, যা গায়েব বা অদৃশ্যের কথা বা বিষয় ঠিকই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজের রাসুলকে তা জানিয়েছেন। নবিজি ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা যত কথা জানিয়েছেন, আর তা নবিজি ﷺ-এর জন্য প্রমাণিত। এই ইলম বা জ্ঞান এক তো হলো আল্লাহ তাআলার জানিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়ত হলো এই ইলম বা জ্ঞান হলো আংশিক। আল্লাহ তাআলার সমস্ত ইলম বা জ্ঞান নয়। গায়েব বা অদৃশ্যের কিছু সংবাদ ওহির মাধ্যমে নবিজি ﷺ-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾

"এটি গায়েবের সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার প্রতি ওহি পাঠাচ্ছি।"[২৯১]

৩. ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের তৃতীয় প্রকার হলো—ওই ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান, যেমন যায়েদের খাওয়া-দাওয়া, রোগ-আরোগ্য, সন্তান, জীবন-মৃত্যু ও লাভ-ক্ষতির ইলম বা জ্ঞান। এই ইলম বা জ্ঞান কি নবিজি ﷺ-এর ছিল?

১. সেই ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান যা সত্তাগত এবং প্রত্যেকটি বস্তু সর্বদার জন্য তার অন্তর্ভুক্ত। এই ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা।

আল্লাহ তাআলার সত্তাগত ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান, যা চিরস্থায়ী। তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই নির্ধারিত। নিম্নের আয়াতসমূহে হসর এবং তাকিদ তথা একমাত্র এবং গুরুত্বের অর্থ প্রদানপূর্বক বর্ণনা করা হয়েছে—ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

---

২৯১. সুরা আলে ইমরান, ৩: ৪৪

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾

"বলো, আল্লাহ ছাড়া আসমানসমূহ ও জমিনে যারা আছে তারা গায়েব জানে না। আর কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে তা তারা অনুভব করতে পারে না।"[২৯২]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾

"আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না।"[২৯৩]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾

"আসমানসমূহ ও জমিনের গায়েব আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।"[২৯৪]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾

"আমার অন্তরে যা আছে তা আপনি জানেন, আর আপনার অন্তরে যা রয়েছে, তা আমি জানি না; নিশ্চয় আপনি গায়েবি বিষয়সমূহে সর্বজ্ঞাত।"[২৯৫]

নোট: এখানে إِنَّكَ এবং أَنتَ হসর তথা একমাত্রের অর্থ প্রদান করে। অতঃপর عَلَّامُ শব্দটি অতিরিক্তবাচক ক্রিয়া। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা অধিক জ্ঞাত। তারপর غُيُوبِ শব্দটিও অতিরিক্তবাচক ক্রিয়া। অর্থাৎ গায়েবের প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত। এজন্য এই গুণটির মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য আর কেউ নয়।

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

---

[২৯২]. সুরা নামাল, ২৭: ৬৫
[২৯৩]. সুরা আনআম, ৬: ৫৯
[২৯৪]. সুরা হুদ, ১১: ১২৩
[২৯৫]. সুরা মায়িদা, ৫: ১১৬

"আসমানসমূহ ও জমিনের গায়েবি বিষয় তাঁরই।"[২৯৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾

"বলো, এ বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই নিকট। আর আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।"[২৯৭]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾

"তারা বলবে, আমাদের কোনো ইলম নেই, নিশ্চয় আপনি গায়েবি বিষয়সমূহের সর্বজ্ঞানী।"[২৯৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের গায়েব সম্পর্কে অবগত আছেন। আর তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।"[২৯৯]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের গায়েবি বিষয়ের জ্ঞানী, অন্তরসমূহে যা রয়েছে সে বিষয়েও তিনি সবিশেষ অবগত।"[৩০০]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾

"তারা কি জানে না, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের গোপনীয় বিষয় ও গোপন পরামর্শ জানেন? আর নিশ্চয় আল্লাহ গায়েবসমূহের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞাত।"[৩০১]

আরও ইরশাদ করেন—

---

[২৯৬]. সুরা কাহাফ, ১৮: ২৬
[২৯৭]. সুরা মুলক, ৬৭: ২৬
[২৯৮]. সুরা মায়িদা, ৫: ১০৯
[২৯৯]. সুরা হুজুরাত, ৪৯- ১৮
[৩০০]. সুরা ফাত্বির, ৩৫: ৩৮
[৩০১]. সুরা তাওবা, ৯: ৭৮

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ﴾

"দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞাতা; তিনিই পরম করুণাময়, দয়ালু।"[৩০২]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানধারী, মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৩০৩]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾

"তিনি গায়েব ও উপস্থিত বিষয়ে পরিজ্ঞাত এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, অধিক অবহিত।"[৩০৪]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"তিনি গায়েব ও উপস্থিতের জ্ঞানী, তারা যা শরিক করে তিনি তার উর্ধ্বে।"[৩০৫]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾

"গায়েব ও উপস্থিত বিষয়ের জ্ঞানী।"[৩০৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

"তারপর তোমাদেরকে অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তারপর তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করতে।"[৩০৭]

---

৩০২. সুরা হাশর, ৫৯: ২২
৩০৩. সুরা তাগাবুন, ৬৪: ১৮
৩০৪. সুরা আনআম, ৬: ৭৩
৩০৫. সুরা মুমিন, ২৩: ৯২
৩০৬. সুরা যুমার, ৩৯: ৪৬
৩০৭. সুরা জুমুআ, ৬২: ৮

আরও ইরশাদ করেন—

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا﴾

"তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না।"[৩০৮]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

"আর আসমানসমূহ ও জমিনে গায়েবি বিষয় আল্লাহরই।"[৩০৯]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا﴾

"এগুলো গায়েবের সংবাদ, আমি তোমাকে ওহির মাধ্যমে তা জানাচ্ছি। ইতঃপূর্বে তা না তুমি জানতে এবং না তোমার কওম।"[৩১০]

নোট : এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজেই বলছেন, হে নবি না আপনার কোনো কিছু জানা ছিল, না আপনার উম্মতের জানা ছিল। আপনার যদি জানাই থাকত, তাহলে আপনার ওপর দীর্ঘ ২৩ বছরে কুরআন অবতীর্ণ করার কী প্রয়োজন ছিল? তা তো শুরু থেকেই আপনার জানা থাকার কথা। আর এর প্রমাণ হলো কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا﴾

"নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি পর্যায়ক্রমে আল-কুরআন নাজিল করেছি।"[৩১১]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا﴾

"আর কুরআন আমি নাজিল করেছি কিছু কিছু করে, যেন তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ধীরে ধীরে এবং আমি তা নাজিল করেছি পর্যায়ক্রমে।"[৩১২]

---

[৩০৮]. সুরা জিন, ৭২: ২৬
[৩০৯]. সুরা নাহল, ১৬: ৭৭
[৩১০]. সুরা হুদ, ১১: ৪৯
[৩১১]. সুরা দাহর, ৭৬: ২৩

এই দুটি আয়াত থেকে বুঝা গেল, নবিজি ﷺ-এর ওপর কুরআন ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছে।

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হলো, ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তিনিই সবকিছু জানেন। অন্য কেউ এই ইলম বা জ্ঞানের অধিকারী নয়। যেখানে উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে অন্য কেউ এই ইলম বা জ্ঞানের অধিকারী নয় প্রমাণিত হলো, তাহলে নবিজি ﷺ-এর জন্য ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান সাব্যস্ত করা সঠিক নয়।

নবিজিকে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমি অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী নই

যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾

"বলো, আল্লাহ ছাড়া আসমানসমূহে ও জমিনে যারা আছে তারা গায়েব জানে না। আর কখন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে তা তারা অনুভব করতে পারে না।"[৩১৩]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾

"বলো, তোমাদের আমি বলি না, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি না।"[৩১৪]

অন্য আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

"বলো, আমি রাসুলদের মধ্যে নতুন নই। আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমার প্রতি যা ওহি করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি।"[৩১৫]

---

[৩১২]. সুরা বনি ইসরাইল, ১৭: ১০৬
[৩১৩]. সুরা নামাল, ২৭: ৬৫
[৩১৪]. সুরা আনআম, ৬: ৫০
[৩১৫]. সুরা আহকাফ, ৪৬: ৯

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾

"আর তোমাদেরকে আমি বলছি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডারসমূহ আছে এবং আমি গায়েব জানি না।"[৩১৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ﴾

"বলো, গায়েবের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই। অতএব তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষায় রয়েছি।"[৩১৭]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ﴾

"তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তা কখন ঘটবে? তুমি বলো, এর জ্ঞান তো রয়েছে আমার রবের নিকট। তিনিই এর নির্ধারিত সময়ে তা প্রকাশ করবেন।"[৩১৮]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ﴾

"লোকেরা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে—বলো, এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটই আছে।"[৩১৯]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾

"আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোনো ক্ষতি স্পর্শ করত না।"[৩২০]

---

[৩১৬]. সুরা হুদ, ১১: ৩১
[৩১৭]. সুরা ইউনুস, ১০: ২০
[৩১৮]. সুরা আরাফ, ৭: ১৮৭
[৩১৯]. সুরা আহযাব, ৩৩: ৬৩
[৩২০]. সুরা আরাফ, ৭: ১৮৮

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে নবিজি ﷺ-কে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমি ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী নই। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী। তাহলে কীভাবে বলা যাবে যে, নবিজি ﷺ ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী?

নবিজিকে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমার নিকট যে ইলম বা জ্ঞান রয়েছে, তা ওহির মাধ্যমে অর্জিত; আমি তারই অনুসরণ করি

নিম্নের ৬টি আয়াতে হসর এবং তাকিদ তথা একমাত্র এবং গুরুত্বের অর্থ প্রদানপূর্বক বর্ণনা করা হয়েছে—আমার নিকট যে ইলম বা জ্ঞান রয়েছে, তা ওহির মাধ্যমে অর্জিত ইলম বা জ্ঞান। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي﴾

“বলো, আমি তো তারই অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে ওহিরূপে প্রেরণ করা হয়।”[৩২১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

“আমি কেবল তাই অনুসরণ করি যা আমার কাছে ওহি প্রেরণ করা হয়।”[৩২২]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

“আমি তো শুধু আমার প্রতি অবতীর্ণ ওহির অনুসরণ করি।”[৩২৩]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

“আমার প্রতি যা ওহি করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি।”[৩২৪]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾

---

[৩২১]. সুরা আরাফ, ৭: ২০৩
[৩২২]. সুরা আনআম, ৬: ৫০
[৩২৩]. সুরা ইউনুস, ১০: ১৫
[৩২৪]. সুরা আহকাফ, ৪৬: ৯

"আর তোমার নিকট যে ওহি পাঠানো হয়েছে, তুমি তার অনুসরণ করো।"[৩২৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

"তাতো কেবল ওহি, যা তার প্রতি ওহিরূপে প্রেরণ করা হয়।"[৩২৬]

উপর্যুক্ত ৬টি আয়াতে হসর তথা একমাত্র এর অর্থ প্রদানপূর্বক নবিজি ﷺ এটা জানিয়ে দিয়েছেন—আমার নিকট যা-কিছু আছে তা শুধু ওহির মাধ্যমে অর্জিত। আমি তারই অনুসরণ করি। এজন্য ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান প্রমাণ করতে হলে অনেক কিছু ভাবতে হবে। তা সত্ত্বেও যদি ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান প্রমাণ করতে হয়, তাহলে এর জন্য এমন কোন আয়াত লাগবে যেখানে সুস্পষ্টভাবে এই ঘোষণা রয়েছে যে, আমি নবিজি ﷺ-কে সমস্ত ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেছি।

পাঁচটি বস্তুর ইলম বা জ্ঞান আল্লাহ তাআলা কাউকে দেননি

নিম্নের পাঁচটি বস্তুর ইলম বা জ্ঞান আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কারও নিকট নেই। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জরায়ুতে যা আছে, তা তিনি জানেন। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মারা যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।"[৩২৭]

এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—উপর্যুক্ত পাঁচটি বস্তুর ইলম বা জ্ঞান আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কারও নিকট নেই।

নবিজিকে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে আমাকে কোনো ক্ষতি স্পর্শ করত না

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

---

৩২৫. সুরা ইউনুস, ১০: ১০৯
৩২৬. সুরা নাজম, ৫৩: ৪
৩২৭. সুরা লুকমান, ৩১: ৩৪

﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾

"আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোনো ক্ষতি স্পর্শ করত না।"[৩২৮]

এই আয়াতে স্বয়ং নবিজি ﷺ-কে দিয়েই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে—আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোনো ক্ষতি স্পর্শ করত না।

নবিজিকে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—গায়েবের ভান্ডার একমাত্র আল্লাহ তাআলারই নিকট এবং গায়েব বা অদৃশ্যের সংবাদ একমাত্র তিনিই জানেন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾

"আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না।"[৩২৯]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে নবিজি ﷺ নিজেই এটা অস্বীকার করেছেন—আমি ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী নই। তারপরও নবিজি ﷺ-এর জন্য ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান কীভাবে প্রমাণিত হয়?

আর যদি বলা হয় যে, আল্লাহ তাআলা নবিজি ﷺ-কে ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেছেন, তাহলে উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে তা অস্বীকার করা হলো কেন?

এমন কোনো আয়াত খুঁজে পাওয়া যায় না, যেখানে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে—আল্লাহ তাআলা নবিজি ﷺ-কে সকল ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেছেন। যে দুই আয়াত দিয়ে ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান প্রমাণ করা হয়, সেখানেও ওহির কথা উল্লেখ রয়েছে। যার দ্বারা বুঝা যায় যে, নবিজি ﷺ-কে ওহির মাধ্যমে অনেক ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান দান করা হয়েছে।

---

[৩২৮]. সুরা আরাফ, ৭: ১৮৮

[৩২৯]. সুরা আনআম, ৬: ৫৯

নবিজি অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী নন, তা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত

যেমন হাদিস শরিফে এসেছে—নবিজি ﷺ-এর সম্মানিতা স্ত্রী আম্মাজান হজরত আয়েশা রা.-এর ওপর মুনাফিকরা অপবাদ দিয়েছিল। যার কারণে প্রায় এক মাস পর্যন্ত নবিজি ﷺ পেরেশান ছিলেন। অতঃপর হজরত আয়েশা রা.-এর পবিত্রতা বর্ণনা করে সুরা নুরের আয়াত নাজিল করা হলো, তখন নবিজি ﷺ নিশ্চিন্ত হয়েছেন। নবিজি ﷺ যদি ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারীই হতেন, তাহলে এক মাস পর্যন্ত পেরেশান থাকার কি প্রয়োজন ছিল? নবিজি ﷺ তো আগেই জানার কথা যে, হজরত আয়েশা রা. নির্দোষ এবং পবিত্র। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ قَالَ لَهَا: أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا... وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ، قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ: فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ...فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ.

"আম্মাজান হজরত আয়েশা রা. থেকে একটি দীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—অপবাদ আরোপকারীরা যা-কিছু তাঁর নিকট বলেছে... নবিজি ﷺ এক মাস অপেক্ষা করার পরও আমার ব্যাপারে তাঁর নিকট কোনো ওহি আসেনি। আয়েশা রা. বলেন, বসার পর নবিজি ﷺ কালিমা শাহাদাত পড়লেন, এরপর বললেন, আয়েশা তোমার ব্যাপারে আমার নিকট অনেক কথাই পৌছেছে, তুমি যদি এর থেকে পবিত্র হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করবেন। আর যদি তুমি কোনো গুনাহ করে থাকো তাহলে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং তাওবা করো... অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমার পবিত্রতা বর্ণনা করে সুরা নুরের ১১ নং আয়াত থেকে পরবর্তী ১০টি আয়াত নাজিল করেন।"[৩৩০]

এই হাদিসে দেখুন নবিজি ﷺ নিজের প্রিয় স্ত্রীর সম্পর্কেও ইলম বা জ্ঞান নেই যে, তিনি নির্দোষ ও পবিত্র কিনা? এক মাস পর্যন্ত পেরেশানি ভোগ করলেন। নবিজি ﷺ যদি ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারীই হতেন, তাহলে এক মাস পর্যন্ত এই পেরেশানির কি প্রয়োজন ছিল?

---

৩৩০. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪১৪১; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৭৭০

সালাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতের মধ্যেও নবিজি ﷺ ভুলে যেতেন। অতঃপর ইরশাদ করেন—আমিও ভুলে যাই। আর এ কথাও বলেছেন যে, আমি ভুল করলে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। নবিজি ﷺ যদি ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারীই হতেন, তাহলে ভুলে যাওয়ার অর্থ কী? পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কথা কেন বলেছেন? এর দ্বারা বুঝা গেল—নবিজি ﷺ ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে—

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ :صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ ....قَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي.

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ সালাত আদায় করলেন... অতঃপর বললেন, যদি সালাত সম্পর্কে নতুন কিছু হতো, তাহলে অবশ্যই তোমাদের তা জানিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল করে থাকো, আমিও তোমাদের মতো ভুলে যাই। সুতরাং আমি কোনো সময় ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।"[৩৩১]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—নবিজি ﷺ ভুলে যেতেন। তাহলে তিনি ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী কীভাবে হন?

যদি তিনি ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারীই হতেন, তাহলে বিচার-ফায়সালার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী মনে করা এবং তার পক্ষে বিচারের রায়ও প্রদান করা কীভাবে সম্ভব? যেমন অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ....فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ.

"আম্মাজান হজরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন... নবিজি ﷺ ঝগড়াকারীদের নিকট এসে বললেন, আমি তো একজন মানুষ। আমার নিকট (কোনো কোনো সময়) ঝগড়াকারীরা (বিচারের জন্য) আসে।

৩৩১. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪০১; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৫৭২

তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের চেয়ে অধিক বাকপটু। তখন আমি মনে করি যে, সে সত্য বলেছে। তাই আমি তার পক্ষে রায় দিই। বিচারে যদি আমি ভুলবশত অন্য কোনো মুসলমানের হক তাকে দিয়ে থাকি, তবে তা জাহান্নামের টুকরা।"[৩৩২]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—কখনো কাউকে তার কথার ওপর ভিত্তি করে সত্যবাদী মনে করতেন। তাহলে তিনি ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী কীভাবে হন?

কিয়ামতের দিনও নবিজি ﷺ ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী হবেন না। যা ফলে নবিজি ﷺ এমন ব্যক্তিকেও মুমিন এবং নিজের সাহাবি মনে করবেন, যে পরবর্তীকালে মুমিন ছিলেন না। যেমন এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.... أَلَا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ؛ فَيُقَالُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ.

"হজরত ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ... নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা জেনে রাখো, আমার কিছু উম্মতের কতগুলো লোককে হাজির করা হবে এবং তাদেরকে বাম দিকে অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে দেওয়া হবে। আমি তখন বলব, হে আমার রব! এরা তো আমার কতক সাহাবি। তখন বলা হবে যে, আপনার পর তারা কী নবোদ্ভাবিত কাজ করেছে তা আপনি জানেন না। এরপর পুণ্যবান বান্দা (হজরত ঈসা আ.) যেমন বলেছিলেন আমি তেমন বলব—

﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

"আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন তখন আপনি ছিলেন তাদের পর্যবেক্ষণকারী। আর আপনি সবকিছুর ওপর সাক্ষী।"

---

[৩৩২]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ২৪৫৮।

এরপর বলা হবে আপনি তাদেরকে ছেড়ে আসার পর থেকে তারা পেছনে ফিরে গিয়ে ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়ে গিয়েছিল।"[৩৩৩]

শাফাআতে কুবরার সময়ও নবিজি ﷺ-এর হামদ তথা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা স্মরণ হবে না। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে হামদ তথা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ইলহাম করবেন। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে একত্রিত করবেন... এরপর আমাকে বলা হবে তোমার মাথা উঠাও। চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উঠাব এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে যে প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে আমার রবের প্রশংসা করব।"[৩৩৪]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আমি তখন আমার রবের এমন হামদ ও সানা তথা প্রশংসা করব, যা আল্লাহ তাআলা আমাকে শিখিয়ে দেবেন। যা থেকে বুঝা যায় যে, নবিজি ﷺ ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের অধিকারী ছিলেন না।

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ থেকে জানা গেল, নবিজি ﷺ ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের অধিকারী ছিলেন না। তবে হ্যাঁ! এটা ঠিক যে, গায়েব বা অদৃশ্যের অনেক বিষয়েই নবিজি ﷺ-কে অবগত করা হয়েছে। যা পূর্বের ও পরের সকল ইলম বা জ্ঞান থেকে অধিক।

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী মনে করা কুফরি

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর প্রসিদ্ধ কিতাব *ফিকহে আকবার*। মোল্লা আলি কারি রহ. উক্ত কিতাবের ব্যাখ্যা লিখেছেন। যার নাম শরহে ফিকহে আকবার। তাতে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী মনে করবে সে কাফির। যেমন *শরহে ফিকহে আকবার* কিতাবে উল্লেখ রয়েছে—

---

৩৩৩. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪৬২৫; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৫৯৯৬

৩৩৪. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬৫৬৫

ثم اعلم ان الانبياء ﷺ لم يعلموا المغيبات من الاشياء الا ما علمهم الله تعالى احيانا، وذكر الحنيفة تصريحا بالتكفير باعتقاد ان النبى ﷺ يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ

"জেনে রেখো, নবিগণ গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ জানেন না। তবে হ্যাঁ! কখনো কখনো যতটুকু তাদের অবগত করা হয়েছে, তথটুকু জানতেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. এ কথাটি সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন—যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, নবিজি ﷺ গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ জানতেন, সে কাফির। কেননা, এর বিপরীতে আল্লাহ তাআলার বাণী রয়েছে—বলো, আল্লাহ ছাড়া আসমানসমূহে ও জমিনে যারা আছে তারা গায়েব জানে না।"[৩৩৫]

নবিজিকে অদৃশ্যের অনেক সংবাদই জানানো হয়েছে

নবিজি ﷺ-কে গায়েব তথা অদৃশ্যের অনেক সংবাদই জানানো হয়েছে। কিন্তু তা হলো আংশিক, পরিপূর্ণ নয়। ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রকার হলো, ওই ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান, যা গায়েব বা অদৃশ্যের কথা বা বিষয় ঠিকই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে জানিয়েছেন। নবিজি ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা যত কথা জানিয়েছেন, সেগুলো নবিজি ﷺ-এর জন্য প্রমাণিত। এই ইলম বা জ্ঞান প্রথমত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়ত হলো এই ইলম বা জ্ঞান আংশিক। আল্লাহ তাআলার সমস্ত ইলম বা জ্ঞান নয়। কিন্তু এই আংশিক ইলম বা জ্ঞানও কিন্তু একদম অল্প নয়। এত অধিক যে, পূর্বের ও পরের যত ইলম বা জ্ঞান রয়েছে, তা থেকেও অধিক। নবিজি ﷺ-কে গায়েব তথা অদৃশ্যের যে সংবাদ জানানো হয়েছে, তা ছিল ৭ প্রকার। যথা :

১. ওহির মাধ্যমে নবিজি ﷺ-কে গায়েবের কথা অবগত করা হতো।

২. আম্বাউল গায়েব তথা গায়েবের সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। তার মাধ্যমে গায়েবের কথা অবগত করা হতো।

৩. গায়েবের বিষয়টি নবিজি ﷺ-এর নিকট প্রকাশ করা হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসিরে এসেছে—এটা আংশিক ইলমে গায়েব। সমস্ত ইলমে গায়েব নয়।

---

৩৩৫. শরহে ফিকহে আকবার, ২৫৩ পৃষ্ঠা

৪. গায়েবের কিছু বিষয়ে নবিজি ﷺ-কে অবগত করা হয়েছে। এটাও নবিজি ﷺ-কে প্রদান করা হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসিরে এসেছে—এটা আংশিক ইলমে গায়েব। সমস্ত ইলমে গায়েব নয়।

৫. গায়েবের অনেক বিষয় এমন রয়েছে যা নবিজি ﷺ-এর সম্মুখে উন্মুক্ত করা হয়েছে। যেমন, মিরাজে নিয়ে নবিজি ﷺ-কে অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে।

৬. সালাতের মধ্যে জান্নাত এবং জাহান্নামের অনেক বস্তু দেখানো হয়েছে।

৭. গোটা জমিনকে নবিজি ﷺ-এর সম্মুখে উন্মুক্ত করা হয়েছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত নবিজি ﷺ দেখে নিয়েছেন। এগুলো সবই আংশিক গায়েব। সমস্ত গায়েব নয়, যা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই নির্ধারিত।

➡ওহির মাধ্যমে নবিজি ﷺ-কে গায়েবের কথা অবগত করা হতো।

এর দলিল হলো কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

"বলো, আমি রাসুলদের মধ্যে নতুন নই। আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমার প্রতি যা ওহি করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি।"[৩৩৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

"আর সে মনগড়া কথা বলে না। তা কেবল ওহি, যা তার প্রতি ওহিরূপে প্রেরণ করা হয়।"[৩৩৭]

➡ আম্বাউল গায়েব তথা গায়েবের সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। তার মাধ্যমে গায়েবের কথা অবগত করা হতো।

নিম্নের আয়াতসমূহে এটা সুস্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে—গায়েবের কিছু সংবাদ নবিজি ﷺ-এর নিকট ওহি প্রেরণ করা হয়েছে। সব সংবাদ নয়। যেমন, কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

---

[৩৩৬]. সুরা আহকাফ, ৪৬: ৯

[৩৩৭]. সুরা নাজম, ৫৩: ৩-৪

﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾

"এটি গায়েবের সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার প্রতি ওহি পাঠাচ্ছি।"[৩৩৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ﴾

"এগুলো গায়েবের সংবাদ, যা আমি তোমার কাছে ওহি করছি। তুমি তো তাদের নিকট ছিলে না।"[৩৩৯]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ﴾

"এগুলো গায়েবের সংবাদ, আমি তোমাকে ওহির মাধ্যমে তা জানাচ্ছি।"[৩৪০]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের বর্ণনামতে গায়েবের কিছু সংবাদ নবিজি ﷺ-এর নিকট ওহি প্রেরণ করা হয়েছে। সকল সংবাদ নয়। এটাকে বলা হয় আম্বাউল গায়েব।

➥ গায়েবের বিষয়টি নবিজি ﷺ-এর নিকট প্রকাশ করা হয়েছে।

এর দলিল হলো কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ﴾

"তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত রাসুল ছাড়া। আর তিনি তখন তার সামনে ও তার পেছনে প্রহরী নিযুক্ত করবেন। যাতে তিনি এটা জানতে পারেন যে, তারা তাদের রবের রিসালাত পৌঁছিয়েছে কিনা।"[৩৪১]

এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—নবিজি ﷺ-এর নিকট গায়েবের সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে।

---

৩৩৮. সুরা আলে ইমরান, ৩: ৪৪
৩৩৯. সুরা ইউসুফ, ১২: ১০২
৩৪০. সুরা হুদ, ১১: ৪৯
৩৪১. সুরা জিন, ৭২: ২৬-২৮

➡ গায়েবের কিছু বিষয়ে নবিজি ﷺ-কে অবগত করা হয়েছে। এটাও নবিজি ﷺ-কে প্রদান করা হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসিরে এসেছে—এটা আংশিক ইলমে গায়েব। সমস্ত ইলমে গায়েব নয়।

এর দলিল হলো কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ﴾

"আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদেরকে গায়েব সম্পর্কে জানাবেন। তবে আল্লাহ তাঁর রাসুলদের মধ্য থেকে যাকে চান বেছে নেন।"[৩৪২]

এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—আল্লাহ তাআলা নবিজি ﷺ-কে গায়েবের কিছু বিষয়ে অবগত করেছেন।

➡ গায়েবের অনেক বিষয় এমন রয়েছে যা নবিজি ﷺ-এর সম্মুখে উন্মুক্ত করা হয়েছে। যেমন মিরাজে নিয়ে নবিজি ﷺ-কে অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে।

এর দলিল হলো কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾

"পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন আল মাসজিদুল হারাম থেকে আল মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি।"[৩৪৩]

➡ সালাতের মধ্যে জান্নাত এবং জাহান্নামের অনেক বস্তু দেখানো হয়েছে। এর দলিল হলো হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُ لَكُمْ ... فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, লোকেরা নবিজি ﷺ-এর নিকট প্রশ্ন করত। এমনকি প্রশ্ন করতে করতে তারা তাঁকে বিরক্ত করে তুলত।

---

৩৪২. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৭৯

৩৪৩. সুরা বনি ইসরাইল, ১৭: ১

একদিন নবিজি ﷺ একদিন মিম্বারে আরোহণ করলেন এবং বললেন, তোমরা আজ আমাকে যে প্রশ্নই করবে, আমি তার উত্তর দেবো... নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আজকের মতো এত উত্তম বস্তু এবং এত খারাপ বস্তু আমি ইতঃপূর্বে কখনো দেখিনি। আমার সামনে জান্নাত ও জাহান্নামের ছবি পেশ করা হয়েছিল। এমনকি আমি উভয়টিকে দেয়ালের পাশেই দেখতে পাচ্ছিলাম।"[৩৪৪]

এই হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম—নবিজি ﷺ-এর সামনে জান্নাত এবং জাহান্নামকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি তা অত্যন্ত কাছে থেকে দেখেছেন।

➡ গোটা জমিনকে নবিজি ﷺ-এর সম্মুখে উন্মুক্ত করা হয়েছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত নবিজি ﷺ দেখে নিয়েছেন।

এর দলিল হলো হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا.

"হজরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা জমিনকে আমার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ পুরো জমিনকে একত্র করে আমার সম্মুখে নিয়ে এসেছেন) তাই আমি এর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত দেখে নিয়েছি।"[৩৪৫]

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ.... فَقَالَ: نَعَمْ؛ عُرِضَ عَلَيَّ مَا هُوَ كَائِنٌ؛ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَ أَمْرِ الْآخِرَةِ

"হজরত আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ একদিন সকালবেলা ... নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, দুনিয়া ও আখিরাতে যা (বড় বড় বিষয়) ঘটবে, তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।"[৩৪৬]

এই হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম, দুনিয়া ও আখিরাতের যত বড় বড় বিষয় ঘটবে, নবিজি ﷺ-এর সামনে তা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

---

[৩৪৪]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৭০৮৯

[৩৪৫]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৮৮৯

[৩৪৬]. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৫। হাদিসটির সনদ হাসান।

আর এটিও নবিজি ﷺ-এর সামনে গায়েবের কিছু বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। আর নবিজি ﷺ তা প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—এগুলো সবই আংশিক গায়েব। সমস্ত গায়েব নয়। আর তা সম্ভবও নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলার ইলম বা জ্ঞান হলো অসীম বা সীমাহীন। সুতরাং তা নবিজি ﷺ-কে কীভাবে প্রদান করবেন, যার ইলম বা জ্ঞান হলো সসীম বা সীমিত।

ওই সকল আয়াত যেগুলো থেকে নবিজি ﷺ-কে প্রদত্ত আংশিক ইলমে গায়েব পুরোপুরি ইলমে গায়েব হওয়ার আশঙ্কা হয়

কেউ কেউ নিম্নের আয়াতটির ﴿تِبۡيَانًا لِّكُلِّ شَيۡءٍ﴾ অংশটি দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, এই কিতাবে সবকিছু আছে। যার অর্থ হলো, নবিজি ﷺ-কে সকল ইলমে গায়েব প্রদান করা হয়েছে। যেমন কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنًا لِّكُلِّ شَيۡءٍ وَهُدًى وَرَحۡمَةً وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ﴾

“আর আমি তোমার ওপর কিতাব নাজিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।”[৩৪৭]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসিরে ﴿تِبۡيَٰنًا لِّكُلِّ شَيۡءٍ﴾-এর তাফসির করা হয়েছে—مِنَ الْحَلَالِ؛ وَالْحَرَامِ؛ وَالْأَمْرِ؛ وَالنَّهْيِ অর্থাৎ এই কিতাবে (কুরআনে) হালাল, হারাম, আদেশ ও নিষেধ এর বর্ণনা রয়েছে। সমস্ত ইলমে গায়েব নয়। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা সমস্ত ইলমে গায়েব প্রমাণ করা কঠিন।

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفۡتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصۡدِيقَ ٱلَّذِي بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَتَفۡصِيلَ كُلِّ شَيۡءٍ وَهُدًى وَرَحۡمَةً لِّقَوۡمٍ يُؤۡمِنُونَ﴾

“এটা কোন বানানো গল্প নয়; বরং তাদের পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী এবং প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ। আর হিদায়াত ও রহমত ওই কওমের জন্য যারা ঈমান আনে।”[৩৪৮]

---

[৩৪৭]. সুরা নাহল, ১৬: ৮৯
[৩৪৮]. সুরা ইউসুফ, ১২: ১১১

কেউ কেউ প্রমাণ পেশ করেছেন যে, পূর্বের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—নবিজি ﷺ-এর ওপর কুরআন নাজিল করেছেন এবং এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—কুরআনে যেহেতু প্রতিটি বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, তাহলে নবিজি ﷺ-কে সমস্ত ইলমে গায়েবই প্রদান করা হয়েছে।

কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসিরে বলা হয়েছে, এখানে প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হালাল-হারামের বিবরণ। সমস্ত ইলমে গায়েব নয়। কেননা তা এই কিতাবেও নেই। আর আল্লাহ তাআলার অসীম তথা সীমাহীন ইলম এই কিতাবে কীভাবে থাকবে।

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ﴾

"তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত রাসুল ছাড়া। আর তিনি তখন তার সামনে ও তার পেছনে প্রহরী নিযুক্ত করবেন। যাতে তিনি এটা জানতে পারেন যে, তারা তাদের রবের রিসালাত পৌঁছিয়েছে কিনা।"[৩৪৯]

এই আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করা সঠিক নয়। কেননা এই আয়াতে বলা হয়েছে— ﴿قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ﴾ "যাতে তিনি এটা জানতে পারেন যে, তারা তাদের রবের রিসালাত পৌঁছিয়েছে কিনা।" অর্থাৎ রাসুলের রিসালাত প্রকাশের জন্য যতটুকু ইলমে গায়েব প্রয়োজন, ততটুকু। সমস্ত ইলমে গায়েব নয়।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসিরে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—আল্লাহ তাআলা সমস্ত ইলমে গায়েব প্রদান করেননি। কিছু কিছু ইলমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ﴾

৩৪৯. সুরা জিন, ৭২: ২৬-২৮

"আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদেরকে গায়েব সম্পর্কে জানাবেন। তবে আল্লাহ তাঁর রাসুলদের মধ্য থেকে যাকে চান বেছে নেন।"[৩৫০]

এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, হে মক্কাবাসী! তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা গায়েব সম্পর্কে অবগত করবেন না। হ্যাঁ! নিজের রাসুলদের মধ্য হতে যাকে চান, তাকে গায়েবের কিছু বিষয়ে অবগত করেন।

এখানেও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসিরে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—আল্লাহ তাআলা নবিজি ﷺ-কে ওহির মাধ্যমে কিছু কিছু ইলমে গায়েব সম্পর্কে অবগত করেছেন। সমস্ত ইলমে গায়েব প্রদান করেননি।

আরও ইরশাদ করেন—

وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

"না কোনো ভেজা এবং না কোনো শুষ্ক কিছু; কিন্তু রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।"[৩৫১]

কেউ কেউ- كِتَابٍ مُّبِينٍ দ্বারা দলিল পেশ করেছেন— كِتَابٍ مُّبِينٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআনুল কারিম। আর কুরআনুল কারিম দেওয়া হয়েছে নবিজি ﷺ-কে। সুতরাং নবিজি ﷺ-কে সমস্ত ইলমে গায়েবই প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এই দলিল পেশ করা সঠিক নয়। কেননা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসিরে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে كِتَابٍ مُّبِينٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লাওহে মাহফুজ। যা নবিজি ﷺ-কে প্রদান করা হয়নি। এটা একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই রয়েছে এবং তাতে সকল বস্তু লিপিবদ্ধ করা আছে। আর লাওহে মাহফুজ যেহেতু নবিজি ﷺ-কে প্রদান করা হয়নি সুতরাং নবিজি ﷺ-কে সমস্ত ইলমে গায়েবও প্রদান করা হয়নি।

ওই সকল হাদিসসমূহ যেগুলো থেকে নবিজি ﷺ-এর ইলমে গায়েবের ওপর দলিল পেশ করা যায়

নিম্নে চারটি হাদিস রয়েছে। যেগুলোতে مَا كَانَ এবং مَا يَكُونُ শব্দদুটি উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ যা-কিছু ঘটেছে এবং কিয়াম পর্যন্ত যা-কিছু ঘটবে, সেগুলো সব নবিজি ﷺ সাহাবায়ে কেরামের সামনে বর্ণনা করেছেন। যার অর্থ হলো, নবিজি ﷺ সৃষ্টির জন্ম থেকে নিয়ে জান্নাত কিংবা জাহান্নামে প্রবেশ করা পর্যন্ত

---

[৩৫০]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৭৯
[৩৫১]. সুরা আনআম, ৬: ৫৯

সমস্ত গায়েবের বিষয়ে অবগত এবং নিম্নের হাদিসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়- مَا كَانَ এবং مَا يَكُوْنُ তথা যা-কিছু ঘটেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা-কিছু ঘটবে, সমস্ত ইলম নবিজি ﷺ-এর রয়েছে।

নিম্নের হাদিসসমূহ দ্বারা কেউ কেউ নবিজি ﷺ-এর জন্য ইলমে গায়েব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করলে, বুঝে আসে এই হাদিসসমূহে নবিজি ﷺ-কে বড় বড় ফিতনা সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে অথবা বড় বড় ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। যার আলোচনা নবিজি ﷺ সাহাবায়ে কেরামের সামনে করেছেন। কেননা ইলমে গায়েব হলো সীমাহীন। এ সবকিছু একদিনে কীভাবে বর্ণনা করেছেন? অন্য হাদিসে এর ব্যাখ্যা রয়েছে যে, নবিজি ﷺ হজরত হুজাইফা রা.-এর সম্মুখে কিয়ামত পর্যন্ত আগত ফিতনাসমূহের আলোচনা করেছেন।

আর এই হাদিসসমূহ দ্বারা যদি সকল ইলমে গায়েব উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তাহলে এ সকল হাদিস পূর্বে বর্ণিত আয়াতসমূহের বিপরীত হয়ে যাবে। যেগুলোতে উল্লেখ রয়েছে—নবিজি ﷺ-কে ইলমে গায়েব প্রদান করা হয়নি। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে-—

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، إِلَّا حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَؤُلَاءِ

"হজরত হুজাইফা রা.বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা-কিছু ঘটবে সবকিছু বর্ণনা করলেন। আমাদের মধ্যে কেউ তা মনে রেখেছে। আর কেউ তা ভুলে গেছে। আমার এই সাথি এ বিষয়টি জানে।"[৩৫২]

এই হাদিস থেকেও জানা গেল, কিয়ামত পর্যন্ত যা-কিছু ঘটবে নবিজি ﷺ সবকিছু বর্ণনা করেছেন।

অন্যান্যরা বলেন, এই হাদিসে বড় বড় ফিতনার আলোচনা করা হয়েছে। সমস্ত ইলমে গায়েবের নয়। কেননা এই হাদিসটি অপর একটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে বড় বড় ফিতনার কথা উল্লেখ রয়েছে। উক্ত সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি হলো—

---

৩৫২. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৮৯১

قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتْنَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ السَّاعَةِ

"হজরত হুজাইফা রা.বর্ণনা করেন, আমার এবং কিয়ামতের মধ্যখানে যত ফিতনা সংঘটিত হবে, আল্লাহর কসম! মানুষের মধ্যে আমি সে সম্পর্কে অধিক অবহিত।"[৩৫৩]

এজন্য এটা সমস্ত ইলমে গায়েব নয়। এই হাদিসসমূহে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত বড় বড় ফিতনাসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আরেক বর্ণনায় এসেছে—

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، فَمَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا قَدْ سَأَلْتُهُ

"হজরত হুজাইফা রা.বর্ণনা করেন, কিয়ামত পর্যন্ত যত ফিতনা সংঘটিত হবে, নবিজি ﷺ আমাকে তা অবগত করেছেন এবং আমিও সেগুলোর প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসা করেছি।"[৩৫৪]

অপর এক হাদিসে এসেছে—

حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ يَعْنِي عَمْرَو بْنَ أَخْطَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ، فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا

"হজরত আবু যায়েদ তথা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ফজরের সালাত পড়ালেন। তারপর মিম্বারে আরোহণ করে আমাদের সামনে ওয়াজ শুরু করলেন। যোহর পর্যন্ত ওয়াজ করলেন। অতঃপর মিম্বার থেকে নেমে যোহরের সালাত পড়ালেন। তারপর আবার ওয়াজ শুরু করলেন। আসর পর্যন্ত ওয়াজ করলেন। অতঃপর মিম্বার থেকে নেমে আসরের সালাত পড়ালেন। তারপর আবার মিম্বারে আরোহণ করে ওয়াজ শুরু করলেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমাদেরকে ওয়াজ করলেন। আর এই ওয়াজের মধ্যে যা-কিছু ঘটেছে এবং যা-কিছু ঘটবে সবই আমাদেরকে অবহিত করলেন। আমাদের

---

৩৫৩. প্রাগুক্ত

৩৫৪. প্রাগুক্ত

মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম হলেন তিনি, যিনি সবচেয়ে বেশি উক্ত নসিহতগুলো স্মরণ রেখেছেন।"[৩৫৫]

এই হাদিসে এসেছে—যা-কিছু ঘটেছে এবং যা-কিছু ঘটবে সবই অবহিত করেছেন। তাহলে এটা খুবই স্পষ্ট কথা—একদিনে গায়েবের সমস্ত বিষয় অবগত করা সম্ভব নয়। বরং বড় বড় ফিতনা এবং বড় বড় ঘটনাবলি সম্পর্কেই অবহিত করেছেন। এজন্য ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি ফিতনার অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। আর উক্ত অধ্যায়ে হজরত হুজাইফা রা.-এর হাদিস আগেই অতিবাহিত হয়েছে। যাতে বড় বড় ফিতনার কথা উল্লেখ রয়েছে। যা কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। নবিজি ﷺ তা আলোচনা করেছেন। তাতে সমস্ত ইলমে গায়েব নেই।

আরেক হাদিসে এসেছে—

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ

"তারিক ইবনে শিহাব রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হজরত উমর রা.-কে বলতে শুনেছি—নবিজি ﷺ আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি আমাদের সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে জ্ঞাত করলেন। অবশেষে তিনি জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীর নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করার কথাও উল্লেখ করলেন। যে ব্যক্তি এ কথাটি স্মরণ রাখতে পেরেছে, সে স্মরণ রেখেছে আর ভুলে যাবার সে ভুলে গেছে।"[৩৫৬]

এই হাদিসেও নবিজি ﷺ বড় বড় ফিতনা কিংবা বড় বড় ঘটনা সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন। কেননা একদিনে তো আর গায়েবের সমস্ত বিষয় অবহিত করা সম্ভব নয়।

আরেক হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُ لَكُمْ ... فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ

৩৫৫. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৮৯২
৩৫৬. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩১৯২

“হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, লোকেরা নবিজি ﷺ-এর নিকট প্রশ্ন করত। এমনকি প্রশ্ন করতে করতে তারা তাঁকে বিরক্ত করে তুলত। একদিন নবিজি ﷺ একদিন মিম্বারে আরোহণ করলেন এবং বললেন, তোমরা আজ আমাকে যে প্রশ্নই করবে, আমি তার উত্তর দেবো... নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আজকের মতো এত উত্তম বস্তু এবং এত খারাপ বস্তু আমি ইতঃপূর্বে কখনো দেখিনি। আমার সামনে জান্নাত ও জাহান্নামের ছবি পেশ করা হয়েছিল। এমনকি আমি উভয়টিকে দেয়ালের পাশেই দেখতে পাচ্ছিলাম।”[৩৫৭]

কেউ কেউ এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন—নবিজি ﷺ ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন যে, তোমরা যা জিজ্ঞেস করবে, সব বলব।

অন্যান্যরা এর জবাব দিয়েছেন—স্বয়ং এই হাদিসেই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা জান্নাত-জাহান্নামকে আমার সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। যার ফলে আমি বর্ণনা করেছি। সুতরাং এটা ইলমে গায়েব নয়; বরং এটা হলো ওহি। যা নবিজি ﷺ-এর ওপর বারবার নাজিল হতো। অথবা ইত্তিলাউল গায়েব তথা গায়েব সম্পর্কে অবহিতকরণ। যেহেতু এই হাদিসের মধ্যেই এই আয়াত রয়েছে যে, যদি কুরআন অবতীর্ণের সময় প্রশ্ন করো, তাহলে সব প্রকাশ করে দেওয়া হবে। যা থেকে বুঝা গেল যে, নবিজি ﷺ ওহির মাধ্যমেই অবহিত করতেন।

আরেক হাদিসে এসেছে—

عَنْ اَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ: أَصِبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ.... فَقَالَ: نَعَمْ؛ عُرِضَ عَلَيَّ مَا هُوَ كَائِنٌ؛ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَ أَمْرِ الْآخِرَةِ؛ فَجُمِعَ الْأَوَّلُوْنَ وَالْآخِرُونَ بِصَعِيْدٍ وَاحِدٍ؛ فَفَظِعَ النَّاسُ بِذٰلِكَ؛ حَتّٰى انْطَلَقُوا اِلٰى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .... وَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ؛ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ

“হজরত আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ একদিন সকালবেলা... নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, দুনিয়া ও আখিরাতে যা (বড় বড় বিষয়) ঘটবে, তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর একটি মাঠে পূর্বের ও পরের সকল লোককে একত্রিত করা হবে। সবাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে হজরত আদম আ.-এর

---

[৩৫৭]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৭০৮৯

নিকট যাবে... আল্লাহ তাআলা বলবেন, আপনার মাথা উঠান। আপনি বলুন কি চান। আপনি যা বলবেন তা-ই শোনা হবে। আর সুপারিশ করলে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।"[৩৫৮]

এই হাদিস দ্বারাও কেউ কেউ দলিল পেশ করেছেন, নবিজি ﷺ ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কেননা এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখিরাতে যা (বড় বড় বিষয়) ঘটবে, তা সব আমার সামেনে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং নবিজি ﷺ সকল বিষয়ে ইলমে গায়েবের অধিকারী ছিলেন।

অন্যান্যরা এর জবাব দিয়েছেন, সম্পূর্ণ হাদিসটি দেখলে বুঝা যায় যে, এই হাদিসে বড় বড় কিছু বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে কিয়ামতের দিন কীভাবে হজরত আদম আ. ও অন্য নবিদের নিকট মানুষ যাবে এবং কীভাবে নবিজি ﷺ শাফাআতে কুবরা করবেন তার আলোচনা। গায়েবের সমস্ত বিষয় নয়।

আরেক হাদিসে এসেছে—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، أَوْ قَالَ: فِي نَحْرِي، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فِي الْكَفَّارَاتِ، وَالْكَفَّارَاتُ: الْمُكْثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আজ রাতে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত আকর্ষণীয়রূপে আমার নিকট এসেছে। বর্ণনাকারী বলেন, নবিজি ﷺ সম্ভবত স্বপ্নের কথা বলেছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি জানেন যে, মালাউন আলা তথা উচ্চমর্যাদাশীল ফেরেশতাগণ পরস্পর কি নিয়ে তর্ক করছে? আমি বললাম, জি না। আমি জানি না। আল্লাহ তাআলা তখন নিজের হাত আমার দুই কাঁধের মাঝখানে রাখলেন। যার শীতল স্পর্শ আমি আমার বুকের মাঝে

---

[৩৫৮]. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৫। হাদিসের সনদ হাসান। হাদিসটি আরও সুদীর্ঘ। অধিক লম্বা হয়ে যাবে বিধায় এখানে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যগুলো আনা হয়েছে। এবং সুদীর্ঘ এই হাদিসটির কিছু অংশ *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণনায় পাওয়া যায়। ইমাম আবু ইয়ালা ও বাযযার তাদের মুসনাদেও এই মর্মে একই হাদিস বর্ণনা করেছেন। এবং সকলের বর্ণিত রাবিই 'সিকাহ'।

বা সিনায় অনুভব করলাম। অতঃপর আমি আসমান ও জমিনে যা-কিছু আছে সব জেনে গেলাম। আল্লাহ তাআলা তখন জিজ্ঞেস করলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি জানেন যে, মালাউন আলা তথা উচ্চমর্যাদাশীল ফেরেশতাগণ পরস্পর কি নিয়ে তর্ক করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ! কাফফারার দ্বারা গুনাহ মিটে যাওয়া বস্তুসমূহ এবং সালাতের পরে মসজিদে অবস্থান করার সাওয়াব সম্পর্কে বিতর্ক করছে।"[৩৫৯]

এখানে মূলত এ সংক্রান্ত তিনটি হাদিস রয়েছে। যথা :

এই হাদিসে এসেছে—فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ তথা আমি আসমান ও জমিনে যা-কিছু আছে সব জেনে গেলাম।

এর পরের হাদিসে এসেছে— فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ তথা জমিনের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে যা-কিছু আছে সব জেনে গেলাম।

এর পরের হাদিসে এসেছে— فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ তথা আমার সম্মুখে সবকিছু উন্মুক্ত করা হলো এবং আমি সব দেখলাম।

কেউ কেউ উপর্যুক্ত তিনও হাদিস দ্বারা নবিজি ﷺ-এর জন্য সমস্ত ইলমে গায়েব প্রমাণ করেন।

অন্যান্যরা এই হাদিস সম্পর্কে চারটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা :

১. এই হাদিসটি ওপরে বর্ণিত আয়াতের বিপরীত। যে আয়াতে বলা হয়েছে—আমি ইলমে গায়েবের অধিকারী নই।

২. দ্বিতীয়ত হলো এই হাদিসে—لَا أَدْرِي তথা আমি জানি না বাক্যটি রয়েছে। সুতরাং নবিজি ﷺ ইলমে গায়েবের অধিকারী কীভাবে হন?

৩. তৃতীয়ত হলো—নবিজি ﷺ কে সমস্ত ইলমে গায়েব দেওয়া হয়নি। বরং মালাউন আলা তথা উচ্চমর্যাদাশীল ফেরেশতাগণ সম্পর্কে কিছু রহস্য প্রকাশ করা হয়েছে। আর তা হলো মালাউন আলা তথা উচ্চমর্যাদাশীল ফেরেশতাগণ পরস্পর কি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছে। নবিজি ﷺ যেন নিজের উম্মতকে এ সকল নেক কাজ সম্পর্কে জানাতে পারেন।

৪. চতুর্থত হলো—এই হাদিসটি স্বপ্ন-সংক্রান্ত হাদিস।

আরেক হাদিসে এসেছে—

---

৩৫৯. *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ৩২৩৩; *মুসনাদে আহমাদ*, ২২১৬২। হাদিসের সনদ সহিহ।

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا

"হজরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা জমিনকে আমার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ পুরো জমিনকে একত্র করে আমার সম্মুখে নিয়ে এসেছেন) তাই আমি এর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত দেখে নিয়েছি এবং যে পর্যন্ত জমিন আমাকে দেখানো হয়েছে, সে পর্যন্ত আমার উম্মতের রাজত্ব পৌঁছে যাবে।"[৩৬০]

এই হাদিস দ্বারাও ইলমে গায়েব প্রমাণ করা হয়।

অথচ এই হাদিসে নবিজি ﷺ-এর একটি মুজিযার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের জমিনকে নবিজি ﷺ-এর সম্মুখে উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং নবিজি ﷺ তা দেখে নিয়েছেন। কিন্তু এই হাদিসে সুস্পষ্ট যে, পূর্ব ও পশ্চিমের বস্তু দেখেছেন। শুধু পূর্ব ও পশ্চিমের বস্তু দেখা সমস্ত ইলমে গায়েব নয়। বরং এটা হলো আংশিক। যা নবিজি ﷺ কে জানানো হয়েছে।

দ্বিতীয় কথা হলো, এখানে زُوِيَ শব্দটি অতীতকালবাচক ক্রিয়া। যার অর্থ হলো, একবারই এমন করা হয়েছিল। আর না হয় নবিজি ﷺ যদি সর্বদা ইলমে গায়েবের অধিকারী হতেন, তাহলে নবিজি ﷺ-এর সামনে জমিনকে উন্মুক্ত করার অর্থ কি? তা তো সর্বদা নবিজি ﷺ-এর সামনেই আছে। সুতরাং এই হাদিস দ্বারা ইলমে গায়েব প্রমাণিত হয় না। বরং কোনো কোনো বিষয় নবিজি ﷺ-কে জানানো হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! আপনি নিজেও একটু ভাবুন।

আরেক হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ

"হজরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন— নিশ্চয় আমি (অদৃশ্য জগতের) যা-কিছু দেখি তোমরা তা দেখো না, আর আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না।"[৩৬১]

---

৩৬০. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৮৮৯

৩৬১. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২৩১২। হাদিসটি সনদ হাসান।

এই হাদিস দ্বারাও কেউ কেউ ইলমে গায়েবের ওপর দলিল পেশ করেছেন—কিন্তু এই হাদিস দ্বারাও সমস্ত ইলমে গায়েব প্রমাণিত হয় না। বরং আল্লাহ তাআলার কোনো কোনো ইলমে গায়েব, যা নবিজি ﷺ-কে অবহিত করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে বুঝা গেল—নবিজি ﷺ ইলমে গায়েবের অধিকারী ছিলেন না।

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ কি যায়েদের সর্বাবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত?

৩. ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের তৃতীয় প্রকার হলো, ওই ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান, যেমন যায়েদের খাওয়া-দাওয়া, রোগ-আরোগ্য, সন্তান, জীবন-মৃত্যু ও লাভ-ক্ষতির ইলম বা জ্ঞান। এই ইলম বা জ্ঞান কি নবিজি ﷺ-এর ছিল?

এ সম্পর্কে তো সুস্পষ্ট আয়াতই রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ

"বলো, আমি রাসুলদের মধ্যে নতুন নই। আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমার প্রতি যা ওহি করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি।"[৩৬২]

এই আয়াতে নবিজি ﷺ নিজে ঘোষণা দিচ্ছেন— আমার নিজেরও জানা নেই যে, আমার সঙ্গে কি হবে এবং তোমাদেরও জানা নেই যে, তোমাদের সঙ্গে কী হবে। তাহলে যায়েদের অবস্থা সম্পর্কে নবিজি ﷺ কীভাবে জানবেন?

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا

"এগুলো গায়েবের সংবাদ, আমি তোমাকে ওহির মাধ্যমে তা জানাচ্ছি। ইতঃপূর্বে তা না তুমি জানতে এবং না তোমার কওম।"[৩৬৩]

নোট : এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজে বলেছেন যে, হে নবি! আপনি কিছুই জানতেন না এবং না আপনার কওম কিছু জানত। তাহলে যায়েদের অবস্থা সম্পর্কে নবিজি ﷺ কীভাবে জানবেন?

---

৩৬২. সুরা আহকাফ, ৪৬: ৯
৩৬৩. সুরা হুদ, ১১: ৪৯

হিন্দুদের বিশ্বাস হলো—তাদের দেব-দেবতাগণ অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী

হিন্দুদের একটি বিশেষ আকিদা বা বিশ্বাস হলো, তাদের ঋষি-মুনি তথা তাদের বড় ওলি, যে মারা গেছে এবং দেব-দেবতাগণ আলিমুল গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী এবং তাদের প্রয়োজনসমূহ শুনে সাহায্যও করে থাকে। এজন্যই এগুলোর মূর্তি বানায় এবং এগুলোর পূজা-উপাসনা করে এবং এগুলোর নিকট নিজের প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করে।

মূল কথা হলো, মুসলিমদের ব্যতীত আরও অনেক জাতির অকিদা বা বিশ্বাস হলো, তাদের ওলি কিংবা রাহবার তথা পথপ্রদর্শকগণ ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ জানেন এবং আমাদের সাহায্যও করতে পারেন। এ কারণেই তারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি ও দেব-দেবতা এবং নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যেরও পূজা-উপাসনা করে থাকে এবং এদের নিকট সাহায্যও প্রার্থনা করে থাকে। এজন্য আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারিমে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন—আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কেউ ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী নয়। যেন না তাদের ইবাদত করে এবং না তাদের নিকট নিজের প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করে।

প্রিয় পাঠক! বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখুন।
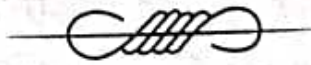
একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা

এ আকিদা সম্পর্কে ৩৭টি আয়াত এবং ৪টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

সাহায্য প্রার্থনা দুই প্রকার। যথা :

১. কেউ যদি সামনে উপস্থিত থাকে, তাহলে তার নিকট সাহায্য চাওয়া যাবে। এতে কোনো সমস্যা নেই। এটা জায়েয বা বৈধ। যেমন, নবিজি ﷺ-এর নিকট সাহাবায়ে কেরাম দুআ চাওয়া। অথবা নবিজি ﷺ-এর নিকট সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন বস্তু চাওয়া। অথবা কিয়ামতের দিন নবিজি ﷺ যখন মানুষের সামনে থাকবেন তখন নবিজি ﷺ-এর নিকট সুপারিশের আবেদন করবে। অথবা ডাক্তারকে বলা যে, আপনি আমার চিকিৎসা করে দিন। অথবা মায়ের নিকট বলা যে, আমাকে খাবার দিন।

ওই দুআ কিংবা সাহায্য যা নবিজি ﷺ-এর নিকট তাঁর জীবদ্দশায় চেয়েছেন এবং কুরআন ও হাদিসে তা উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা কেউ কেউ দলিল পেশ করেছেন—মৃত্যুর পরেও নবিজি ﷺ-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয। বস্তুত মৃত্যুর পরের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মৃত্যুর পরে সাহায্য প্রার্থনার জন্য সুস্পষ্ট কোনো আয়াত কিংবা হাদিস থাকতে হবে।

২. দ্বিতীয় প্রকার হলো—একজন ব্যক্তি মৃত। সে সামনে উপস্থিত নেই। এখন তার সম্পর্কে এই ধারণা করা যে, সে আমাদের কথা শুনছে এবং আমরা যা-কিছু চাইব সে তা দিয়ে দেবে। এটা জায়েয নেই। কেননা, এমন সাহায্য একমাত্র আল্লাহ তাআলাই করতে পারেন।

কোনো মৃতের নিকট সাহায্য চাওয়ার পূর্বে ৪টি প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি

সাহায্য প্রার্থনার পূর্বে ৪টি প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি। প্রশ্নগুলো হলো :

ক. প্রথম প্রশ্ন হলো, আমরা যে মৃতের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, সে আমাদের কথা শুনে কিনা? মৃতের শ্রবণ নিয়ে অনেক মতবিরোধ রয়েছে।

এক দলের অভিমত হলো, মৃতব্যক্তি শুনে না। কেননা, কুরআনুল কারিমের ঘোষণা—

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾

"আর জীবতরা ও মৃতরা এক নয়; নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনাতে পারেন, কিন্তু যে ব্যক্তি কবরে আছে তাকে তুমি শুনাতে পারবে না।"[৩৬৪]

এই আয়াতে বলা হয়েছে—হে নবি আপনি মৃতকে শুনাতে পারবেন না।

আর অপর দলের অভিমত হলো, আমরা শুনাতে পারব না। তবে হ্যাঁ! আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে কোনো কথা মৃতকে শুনাতে পারেন। আর এর দলিল হলো, নবিজি ﷺ আবু জাহাল এবং আবু লাহাবকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, তোমরা কি সেই বস্তু পেয়ে গেছ, তোমাদের সঙ্গে যার অঙ্গীকার করা হয়েছিল?

এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে এসেছে—

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ, قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ, فَقَالَ: وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، فَقِيلَ لَهُ: تَدْعُو أَمْوَاتًا، فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ

"হজরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ গর্তবাসীদের (যে কূপে বদরের যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের নিক্ষেপ করা হয়েছিল) দিকে ঝুঁকে দেখে বললেন, তোমাদের সঙ্গে রব যে ওয়াদা করেছিলেন, তা তোমরা বাস্তবে পেয়েছ তো? তখন তাকে বলা হলো, আপনি মৃতদের ডেকে কথা বলছেন? (ওরা কি শুনতে পায়?) নবিজি ﷺ তখন বললেন, তোমরা তাদের চেয়ে অধিক শুনতে পাও না, তবে তারা জবাব দিতে পারছে না।"[৩৬৫]

এই হাদিসের ভাষ্যমতে মৃতরা শুনতে পায়।

যেহেতু মৃতের শোনা নিয়েই মতবিরোধ রয়েছে, সুতরাং আমরা মৃতের নিকট কীভাবে চাইব?

খ. দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, আমরা চাইলেই কি মৃতব্যক্তি আমাদের সাহায্য করতে পারবে? যেখানে হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ

---

[৩৬৪]. সুরা ফাত্বির, ৩৫: ২২

[৩৬৫]. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৩৭০

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়।"[৩৬৬]

মৃত্যুর পরে মৃতব্যক্তি দুনিয়ার কোনো কাজ করতে পারে না। যার থেকে বুঝা যায় যে, তারা আমাদের সাহায্য করার কোনো ক্ষমতা নেই।

গ. তৃতীয় প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তাআলা কিংবা রাসুল ﷺ কি আমাদেরকে মৃতদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার কোনো নির্দেশ দিয়েছেন? অথবা এমন সাহায্য প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন কিনা?

এই তৃতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে ৩০টি আয়াত এবং ৩টি হাদিস সামনে আসবে যে-সকল আয়াত এবং হাদিসসমূহে এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো না।

প্রিয় পাঠক! আপনি নিজেও উক্ত আয়াত এবং হাদিসসমূহের ওপর চিন্তা-ভাবনা করবেন।

ঘ. চতুর্থ প্রশ্ন হলো, হিন্দুরাও এক আল্লাহকেই মানে। যাকে তারা কৃষ্ণ, ভগবান ইত্যাদি বলে থাকে। কিন্তু তার পাশাপাশি অন্য দেব-দেবীদের নিকটও সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে।

সুতরাং আপনিও যদি আল্লাহ তাআলা ব্যতীত নবিদের নিকট, ওলিদের নিকট এবং অন্যান্য লোকদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাহলে হিন্দুদের মধ্যে আর আপনার বিশ্বাসের মধ্যে কি পার্থক্য রইল?

দুআ একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই করা উচিত

গায়েব তথা অনুপস্থিত কারও কাছে যদি সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়, তাহলে একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

"আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই।"[৩৬৭]

এই আয়াতে হসর তথা একমাত্র এর অর্থ প্রদানপূর্বক বলা হয়েছে—আমরা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।

---

৩৬৬. *সহিহ মুসলিম*, ১৬৩১; *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ১৩৭৬; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ৩৬৫১

৩৬৭. সুরা ফাতিহা, ১: ৫

দিন-রাত ফরজ সালাত ১৭ রাকাতে কমপক্ষে ১৭ বার একজন মুমিনকে দিয়ে এটা বলানো হয় যে, আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি এবং একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। এজন্য অন্য আর কারও ইবাদত করাও জায়েয নেই এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনাও জায়েয নেই। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ﴾

"তবে কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? বরং তাকেই তোমরা ডাকবে।"[৩৬৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

"আর নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে ডেকো না।"[৩৬৯]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ﴾

"আর আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকো তারা খেজুরের আঁটির আবরণেরও মালিক নয়।"[৩৭০]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾

"বলো, নিশ্চয় আমি আমার রবকে ডাকি এবং তার সঙ্গে কাউকে শরিক করি না।"[৩৭১]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾

---

৩৬৮. সুরা আনআম, ৬: ৪০-৪১
৩৬৯. সুরা জিন, ৭২: ১৮
৩৭০. সুরা ফাত্বির, ৩৫: ১৩
৩৭১. সুরা জিন, ৭২: ২০

"আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী কেউ নেই।"[৩৭২]

আরও ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾

"আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো ক্ষতি পৌঁছান, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই।"[৩৭৩]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে হসর এবং তাকিদ তথা একমাত্র এবং গুরুত্বের অর্থ প্রদানপূর্বক বর্ণনা করা হয়েছে—একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই ডাকো এবং তাঁর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করো। তাহলে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা কীভাবে জায়েয হবে?

নিম্নের আয়াতসমূহে হসর এবং তাকিদ তথা একমাত্র এবং গুরুত্বের অর্থ প্রদানপূর্বক বর্ণনা করা হয়েছে—সাহায্য একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

"আর সাহায্য কেবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে।"[৩৭৪]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

"এবং সাহায্য তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৩৭৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾

"আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।"[৩৭৬]

---

[৩৭২]. সুরা আনআম, ৬: ১৭
[৩৭৩]. সুরা ইউনুস, ১০: ১০৭
[৩৭৪]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১২৬
[৩৭৫]. সুরা আনফাল, ৮: ১০
[৩৭৬]. সুরা বাকারা, ২: ১০৭

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾

“এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।”[৩৭৭]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾

“আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং কোনো সাহায্যকারীও নেই।”[৩৭৮]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে হসর এবং তাকিদ তথা একমাত্র এবং গুরুত্বের অর্থ প্রদানপূর্বক বর্ণনা করা হয়েছে—আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো সাহায্যকারী ও অভিভাবক নেই। এজন্য আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত নয়।

প্রিয় পাঠক! উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের ওপর আপনি নিজেও একটু ভাবুন।

নবিজিকে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে আমি নিজেও লাভ-ক্ষতির মালিক নই

নিম্নের আয়াতসমূহে নবিজি ﷺ-কে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমি নিজেও লাভ-ক্ষতির মালিক নই। সুতরাং মানুষ যেন নবিজি ﷺ-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা না করে। আর যেখানে নবিজি ﷺ-এর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে অন্য কারও নিকট সাহায্য প্রার্থনার অনুমতি কীভাবে থাকতে পারে?

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

“বল, আমি আমার নিজের কোনো উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান।”[৩৭৯]

---

[৩৭৭]. সুরা আনকাবুত, ২৯: ২২
[৩৭৮]. সুরা শুরা, ৪২: ৩১
[৩৭৯]. সুরা আরাফ, ৭: ১৮৮

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

"বলো, আমি নিজের ক্ষতি বা উপকারের অধিকার রাখি না, তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন।"[৩৮০]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾

"বলো, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য না কোনো অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখি এবং না কোনো কল্যাণ করার।"[৩৮১]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে নবিজি ﷺ-কে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—বলে দিন, আমি নিজেও লাভ-ক্ষতির মালিক নই।

আর এর অন্যতম একটি কারণ হলো, হিন্দুরা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত দেব-দেবতাকে লাভ-ক্ষতির মালিক মনে করে। এজন্য তারা আল্লাহ তাআলাকে ছেড়ে দেব-দেবীর পূজা করে শিরকে লিপ্ত হয়েছে।

নিম্নের আয়াতসমূহেও ঘোষণা করা হয়েছে—নবিজির কোনো ক্ষমতা নেই

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾

"এ বিষয়ে তোমার কোনো অধিকার নেই—হয়তো তিনি তাদের ক্ষমা করবেন অথবা তিনি তাদের আজাব দেবেন। কারণ নিশ্চয় তারা জালিম।"[৩৮২]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾

"আর কোনো কিছুর ব্যাপারে তুমি মোটেই বলবে না যে, নিশ্চয় আমি তা আগামীকাল করব, তবে আল্লাহ যদি চান।"[৩৮৩]

---

[৩৮০]. সুরা ইউনুস, ১০: ৪৯

[৩৮১]. সুরা জিন, ৭২: ২১

[৩৮২]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১২৮

[৩৮৩]. সুরা কাহাফ, ১৮: ২৩-২৪

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

"নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে তুমি হিদায়াত দিতে পারবে না; বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন। আর হিদায়াতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনি ভালো জানেন।"[৩৮৪]

উপর্যুক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—নবিজি ﷺ চাইলেই কাউকে হিদায়াত দিতে পারবেন না। যতক্ষণ আল্লাহ তাআলা না চাইবেন। নবিজি ﷺ-কে হিদায়াতের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে। তারপরও যখন নবিজি ﷺ চাইলেই হিদায়াত দিতে পারবেন না, তাহলে অন্যান্য বস্তু কীভাবে হিদায়াত দেবে? আর আমরাও কীভাবে তাদের নিকট সাহায্য চাইতে পারি?

নিম্নের আয়াতসমূহেও বলা হয়েছে—তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাকেই ডাকো, সে তো নিজেরই সাহায্য করতে পারে না, তাহলে তোমাদেরকে কীভাবে সাহায্য করবে?

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ﴾

"আর তাঁকে ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাকো তারা তোমাদের সাহায্য করতে পারে না এবং তারা নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না।"[৩৮৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ﴾

"আর যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে, তারা তাদের ডাকে সামান্যও সাড়া দিতে পারে না।"[৩৮৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

---

[৩৮৪]. সুরা কাসাস, ২৮: ৫৬

[৩৮৫]. সুরা আরাফ, ৭: ১৯৭

[৩৮৬]. সুরা রা'দ, ১৩: ১৪

"নিশ্চয় আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, অবশ্যই তা বাতিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ তো সমুচ্চ, সুমহান।"[৩৮৭]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

"বলো, আল্লাহ যদি তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে চান কিংবা কোনো উপকার করতে চান, তবে কে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমাদের জন্য কোনো কিছুর মালিক হবে? বরং তোমরা যে আমল করো আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।"[৩৮৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾

"বলো, তাদেরকে ডাকো, আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে (উপাস্য) মনে করো। তারা তো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না।"[৩৮৯]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾

"আর তোমাদের কাছে যেসব নিয়ামত আছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতঃপর দুঃখ-দুর্দশা যখন তোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা শুধু তার কাছেই ফরিয়াদ করো।"[৩৯০]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ﴾

"আর যখন মানুষকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে শুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে। অতঃপর আমি যখন তার বিপদ দূর করে দিই, তখন সে এমনভাবে চলতে থাকে মনে হয় যেন তাকে কোনো বিপদ স্পর্শ করার কারণে সে আমাকে ডাকেনি।"[৩৯১]

---

[৩৮৭]. সুরা হাজ্জ, ২২: ৬২
[৩৮৮]. সুরা ফাতহ, ৪৮: ১১
[৩৮৯]. সুরা বনি ইসরাইল, ১৭: ৫৬
[৩৯০]. সুরা নাহল, ১৬: ৫৩
[৩৯১]. সুরা ইউনুস, ১০: ১২

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

"আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিই, যখন সে আমাকে ডাকে।"[৩৯২]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

"আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আর আমি তার গলার ধমনী হতেও অধিক কাছে।"[৩৯৩]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

"আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেবো। নিশ্চয় যারা অহংকার বশত আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৩৯৪]

এই আয়াতে তো অত্যন্ত কঠোরভাবেই বলা হয়েছে—যে আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে না, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

"তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা দ্বীনকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করে তাঁকে ডাকো।"[৩৯৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ﴾

---

[৩৯২]. সুরা বাকারা, ২: ১৮৬
[৩৯৩]. সুরা ক্বাফ, ৫০: ১৬
[৩৯৪]. সুরা গাফির, ৪০: ৬০
[৩৯৫]. প্রাগুক্ত, ৬৫

"যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তবে তোমাদের ওপর বিজয়ী কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেন তবে কে এমন আছে যে, তোমাদেরকে এরপরে সাহায্য করবে?"[৩৯৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾

"বরং আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি উত্তম সাহায্যকারী।"[৩৯৭]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে—একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করো। এজন্য আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয নেই।

হাদিস শরিফেও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করার

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, তোমারা তোমাদের প্রতিটি প্রয়োজনে নিজের রবের নিকটই সাহায্য চাও। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তাও আল্লাহ তাআলার নিকটই চাও।"[৩৯৮]

এই হাদিসে বলা হয়েছে—সকল প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার নিকটই চাওয়া উচিত।

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যখন আমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হতো নবিজি ﷺ তখন তাঁর ডান হাত দ্বারা অসুস্থ ব্যক্তির শরীর মাসেহ করতেন আর এই দুআ পাঠ করতেন—

---

৩৯৬. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৬০

৩৯৭. প্রাগুক্ত, ১৫০

৩৯৮. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৬০৪। হাদিসের সনদ হাসান লি গাইরিহি।

أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

হে মানুষের রব! তুমি রোগ দূর করে দাও এবং আরোগ্য দান করো। তুমিই তো আরোগ্যদানকারী, তোমার আরোগ্য ভিন্ন আর কোনো আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য দাও, যারপর কোনো রোগ থাকে না।"[৩৯৯]

এই হাদিসে একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই আরোগ্য কামনা করা হয়েছে।

কিয়ামতের দিনও নবিজি ﷺ আল্লাহ তাআলার নিকটই চাইবেন এবং আল্লাহ তাআলা দেবেন

হাদিসে শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا....ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ، فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، حَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ، إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন মানুষ বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের নিকট কারও সুপারিশ নিয়ে যেতে পারি, তাহলে মনে হয় অনেক উপকার হতে পারে। সম্ভবত আমরা এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারি।... অতঃপর বলবেন আপনি মাথা উঠান এবং বলুন আপনি কি চান? আমি তা-ই দেবো। তখন আমি সুপারিশ করার অনুমতি করব। তখন সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তখন আমার রবের এমন হামদ ও সানা তথা প্রশংসা করব, যা আল্লাহ তাআলা আমাকে শিখিয়ে দেবেন। অতঃপর আমি সুপারিশ করব। আর তখন আমার জন্য সুপারিশের সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে এবং আমি মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ব। এভাবে তৃতীয় কিংবা চতুর্থবার জাহান্নামে শুধু ওই সকল লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে, যাদেরকে কুরআন বাধা দিয়েছে তথা যাদেরকে কুরআনুল কারিম চিরস্থায়ী

---

৩৯৯. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৫৭৫০; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২১৯১; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩৮৮৩; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৬১৯; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৫৬৫

জাহান্নামি হওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে। অর্থাৎ শুধু কাফিররাই জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে।"[৪০০]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে নবি আপনি চান। আমি দেবো। যার অর্থ হলো, কিয়ামতের দিনও নবিজি ﷺ-এর কোনো ক্ষমতা থাকবে না। বরং নবিজি ﷺ চাইবেন এবং আল্লাহ তাআলা দেবেন। তিনি শাফাআত চাইবেন আর আল্লাহ তাআলা দেবেন।

একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত

ইমাম গাজালি রহ. তাঁর 'কাওয়ায়েদুল আকাইদ' গ্রন্থে লিখেন—

فالله وحده هوالذى يتقرب اليه المسلم بعبادته وبخضوعته- ومن الله وحده يستمد المسلم العون ويطلب الهداية- هذا هو المعنى الذى يعينه المسلم كلما قرأ قول الله تعالى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তাআলাই এমন সত্তা যার ইবাদত করে এবং তাঁর সামনে নত হয়ে মুসলমান তাঁর নৈকট্য অর্জন করে থাকে। মুসলমান যখনই إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ তথা "আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই।" পাঠ করে, তখন এটাই উদ্দেশ্য হয় এবং এই উদ্দেশ্য গ্রহণ করা মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব।

উপর্যুক্ত বক্তব্যে এবং আয়াতে এটাই বর্ণিত হয়েছে—একমাত্র আল্লাহ তাআলারই ইবাদত করা উচিত এবং একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা উচিত। এটাই তাওহিদ।

নিম্নের আয়াত এবং হাদিসসমূহ থেকে আশঙ্কা হয়—ইন্তেকালের পরেও নবিজি ﷺ-এর নিকট চাওয়ার অনুমতি রয়েছে

প্রথম কথা হলো, পেছনে উল্লেখিত আয়াতসমূহে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার নিকটই চাইবে। আর নিচের আয়াতসমূহে যে সাহায্য প্রার্থনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ছিল নবিজি ﷺ-এর জীবদ্দশায়। নবিজি ﷺ তখন জীবিত ছিলেন। সামনাসামনি ছিলেন। তাই তখন নবিজি ﷺ-এর নিকট চাওয়ার গুরুত্ব ছিল। অথবা কিয়ামতের দিন যখন উম্মত নবিজি ﷺ-এর সামনাসামনি হবে, তখন নবিজি ﷺ-এর

---

[৪০০]. *সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬৫৬৫*

নিকট সুপারিশ করার জন্য বলবে। অথবা হাউজে কাউসারের পানি চাইবে। আর এগুলো সবকিছুই জায়েয।

এখন প্রশ্ন হলো, নবিজি ﷺ-এর মৃত্যুর পরেও কি আমাদের নবিজি ﷺ-এর নিকট চাওয়ার অনুমতি আছে? অথবা কোনো ওলি কিংবা সাহাবির নিকট চাওয়ার অনুমতি আছে? এ সম্পর্কে কোনো আয়াত এবং হাদিস আমি পাইনি। যে আয়াত এবং হাদিস পাওয়া যায়, তা হলো নবিজি ﷺ-এর জীবদ্দশার। অথবা কিয়ামতের দিন যখন উম্মত নবিজি ﷺ-এর সামনে থাকবেন তখনকার সময়ের। গায়েব বা অনুপস্থিতে চাওয়ার কোনো হাদিস আমি পাইনি। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾

"আর যদি তারা, যখন নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল তখন তোমার কাছে আসত, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসুলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পেত।"[৪০১]

নোট : এই আয়াতে নবিজি ﷺ-এর নিকট ইস্তিগফার করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। যার ফলে বুঝা গেল—নবিজি ﷺ-এর নিকট চাইতে পারবে। কিন্তু এই চাওয়াটা ছিল নবিজি ﷺ-এর জীবদ্দশায়। যা সকলের নিকটই জায়েয।

আরও এরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾

"তোমাদের সাহায্যকারী কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে বিনীত হয়ে।"[৪০২]

এই আয়াত দ্বারা কেউ কেউ দলিল পেশ করেছেন—এই আয়াতে যেহেতু বলা হয়েছে, রাসুল সাহায্যকারী এবং সালাত কায়েমকারীও সাহায্যকারী, সুতরাং আমরা তাদের নিকট সাহায্য চাইতে পারি। কিন্তু তাফসিরের মধ্যে এটা সুস্পষ্ট রয়েছে—আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তার সাথি ইহুদি ছিল। যখন সে মুসলমান হয়েছে তখন তার আত্মীয়স্বজনরা মুখ ফিরিয়ে নিল। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে সান্ত্বনা দিলেন যে, ভয়ের কোনো কারণ নেই। তোমাদের সাহায্যকারী তো আল্লাহ, রাসুল এবং মুসলিমরা। আর এটা ছিল

---

[৪০১]. সুরা নিসা, ৪: ৬৪

[৪০২]. সুরা মায়িদা, ৫: ৫৫

নবিজি ﷺ-এর জীবদ্দশায়। নবিজি ﷺ-এর মৃত্যুর পরে সাহায্য চাওয়া এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

"আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের সাহায্যকারী, তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে।"[৪০৩]

নোট : এই আয়াত দ্বারাও দলিল পেশ করে থাকেন—যেহেতু মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের সাহায্যকারী, এজন্য তাদের নিকট মৃতুর পরেও প্রার্থনা করা যাবে এবং এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ওলির নিকটও প্রার্থনা করা যাবে। কিন্তু এই আয়াতটিও মৃত্যুর পরে সাহায্য প্রার্থনা সম্পর্কিত নয়। বরং জীবিত থাকলে একে অপরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে পারবে। এজন্যই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা মৃত্যুর পরে সাহায্য চাওয়া প্রমাণিত হয় না। আর হবেই-বা কীভাবে। যেখানে এ বিষয়টি পূর্বে বর্ণিত ৩৫টি আয়াতের বিপরীত।

হাদিস শরিফে এসেছে—

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطِيبًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي

"হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হজরত মুআবিয়া রা.-কে খুতবায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছি—আল্লাহ তাআলা যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের ইলম দান করেন। আমি তো বিতরণকারী মাত্র, আল্লাহই (জ্ঞান) দাতা।"[৪০৪]

কেউ কেউ এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন—নবিজি ﷺ যেহেতু বিতরণকারী সুতরাং তাঁর নিকট চাওয়া যাবে। কিন্তু পুরো হাদিসটি পাঠ করলে বুঝা যায় যে, এর অর্থ হলো—বুঝ দান করা এটা আল্লাহ তাআলার কাজ। এজন্য আল্লাহ তাআলার নিকটই বুঝ চাইতে হবে। তবে কুরআন-হাদিস এবং দ্বীনের ইলম বা জ্ঞান যা আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রদান

---

৪০৩. সুরা তাওবা, ৯: ৭১

৪০৪. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৭১

করেছেন, অথবা যে গনিমতের মাল আমাকে প্রদান করেছেন, তা আমি বর্ণনা করি এবং বিতরণ করি। এজন্য ইমাম বুখারি রহ. এই হাদিস দ্বারা অধ্যায়ের শিরোনাম করেছেন—مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ তথা আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করেন, তাকে তিনি দ্বীনের বুঝ দান করেন।

দ্বিতীয় কথা হলো, এই বিতরণ করাটাও ছিল নবিজি ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই। নবিজি ﷺ-এর ইন্তেকালের পরেও নবিজি ﷺ দুনিয়াবাসীর মধ্যে বিতরণ করছেন, এমনটি এই হাদিসে উল্লেখ নেই।

হিন্দুদের বিশ্বাস হলো, তাদের দেব-দেবতাগণ তাদেরকে সাহায্য করে থাকে

হিন্দুদের একটি বিশেষ আকিদা বা বিশ্বাস হলো, তাদের ঋষি-মুনি তথা তাদের বড় ওলি যে মারা গেছে, তাদের রুহ বা আত্মাকে আল্লাহ তাআলা এমন ক্ষমতা প্রদান করেছেন—যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে এবং যাকে ইচ্ছা তাকে সাহায্য করতে পারে। সাহায্য করা তাদের ঋষি-মুনি তথা তাদের বড় ওলি যে মারা গেছে, তার রুহ বা আত্মার নিয়ন্ত্রণেই আছে। এজন্যই তারা এক ভগবান তো মানে কিন্তু সাহায্য প্রার্থনার জন্য আরও অনেক দেব-দেবতাকে মানে। এগুলোর মূর্তি বানায় এবং এগুলোর পূজা-উপাসনা করে এবং এগুলোর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে।

আল্লাহ তাআলা ৩৫ আয়াতে ইরশাদ করেছেন—সাহায্য করার ক্ষমতা অন্য আর কাউকে দেননি। বরং তিনি নিজেই সরাসরি সাহায্য করেন। এজন্য জীবিকা, রোগ মুক্তি, সন্তানলাভ, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও পরকালের জন্য আমার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করো। অন্য কারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক। আর নবিজি ﷺ এই শিরককে ধ্বংসের জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। এজন্য উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের ওপর গভীরভাবে পাঠ করুন। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমি আরও অনেক আয়াত উল্লেখ করিনি।

কোনো নবি কিংবা ওলির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা যদি জায়েয হতো, তাহলে এর জন্য সুস্পষ্ট কোনো আয়াত কিংবা বিশুদ্ধ কোনো হাদিস অবশ্যই থাকত—অমুকের নিকট তার মৃত্যুর পরে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর এই সাহায্য প্রার্থনা আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনারই নামান্তর। এমন সুস্পষ্ট কোনো আয়াত কিংবা বিশুদ্ধ কোনো হাদিস আমি মাকতাবায়ে শামেলা খুঁজেও পাইনি।

দ্বাদশ অধ্যায়
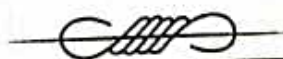
অসিলা

এ আকিদা সম্পর্কে ৪টি আয়াত এবং ১০টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

অসিলা অনেক বিতর্কিত একটি বিষয়। আর এ ব্যাপারে অনেকগুলো দল রয়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ মতামতের ওপর দলিল দিয়ে থাকেন। এজন্য আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

অসিলা ৫ প্রকার। যথা :

১. প্রথম প্রকার হলো, আল্লাহ তাআলার নিকটই প্রার্থনা করবে। কিন্তু এটা বলবে, হে আল্লাহ আপনি এই দুআকে নবিজি ﷺ-এর অসিলায় কবুল করে নিন। এটা জায়েয আছে। তবে সর্বদা এটার অভ্যাস করবে না। কেননা কিছু হাদিসে এর উল্লেখ থাকলেও বাকি কুরআন-হাদিসে যত দুআ রয়েছে, তাতে অসিলা বা মাধ্যমের উল্লেখ নেই। বরং সরাসরি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনার উল্লেখ রয়েছে।

২. দ্বিতীয় প্রকার হলো, কেউ কোনো নেক কাজ করে তাকে নিজের দারাজাত বুলন্দি তথা মর্যাদা বৃদ্ধির অসিলা বানানো। এটা অনেক উত্তম। কুরআনুল কারিমে এর ওপর উৎসাহিত করা হয়েছে।

৩. তৃতীয় প্রকার হলো, কোনো জীবিত ব্যক্তির নিকট দরখাস্ত করা—আপনি আমার জন্য দুআ করবেন যেন আমার অমুক কাজটি হয়ে যায়। অথবা আমি যেন অমুক নেকিটি পেয়ে যাই। এটা ঠিক হয়ে যায়। অনেক হাদিসেই পাওয়া যায়—সাহাবিরা নবিজি ﷺ-এর নিকট দুআ চেয়েছেন।

৪. চতুর্থ প্রকার হলো, কোনো নবি কিংবা ওলিকে এটা বলা যে, আপনি দুআ করে দিন যেন আল্লাহ তাআলা আমার এই কাজটি করে দেন। এটা যদি জীবিত কোনো নবি কিংবা ওলির নিকট বলে, তাহলে সম্পূর্ণ জায়েয। কিন্তু যদি কোনো মৃত নবি কিংবা ওলিকে এটা বলে যে, আপনি আমার জন্য দুআ করবেন। এ সম্পর্কে কোনো আয়াত কিংবা হাদিস আমি পাইনি। বরং এমন

হাদিস পেয়েছি যে, মৃত্যুর পরে মানুষের সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর দুআ করাও একটি আমল। সুতরাং তার পক্ষে দুআ করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় কথা হলো, মৃতব্যক্তি শুনতে পায় কিনা এ নিয়েই যেহেতু মতবিরোধ রয়েছে, তাহলে এটা কীভাবে বলা যাবে যে, হে নবি! অথবা হে ওলি! আপনি আমার জন্য দুআ করবেন। সুতরাং এই প্রকারটিও জায়েয নেই।

৫. পঞ্চম প্রকার হলো, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও নিকট প্রার্থনা করা এবং এমন বলা—হে নবি! হে ওলি! আপনি দুআ কবুল করে নিন। এটা জায়েয নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও নিকট প্রার্থনা করা জায়েয নেই। এই পঞ্চম প্রকারের দলিল সামনে আসবে।

দুআ আল্লাহ তাআলার নিকটই করবে কিন্তু কারও অসিলা দেবে

অসিলার প্রথম প্রকার হলো, দুআ আল্লাহ তাআলার নিকটই করবে এবং বলবে যে, হে আল্লাহ, অমুকের অসিলায় এই দুআকে কবুল করে নিন। অথবা এই কাজটি করে দিন। এটা জায়েয। তবে সর্বদা এমনটি না করা। যেহেতু অসিলার সঙ্গে দুআ করার বিষয়টি দু-চারটি হাদিসেই কেবল এসেছে। বাকি অসংখ্য হাদিসে অসিলা ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ তাআলার নিকটই দুআ করার বিষয়টি স্বীকৃত তাই কুরআন-হাদিসে বর্ণিত দুআসমূহ করা হয়, তাহলে তা বেশি কবুল হবে। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي، قَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ، قَالَ: فَادْعُهْ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ، مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ، اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ

“হজরত উসমান ইবনে হুনাইফ রা. থেকে বর্ণিত, এক অন্ধ ব্যক্তি নবিজি ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর নবি! আমার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করুন, যেন তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন। তিনি বললেন, তুমি কামনা করলে আমি দুআ করব, আর তুমি চাও ধৈর্যধারণ করতে পারো, সেটা হবে তোমার জন্য উত্তম। সে বলল, তাঁর নিকটে দুআ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাকে উত্তমভাবে অজু করার হুকুম করলেন এবং এই দুআ করতে বললেন। দুআটি হলো—

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ، مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ، اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ

হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি প্রার্থনা করি এবং তোমার প্রতি মনোনিবেশ করি তোমার নবি দয়ার নবি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর (দুআর) মাধ্যমে। আমি তোমার দিকে ঝুঁকে পড়লাম, আমার প্রয়োজনের জন্য আমার রবের দিকে ধাবিত হলাম, যাতে আমার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেওয়া হয়। হে আল্লাহ, আমার প্রসঙ্গে তুমি তাঁর সুপারিশ কবুল করো।"[৪০৫]

এই হাদিসে দুটি বিষয় রয়েছে। এক হলো, একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই প্রার্থনা করা। দ্বিতীয়টি হলো, নবিজি ﷺ-এর অসিলা দেওয়া। এতটুকু জায়েয আছে।

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيْئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا غَفَرْتَ لِي، فَقَالَ اللهُ: يَا آدَمُ، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوْحِكَ؛ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ؛ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، فَقَالَ اللهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ، إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، ادْعُنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ

"হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, হজরত আদম আ. যখন ভুল করেছে তখন বলেছে, হে আল্লাহ! আমি মুহাম্মাদের অসিলা দিয়ে আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তাআলা তখন জিজ্ঞেস করলেন, হে আদম! মুহাম্মাদকে তো আমি এখনো সৃষ্টিই করিনি। তুমি তাকে কীভাবে চিনলে? হজরত আদম আ. বললেন, হে আল্লাহ! আপনি যখন আমাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করে আমার ভেতর রুহ বা আত্মা প্রেরণ করলেন, তখন আমি আমার মাথা উত্তোলন করে আরশের পায়ার মধ্যে لَاإِلٰهَ إِلَّااللهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللهِ লেখা দেখেছি। তখন আমি বুঝে গেছি যে, আপনি আপনার নিজের নামের সঙ্গে তাকেই রাখবেন, সৃষ্টির মধ্যে আপনার সবচেয়ে বেশি মাহবুব তথা প্রিয়জন।

---

৪০৫. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৫৭৮; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৩৮৫। হাদিসটিকে বিভিন্ন সূত্রে বহু মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সনদ বিবেচনায় হাদিসটির মান সহিহ।

তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, আদম! তুমি সত্য বলেছ। হজরত মুহাম্মাদ মাখলুকের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয়। তুমি তাঁর অসিলা নিয়ে দুআ করেছ, তাই আমি মাফ করে দিয়েছি। যদি মুহাম্মাদ না হতো, তাহলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।"[৪০৬]

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَت يهود خَيْبَر تقَاتل غطفان فَكلما الْتَقَوْا هزمت يهود فعاذت بِهَذَا الدُّعَاء: اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلك بِحَق مُحَمَّد النَّبِي الْأُمِّي الَّذِي وعدتنا أَن تخرجه لنا فِي آخر الزَّمَان

"হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, খাইবারের ইহুদিরা গাতফান গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। আর যখনই যুদ্ধ হতো, তখনই খাইবারের ইহুদিরা পরাজিত হতো। আর তখন এই দুআ পাঠ করে প্রার্থনা করত—

اَللّٰهُمَّ إِنَّا اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِى وَعَدْتَنَا اَنْ تُخْرِجَهُ لَنَا فِى آخِرِ الزَّمَانِ

হে আল্লাহ, উম্মি নবি মুহাম্মাদের অসিলায় আমরা আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। যার ওয়াদা আপনি আমাদের সঙ্গে করেছেন, তাঁকে শেষ যুগে প্রেরণ করেছেন।"[৪০৭]

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহে দেখা গেল, নবিজি ﷺ-এর অসিলা দিয়ে দুআ করা হয়েছে।

সাহাবির অসিলা দিয়ে দুআ করা

হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ

"হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, হজরত উমর রা.অনাবৃষ্টির সময় হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা.-এর অসিলা দিয়ে দুআ করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! (পূর্বে) আমরা আমাদের নবি ﷺ-এর

---

[৪০৬]. *মুস্তাদরাকে হাকেম*, *দালায়েলুন নবুওয়্যাহ*: ২/৬৭২ হাদিস নং ৪২২৮। হাদিসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

[৪০৭]. *মুস্তাদরাকে হাকেম*, ২/২৮৯ হাদিস নং ৩০৪২। হাদিসটি সিরাত ও তাফসিরগ্রন্থে বেশ প্রসিদ্ধ ইমাম হাকেম ছাড়াও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ ইহা নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে হাদিসটির সনদ সহিহ নয়। এর সনদে 'আবদুল মালিক ইবনু হারুন ইবনু আনতাহ' রিজালশাস্ত্রে কঠিনভাবে সমালোচিত।

অসিলা দিয়ে দুআ করতাম এবং আপনি বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আমাদের নবি ﷺ-এর চাচার অসিলা দিয়ে দুআ করছি, আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, দুআর সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি বর্ষিত হতো।"[৪০৮]

সাহাবির এই বাণীতে দেখা গেল, নবিজি ﷺ-এর অসিলা দিয়ে দুআ করতেন এবং পরবর্তী সময়ে নবিজি ﷺ-এর চাচা হজরত আব্বাস রা.-এর অসিলা দিয়ে দুআ করতেন।

এখানে ভাবনার বিষয় হলো, সাহাবাগণ—হজরত আব্বাস রা. যিনি জীবিত ছিলেন—তার অসিলা দিয়ে দুআ করেছেন। আর যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁর অসিলা দিয়ে দুআ করেননি।

আরেক হাদিসে এসেছে—

أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْطًا شَدِيدًا، فَشَكَوْا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: انْظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كِوًى إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ. قَالَ: فَفَعَلُوا، فَمُطِرْنَا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ

"হজরত আউস ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, মদিনায় একবার দুর্ভিক্ষ হলে লোকেরা হজরত আয়েশা রা.-এর নিকট অভিযোগ করলেন। হজরত আয়েশা রা. তখন বললেন, নবিজি ﷺ-এর কবর এবং আসমানের মধ্যে একটি জানালা খুলে দাও যেন কবর ও আসমানের মধ্যে কোনো ছাদ না থাকে। লোকেরা তাই করল। তখন এ পরিমাণ বৃষ্টি হলো যে, ঘাস উৎপন্ন হয়ে গেল।"[৪০৯]

সাহাবায়ে কেরামের এই আমলের মাঝে দেখা গেল—নবিজি ﷺ-এর কবরের নিকট জানালা খুলেছে তো বৃষ্টি হয়েছে। যার দ্বারা অসিলা জায়েয হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আরেক হাদিসে এসেছে—

عَنْ مَالِكِ الدَّارِ، قَالَ: وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الطَّعَامِ، قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

---

৪০৮. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১০১০

৪০৯. *সুনানে দারেমি*, ১/২২৭ হাদিস নং ৯৩। হাদিসটির সকল রাবিই নির্ভরযোগ্য। কেউ কেউ এর সনদে ত্রুটি উল্লেখ করলেও তা যথার্থ নয়।

اسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: ائْتِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مُسْتَقِيمُونَ

হজরত মালেক ইবনে দার বলেন, হজরত উমর রা.-এর খাদ্য বিভাগের জন্য একজন কোষাধ্যক্ষ ছিল। হজরত উমর রা.-এর যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো, এক ব্যক্তি তখন নবিজি ﷺ-এর কবরের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আপনার উম্মতের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট বৃষ্টির প্রার্থনা করুন। ওই ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল। জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে তার স্বপ্নে দেখা হলে ওই ব্যক্তি তাকে বলল, উমর রা.-এর নিকট গিয়ে তাকে সালাম বলবে এবং তাকে বলবে যে, বৃষ্টি হবে।"[৪১০]

সাহাবায়ে কেরামের এই আমলের মাঝে দেখা গেল, নবিজি ﷺ-এর কবরের নিকট এসে নবিজি ﷺ-কে এই আবেদন করল, আপনি আল্লাহ তাআলার নিকট উম্মতের জন্য বৃষ্টির প্রার্থনা করুন।

উপর্যুক্ত দুটি হাদিস ও চারটি আমলে সাহাবা থেকে বুঝা গেল, আল্লাহ তাআলার নিকটই প্রার্থনা করতে হবে। তবে যদি এটা বলে যে, অমুকের অসিলায় এই দুআ কবুল করে নিন। এটা জায়েয আছে। কেননা হাদিস শরিফে তা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু যেহেতু কুরআন ও হাদিসে এবং অন্যান্য সকল দুআসমূহে অসিলার উল্লেখ নেই; বরং সরাসরি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনার উল্লেখ রয়েছে, এজন্য সরাসরি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করাই উত্তম। তবে কখনো কখনো যদি অসিলার উল্লেখ করা হয়, তাহলে এটা জায়েয আছে। কেননা উপর্যুক্ত হাদিসেও কখনো কখনো অসিলার মাধ্যমে দুআ করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

নেক আমল করে তার অসিলা গ্রহণ করা

২. দ্বিতীয় প্রকার হলো, কেউ কোনো নেক কাজ করে তাকে নিজের দারাজাত বুলন্দি তথা মর্যাদা বৃদ্ধির অসিলা বানানো। এটা অনেক উত্তম। কুরআনুল কারিমে এর ওপর উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾

---

৪১০. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা*, ৬/৩৫৯ হাদিস নং ২৩০০২। ইমাম ইবনু হাজার-সহ অনেক মুহাদ্দিসই এই হাদিসের সনদকে হাসান ও সহিহ বলেছেন। তবে কেউ কেউ একে যইফও বলেছেন। তবে যারা দুর্বল বলেছেন তাদের যুক্তি অনেক ক্ষেত্রেই সহিহ নয়।

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর নৈকট্যের (অসিলা) অনুসন্ধান করো।"[৪১১]

অসিলা দ্বারা এখানে প্রত্যেক ওই নেক আমল উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির অসিলা বা মাধ্যম হয়।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য নেক আমল করো এবং তাকে নৈকট্যের অসিলা বানাও। এই আয়াতের ব্যাখ্যা কখনো এটা নয়—নেক লোকদের অসিলা দিয়ে দুআ করো। হ্যাঁ! পূর্বে বর্ণিত কয়েকটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, অসিলা দিয়ে দুআ করা জায়েয। কেউ কেউ এখানে এটাই উদ্দেশ্য নিতে চেষ্টা করেছেন যে, নেক লোকদের অসিলা দিয়ে দুআ করো এবং এর চেয়েও বাড়াবাড়ি হলো; স্বয়ং বুজুর্গদের নিকটই দুআ করতে লাগলেন।

তাফসিরে ইবনে আব্বাসে এই আয়াতের তাফসিরে এসেছে, নেক আমল করে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করো। অন্যান্য তাফসিরসমূহেও এ ধরনের বাক্যই এসেছে। এজন্য এই আয়াতের দ্বারা বুজুর্গদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা প্রমাণিত হয় না। তবে হ্যাঁ! পূর্বে বর্ণিত কয়েকটি হাদিসের বর্ণনা দ্বারা এতটুকু সুযোগ রয়েছে যে, হে আল্লাহ অমুকের অসিলায় আমার দুআ কবুল করে নিন। তাহলে এটার সুযোগ আছে। এতেও আল্লাহ তাআলার নিকটই প্রার্থনা করতে হবে। তবে শুধু এতটুকু বলবে যে, হে আল্লাহ এই বুজুর্গের লাজ রক্ষা করে আমার দুআ কবুল করে নিন। অথবা এই বুজুর্গের অসিলায় আমার দুআ কবুল করে নিন। তাহলে এটার সুযোগ আছে।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾

"তারা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই তো তাদের রবের কাছে নৈকট্যের মাধ্যম (অসিলা) অনুসন্ধান করে।"[৪১২]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মক্কার কাফিরদেরকে এই কথার ওপর সতর্ক করছেন, যে লোক ফেরেশতাদের এবং জিনদের পূজা করে, আর সে মনে করে যে, তারা আমাকে মুক্তি দেবে কিংবা কোনো প্রকার সাহায্য করবে, এই

---

[৪১১]. সুরা মায়িদা, ৫: ৩৫

[৪১২]. সুরা বনি ইসরাইল, ১৭:৫৭

ধারণা ভুল। কেননা এই ফেরেশতা এবং জিনদের অবস্থাও তো হলো—এরা নিজেরাই আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী এবং নেক কাজ করে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে থাকে। সুতরাং যেখানে তারা নিজেরাই মুখাপেক্ষী, সেখানে এই পূজারিদেরকে কি দেবে? এজন্য মক্কার এই কাফিরদের উচিত যে, সরাসরি আল্লাহ তাআলার নিকটই প্রার্থনা করা।

তাফসিরে ইবনে আব্বাসে এই আয়াতের তাফসিরে এসেছে—যে-সকল ফেরেশতা ও জিনদেরকে মক্কার এই কাফিররা পূজা করে, তারা নিজেরাই নিজের রবের নৈকট্য এবং ফজিলত তালাশ করছে। তাহলে এরা এই পূজারিদেরকে কি দেবে?

এজন্য এই আয়াত থেকেও বুজুর্গদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। হ্যাঁ! তারপরও যদি কেউ জোর-জবরদস্তিপূর্বক টেনে-হেঁচড়ে প্রমাণ করতে চায় এবং নির্ভরযোগ্য মুফাসসিরদের তাফসিরকে এড়িয়ে গিয়ে বুজুর্গদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি প্রমাণ করতে চায়, তাহলে এটা তার ইচ্ছা।

জীবিত ব্যক্তির নিকট দুআ চাওয়া জায়েয

৩. তৃতীয় প্রকার হলো, কোনো জীবিত ব্যক্তির নিকট দরখাস্ত করা অথবা তার নিকট সাহায্য চাওয়া অথবা তার অসিলা দিয়ে আল্লাহ তাআলার নিকটই প্রার্থনা করা জায়েয। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾

“আর যদি তারা, যখন নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল তখন তোমার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসুলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পেত।”[৪১৩]

এই আয়াত থেকে বুঝা গেল, জীবিত ব্যক্তির নিকট দুআর দরখাস্ত করা জায়েয।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ﴾

---

৪১৩. সুরা নিসা, ৪: ৬৪

"আর আল্লাহ এমন নন যে, তাদেরকে আজাব দেবেন এ অবস্থায় যে, তুমি তাদের মাঝে বিদ্যমান।"[৪১৪]

এই আয়াত থেকে বুঝা গেল, নেককার ব্যক্তি জীবিত থাকলে তার থেকে উপকৃত হতে সমস্যা নেই।

কোনো জীবিত ব্যক্তির নিকট দুআ চাওয়া জায়েয

হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ.... ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، وَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত তিনি নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছেন... অতঃপর আমার জন্য তোমরা আল্লাহ তাআলার নিকটে অসিলা প্রার্থনা করো। কেননা অসিলা হলো জান্নাতের এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ জায়গা যা আল্লাহ তাআলার বান্দাদের মাঝে শুধু একজনই অর্জন করবে। আশা করি আমিই হব সেই বান্দা। আর যে ব্যক্তি আমার জন্য (আল্লাহ তাআলার নিকট) অসিলার প্রার্থনা করল, তার জন্য আমার শাফাআত তথা সুপারিশ অবধারিত হলো।"[৪১৫]

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ؛ فَقَالَ: أَيْ أُخَيَّ أَشْرِكْنَا فِي دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا

"হজরত উমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবিজি ﷺ-এর নিকট ওমরাহ করার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি প্রদান করে বললেন, হে আমার ভাই! তোমার দুআয় আমাদেরকে যেন ভুলে যেয়ো না।"[৪১৬]

উপর্যুক্ত দুটি হাদিসেই নবিজি ﷺ নিজের উম্মতের নিকট দুআর দরখাস্ত করেছেন। যখন জীবিত ছিলেন অথবা যখন সে জীবিত থাকবে। এজন্য এটা জায়েয।

---

[৪১৪]. সুরা আনফাল, ৮: ৩৩

[৪১৫]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৩৮৪; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২৮৯৪; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৬১৪

[৪১৬]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ১৪৯৮; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৫৬২। এই হাদিসের সনদে 'আসেম ইবনু উবাইদুল্লাহ' যইফ রাবি। তবে ইমাম তিরমিজি রহ. এই হাদিসের ব্যাপারে বলেছেন, হাসান সহিহ।

আরেক হাদিসে এসেছে—

سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ

"হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জুমার দিন মিম্বারের সোজাসুজি দরজা দিয়ে (মসজিদে) প্রবেশ করল। নবিজি ﷺ তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। সে নবিজি ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাগুলোর চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং আপনি আল্লাহ তাআলার নিকট বৃষ্টির জন্য দুআ করুন, যেন তিনি আমাদেরকে বৃষ্টি দেন। বর্ণনাকারী বলেন, সে ব্যক্তি এ কথা বলতেই নবিজি ﷺ তখন তাঁর উভয় হাত তুলে দুআ করলেন।"[৪১৭]

এই হাদিসে জীবিত অবস্থায় নবিজি ﷺ-এর নিকট দুআর দরখাস্ত করা হয়েছে।

কোনো জীবিত মানুষের অসিলা দেওয়া সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত

হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ.

"হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, হজরত উমর রা.অনাবৃষ্টির সময় হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা.-এর অসিলা দিয়ে দুআ করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! (পূর্বে) আমরা আমাদের নবি ﷺ-এর অসিলা দিয়ে দুআ করতাম এবং আপনি বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আমাদের নবি ﷺ-এর চাচার অসিলা দিয়ে দুআ করছি, আপনি আমাদেরকে

---

৪১৭. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১০১৩।

বৃষ্টি দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, দুআর সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি বর্ষিত হতো।"[৪১৮]

সাহাবির এই বাণীতে দেখা গেল, নবিজি ﷺ-এর অসিলা দিয়ে দুআ করতেন এবং পরবর্তী সময়ে নবিজি ﷺ-এর চাচা হজরত আব্বাস রা.-এর অসিলা দিয়ে দুআ করতেন। যা দ্বারা প্রমাণিত হয়—জীবিত ব্যক্তির অসিলা দেওয়া হয়েছে।

এ সকল হাদিস ও আমলে সাহাবার মধ্যে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট—দুআ আল্লাহ তাআলার নিকটই করা হয়েছে। কোনো মানুষের নিকট প্রয়োজন পূরণের কথা বলা হয়নি। তবে হ্যাঁ! জীবিত ব্যক্তির অসিলা গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য মৃতব্যক্তির নিকট এটা বলা—আপনি এই কাজটি করে দিন অথবা আপনি আমার রোগ ভালো করে দিন কিংবা আপনি আমাকে সন্তান দিন অথবা আপনি বৃষ্টি দিন। এটা মোটেও জায়েয নেই।

মাজার পূজারিদের বাড়াবাড়ি

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ থেকে শুধু এতটুকু প্রমাণিত হয়েছে—কখনো কখনো কারও অসিলা দিয়ে দুআ করতে চাইলে তার সুযোগ আছে। কিন্তু আমাদের মাজার পূজারি ব্যক্তিদের পুরো বছরের খরচ উঠাতে হবে। নিজের স্ত্রী-সন্তানদেরও পালতে হবে। নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও ঠিক রাখতে হবে। নিজেদের মর্যাদা এবং সম্মানও বৃদ্ধি করতে হবে। নিজেদের প্রসিদ্ধিও লাভ করতে হবে। এজন্য তারা ছোট্ট সুযোগটির সৎব্যবহার করে কবরবাসী সম্পর্কে বড় বড় বক্তব্য প্রদান করে। তাদের বিভিন্ন কারামত বর্ণনা করে এবং ফয়েজ লাভের নামে, প্রয়োজন পূর্ণ করে দেওয়ার নামে খুব ভালোভাবেই অর্থ উপার্জন করে নিজেদের পকেট ভারী করে থাকে। অতঃপর এমন এমন ফজিলত বর্ণনা করে যেন লোকজন বারবার এখানে আসে এবং বারবার তাদের থেকে অর্থ উপার্জন করা যায়। বরং কোনো কোনো সময় অনেক ক্ষতির মধ্যে লিপ্ত করে দেওয়া হয় যে, মানুষ তাতে ফেঁসে থাকে। এ সম্পর্কে মহিলারা বেশি ফেঁসে থাকে এবং বেশি ক্ষতিতে লিপ্ত হয়। এজন্য এ সম্পর্কে অনেক সতর্কতা প্রয়োজন।

---

৪১৮. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১০১০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

৫টি গুরুত্বপূর্ণ আকিদা

আল্লাহ তাআলা নবিজি ﷺ-কে দিয়ে "কুল তথা আপনি বলুন" বাক্য দ্বারা সুস্পষ্ট ঘোষণা করিয়েছেন—নবি আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমার নিকট এ সকল বস্তু নেই

এ আকিদা সম্পর্কে ২৫টি আয়াত রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

৫টি গুরুত্বপূর্ণ আকিদা হলো :

১. নবিজি ﷺ অবশ্যই মানুষ।

২. নবিজি ﷺ ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী নন।

৩. নবিজি ﷺ-এর হাতে লাভ-ক্ষতির ক্ষমতা নেই।

৪. আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কাউকে শরিক করা উচিত নয়।

৫. নাজাতের জন্য শুধু নবিজি ﷺ-এর অনুসরণ করা।

নোট : কেউ কেউ কিছু তাফসিরের বর্ণনা দিয়ে উপর্যুক্ত আকিদাসমূহ নিয়ে অনেক লম্বা লম্বা বক্তব্য প্রদান করে থাকে। এজন্য বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম বলেন, আলেম-উলামাদের সামনের আয়াতসমূহের আলোকে আকিদা বর্ণনা করা উচিত।

১. নবিজিকে দিয়ে ঘোষণা করানো হয়েছে—আমি মানুষ

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾

"বলো, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহি প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ।"[৪১৯]

---

৪১৯. সুরা কাহাফ, ১৮: ১১০

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾

"বলো, আমি কেবল তোমাদের মতো একজন মানুষ। আমার কাছে ওহি পাঠানো হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবলমাত্র এক ইলাহ।"[৪২০]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا﴾

"বলো, পবিত্র মহান আমার রব! আমি তো একজন মানব-রাসুল ছাড়া কিছুই নই?"[৪২১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾

"তাদেরকে তাদের রাসুলগণ বলল, আমরা তো কেবল তোমাদের মতোই মানুষ।"[৪২২]

এই চার আয়াতে স্বয়ং নবিজি ﷺ-কে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমি অবশ্যই মানুষ।

২. স্বয়ং নবিজিকে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমি ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী নই

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾

"বলো, আল্লাহ ছাড়া আসমানসমূহে ও জমিনে যারা আছে তারা গায়েব জানে না। আর কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে তা তারা অনুভব করতে পারে না।"[৪২৩]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾

---

৪২০. সুরা ফুসসিলাত, ৪১: ৬
৪২১. সুরা বনি ইসরাইল, ১৭: ৯৩
৪২২. সুরা ইবরাহিম, ১৪: ১১
৪২৩. সুরা নামাল, ২৭: ৬৫

"বলো, তোমাদেরকে আমি বলি না, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি না।"[৪২৪]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾

"আর তোমাদেরকে আমি বলছি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডারসমূহ আছে এবং আমি গায়েব জানি না।"[৪২৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ﴾

"বলো, গায়েবের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই। অতএব তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষায় রয়েছি।"[৪২৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ﴾

"তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তা কখন ঘটবে? তুমি বলো, এর জ্ঞান তো রয়েছে আমার রবের নিকট। তিনিই এর নির্ধারিত সময়ে তা প্রকাশ করবেন।"[৪২৭]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ﴾

"লোকেরা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলো, এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটই আছে।"[৪২৮]

নবিজি ﷺ-কে কিছু যত ইলম বা জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তা ওহির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي﴾

---

[৪২৪]. সুরা আনআম, ৬: ৫০
[৪২৫]. সুরা হুদ, ১১: ৩১
[৪২৬]. সুরা ইউনুস, ১০: ২০
[৪২৭]. সুরা আরাফ, ৭: ১৮৭
[৪২৮]. সুরা আহযাব, ৩৩: ৬৩

"বলো, আমি তো তারই অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে ওহিরূপে প্রেরণ করা হয়।"[৪২৯]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

"বলো, আমি রাসুলদের মধ্যে নতুন নই। আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমার প্রতি যা ওহি করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি।"[৪৩০]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে স্বয়ং নবিজি ﷺ-কে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমি ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী নই।

৩. স্বয়ং নবিজি ﷺ-কে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমি লাভ-ক্ষতির মালিক নই। সুতরাং আমার নিকট প্রার্থনা করো না। একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই প্রার্থনা করো।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

"বলো, আমি আমার নিজের কোনো উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান।"[৪৩১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

"বলো, আমি নিজের ক্ষতি বা উপকারের অধিকার রাখি না, তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন।"[৪৩২]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾

"বলো, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য না কোনো অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখি এবং না কোনো কল্যাণ করার।"[৪৩৩]

---

৪২৯. সুরা আরাফ, ৭: ২০৩
৪৩০. সুরা আহকাফ, ৪৬: ৯
৪৩১. সুরা আরাফ, ৭: ১৮৮
৪৩২. সুরা ইউনুস, ১০: ৪৯

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

"বলো, আমি রাসুলদের মধ্যে নতুন নই। আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমার প্রতি যা ওহি করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি।"[৪৩৪]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

"বলো, আল্লাহ যদি তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে চান কিংবা কোনো উপকার করতে চান, তবে কে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমাদের জন্য কোনো কিছুর মালিক হবে? বরং তোমরা যে আমল করো আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।"[৪৩৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾

"বলো, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য না কোনো অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখি এবং না কোনো কল্যাণ করার। বলো, নিশ্চয় আল্লাহর কাছ থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ছাড়া কখনো আমি কোনো আশ্রয়ও পাব না।"[৪৩৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾

"বলো, আমার নিজের পক্ষ থেকে এতে কোনো পরিবর্তনের অধিকার নেই।"[৪৩৭]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে স্বয়ং নবিজি ﷺ-কে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমি কোনো প্রকার লাভ-ক্ষতির মালিক নই।

---

[৪৩৩]. সুরা জিন, ৭২: ২১
[৪৩৪]. সুরা আহকাফ, ৪৬: ৯
[৪৩৫]. সুরা ফাতহ, ৪৮: ১১
[৪৩৬]. সুরা জিন, ৭২: ২১-২২
[৪৩৭]. সুরা ইউনুস, ১০: ১৫

৪. স্বয়ং নবিজি ﷺ-কে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কাউকে শরিক করো না

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾

"বলো, নিশ্চয় আমি আমার রবকে ডাকি এবং তার সঙ্গে কাউকে শরিক করি না।"[৪৩৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ﴾

"বলো, আমাকে কেবল আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেন আমি আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁর সঙ্গে শরিক না করি।"[৪৩৯]

এই দুই আয়াতে স্বয়ং নবিজি ﷺ-কে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কাউকে শরিক করো না।

৫. স্বয়ং নবিজি ﷺ-কে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—নাজাতের জন্য নবিজি ﷺ-এর অনুসরণ করো

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৪৪০]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

"বলো, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের ভালোবাসেন না।"[৪৪১]

---

[৪৩৮]. সুরা জিন, ৭২: ২০
[৪৩৯]. সুরা রাদ, ১৩: ৩৬
[৪৪০]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ৩১
[৪৪১]. প্রাগুক্ত, ৩২

আরও ইরশাদ করেন—

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾

"বলো, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো। তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে সে শুধু তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য দায়ী এবং তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য করো তবে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।"[৪৪২]

এই তিন আয়াতে স্বয়ং নবিজি ﷺ-কে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—যদি নাজাত চাও, তাহলে নবিজি ﷺ-এর অনুসরণ করো।

[৪৪২]. সুরা নুর, ২৪:৫৪
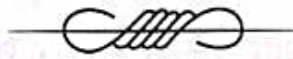
চতুর্দশ অধ্যায়

শাফাআতের বর্ণনা

এ আকিদা সম্পর্কে ৪টি আয়াত এবং ৮টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

কিয়ামতের দিন দুই প্রকারের শাফাআত বা সুপারিশ হবে। যথা :

১. শাফাআতে কুবরা বা বড় সুপারিশ। যার ক্ষমতা একমাত্র নবিজি ﷺ-কেই প্রদান করা হবে।

২. শাফাআতে সুগরা বা ছোট সুপারিশ। এটার ক্ষমতা অন্যান্য নবি ও নেককারদেরকেও প্রদান করা হবে।

এ সকল সুপারিশ আল্লাহ তাআলার অনুমতি পেলেই করতে পারবে। আল্লাহ তাআলার অনুমতি ব্যতীত করতে পারবে না। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

"কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?"[৪৪৩]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ﴾

"তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই।"[৪৪৪]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾

"আর আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া তাঁর কাছে কোনো সুপারিশ কারও উপকার করবে না।"[৪৪৫]

---

৪৪৩. সুরা বাকারা, ২: ২৫৫

৪৪৪. সুরা ইউনুস, ১০: ৩

আরও ইরশাদ হয়েছে–

﴿قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾

"বলো, সকল সুপারিশ আল্লাহর মালিকানাধীন।"[৪৪৬]

কিয়ামতের দিন ৮ প্রকারের সুপারিশ করা হবে

কিয়ামতের দিন মোট ৮ প্রকারের সুপারিশ করা হবে। যথা :

১. শাফাআতে কুবরা তথা বড় সুপারিশ। এই শাফাআতের ক্ষমতা কেবল নবিজি ﷺ-কেই প্রদান করা হবে।

২. ওই মুমিন, যার গুনাহের কারণে জাহান্নামের ফায়সালা হয়ে গেছে। তাকে সুপারিশ করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। এই সুপারিশের ক্ষমতা নবিজি-সহ অন্যান্য নবিগণ ও নেককারদেরকেও প্রদান করা হবে।

৩. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশে কোনো কোনো মুমিনকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে।

৪. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশে জাহান্নামির আজাব কমিয়ে দেওয়া হবে। যেমন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশে আবু তালিবের আজাব কমিয়ে দেওয়া হবে।

৫. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশে সকল মুমিনকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

৬. ওই কবিরা গুনাহকারী, যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে, সুপারিশের মাধ্যমে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

৭. ওই মুমিন যার গুনাহ এবং নেকি সমান-সমান। তাকে সুপারিশ করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে। আর এই সুপারিশের ক্ষমতাও নবিজি-সহ অন্যান্য নবিগণ ও নেককারদেরকেও প্রদান করা হবে।

৮. জান্নাতিদের দারাজাত বুলন্দির জন্য সুপারিশ করা হবে। আর এই সুপারিশের ক্ষমতাও নবিজি-সহ অন্যান্য নবিগণ ও নেককারদেরকেও প্রদান করা হবে।

কিয়ামতের দিন মোট এই ৮ প্রকারের সুপারিশ হবে।

---

[৪৪৫]. সুরা সাবা, ৩৪: ২৩

[৪৪৬]. সুরা যুমার, ৩৯: ৪৪

১. শাফাআতে কুবরা বা বড় সুপারিশ

হাদিস শরিফে এসেছে, কিয়ামতের দিন উম্মত নবিগণের নিকট যাবে যেন কমপক্ষে হিসাব-কিতাব হয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট সুপারিশ করে। কিন্তু নবিগণ অস্বীকার করবে। শুধু নবিজি ﷺ এই সুপারিশ করবেন। কেবল নবিজি ﷺ এই সুপারিশ করবেন, এজন্য এটাকে শাফাআতে কুবরা বা বড় সুপারিশ বলা হয়। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وَيَقُولُ: ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلًا، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا عِيسَى، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ، فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ، فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، حَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ، إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন তারা বলবে, আমাদের জন্য আমাদের রবের নিকট কেউ যদি শাফাআত করত, যা এ সংকট থেকে আমাদের উদ্ধার করত। তখন তারা সকলেই হজরত আদম আ.-এর কাছে এসে বলবে, আপনি ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে নিজ থেকে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের হুকুম করেছেন; তারা আপনাকে সিজদা করেছে। আপনি আমাদের জন্য আমাদের রবের নিকট শাফাআত করুন। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযুক্ত নই এবং নিজ অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, তোমরা হজরত নুহ আ.-এর নিকট যাও, যাকে আল্লাহ তাআলা প্রথম রাসুল হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। তখন তারা

তার নিকট আসবে। তিনিও নিজ অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, আমি তোমাদের জন্য এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা হজরত ইবরাহিম আ.-এর নিকট যাও, যাকে আল্লাহ তাআলা নিজের খলিলরূপে গ্রহণ করেছেন। তখন তারা তার নিকট আসবে। তিনিও নিজ অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, আমি তোমাদের জন্য এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা হজরত মুসা আ.-এর নিকট যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন। তখন তারা তার নিকট আসবে। তিনিও নিজ অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, আমি তোমাদের জন্য এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা হজরত ঈসা আ.-এর নিকট যাও। তখন তারা তার নিকট আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের জন্য এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট যাও। তার অগ্র-পশ্চাতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তখন তারা সকলেই আমার নিকট আসবে। তখন আমি আমার রবের নিকট অনুমতি চাইব। যখনই আমি আল্লাহকে দেখতে পাব তখন সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। এরপর আমাকে বলা হবে তোমার মাথা উঠাও। চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উঠাব এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে যে প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে আমার রবের প্রশংসা করব। এরপর আমি সুপারিশ করব, তখন আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। অতঃপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। এরপর আমি আগের মতো করব। অতঃপর তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার সিজদায় পড়ে যাব। অবশেষে কুরআনের বাণী মোতাবেক যারা অবধারিত জাহান্নামি তাদের ব্যতীত আর কেউই জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে না।"[৪৪৭]

২. ওই মুমিন, যার গুনাহের কারণে জাহান্নামের ফায়সালা হয়ে গেছে। তাকে সুপারিশ করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ

[৪৪৭]. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬৫৬৫

"হজরত আলি ইবনে আবি তালেব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়েছে এবং তা হিফজ রেখেছে, এর হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মেনেছে, তাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবার-পরিজন থেকে এমন ১০ জন ব্যক্তি সম্পর্কে তার সুপারিশ কবুল করবেন যাদের প্রত্যেকের জন্য জাহান্নাম অনিবার্য ছিল।"[৪৪৮]

৩. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশে কোনো কোনো মুমিনকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে ৭০ হাজার ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করে দিন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকেও এ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। নবিজি ﷺ দুআ করে দিলেন, হে আল্লাহ! তাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন।"[৪৪৯]

৪. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশে জাহান্নামির আজাব কমিয়ে দেওয়া হবে।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ

"হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন তাঁরই সামনে তাঁর চাচা আবু তালেবের আলোচনা আলোচনা করা হলো, তিনি বললেন, আশা করি কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তার উপকারে আসবে। অর্থাৎ আগুনের হালকা স্তরে তাকে ফেলা হবে, যা তার

---

৪৪৮. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২৯০৫; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২১৬। হাদিসটি সনদ যইফ। এতে হাফস ইবনু সুলাইমান রয়েছে। হাদিসশাস্ত্রে তিনি দুর্বল।

৪৪৯. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২১৬

পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছবে আর এতে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে।"[৪৫০]

এই হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী নবিজি ﷺ-এর সুপারিশে জাহান্নামির আজাব কমিয়ে দেওয়া হবে।

৫. নবিজির সুপারিশে সকল মুমিনকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আমিই প্রথম ব্যক্তি যে জান্নাতের জন্য সুপারিশ করব এবং যত নবি আছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুসারী হবে আমার।"[৪৫১]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নবির জন্য একটি মাকবুল দুআ থাকে। যা তিনি নিজ উম্মতের জন্য করে থাকেন। আর আমি আমার উম্মতের জন্য একটি দুআ লুকিয়ে রেখেছি। আর তা হলো, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করব।"[৪৫২]

এই দুটি হাদিসের ইঙ্গিত থেকে বুঝা গেল, নবিজি ﷺ-এর দুআয় নবিজি ﷺ-এর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৬. ওই কবিরাহ গুনাহকারী, যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে, সুপারিশের মাধ্যমে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

---

৪৫০. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৮৮৫

৪৫১. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৯৬

৪৫২. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২০০

عَنْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمَّوْنَ: الْجَهَنَّمِيِّينَ

"হজরত ইমরা ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, একটি দল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুপারিশে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে জাহান্নামি বলেই সম্বোধন করা হবে।"[৪৫৩]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের কবিরা গুনাহকারীদের জন্য আমি সুপারিশ করব।"[৪৫৪]

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহে বর্ণিত হয়েছে—ওই কবিরা গুনাহকারী, যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তাকে নবিজি ﷺ-এর সুপারিশে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।
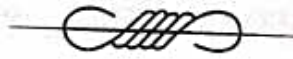
৪৫৩. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬৫৬৬

৪৫৪. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৭৩৯; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২৪৩৫; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৩২২২। হাদিসটির সনদ সহিহ।

সকল নবিদের ওপর ঈমান আনা জরুরি

এ আকিদা সম্পর্কে ১৭টি আয়াত এবং ২টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

বহু নবি প্রেরণ করা হয়েছে। বলা হয়, ১ লক্ষ ২৪ হাজার আম্বিয়া প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে কুরআনে মাত্র কয়েকজনের কথা আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের জন্য জরুরি হলো, সকল নবিগণের ওপর ঈমান রাখা। তারা নিজ নিজ যুগে সত্যের ওপর ছিলেন এবং তাদের শরিয়ত সত্য ছিল। তবে নবিজি ﷺ-এর আগমনের পরে তাদের শরিয়ত রহিত হয়ে গেছে। বর্তমানে নবিজি ﷺ-এর শরিয়তের ওপর ঈমান আনা এবং এর ওপর আমল করা জরুরি। তাহলেই নাজাত পাওয়া যাবে।

উক্ত নবিগণের শরিয়তেও নিম্নের ছয়টি বিষয়ের ওপর ঈমান আনা জরুরি ছিল, যে ছয়টি বিষয়ের ওপর ঈমান আনা নবিজি ﷺ-এর শরিয়তেও ঈমান আনা জরুরি। উক্ত ছয়টি বিষয় হলো :

১. আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান।

২. রাসুলগণের ওপর ঈমান।

৩. কিতাবসমূহের ওপর ঈমান।

৪. ফেরেশতাদের ওপর ঈমান।

৫. পরকালের ওপর ঈমান।

৬. তাকদিরের ওপর ঈমান।

তবে মানুষের জন্য সালাত-সিয়াম ইত্যাদির যে-সকল শাখা-প্রশাখাগত মাসায়েল ছিল, তা ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

এজন্য নবিদের ওপর ঈমান আনা—তারা নিজ যুগের সত্য নবি ছিলেন এবং তাদের শরিয়তও সত্য ছিল। এ কথার ওপর ঈমান আনাও একজন মুসলমানের জন্য জরুরি। আর না হয় ঈমান পরিপূর্ণ হবে না।

সকল নবিকে মানা জরুরি, না হয় ঈমান পরিপূর্ণ হবে না

ইসলামের আশ্চর্য গুণ হলো, ইসলাম সকল নবিদের ওপর ঈমান আনা জরুরি মনে করে এবং তার পূর্ণ সম্মান করে। সকল নবিকে মানার অর্থ হলো, আমরা এটা মানব যে, সকল নবি সত্য এবং তাদের শরিয়ত তাদের যুগের জন্য পুরোপুরি সত্য ও সঠিক ছিল। তবে এখন উক্ত শরিয়ত রহিত হয়ে গেছে এবং তাদের ওপর যে কিতাব নাজিল হয়েছিল, সেগুলোও আল্লাহর কিতাব এবং নিজ যুগের জন্য পুরোপুরি সত্য ও সঠিক ছিল। সেগুলোর ওপর ঈমান আনাও জরুরি। তবে কুরআন নাজিল হওয়ার পরে উক্ত কিতাবসমূহ এখন আর আমলের উপযুক্ত নেই। এখন কুরআনের ওপরই আমল করতে হবে। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

"বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা নাজিল করা হয়েছে আমাদের ওপর, আর যা নাজিল করা হয়েছে ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের সন্তানদের ওপর। আর যা দেওয়া হয়েছে মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবিকে তাদের রবের পক্ষ থেকে, আমরা তাদের কারও মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।"[৪৫৫]

এই আয়াতে এটাও বলা হয়েছে—সকল নবির ওপর ঈমান আনো এবং তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করো না।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾

"রাসুল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসুলগণের ওপর, আমরা তাঁর রাসুলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না।"[৪৫৬]

---

[৪৫৫]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ৮৪

[৪৫৬]. সুরা বাকারা, ২: ২৮৫

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

"তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর এবং যা নাজিল করা হয়েছে আমাদের ওপর ও যা নাজিল করা হয়েছে ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের সন্তানদের ওপর আর যা প্রদান করা হয়েছে মুসা, ঈসাকে এবং যা প্রদান করা হয়েছে তাদের রবের পক্ষ হতে নবিগণকে। আমরা তাদের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত।"[৪৫৭]

এই আয়াতসমূহে বলা হয়েছে—সকল নবিগণের ওপর ঈমান রাখা জরুরি। আর না হয় ঈমান পরিপূর্ণ হবে না।

পবিত্র কুরআনে মাত্র কয়েকজন নবির আলোচনা রয়েছে

পবিত্র কুরআনে মাত্র কয়েকজন নবির আলোচনা রয়েছে আর বাকিদের আলোচনা নেই। তবে একটি হাদিসে এসেছে—আল্লাহ তাআলা ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। তাদের মধ্যে ৩১৫ জন হলেন রাসুল।

কয়েকজন নবির আলোচনা রয়েছে আর বাকিদের আলোচনা নেই। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾

"আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে অনেক রাসুল পাঠিয়েছি। তাদের মধ্যে কারও কারও কাহিনি আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি আর কারও কারও কাহিনি তোমার কাছে বর্ণনা করিনি।"[৪৫৮]

আল্লাহ তাআলা ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ جَالِسًا.... قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ كَمْ وَفَّى عِدَّةُ الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ: مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا، الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا

---

৪৫৭. প্রাগুক্ত, ১৩৬

৪৫৮. সুরা গাফির, ৪০: ৭৮

"হজরত আবু উমামা বাহিলি রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ মসজিদে বসা ছিলেন... আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! নবিদের সংখ্যা কত? নবিজি ﷺ তখন বললেন, ১ লক্ষ ২৪ হাজার। তাদের মধ্যে রাসুল হলো ৩১৫ জন। যা বড় একটি জামাত।"[৪৫৯]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—আল্লাহ তাআলা ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবি প্রেরণ করেছেন। আর তাদের মধ্যে রাসুল হলো ৩১৫ জন। এদের মধ্যে চারজন হলেন সবচেয়ে বড়। আর তারা হলেন :

১. হজরত মুসা আ.

২. হজরত ঈসা আ.

৩. হজরত দাউদ আ.

৪. হজরত মুহাম্মাদ ﷺ

সকল নবির ধর্মে মৌলিক শিক্ষা ছিল তাওহিদ তথা আল্লাহ তাআলা এক

সকল নবির ধর্মেই মৌলিক শিক্ষা ছিল তাওহিদ তথা আল্লাহ তাআলা এক এবং ছয়টি বিষয়, যা ঈমানের জন্য জরুরি। যথা :

১. আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান।

২. রাসুলগণের ওপর ঈমান।

৩. কিতাবসমূহের ওপর ঈমান।

৪. ফেরেশতাদের ওপর ঈমান।

৫. পরকালের ওপর ঈমান।

৬. তাকদিরের ওপর ঈমান।

এ বিষয়গুলো তাদের শরিয়তেও জরুরি ছিল। তবে তাদের শরিয়তের বিধানের মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য ছিল। যেমন, সালাতের পদ্ধতি ভিন্ন ছিল। সিয়ামের সংখ্যা কম-বেশি ছিল ইত্যাদি। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾

---

৪৫৯. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২২২৮৮। এই সনদে আলি ইবনু ইয়াযিদ নামক যইফ রাবি রয়েছেন। এ ছাড়াও ইমাম ইবনে কাসির ও হাইসামি রহ. একে যইফ বলেছেন। *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ২/১৪০; *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, ১/১৬৪

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরিয়ত ও স্পষ্ট পন্থা।"[৪৬০]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেন—

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾

"রাসুল তাঁর নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসুলগণের ওপর, আমরা তাঁর রাসুলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না।"[৪৬১]

এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—পূর্বের সকল শরিয়তেও আল্লাহ তাআলা, সকল নবি-রাসুল, ফেরেশতা এবং সকল কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনা জরুরি ছিল।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আমি দুনিয়া ও আখিরাতে হজরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ.-এর ঘনিষ্ঠতম। নবিগণ একে অন্যের বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মা ভিন ভিন্ন কিন্তু দ্বীন একই।"[৪৬২]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিসে বলা হয়েছে—সকল নবিদের দ্বীন এক তবে শাখাগত বিধানসমূহ ভিন্ন ভিন্ন।

এখন নবিজির প্রতি ঈমান আনা জরুরি

নবিজি ﷺ-এর আগমনের পর নবিজি ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনা জরুরি এবং একমাত্র নবিজি ﷺ-এর ঈমান আনার ওপরই মুক্তি। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।"[৪৬৩]

---

[৪৬০]. সুরা মায়িদা, ৫: ৪৮

[৪৬১]. সুরা বাকারা, ২: ২৮৫

[৪৬২]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৪৪৩

[৪৬৩]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৯

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না।"[৪৬৪]

আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।"[৪৬৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ﴾

"অতঃপর তোমাদের সঙ্গে যা আছে তা সত্যায়নকারীরূপে একজন রাসুল তোমাদের কাছে আসবে, তখন অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।"[৪৬৬]

এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—নবিজি ﷺ-এর ওপর ঈমান আনা জরুরি এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেই নাজাত পাবে। অন্য কোনো ধর্ম আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, ওই সত্তার কসম, যার কুদরতি হাতে মুহাম্মাদের জীবন। এ যুগে (অর্থাৎ আমার যুগ থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত) কোনো ইহুদি-খ্রিষ্টান (অথবা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী) আমার সম্পর্কে শুনল অতঃপর আমার ওপর এবং আমার

---

৪৬৪. প্রাগুক্ত, ৮৫

৪৬৫. সুরা মায়িদা, ৫: ৩

৪৬৬. সুরা আলে ইমরান, ৩: ৮১

রিসালাতের ওপর ঈমান আনল না, আর এ অবস্থায় সে মারা গেল, তাহলে সে জাহান্নামে যাবে।"[৪৬৭]

কোনো নবিকে অন্য কোনো নবির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া ঠিক নয়

কোনো নবিকে অন্য কোনো নবির ওপর এতটা শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া জায়েয নেই, যার দ্বারা তার অমর্যাদা হয়। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

"হজরত ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিন উমর রা.-কে মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। যেমনটি হজরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ.-এর সম্পর্কে নাসারা (খ্রিষ্টানরা) বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুলই বলবে।"[৪৬৮]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—যেভাবে খ্রিষ্টানরা হজরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ.-এর সম্পর্কে অনেক বাড়াবাড়ি করেছে, এমনকি আল্লাহর পুত্র বানিয়ে ফেলেছে, তোমরাও আমার সম্পর্কে এমনটি করো না। আমাকে শুধু আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুলই বলো।

কুরআনে চারটি বড় বড় কিতাবের আলোচনা

আল্লাহ তাআলা রাসুলদের ওপর অনেক কিতাব নাজিল করেছেন। কিন্তু বড় বড় কিতাব হলো চারটি। যা চারজন বড় বড় রাসুলের ওপর নাজিল করা হয়েছে।

কুরআন হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর। তাওরাত হজরত মুসা আ.-এর ওপর। ইনজিল হজরত ঈসা আ.-এর ওপর। যাবুর হজরত দাউদ আ.-এর ওপর। আর কিছু সহিফা তথা ছোট ছোট কিতাব হজরত ইবরাহিম আ.-এর ওপর।

---

[৪৬৭]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৫৩
[৪৬৮]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৪৪৫

নবিজি ﷺ-এর ওপর কুরআন নাজিল হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ﴾

"আমি তোমার প্রতি আল-কুরআন এজন্য নাজিল করিনি যে, তুমি দুর্ভোগ পোহাবে।"[৪৬৯]

এই আয়াতে কুরআন নাজিলের আলোচনা রয়েছে।

তাওরাত নাজিল হয়েছে হজরত মুসা আ.-এর ওপর। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾

"নিশ্চয় আমি তাওরাত নাজিল করেছি, তাতে ছিল হিদায়াত ও আলো।"[৪৭০]

এই আয়াতে তাওরাত নাজিলের আলোচনা রয়েছে।

ইনজিল নাজিল হয়েছে হজরত ঈসা আ.-এর ওপর। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ﴾

"এবং তাকে দিয়েছিলাম ইনজিল, এতে রয়েছে হিদায়াত ও আলো।"[৪৭১]

এই আয়াতে ইনজিল নাজিলের আলোচনা রয়েছে।

যাবুর নাজিল হয়েছে হজরত দাউদ আ.-এর ওপর। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾

"আর আমি তো কতক নবিকে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি এবং দাউদকে দিয়েছি যাবুর।"[৪৭২]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾

---

[৪৬৯]. সুরা ত্ব-হা, ২০: ২
[৪৭০]. সুরা মায়িদা, ৫: ৪৪
[৪৭১]. প্রাগুক্ত, ৪৬
[৪৭২]. সুরা বনি ইসরাইল, ১৭: ৫৫

"নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ওহি পাঠিয়েছি, যেমন ওহি পাঠিয়েছি নুহ ও তার পরবর্তী নবিগণের নিকট এবং আমি ওহি পাঠিয়েছি ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, তার বংশধরগণ, ইসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের নিকট এবং দাউদকে প্রদান করেছি যাবুর।"[৪৭৩]

এই দুই আয়াতে যাবুর নাজিলের আলোচনা রয়েছে।

ছোট ছোট আরও অনেক কিতাব নাজিল করেছেন

উপর্যুক্ত বড় বড় চারটি কিতাব ছাড়াও ছোট ছোট আরও অনেক কিতাব নাজিল করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

"বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা নাজিল করা হয়েছে আমাদের ওপর, আর যা নাজিল করা হয়েছে ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের সন্তানদের ওপর। আর যা দেওয়া হয়েছে মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবিকে তাদের রবের পক্ষ থেকে, আমরা তাদের কারও মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আমরা তারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।"[৪৭৪]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾

"আর তোমার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি যথাযথভাবে, এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর ওপর তদারককারীরূপে।"[৪৭৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾

"নিশ্চয় এটা আছে পূর্ববর্তী সহিফাসমূহে। ইবরাহিম ও মুসার সহিফাসমূহে।"[৪৭৬]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে অন্যান্য কিতাবসমূহে নাজিল করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

---

[৪৭৩]. সুরা নিসা, ৪: ১৬৩
[৪৭৪]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ৮৪
[৪৭৫]. সুরা মায়িদা, ৫: ৪৮
[৪৭৬]. আ'লা- ৮৭: ১৮-১৯

ষোড়শ অধ্যায়

গোস্তাখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

এ আকিদা সম্পর্কে ৩টি আয়াত এবং ২টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে গোস্তাখি তথা বেয়াদবি চার প্রকার। যথা :

১. নবিজি ﷺ-কে প্রকাশ্যে গালি দেওয়া এবং বুঝানোর পরেও ফিরে আসে না।

২. নবিজি ﷺ-কে প্রকাশ্যে গালি দেয় না, কিন্তু এমন বাক্য ব্যবহার করে, যারা দ্বারা নবিজি ﷺ-এর অপমান হয়।

৩. মুসলিম ব্যক্তি এমন কোনো অস্পষ্ট বাক্য ব্যবহার করেছে, যার দ্বারা ভিন্ন মতাবলম্বী কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বীগণ উক্ত বাক্যকে গুঁড়িয়ে-প্যাঁচিয়ে এই ফলাফল বের করেছে—সে নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে গোস্তাখি তথা বেয়াদবি করেছে।

৪. অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলিমের সামনে কোনো অমুসলিম এমন কোনো আচরণ করেছে, যার দ্বারা নবিজি ﷺ-এর অপমান হয়। তাহলে উক্ত মুসলিমের করণীয় কী?

এ ব্যাপারে প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

নবিজির সঙ্গে বেয়াদবি অনেক বড় শাস্তির কারণ

নবিজি ﷺ-কে গালি দেওয়া অনেক বড় শাস্তির কারণ। বরং যেকোনো নবিকে গালি দেওয়াই অনেক বড় শাস্তির কারণ। এর দ্বারা ঈমান চলে যায়। কুরআনুল কারিমে নবিদের সম্মান করতে এবং তাদের অনুসরণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লানত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অপমানজনক আজাব।"[৪৭৭]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবির আওয়াজের ওপর তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না এবং তোমরা নিজেরা পরস্পর যেমন উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো, তাঁর সঙ্গে সেরকম উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না। এ আশঙ্কায় যে, তোমাদের সকল আমল-নিষ্ফল হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না।"[৪৭৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾

"যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর ঈমান আনো, তাকে সাহায্য ও সম্মান করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করো।"[৪৭৯]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে গুরত্বারোপ করা হয়েছে—যেন নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে সামান্যও বেয়াদবি না হয়। বরং সর্বদা তাঁর জন্য সম্মানসূচক বাক্য ব্যবহার হয়। আর রাসুলের সঙ্গে বেয়াদবি তো দূরের কথা, কোনো সাহাবির সঙ্গেও বেয়াদবি করা জায়েয নেই। তাও অনেক বড় গুনাহ।

১. নবিজিকে প্রকাশ্যে গালি দেওয়া এবং বুঝানোর পরেও ফিরে না আসা

কেউ যদি নবিজি ﷺ-কে গালি দেয় এবং বুঝানোর পরেও ফিরে না আসে, তাহলে ওই ব্যক্তি কাফির এবং মুরতাদ হয়ে যাবে। কেননা ঈমানের ছয়টি অংশের মধ্যে অন্যতম একটি অংশ হলো, রাসুলের ওপর ঈমান আনা। আর যেহেতু সে রাসুলকে গালি দিয়েছে, তাহলে এখন রাসুলের ওপর তার ঈমান অবশিষ্ট নেই। এজন্য সে এখন মুরতাদ (ধর্মচ্যুত) হয়ে গেছে। এখন তাকে হত্যা করা হবে।

---

[৪৭৭]. সুরা আহযাব, ৩৩: ৫৭
[৪৭৮]. সুরা হুজুরাত, ৪৯: ২
[৪৭৯]. সুরা ফাতহ, ৪৮: ৯

আমি "প্রকাশ্যে গালি" শব্দটি কেন ব্যবহার করলাম?

এখানে প্রকাশ্যে গালি দেওয়া শব্দটি এজন্য ব্যবহার করেছি—এমন কিছু কিতাব আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যেগুলোতে দেখেছি যে, এক মতাবলম্বীরা অন্য মতাবলম্বীদের বিভিন্ন কিতাব থেকে ইবারত (মূল পাঠ) এনে, তাকে ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে এই অর্থ বের করে যে, তারা নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে বেয়াদবি করেছে এবং তা এই পরিমাণ ছড়িয়েছে যে, মানুষ বিশ্বাস করছে যে, এরা গোস্তাখে রাসুল তথা রাসুলের অবমাননাকারী এবং এরা কাফির। এমনকি তাদের সম্পর্কে এটা পর্যন্ত লিখেছে যে, যে তাদেরকে কাফির না মনে করবে, সেও কাফির। যেমন,

ومن شك في كفره وعذابه كفر

অর্থাৎ যারা এই গালিদাতার কুফরের ব্যাপারে এবং তার শাস্তির ব্যাপারে সন্দেহ করবে, সেও কাফির।[৪৮০]

আমি এই মতাবলম্বীদেরকে জিজ্ঞেস করে এবং তাদের বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করে জানতে পেরেছি যে, এই মতাবলম্বীগণ কখনোই নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে বেয়াদবি করেনি এবং না এই লেখক বেয়াদবি করেছে। তবে হ্যাঁ! এমন কোনো কথা, যা কুরআন ও হাদিসে নেই। অন্য মতাবলম্বীগণ তা সাব্যস্ত করতে চায় কিন্তু যেহেতু তা কুরআন ও হাদিসে নেই, তাই লেখক এটা মানে না। এজন্য অন্য মতাবলম্বীগণ গন্ডগোল বাধিয়েছে এবং তাকে গোস্তাখে রাসুল তথা রাসুলের অবমাননাকারী বলে কাফির আখ্যা দিয়েছে। এমনকি এটা পর্যন্ত লিখেছে যে, যে তাকে কাফির না মনে করবে, সেও কাফির।

প্রিয় পাঠক! আপনিই ইনসাফের সঙ্গে বলুন তো! কোথায় নবিজি ﷺ-কে গালি দেওয়া। আর কোথায় কুরআন ও হাদিসের বিরোধী হওয়ার কারণে অন্য মতাবলম্বীদের কথা না মানা। উভয়ের মাঝে কত বড় পার্থক্য। এই ফতোয়ার কারণে মুসলমানদের বড় একটি দল দুই ভাগ হয়ে গেছে।

এজন্য আমি আমার আলোচনায় এই শর্ত আরোপ করেছি যে, যদি নবিজি ﷺ-কে প্রকাশ্যে গালি দেয় এবং বুঝানোর পরেও না মানে, তাহলে সে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যাবে। এভাবে ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে কথা বানানোর দ্বারা এবং

---

৪৮০. দুররে মুখতার, ৬/৩৫৭

গোস্তাখে রাসুল তথা রাসুলের অবমাননাকারী আখ্যা দেওয়ার দ্বারা সে কাফির হবে না।

দ্বিতীয় উপমা হলো—মিডিয়াতে এসেছে যে, এক বালক কলেজে পড়ত। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হয়ে গেছে। নবিজি ﷺ-কে গালি দেওয়া তার উদ্দেশ্য ছিল না এবং না তার বেয়াদবি করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তার বন্ধুবান্ধবরা তার কথাটাকে প্যাঁচিয়ে বানিয়েছে যে, সে নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে বেয়াদবি করেছে। উক্ত ছাত্র বারবার অস্বীকার করেছে এবং বলেছে যে, কখনোই আমার এই উদ্দেশ্য ছিল না যে, আমি নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে বেয়াদবি করব। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের কেউ তার এ কথাটি মানেনি। তাকে মেরে মেরে হত্যা করে ফেলেছে। এ কথাটি মিডিয়া অনেক ফলাও করে প্রচার করেছে এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে এই বার্তা দিয়েছে যে, মুসলিম জাতি অনেক কঠোর জাতি। সামান্য একটি কথার কারণে নিজের মুসলিম ভাইকেই হত্যা করে ফেলে। এই ধর্মের অনুসারীরা অনেক খারাপ হয়ে থাকে। আর এ কথাটি গোটা ইউরোপে কয়েক মাস যাবৎ প্রচার করা হয়।[৪৮১]

এজন্য আমার অবেদন হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জানা না যাবে যে, বাস্তবেই সে জেনেবুঝে নবিজি ﷺ-কে গালি দিয়েছে কিংবা নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে বেয়াদবি করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর কুফরের ফতোয়া না লাগানো। এর দ্বারা অনেক ক্ষতি হয়। স্বয়ং মুসলমানই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং একে অপরের পেছনে সালাত পর্যন্ত পড়ে না।

তৃতীয় উপমা হলো—এক মতাবলম্বীগণ আহলে বাইতের পরিপূর্ণ সম্মান করে। তাদের মহব্বতকে নিজ ঈমানের অংশ মনে করে। তাদেরকে নিজের মাথার তাজ মনে করে এবং তাদের সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অমর্যাদাও সহ্য করে না। কিন্তু অপর মতাবলম্বীগণের ধারণা হলো, যেভাবে আমরা বলি, তারা সেভাবে সম্মান করে না অথবা আহলে বাইতকে সেভাবে মানে না, যেভাবে আমরা মানি। এ কারণে তাদেরকে কাফির মনে করে। গোস্তাখে আহলে

---

৪৮১. মনে রাখতে হবে শরিয়তের বিধান প্রয়োগ ও প্রচার করা ছাড়া যেখানে কোনো বিকল্প নেই সেখানে কে (বিজাতি ও ভিন্ন ধর্মের লোকেরা) কি বলবে অথবা ভুল ম্যাসেজ পাবে এমন বাহানা দিয়ে শরিয়তে উক্ত বিষয়কে প্রয়োগ না করা কিংবা তা পরিহার করা যেমন শরিয়ত মোতাবেক অন্যায় তেমনই এমন চিন্তা দাসত্ববোধেরও পরিচায়ক। তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই আবেগ ও বিবেক কাজ করবে ও তার ক্ষেত্র যথার্থ হতে হবে। সে ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে কোনো প্রকার লজ্জাবোধ হওয়া মুসলিমদের জন্য শোভনীয় নয়।

বাইত তথা আহলে বাইতের অবমাননাকারী মনে করে এবং তাদের পেছনে সালাত পর্যন্ত পড়ে না।

তাই এ ধরনের অপবাদ আরোপের কারণে সে মুরতাদ হবে না এবং সে ওয়াজিবুল কতল তথা হত্যাযোগ্যও হবে না। বরং এটা যাচাই করতে হবে যে, বাস্তবেই সে নবিজি ﷺ-কে গালি দেয় কিনা অথবা নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে গোস্তাখি তথা বেয়াদবি করে কিনা এবং জেনেবুঝে এমনটা করে কিনা। যদি এমনটি করে, তাহলে সে মুরতাদ হবে। এজন্য আমি শিরোনাম লিখেছি— সে নবিজি ﷺ-কে প্রকাশ্যে গালি দেয় এবং বুঝানোর পরেও ফিরে আসে না। কেননা বর্তমানে এটা একটি প্রথা হয়ে গেছে যে, আপনি যদি আমাদের কথা যদি না মানেন, তাহলে আপনি গোস্তাখে রাসুল তথা রাসুলের অবমাননাকারী কিংবা গোস্তাখে আহলে বাইত তথা আহলে বাইতের অবমাননাকারী।

আর বুঝানোর পরেও ফিরে আসে না লিখেছি এজন্য যে, অনেক সময় ব্যক্তি মূর্খ হয়ে থাকে। সে জানেই না যে, কোন বাক্য দ্বারা নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে গোস্তাখি তথা বেয়াদবি হয়। এজন্য তাকে প্রথমে বুঝাতে হবে যে, এ বাক্যের দ্বারা গোস্তাখি বা বেয়াদবি হয়। আর আপনি এ বাক্যটি বলেছেন। এর দ্বারা নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে গোস্তাখি তথা বেয়াদবি হয়েছে। এভাবে বুঝানোর পরেও যদি গোস্তাখি বা বেয়াদবি করে, তাহলে তাকে কাফির বলে গণ্য করা হবে।

গালিদাতাকে হত্যা করা হবে

নবিজি ﷺ-এর গালিদাতাকে হত্যা করা হবে। এর দলিল হলো হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا... فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, এক অন্ধ সাহাবির একটি উম্মে ওলাদ ক্রীতদাসী ছিল। যে নবিজি ﷺ-কে গালি দিত এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলত। উক্ত অন্ধ সাহাবি তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিরত হতো না। সে তাকে ভর্ৎসনা করত; কিন্তু তাতেও সে বিরত হতো না।

একরাতে সে যখন নবিজি ﷺ-কে গালি দিতে শুরু করল এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলতে লাগল, তখন উক্ত অন্ধ সাহাবি ধারালো ছুরি নিয়ে সেই দাসীর পেটে ঢুকিয়ে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করল... তখন নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা সাক্ষী থাকো, তার রক্ত বৃথা গেল। অর্থাৎ হত্যাকারীর ওপর কিসাস নেওয়া হবে না।"[৪৮২]

এই হাদিসে فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ তথা তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিরত হতো না। সে তাকে ভর্ৎসনা করত; কিন্তু তাতেও সে বিরত হতো না। এর থেকে বুঝা গেল, গালিদাতাকে নিষেধ করলে যদি না মানে তাহলে সে কাফির এবং মুরতাদ হয়ে যাবে। কোনো অস্পষ্ট বাক্যের দ্বারা সে মুরতাদ হবে না।

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَمَهَا

"হজরত আলি রা. থেকে বর্ণিত, এক ইহুদি মহিলা নবিজি ﷺ-কে গালাগালি করত এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলত। একদা জনৈক সাহাবি তাকে গলা টিপে হত্যা করে। নবিজি ﷺ তার রক্ত বাতিল বলে করেন অর্থাৎ উক্ত সাহাবিকে মাফ করে দেন।"[৪৮৩]

এই দুই হাদিসেই দেখা গেল, নবিজি ﷺ-কে প্রকাশ্যে গালিদাতাকে যে হত্যা করেছে, নবিজি ﷺ তার কিসাস মাফ করে দিয়েছেন।

নবিজিকে গালিদাতা কাফির

নবিজি ﷺ-কে গালি দিলে গালিদাতা কাফির হয়ে হয়ে যাবে। কিন্তু তার তাওবা কবুল করা হবে কি না এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে। যথা :

ক. একটি অভিমত হলো, সে যদি তাওবা করে, তাহলে তার তাওবা কবুল করা হবে না। তাকে হত্যা করা হবে। অধিকাংশ আইম্মায়ে কেরামের অভিমতও এটি।

---

৪৮২. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৩৬১; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ৪০৭৫। হাদিসটির সনদ সহিহ ও দলিলযোগ্য।

৪৮৩. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৩৬২। হাদিসটির মান সহিহ।

খ. দ্বিতীয় অভিমত হলো, সে যদি তাওবা করে, তাহলে তার তাওবা কবুল করা হবে। তাকে তাওবা করার জন্য তিন দিন সময় দেওয়া হবে। এই তিন দিনের মধ্যে যদি সে তাওবা করে নেয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না। তার বিধান হলো মুরতাদের বিধানের মতো। মুরতাদকেও তাওবা করার জন্য তিন দিন সময় দেওয়া হবে।

প্রথম অভিমতের ব্যাখ্যা : যে-সকল আইম্মায়ে কেরামের অভিমত হলো, তার তাওবা কবুল করা হবে না, তাদের দলিল হলো, ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *দুররে মুখতার*-এর নিম্নের ইবারত বা মূলপাঠ—

وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة؛ الا الكافر بسب نبي من الأنبياء فانه يقتل حدا ولا تقبل توبته مطلقا ... وشك فى عذابه وكفره كفر

অর্থাৎ কোনো মুসলমান যদি মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তার তাওবা কবুল করা হবে। কিন্তু যে নবিজি ﷺ কিংবা অন্য কোনো নবিকে গালি দেওয়ার কারণে কাফির হয়, তার তাওবা কবুল করা হবে না। তাকে শরয়ি দণ্ডবিধি হিসেবে হত্যা করা হবে। কখনোই তার তাওবা করা কবুল করা হবে না।... তারপর আরেকটু সামনে এই ইবারত বা মূলপাঠও রয়েছে—যে তার এই শাস্তি এবং কুফরের ব্যাপারে সন্দেহ করবে, সেও কাফির হয়ে যাবে।[৪৮৪]

নোট : শরয়ি দণ্ডবিধি বাস্তবায়নের জন্য ইসলামি শাসনব্যবস্থা থাকতে হবে। ইসলামি রাষ্ট্রের কাজি তথা বিচারক যদি ফায়সালা করে, তাহলে শরয়ি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা হবে। আর না হয় সাধারণ জনগণ তা বাস্তবায়ন করলে রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হবে। যা আরও অনেক বিশৃঙ্খলার কারণ হবে।

দ্বিতীয় অভিমতের ব্যাখ্যা : যে-সকল আইম্মায়ে কেরামের অভিমত হলো, নবিজি ﷺ-কে গালিদাতা কাফির তো অবশ্যই কিন্তু সে যদি তাওবা করে, তাহলে তার তাওবা কবুল করা হবে। তার ওপর আর শরয়ি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা হবে না। তবে তাকে অবশ্যই সতর্ক করে দেওয়া হবে, যেন ভবিষ্যতে আর কখনো এমনটি না করে। প্রয়োজনে কিছু লঘু শাস্তিও প্রদান করা হবে। তাদের দলিলও ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *দুররে মুখতার*-এর নিম্নের ইবারত বা মূলপাঠ—

---

[৪৮৪]. *দুররে মুখতার*, ৬/৩৫৬

من سب الرسول ﷺ فانه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما فعل بالمرتد وهو ظاهر في قبول توبته كما مر عن الشفاء

অর্থাৎ কেউ যদি নবিজি ﷺ-কে গালি দেয়, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে এবং তার বিধান হলো, মুরতাদের বিধানের মতো। এই ইবারত বা মূলপাঠ থেকে বুঝা যায় যে, তার তাওবা কবুল করা হবে। যেমনটি *শিফা* নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।[৪৮৫]

দুররে মুখতার-এর তৃতীয় ইবারত বা মূলপাঠ হলো,

ولكن صرح في آخر الشفاء بان حكمه كالمرتد؛ ومفاده قبول التوبة كما لا يخفى

অর্থাৎ *শিফা* নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে, গালিদাতার বিধান মুরতাদের বিধানের অনুরূপ। এর ফায়দা হলো, তার তাওবা কবুল করা হবে। যা কোনো গোপন বিষয় নয়।[৪৮৬]

দুররে মুখতার-এর চতুর্থ ইবারত বা মূলপাঠ হলো,

قالوا ويستتاب منها فان تاب نكل؛ وان ابى قتل؛ فحكموا له بحكم المرتد مطلقا؛ والوجه الاول اشهر و اظهر

অর্থাৎ উলামায়ে কেরাম বলেন, গালিদাতাকে বলা হবে যে, তুমি তাওবা করো। তখন সে যদি তাওবা করে নেয় (তখন শরয়ি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা হবে না) তাহলে তাকে শিক্ষনীয় শাস্তি প্রদান করা হবে। আর যদি সে তাওবা করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। উলামায়ে কেরাম এই সিদ্ধান্তে উনীত হয়েছেন—এই গালিদাতার বিধান সাধারণত মুরতাদের বিধানের অনুরূপ। কিন্তু প্রথম সিদ্ধান্তটিই অধিক প্রসিদ্ধ।[৪৮৭]

উপর্যুক্ত তিনটি ইবারত তথা মূলপাঠের মধ্যেই বলা হয়েছে, নবিজি ﷺ-এর গালিদাতা যদি তাওবা করে, তাহলে তার তাওবা কবুল করা হবে।

এক বুজুর্গকে দেখলাম, অন্য মতাবলম্বীদের অস্পষ্ট কথাকে ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে প্রমাণ করার চেষ্ট করছেন যে, এরা গোস্তাখে রাসুল। আর এই ফতোয়াও দিচ্ছেন যে, এদের তাওবাও কবুল হবে না। বরং তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে যে সন্দেহ করবে, সেও কাফির।

---

৪৮৫. প্রাগুক্ত, ৩৬০

৪৮৬. প্রাগুক্ত, ৩৫৭-৩৫৯

৪৮৭. প্রাগুক্ত, ৩৫৮

এই ফতোয়ার দ্বারা মুসলিমদের বড় একটি জামাত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং কাফির হওয়া আর মুসলমান হওয়ার দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়েছে। অসংখ্য ফিতনার বিস্তার লাভ করেছে। তাদের জন্য আফসোস ছাড়া আর কি করার আছে?

যাদের মতে রাসুলের অবমাননাকারীর তাওবা কবুল করা হবে, তাদের নিকট তাওবার জন্য তিন দিন সময় দেওয়া হবে

যে-সকল আইম্মায়ে কেরামের মতে নবিজি ﷺ-কে গালিদাতার তাওবা কবুল করা হবে, তাদের নিকট তাওবার জন্য তিন দিন সময় দেওয়া হবে। কেননা সে মুরতাদের মতো। মুরতাদকে তিন দিনের সময় দেওয়ার ব্যাপারে দলিল হলো, হজরত উমর রা.তিন দিন সময় দেওয়া ব্যাপারে অনেক কঠোর ছিলেন। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে—

لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَتْحُ تَسْتُرَ ، وَتَسْتُرُ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ ، سَأَلَهُمْ: هَلْ مِنْ مُغْرِبَةٍ ؟ قَالُوا : رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَخَذْنَاهُ، قَالَ : فَمَا صَنَعْتُمْ بِهِ؟ قَالُوا : قَتَلْنَاهُ، قَالَ : أَفَلاَ أَدْخَلْتُمُوهُ بَيْتًا، وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا ، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، ثُمَّ اسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلاَثًا ، فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ قَتَلْتُمُوهُ، ثُمَّ قَالَ : اللهُمَّ لَمْ أَشْهَدْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي، أَوْ قَالَ : حِينَ بَلَغَنِي

“হজরত উমর রা.-এর নিকট যখন তাস্তুর বিজয়ের সংবাদ এলো। তাস্তুর হলো বসরার একটি এলাকা। হজরত উমর রা.জিজ্ঞেস করলেন, পশ্চিমা কোনো ব্যক্তি আছে? লোকেরা বলল, একজন মুসলমান ব্যক্তি মুশরিক হয়ে গেলে আমরা তাকে গ্রেপ্তার করেছি। হজরত উমর রা.জিজ্ঞেস করলেন, তার সঙ্গে কি আচরণ করেছ? লোকেরা বলল, আমরা তাকে হত্যা করে ফেলেছি। হজরত উমর রা.তখন বললেন, তাকে ঘরে বন্দি করে রাখতে এবং প্রতিদিন রুটি খাওয়াতে। তারপর তিন দিন পর্যন্ত তাকে তাওবা করার জন্য বলতে। যদি তাওবা করে নিত, তাহলে ছেড়ে দিতে আর তাওবা করতে অস্বীকার করলে, তখন গিয়ে হত্যা করতে। অতঃপর হজরত উমর রা. বললেন, আল্লাহ তাআলা সাক্ষী! আমি এই লোকদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিইনি এবং যখন তার হত্যার সংবাদ পৌঁছল, তখন আমি তার ওপর সন্তুষ্টও ছিলাম না।”[৪৮৮]

---

[৪৮৮]. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা*, ৬/৪৪৪ পৃষ্ঠা হাদিস নং ৩২৭৪৪; *সুনানে বায়হাকি*, ৮/৩৫৯ পৃষ্ঠা হাদিস নং ১৬৮৮৭।

অপর এক হাদিসে এসেছে—

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا

"হজরত আলি রা. মুরতাদকে তিন দিন পর্যন্ত তাওবার আহ্বান করতেন।"[৪৮৯]

সাহাবিদের উপর্যুক্ত বক্তব্যে দেখা গেল, তিন দিনের পূর্বে হত্যা করার কারণে হজরত উমর রা. বলেন, হে আল্লাহ! না আমি এতে উপস্থিত ছিলাম, না আমি এর নির্দেশ দিয়েছি এবং না আমি এর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি। যার ফলে বুঝা গেল, তিন দিন পর্যন্ত তাওবার সুযোগ দেওয়া জরুরি। তিন দিন পরেও যদি সে তার নিজের মতের অটল থাকে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।

২. এমন বাক্য ব্যবহার করে, যার দ্বারা নবিজির অপমানের আশঙ্কা হয়

দ্বিতীয় প্রকার হলো, নবিজি ﷺ-কে প্রকাশ্যে গালি দেয় না, কিন্তু এমন বাক্য ব্যবহার করে, যার দ্বারা নবিজি ﷺ-এর অপমানের আশঙ্কা হয়। যেহেতু অস্পষ্ট বাক্য, তাহলে সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে অমর্যাদা করতে চায় এবং এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে অমর্যাদা করতে চায় না। বরং হয়তো না জানার কারণে মুখ ফসকে এমন বাক্য বের হয়ে গেছে। সে বলতেই পারবে না যে, সে অমর্যাদা করতে চায় কি না? এজন্য তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, সে এই বাক্য দ্বারা কি উদ্দেশ্য নিয়েছে? সে যদি বলে যে, এর দ্বারা তার অপমান করা উদ্দেশ্য, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা সে নবিজি ﷺ-কে অপমান করেছে। আর যদি সে বলে যে, এই বাক্য দ্বারা তার নবিজি ﷺ-কে অপমান করা উদ্দেশ্য নয়; বরং সে জানেও না যে, এই বাক্য নবিজি ﷺ-এর জন্য অপমানজনক। তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কিন্তু অবশ্যই তাকে সতর্ক করা হবে যেন ভবিষ্যতে এমন বাক্য ব্যবহার না করে। কেননা এই বাক্যও আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়।

৩. মুসলিম ব্যক্তি এমন কোনো অস্পষ্ট বাক্য ব্যবহার করেছে, যার দ্বারা ভিন্ন মতাবলম্বী কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বীগণ উক্ত বাক্যকে ঘুড়িয়ে-প্যাঁচিয়ে এই ফলাফল বের করেছে—সে নবিজির সঙ্গে বেয়াদবি করেছে।

যেহেতু সে মুসলিম; তাই প্রবল ধারণা হলো, সে নবিজি ﷺ-কে অপমান করেনি অথবা অন্য কোনো নবি কিংবা ওলিকে অপমান করেনি। কেননা

---

৪৮৯. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা*, ৬/৫৮৪ পৃষ্ঠা হাদিস নং ১৬৮৮৭।

ইসলামের শিক্ষা এটাই যে, সে না নবিজি ﷺ-কে অপমান করেছে, না অন্য কোনো নবিকে অপমান করেছে। না কোনো আহলে বাইতকে অপমান করেছে কিংবা না কোনো ওলিকে অপমান করেছে। সে তো না জেনেই এই বাক্য বলে থাকবে। তার এটা জানাই নেই যে, সে কোনো নবি কিংবা ওলিকে অপমান করেছে, অথবা এই বাক্য দ্বারা বেয়াদবি হয়। অথবা কেউ তার এই বাক্যের ভুল ব্যাখ্যা করে তার বদনাম করার চেষ্টা করেছে। সে যদি বলে যে, তার অপমান করার ইচ্ছা ছিল না, তাহলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কেননা সে তো জেনেশুনে অপমান করেনি। তবে তাকে অবশ্যই সতর্ক করে দেওয় হবে যেন ভবিষ্যতে এমন বাক্য ব্যবহার না করে।

এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি লালন করলে অনেক গন্ডগোল মিটে যাবে এবং পরস্পর ধর্মীয় মতবিরোধও কমে আসবে ইনশাআল্লাহ।

নবিজির সঙ্গে বেয়াদবি এ যুগের বড় সমস্যা

গোস্তাখে রাসুল তথা নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে বেয়াদবি এ যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই নিয়ে সারা পৃথিবীব্যাপী অস্থিরতা চলছে।

বেশ কয়েকটি কিতাব অধ্যয়ন করার সময় লক্ষ করেছি যে, একটি মতাদর্শের অনুসারীগণ নবিজি ﷺ-কে রাসুল মানে। তাঁকে পুরোপুরি ইজ্জত করে। কিন্তু যেমন আয়াত— لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ এর কারণে এতটুকু মানে যে, নবিজি ﷺ-কে ইলমে গায়েবের কিয়দংশ প্রদান করা হয়েছিল। তবে বিস্তারিত ইলম দান করা হয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহ তাআলার গুণ। এটা মানে না। অথবা আয়াত— لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا এর কারণে নবিজি ﷺ-কে মুখতারে কুল তথা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মানে না। এখানে তাহলে আয়াতের কারণে নবিজি ﷺ-এর মধ্যে একটি গুণকে মানে না। কেননা আল্লাহ তাআলা নিজেই উক্ত গুণকে অস্বীকার করেছেন। এখন অপর মতাদর্শীগণ ছড়াচ্ছে যে, সে গোস্তাখি করেছে এবং হয়তো সে মুরতাদ হয়ে গেছে এবং তার সকল অনুসারীগণও মুরতাদ হয়ে গেছে। তাই সকলকে মুরতাদের শাস্তিই দিতে হবে। এর ওপর এ পরিমাণ পীড়াপীড়ি করেছে যে, বহু জাতি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এটা বড়ই জুলুমের কথা যে, আয়াত থেকে বিশুদ্ধ দলিল পেশকারীদেরকে গোস্তাখ এবং মুরতাদ আখ্যা দেওয়া হচ্ছে।

এটা তো অনেক বড় কথা যে, এক দল মুসলিম। কিন্তু নিজ ধারণার ওপর ভিত্তি করে তাদেরকে মুরতাদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং এটাও লিখে দেওয়া

হয়েছে—যে তাতে সন্দেহ করবে সেও কাফির। আর এর রেফারেন্স হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে *দুররে মুখতার*-এর সেই ইবারত বা মূলপাঠ—

وشك في عذابه وكفره كفر

অর্থাৎ যে তার এই শাস্তি এবং কুফরের ব্যাপারে সন্দেহ করবে, সেও কাফির হয়ে যাবে।[৪৯০]

এজন্য গোস্তাখে রাসুল অথবা মুরতাদ ফতোয়া দেওয়ার সময় এটা জরুরি হলো, বাস্তবেই যদি সে নবিজি ﷺ-কে গালি দিয়ে থাকে এবং তিন দিন পর্যন্ত বুঝানোর পরেও তাওবা না করে, তাহলে তাকে মুরতাদ আখ্যা দেওয়া হবে। শুধু একটি মতাদর্শের অনুসারীদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে কিংবা নিজ চিন্তাধারার ভিত্তিতে মুরতাদ ও গোস্তাখে রাসুল আখ্যা দেওয়া হবে না। এটা খুব লক্ষ রাখতে হবে। কিছু লোক এটার লক্ষ না রেখে মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর ঘৃণার অগ্নি প্রজ্বলিত করেছে। যা ফলে ইসলামের কোনো কাজেই আর তারা পরস্পর মিলতে পারে না। নিজেরা নিজেরা লড়ে লড়েই ধ্বংস হয়ে গেল। বর্তমান সিরিয়া, ইরাক, মিশর, লিবিয়া, ইয়ামান যার জীবন্ত উপমা। এজন্য কোনো মুসলিমের জন্য গোস্তাখির ফতোয়া দেওয়ার পূর্বে অনেক চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন।

বি. দ্র. গোস্তাখে রাসুল ও শাতিমে রাসুলের শাস্তির ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের ঐকমত্য মাসআলা হলো, সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার যদি তাদের বিচার না করে, আর কোনো আশিকে রাসুল উম্মত যদি স্বপ্রণোদিত হয়ে তাদের শাস্তি বাস্তবায়ন করে ফেলে, তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে সে দোষী সাব্যস্ত হবে না। [অনুবাদক][৪৯১]

---

[৪৯০]. *দুররে মুখতার*, ৬/৩৫৬

[৪৯১]. ইসলামি শাসনব্যবস্থা কায়েম আছে এমন রাষ্ট্রে শাতিমে রাসুল তথা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে অবমাননাকারীর সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করবে ওই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা তার নিযুক্ত দায়িত্বশীলরা। তবে তা অবশ্যই প্রমাণিত হতে হবে। এবং সে ক্ষেত্রে কোনো আশিকে রাসুল যদি আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে (প্রমাণিত হয়েছে এমন) কোনো শাতিমকে হত্যা করে তাহলে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার কারণে 'তাযিরান ওয়া তাদিবান' তাকে সামান্য শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। কেননা জনসাধারণের নিকট এই দায়িত্ব ছেড়ে দিলে ইসলামি সমাজে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। এমনকি শরিয়তের দৃষ্টিতে শাতিম সাব্যস্ত হয় না এমন ব্যক্তিকেও অনেকে শাতিম আখ্যায়িত করে হত্যা করতে পারে। এজন্য ফুকাহায়ে কেরাম সমাজে দৃষ্টান্ত তৈরি করার জন্য সামান্য শাস্তির কথা বলেছেন। কিন্তু ওই আশিকে রাসুলকে কিসাসের আওতায় এনে মৃত্যুদণ্ডের ফায়সালা করা কিংবা বড় ধরনের শাস্তি দেওয়া জায়েয নেই। কেননা শাতিমে রাসুল হওয়ার কারণে নিহত ব্যক্তি মুবাহুদ দম (তথা তার রক্ত হালাল) ছিল। অনুরূপভাবে যেসকল রাষ্ট্রে ইসলামি আইন নেই সে সকল রাষ্ট্রে শাতিমে রাসুল-এর মৃত্যুদণ্ডের আইন যাতে থাকে যেই বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। যদি তাতেও আইন না করা হয় তাহলে সেসব রাষ্ট্রে কোনো আশিকে রাসুল যদি কোনো শাতিমকে হত্যা করে তাহলে তার ব্যাপারে কোনো মুসলিম কটূক্তি করতে পারবে না। অথবা তাদের শাস্তির

দাবিও করতে পারবে না। হানাফি মাযহাবের আসারভিত্তিক ফিকহ-সংবলিত প্রখ্যাত গ্রন্থ *বাদায়েউস সানায়ে* গ্রন্থে ইমাম কাসানি রহ. বলেন, হদ্দের বিধান বাস্তবায়ন করবে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান অথবা যাকে তিনি একাজে নিযুক্ত করেছেন। [*বাদায়েউস সানায়ে*, ৭/৫৭]

আল্লামা হাত্তাব আল রুয়াইনি আল মালেকি রহ বলেন, মূলত আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে মুরতাদের শাস্তি বাস্তবায়ন করা প্রত্যেক বান্দার জন্যই জায়েয হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শরিয়ত এই দায়িত্বটি শাসকদের হাতে ন্যস্ত করেছে, যাতে করে এই স্বেচ্ছাচারিতার কারণে সমাজে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। [*মাওয়াহিবুল জালিল*,৩/৩৫৮]

ইমাম কাসানি রহ. আরও বলেন, যদি তাকে কেউ তাওবা করার আগেই হত্যা করে, তাহলে কাজটি মাকরুহ হলেও হত্যাকারীর উপর কোনো কিছু আবশ্যক হবে না। কেননা, মুরতাদ হওয়ার কারণে গোস্তাখে রাসুল লোকটি প্রথমেই তার রক্তকে হালাল করে দিয়েছে। [*বাদায়েউস সানায়ে*, কাসানি, ৭/১৩৬]

ইমাম নববি আশ শাফেয়ি রহ. তার *মিনহাজুত তালিবিন* গ্রন্থে বলেন, হারবি কাফের, মুরতাদ ও যার ওপরে কিসাস ওয়াজিব হয়েছে তার রক্ত হালাল। [*মুগনিল মুহতাজ ইলা মারিফাতি মাআনি আল-ফাজিল মিনহাজ*, শারবিনি, ৪/২২]

ইমাম নববি রহ. আরও বলেন, মুরতাদকে তাওবার সুযোগ দেওয়ার পরেও যদি তাওবা না করে তাহলে তাকে কুফরের কারণে হত্যা করা হবে হদ্দ হিসেবে নয়। সুতরাং (হত্যার পর) তাকে গোসল করানো, কাফন পরানো জরুরি নয়। তার জানাযার নামাজও পড়া হবে না, এমনকি মুসলমানদের কবরেও তাকে দাফন করা হবে না। কেননা সে রিদ্দার কারণে ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ (এই কারণেই) তাকে শাসক হত্যা করেছেন। তবে যদি শাসক ব্যতীত অন্য কেউ তাকে হত্যা করে, তাহলে শাসকের ওপর পণ্ডিতি করার কারণে (অর্থাৎ শাসকের বিচারিক অধিকার লঙ্ঘন করার কারণে) সামান্য শাস্তি দেবে।

[*ইয়ানাতুত তালিবিন*, ৪/১৫৭]

শাফেয়ি মাযহাবের আরেক প্রখ্যাত ফকিহ ইমাম মাওয়ারদি রহ.ও একই কথা বলেছেন, কেননা মুরতাদের রক্ত মুসলমানদের নিকট হালাল, তবে সাধারণ কাফেরদের রক্ত এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য হালাল হবে না। যেমনইভাবে (কিসাসের ক্ষেত্রে) নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ও দায়িত্বশীলদের নিকট হত্যাকারীর রক্ত হালাল কিন্তু অন্যদের জন্য তা হালাল নয়। সুতরাং নিহতের অভিভাবকরা যদি তাকে হত্যা করে তাহলে কোনো যিমান সাব্যস্ত হবে না। আর যদি অন্যরা তাকে হত্যা করে সে ক্ষেত্রে যিমান সাব্যস্ত হবে।

[*আল হাউই আল কাবির*, মাওয়ারদি, ১২/৮০ (কিতাবুল কতল)]

ইমাম ইবনু রাজাব আল হাম্বলি রহ. বলেছেন, সুতরাং যদি কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-কে গালি দেয় কিংবা তাদের নিয়ে বাজে মন্তব্য করে সে বাহ্যিকভাবে ইসলামে থাকার স্বীকারোক্তি করলেও (কাফের হয়ে যায় ফলে) তার রক্ত (মুসলমানদের জন্য) হালাল। [*জামেউল উলুমি ওয়াল হিকাম*, ১/৩২৭]

ইমাম ইবনু কুদামা আল হাম্বলি ও ইমাম ইবনু মুফলিহ আল হাম্বলি রহ. বলেন, কিসাসের (হত্যার বদলে হত্যার) জন্য শর্ত হচ্ছে নিহত ব্যক্তি নির্দোষ হতে হবে (অর্থাৎ এমন কোনো অপরাধ থাকবে না যার কারণে তার রক্ত মুসলমানদের জন্য হালাল হয়)। সুতরাং কোনো হারবি কাফের (মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত কাফের), কোনো মুরতাদ এবং কোনো বিবাহিত যিনাকারী পুরুষকে হত্যা করলে কিসাস ওয়াজিব হবে না। (এখানে কেবল ইবনু কুদামার প্রাসঙ্গিক বক্তব্যই অনুবাদ করা হলো আর বাকি ইবনুল মুফলিহর শরাহ ও বক্তব্য নিচে ইবারাতসহ উল্লেখ করা হলো)

[*আল মুবদি ফি শারহিল মুকনি* (কিতাবুল জিনায়াত, বাবু শুরুত্বিল কিসাস, ফাসলুস সানি, ৮/২৬৩]

তবে এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই রাসুলের অবমাননা শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রমাণিত হতে হবে। আল্লামা ইবনু তাইমিয়া আল হাম্বলি রহ. বলেন, নবী কেবল নিজের ইলম দিয়ে, কোনো একজন বলার কারণে, (শাস্তিযোগ্য বিষয়ে) শুধু ওহির ভিত্তিতে অথবা কোনো সম্ভাব্য তত্ত্ব-উপাত্তের ভিত্তিতে কারও হদ্দের শাস্তি কায়েম করেননি যতক্ষণ পর্যন্ত না তা সুস্পষ্টভাবে কিংবা অপরাধীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়েছে। [*আস সারিমুল মাসলুল*, পৃ. ৩৫৬]

শাতিমদের রক্ত হালাল এবং শাসকের অনুমতি ব্যতীত কেউ তাদের হত্যা করলে ইসলামি আইন মোতাবেক তাকে কিসাসের আওতায় নিয়ে এসে মৃত্যুদণ্ড কিংবা কোনো বড় ধরনের শাস্তি যে দেওয়া হবে না তার পক্ষে দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত দুটি হাদিস দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন—

১. হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। এক অন্ধ সাহাবির একটি উম্মে ওয়ালাদ বাঁদি ছিল। সে বাঁদিটি রাসুল সা.-কে গালাগাল করত। অন্ধ সাহাবি তাকে নিষেধ করেন, কিন্তু সে নিষেধ অমান্য করে, তিনি তাকে হুমকি দেন, তাতেও সে বিরত থাকে না। তিনি বলেন, একদা রাতে বাঁদিটি রাসুল সা.-কে গালাগাল শুরু করে, তখন সাহাবি খঞ্জর নিয়ে তার পেটে চেপে ধরলেন। এবং জোরে চাপ দিলেন। ফলে বাঁদিটি মারা গেল। এমনকি বাঁদিটি দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে পেটের বাচ্চা বের হয়ে যায়। বাচ্চাটি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। সকালে বিষয়টি রাসুল সা.-এর কাছে উপস্থাপিত হয়। তখন রাসুল সা. সবাইকে একত্র করে বলেন, যে এ কাজ করেছে তাকে আল্লাহর কসম ও আমার ওপর থাকা তার হকের কসম দিচ্ছি সে যেন দাঁড়িয়ে যায়। তখন সেই অন্ধ সাহাবি দাঁড়ালেন। তিনি লোকদের ভীর

সপ্তদশ অধ্যায়

সকল সাহাবায়ে কেরামের সম্মান অনেক জরুরি

এ আকিদা সম্পর্কে ১০টি আয়াত এবং ৭টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

যিনি ঈমানের সঙ্গে নবিজি ﷺ-কেদেখেছেন এবং ঈমানের ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন তিনিই সাহাবি। কেননা এই চোখ দিয়ে তারা নবিজি ﷺ-কে দেখেছেন এবং নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁকে অনেক সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। যা পরবর্তী লোকদের ভাগ্যে জুটেনি। তাদের ত্যাগ ও কুরবানিতেই আমাদের পর্যন্ত দ্বীন পৌঁছেছে। এজন্য সকল সাহাবির ইজ্জত ও সম্মান অত্যন্ত জরুরি। চাই সে যেই সাহাবিই হোক না কেন।

প্রত্যেক সাহাবিকে সম্মান এবং আন্তরিকভাবে মহব্বত করা জরুরি

সকল সাহাবিকেই ইজ্জত ও সম্মান করা জরুরি। কেননা এরা নবিজি ﷺ-এর সঙ্গীসাথি। যারা সর্বাবস্থায় নবিজি ﷺ-এর সঙ্গ দিয়েছেন। তাদের মধ্য থেকে কাউকেই মন্দ বাক্য দ্বারা সম্বোধন করা উচিত নয়। তাদের পরস্পর যে-

---

ঠেলে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেলেন। রাসুল সা.-এর সামনে গিয়ে বসে পড়লেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! সে আপনাকে গালাগাল করত, আপনার কুৎসা রটাত। আমি তাকে এসব করতে বাধা দিতাম। কিন্তু সে বিরত হতো না। তাকে হুমকি ধমকি দিতাম, তবুও সে থামত না। আর আমার হীরার টুকরোর মতো দুটি সন্তান তার গর্ভ থেকে আছে। আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম। গত রাতে সে যখন সে আপনাকে গালাগাল শুরু করে, কুৎসা বলতে থাকে, তখন আমি একটি খঞ্জর তার পেটে চেপে ধরি। তারপর তা চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করি। তখন রাসুল সা. বললেন, লোকেরা তোমরা সাক্ষ্য থাকো, তার রক্ত বৃথা গেল। (অর্থাৎ তার রক্তের বদলা নেওয়া হবে না।) [*সুনানে আবু দাউদ*, ৪৩৬১; *সুনানে দারা কুতনি*, ১০৩; *আল মুজামুল কাবির*, ১১৯৮৪; *বুলুগুল মারাম*, ১২০৪; এই হাদিসের সনদ সহিহ।]

২. আলি রা. থেকে বর্ণিত, এক ইহুদি মহিলা নবী সা.-কে গালাগালি করত এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলত। একদা জনৈক ব্যক্তি তাকে গলা টিপে হত্যা করে। রাসুলুল্লাহ সা. তার রক্ত বাতিল বলে ঘোষণা করেন। (অর্থাৎ তাকে হত্যার বদলে হত্যার বিধান বাতিল করেন) [*সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৩৬২, *সুনানে বায়হাকি কুবরা*, হাদিস নং ১৩১৫৪; *আল মুখতারাহ*, মাকদেসি, ২/১৬৯; হাদিসটির সনদ সহিহ, তবে শাবি রহ. থেকে আলি রাদির শ্রবণ প্রমাণিত না হওয়ায় একে অনেকে মুনকাতি ও মুরসাল বলেছেন। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসদের নিকট শাবির ইরসাল গ্রহণযোগ্য। এ ছাড়াও এই হাদিসটির সনদকে আল্লামা ইবনু তাইমিয়া তার *সারিমুল মাসলুল* কিতাবে (পৃ. ৬৫) উল্লেখ করে জায়্যিদ বলেছেন। এবং এই সনদকে মুত্তাসিল হিসেবে প্রমাণ করেছেন, উপরন্তু আলি রাদি ও শাবী একে অপরকে দেখেছেন এই দাবি করে হাদিসটির ব্যাপারে অভিযোগকারীদের জবাব দিয়েছেন। সর্বোপরি এই হাদিসটির শাহেদ হিসেবে *তবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ* (৪/২১০) আব্দুল্লাহ ইবনু মাকাল থেকেও সহিহ বর্ণনা পাওয়া যায়।]

সকল মতবিরোধ রয়েছে, সেগুলো ইজতিহাদি ভুল গবেষণালব্ধ ত্রুটি হিসেবে গণ্য করা উচিত। তাদের ভুলগুলো ধরে ধরে বারবার আলোচনা করা অনুচিত।

তাদের মধ্যে কোনো কোনো সাহাবি ছিলেন নবিজি ﷺ-এর শ্বশুর। যেমন হজরত আবু বকর রা.। হজরত উমর রা.। আর হজরত উসমান রা.ছিলেন নবিজি ﷺ-এর জামাতা। তেমনইভাবে হজরত আলি রা.-এর ছিলেন নবিজি ﷺ-এর জামাতা। তাই যেমনইভাবে হজরত আলি রা.-কে গালমন্দ করা জায়েয নেই ঠিক তেমনইভাবে হজরত উসমান রা.-কেও গালমন্দ করা জায়েয নেই। কেননা তিনিও নবিজি ﷺ-এর জামাতা।

হজরত উমর রা.-এর সম্পর্কে তো একটি ফজিলত এটাও রয়েছে যে, তিনি হজরত আলি রা. এবং হজরত ফাতিমা রা.-এর জামাতা। হজরত ফাতিমা রা.-এর কন্যা উম্মে কুলসুম রা.-এর সঙ্গে হজরত উমর রা.-এর বিবাহ হয়। এজন্য হজরত উমর রা.-কে তো আরও আগেই গালমন্দ করা উচিত নয়। কেননা তিনি হজরত ফাতিমা রা.-এর জামাতা।

হজরত আয়েশা রা., হজরত সাওদা রা. নবিজি ﷺ-এর স্ত্রী এবং উম্মতের মা। হজরত আয়েশা রা. নবিজি ﷺ-এর এত প্রিয় স্ত্রী ছিলেন—তার কোলেই নবিজি ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়েছে। এজন্য যেমনইভাবে হজরত খাদিজা রা. নবিজি ﷺ-এর স্ত্রী এবং উম্মতের মা এবং তাকে গালমন্দ করা জায়েয নেই—ঠিক তেমনইভাবে হজরত আয়েশা রা., হজরত সাওদা রা.-কেও মন্দ বলা জায়েয নেই। কেননা এরাও নবিজি ﷺ-এর স্ত্রী। কোনো ব্যক্তি যদি আপনার স্ত্রীকে মন্দ বলে তাহলে আপনার নিকট কতটা খারাপ লাগবে। এমনইভাবে নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীকে মন্দ বললে নবিজি ﷺ-এর কতটা খারাপ লাগবে ভাবুন তো! সুতরাং নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীদেরকে মন্দ বলা জায়েয নেই। যারা এমনটি করে, তারা অনেক বড় ভুল করছে।

সাহাবাদের প্রতি সীমাহীন মহব্বত করা সম্পর্কে ইমাম তহাবি রহ.-এর নির্দেশ

আকিদার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *আকিদাতুত তহাবিতে* এসেছে—

وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ

অর্থাৎ আমরা নবিজি ﷺ-এর সাহাবিদের মহব্বত করি। তাদের মধ্যে কারও মহব্বতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করো না। তাদের মধ্যে কারও প্রতি শত্রুতা পোষণ করো না। যারা সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে কিংবা তাদেরকে কল্যাণ ব্যতীত স্মরণ করে, আমরা তাদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করব এবং আমরা সাহাবায়ে কেরামকে কল্যাণের সঙ্গেই স্মরণ করব। কেননা তাদেরকে মহব্বত করা হলো দ্বীন, ঈমান ও ইহসান। আর তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা হলো কুফর, নিফাক এবং বিদ্রোহ।[৪৯২]

উক্ত গ্রন্থে আরও এসেছে—

وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ، وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ

অর্থাৎ নবিজি ﷺ-এর সাহাবি এবং তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের মন্দের ব্যাপারে যে ভালো কথা বলবে এবং পবিত্র সন্তানদের সুনাম বর্ণনা করে, সে নিফাক থেকে মুক্ত।[৪৯৩]

উপর্যুক্ত বক্তব্য অনুযায়ী নবিজি ﷺ-এর সকল সাহাবি এবং তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের কল্যাণের সঙ্গে স্মরণ করা উচিত এবং তাদের সকলের প্রতি মহব্বত রাখা উচিত।

সাহাবায়ে কেরামের ফজিলত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।"[৪৯৪]

---

[৪৯২]. *আকিদাতুত তহাবি*, আকিদা নং ৯৩ পৃষ্ঠা- ২০

[৪৯৩]. প্রাগুক্ত, আকিদা নং ৯৬ পৃষ্ঠা- ২১

[৪৯৪]. সুরা তাওবা, ৯: ১০০

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

"অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কী ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের ওপর প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে।"[৪৯৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের আশা করে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৪৯৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করেছেন। আর তোমাদের কাছে কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। তারাই তো সত্য পথপ্রাপ্ত। আল্লাহর পক্ষ থেকে করুণা ও নিয়ামতস্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৪৯৭]

এই আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্কে বলা হয়েছে—তাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত রয়েছে। এজন্য তাদের মধ্যে কাউকে কাফির কিংবা গুনাহগার বলা অনেক খারাপ কথা।

---

৪৯৫. সুরা ফাতহ, ৪৮: ১৮
৪৯৬. সুরা বাকারা, ২: ২১৮
৪৯৭. সুরা হুজুরাত, ৪৯: ৭-৮

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে যারা পিছু হটে গিয়েছিলে সেদিন, যেদিন দুদল মুখোমুখি হয়েছিল, শয়তানই তাদের কিছু কৃতকর্মের ফলে তাদেরকে পদস্খলিত করেছিল। আর অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, সহনশীল।"[৪৯৮]

এই আয়াতে বলা হয়েছে—যুদ্ধের সময় সাহাবায়ে কেরামের যে ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। এজন্য এখন ওই সকল ভুল-ভ্রান্তিসমূহ ধরে ধরে তাদের গালমন্দ করা একদমই জায়েয নেই।

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সঙ্গে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকুকারী, সিজদাকারী হিসেবে দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে।"[৪৯৯]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা সকল সাহাবিদের প্রশংসা করেছেন। এজন্য কোনো সাহাবিকেই মন্দ বলা জায়েয নেই।

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

"অবশ্যই আল্লাহ নবি, মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করলেন, যারা তার অনুসরণ করেছে সংকটপূর্ণ মুহূর্তে। তাদের মধ্যে এক দলের হৃদয়

---

[৪৯৮]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৫৫

[৪৯৯]. সুরা ফাতহ, ৪৮: ২৯

সত্যচ্যুত হওয়া উপক্রম হবার পর। তারপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।"[৫০০]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা সমান নয়। তারা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আর তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবগত।"[৫০১]

এই আয়াতে বলা হয়েছে—যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছে, তাদের মর্যাদা অনেক বেশি। আর হজরত আবু বকর রা., হজরত উমর রা. এবং হজরত উসমান রা. মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয়কারী। এজন্য তাদের মর্যাদাও অনেক বেশি। সুতরাং কখনোই তাদেরকে গালমন্দ করা যাবে না।

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে সকল সাহাবায়ে কেরামেরই মর্যাদা ও ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য কোনো সাহাবি কিংবা সাহাবিয়াতকেই গালমন্দ করা যাবে না। এর দ্বারা ঈমান চলে যায়। এর বড় একটি ক্ষতি এটাও যে, মানুষের অন্তর থেকে সাহাবায়ে কেরামর সম্মান ও মর্যাদা বের হয়ে যায়। যাদের মাধ্যমে আমাদের নিকট দ্বীন এসেছে, সেই দ্বীনের ওপর আমল করতে এবং সেই দ্বীনকে মানতে অলসতা ও দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। এজন্য সকল সাহাবায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদা অন্তরে লালন করা জরুরি।

সাহাবাদেরকে গালি দিতে হাদিস শরিফে নিষেধ করা হয়েছে

নবিজি ﷺ তাঁর সাহাবিদেরকে গালি দিতে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এজন্য যেকোনো সাহাবিকে কখনো গালমন্দ করা একেবারেই উচিত নয়। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

---

৫০০. সুরা তাওবা, ৯: ১১৭

৫০১. সুরা হাদিদ, ৫৭: ১০

"হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা আমার সাহাবিদেরকে গালমন্দ কর না। তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো, তবুও তাদের এক মুদ (পরিমাপের একটি পরিমাণ) কিংবা অর্ধ মুদ-এর সমপরিমাণ সাওয়াব হবে না। (কেননা তারা নবিজি ﷺ-এর সাহায্যের জন্য খরচ করেছেন)।"[৫০২]

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ عَطَاءٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ

"হজরত আতা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার সাহাবিদের গালি দেয়, তার ওপর আল্লাহর লানত।"[৫০৩]

আরেক হাদিসে এসেছে—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي، اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—হুঁশিয়ার! আমার সাহাবিদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। আমার পরে তোমরা তাদের (গালি ও বিদ্রুপের) লক্ষ্যবস্তু বানিও না। যেহেতু যে ব্যক্তি তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করল, সে আমার প্রতি ভালোবাসার খাতিরেই তাদের ভালোবাসল। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি শক্রতা ও হিংসা পোষণ করল, সে আমার প্রতি শক্রতা ও হিংসাবশেই তাদের প্রতি শক্রতা ও হিংসা পোষণ করল। যে ব্যক্তি তাদেরকে কষ্ট দিলো, সে যেন আমাকেই কষ্ট দিলো। আর যে আমাকে কষ্ট দিলো, সে যেন আল্লাহ তাআলাকেই কষ্ট দিলো। আর যে আল্লাহ তাআলাকে কষ্ট দিলো, শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা তাকে পাকড়াও করবেন।"[৫০৪]

নবিজি ﷺ অত্যন্ত দরদের সঙ্গে তাঁর সাহাবিদের ব্যাপারে বলেছেন যে, তোমরা তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানিও না।

---

[৫০২]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৬৭৩; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৫৪০

[৫০৩]. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা*, ৬/৪০৫ হাদিস নং ৩২৪১৯। হাদিসটির সনদ হাসান।

[৫০৪]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৮৬২; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২০৫৫০। সনদ হাসান।

আরেক হাদিসে এসেছে—

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍورَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ... وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, বনি ইসরাইল যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতও সেই অবস্থার সম্মুখীন হবে, যেমন এক জোড়া জুতার একটি আরেকটির মতো হয়ে থাকে... বনি ইসরাইল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ব্যতীত তাদের সবাই জাহান্নামি হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! সেই দলটি কোনটি? নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, এরা হলো ওই দল, যারা আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম যার ওপর প্রতিষ্ঠিত।"[৫০৫]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—এই উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। সকল দলই জাহান্নামে যাবে। শুধু সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সে দলই মুক্তি প্রাপ্ত হবে।

আরেক হাদিসে এসেছে—

سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

"হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হলো আমার যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ।"[৫০৬]

এই হাদিস থেকে জানা গেল, নবিজি ﷺ-এর যুগে যে-সকল সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন, তারা ছিলেন এই উম্মতের সর্বোত্তম লোক। এজন্যও তাদেরকে গালমন্দ করা জায়েয নেই।

---

[৫০৫]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২৬৪১; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৫৯৭। সনদ হাসান।

[৫০৬]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৬৫০

আরেক হাদিসে এসেছে—

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِي، أَوْ رَأَى مَنْ رَآنِي

"হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছি— জাহান্নামের আগুন এমন মুসলিম ব্যক্তিকে স্পর্শ করবে না, যে ব্যক্তি আমাকে দেখেছে অথবা আমার দর্শনলাভকারীকে দেখেছে (অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামকে) দেখেছে।"[৫০৭]

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কোনো মতবিরোধ পাওয়া গেলে তার এমন ব্যাখ্যা করা, যা থেকে অত্যধিক ঐক্যের রূপ-রেখা ফুটে ওঠে

পবিত্র কুরআনুল কারিমের শিক্ষা হলো, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কোনো মতবিরোধ থাকলেও সেই মতবিরোধকে অধিক বৃদ্ধি করে বর্ণনা করো না। বরং এমন ব্যাখ্যা করো, যার দ্বারা মতবিরোধের বিষয়টি কমে যায় এবং অত্যধিক ঐক্যের রূপ-রেখা ফুটে ওঠে। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾

"আর যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।"[৫০৮]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

"নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।"[৫০৯]

উপর্যুক্ত দুটি আয়াতে বলা হয়েছে—যদি যুদ্ধও হয়ে যায়, তাহলে সন্ধি করে দাও। এজন্য সাহাবায়ে কেরামের মতবিরোধকে ইজতিহাদি তথা গবেষণামূলক ভুল হিসেবে গণ্য করবে এবং অধিক থেকে অধিক ঐক্যের

---

[৫০৭]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৮৫৮। সনদ হাসান।

[৫০৮]. সুরা হুজুরাত, ৪৯: ৯

[৫০৯]. প্রাগুক্ত, ১০

রূপ-রেখা ফুটিয়ে তুলবে। তাদের মতবিরোধে অধিক উসকানি দেওয়া উচিত নয়।

সাহাবাদের মতবিরোধের ব্যাপারে আমাদের প্রতি নবিজির দুটি নসিহত

নবিজি ﷺ-কে ওহির মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছিল, নবিজি ﷺ-এর পরে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ হবে। আর হজরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রা.-কে অনেক কথা অবহিত করে গেছেন। এজন্য হজরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রা.-এর উপাধি হলো, সিররে রাসুল তথা রাসুলের গোপন তথ্যের ভান্ডার। নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আমার পরে যখন তোমরা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ দেখতে পাবে, তখন দুটি কাজ করবে। আর তা হলো :

১. প্রথম কাজ হলো, যত খুলাফায়ে রাশেদিন আছে, তাদের অনুসরণ করবে।

২. দ্বিতীয় কাজ হলো, সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে চুপ থাকবে। কোনো এক দলের সাহায্য করতে গিয়ে অপর দলের বিরুদ্ধে তরবারি উঠিও না।

হাদিস শরিফে এসেছে—চারও খলিফার নীতি ও আদর্শসমূহকে নিজের ওপর অত্যাবশ্যক করে নাও। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

"হজরত ইরবাজ বিন সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ একদিন ফজরের সালাতের পর আমাদের মর্মস্পর্শী ওয়াজ শুনালেন, যাতে আমাদের সকলের চোখে পানি চলে এলো এবং অন্তর কেঁপে উঠল। কোনো একজন বলল, এ তো বিদায়ী ব্যক্তির নসিহতের মতো। হে আল্লাহর রাসুল! এখন আপনি আমাদেরকে কী উপদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদের আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার এবং (আমিরের আদেশ) শ্রবণ ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (আমির) হাবশি ক্রীতদাসই হয়ে

থাকে। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা বহু মতভেদ প্রত্যক্ষ করবে। তখন তোমরা নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করা হতে দূরে থাকবে। কেননা তা গোমরাহি বা ভ্রষ্টতা। তোমাদের মধ্যে কেউ সে যুগ পেলে সে যেন আমার সুন্নাতে ও সৎপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাতে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকে। তোমরা এসব সুন্নাতকে চোয়ালের দাঁতের সাহায্যে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো।"[৫১০]

এই হাদিসে তিনটি কথা আছে। যথা :

১. প্রথম কথা হলো, নবিজি ﷺ অত্যন্ত দরদের সঙ্গে শেষ নসিহত করেছেন। এজন্য নবিজি ﷺ সাহাবায়ে কেরামদের থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. দ্বিতীয় কথা বলেছেন, আমার পরে অনেক মতবিরোধ হবে। এজন্য ওই সময় খুলাফায়ে রাশেদিনের নীতি ও আদর্শকে অবশ্যই আঁকড়ে থাকবে।

৩. তৃতীয় কথা হলো, চারও খুলাফায়ে রাশেদিনই হিদায়াতের ওপর রয়েছেন। তাহলে বর্তমানে যারা শুধু হজরত আলি রা.-কে মানে আর বাকি তিন খলিফাকে ত্যাগ করে, তারা কত বড় ভুল করছে। সুতরাং যেহেতু চারও খলিফা হিদায়াতের ওপর আছেন, তাহলে ওই সকল লোক যারা তিন খলিফাকে গোমরাহ তথা ভ্রান্ত মনে করে, তারা কত বড় ভুল করছে তা ভেবে দেখা দরকার।

হাদিস শরিফে সাহাবায়ে কেরামের মতবিরোধের ব্যাপারে চুপ থাকার নির্দেশ এসেছে। যেমন হাদিসে এসেছে—

قَالَ لِي أُهْبَانُ بْنُ صَيْفِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أُهْبَانُ، أَمَا إِنَّكَ إِنْ بَقِيتَ بَعْدِي فَسَتَرَى فِي أَصْحَابِي اخْتِلَافًا، فَإِنْ بَقِيتَ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَاجْعَلْ سَيْفَكَ مِنْ عَرَاجِينَ قَالَ: فَجَعَلْتُ سَيْفِي مِنْ عَرَاجِينَ

"হজরত আহবান রা.বর্ণনা করেন, আমাকে নবিজি ﷺ বলেছেন, হে আহবান! আমার পরে যদি তুমি জীবিত থাকো, তাহলে তুমি আমার সাহাবাদের মাঝে মতবিরোধ দেখতে পাবে। তুমি যদি সেই যুগ পর্যন্ত জীবিত থাক, তাহলে তোমার তরবারি খেজুরের ঢালা দিয়ে বানিয়ে নেবে। (অর্থাৎ

---

৫১০. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২৬৭৬; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৬০৭; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৪২। সনদ সহিহ।

লোহার তরবারি দিয়ে কোনো সাহাবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না।) হজরত আহবান রা. বলেন, আমি খেজুরের ঢালার তরবারি বানিয়ে নিয়েছি।"[৫১১]

সাহাবাদের মধ্যে যে-সকল মতবিরোধ হয়েছে, তাতে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়

হজরত ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন,

تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَاللهُ أَيْدِينَا مِنْهَا فَلَا نُلَوِّثُ أَلْسِنَتَنَا بِهَا

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা আমাদের হাতসমূহ তা থেকে পবিত্র রেখেছেন। সুতরাং এখন আমরা আমাদের কণ্ঠকে এতে অপবিত্র করব না।[৫১২]

হজরত ইমাম আহমাদ রহ. বলেন,

وسئل أحمد عن أمر علي وعائشة رضي الله عنهما، فقال: تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ হজরত আলি রা. এবং হজরত আয়েশা রা.-এর মধ্যে যে মতবিরোধ হয়েছিল, এ সম্পর্কে হজরত ইমাম আহমাদ রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সেটা এমন এক উম্মত যা বিগত হয়েছে। তারা অর্জন করেছে তা তাদের জন্যই, আর তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্যই। আর তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না।"[৫১৩]

উপর্যুক্ত দুই ইমামই বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে যে-সকল মতবিরোধ ছিল, তা ছিল তাদের ইজতিহাদি তথা গবেষণামূলক ত্রুটি। এজন্য আমাদের তাতে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। উপর্যুক্ত দুই ইমামই পূর্বে হাদিসসমূহ দিয়ে দলিল পেশ করেছেন এবং এর ওপরই আমল করেছেন। সুতরাং আমাদেরও এর ওপরই আমল করা উচিত।

দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ সাহাবি

এই ১০ জন সাহাবিকে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আশ্চর্যের কথা হলো, তা সত্ত্বেও হজরত আবু বকর রা., হজরত উমর রা., হজরত উসমান রা.প্রমুখগণকে কিছু লোক গালমন্দ করে থাকে। হাদিস শরিফে এসেছে—

---

[৫১১]. *তাবরানি কাবির, মুসনাদে আহবান*, ১/২৯৫ হাদিস নং ৮৬৮। সনদ যইফ।

[৫১২]. *শরহে ফিকহুল আকবার*, পৃষ্ঠা ১১৭

[৫১৩]. প্রাগুক্ত

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ

"হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আবু বকর জান্নাতি। উমর জান্নাতি। উসমান জান্নাতি। আলি জান্নাতি। তালহা জান্নাতি। যুবাইর জান্নাতি। আবদুর রহমান ইবনে আউফ জান্নাতি। সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস জান্নাতি। সাইদ বিন যায়েদ জান্নাতি। আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ জান্নাতি।"[৫১৪]

এরা হলেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যাদেরকে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এটা হলো সেই হাদিস যে হাদিসে ১০ জন জান্নাতির নাম এক মজলিসে একসঙ্গে এসেছে। আর এ কারণেই এই ১০ জনকে "আশারায়ে মুবাশশারাহ" তথা সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন বলা হয়। আর না হয় জান্নাতের সুসংবাদ নবিজ ﷺ এই ১০ জন ছাড়াও আরও অনেক সাহাবিকেই দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও তাদের সঙ্গ নসিব করুন।

[৫১৪]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৭৪৭। হাদিসটির সনদ সহিহ।
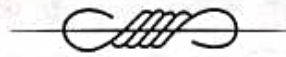
নবিজির পরিবার-পরিজনকে মহব্বত করা ঈমানের অংশ

এ আকিদা সম্পর্কে ৭টি আয়াত এবং ৪৩টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

নবিজি ﷺ-এর সকল সম্মানিতা স্ত্রী রা. এবং হজরত ফাতিমা রা., হজরত আলি রা. এবং হজরত হাসান ও হুসাইন রা.—এরা সকলেই আহলে বাইত তথা নবিজি ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত এবং সর্বদা আহলে বাইতই থাকবেন।

এটাও জরুরি, নবিজি ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের মহব্বতে কোনো সাহাবিকে গালমন্দ করা একদম উচিত নয়। বিশেষ করে হজরত আয়েশা রা. ও হজরত আবু বকর রা., হজরত উমর রা. এবং হজরত উসমান রা.-কে গালমন্দ করা একদমই ঠিক নয়। তাদের মধ্যে যে মতবিরোধ হয়েছে, তা ইজতিহাদি তথা গবেষণামূলক ত্রুটি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিন।

হজরত আলি রা. এবং হজরত হুসাইন রা.-এর এত ফজিলত সত্ত্বেও তারা কিন্তু মুশকিল কুশা তথা সকল সমস্যা সমাধানকারী কিংবা সকল কাজ সম্পাদনকারী নয়। এজন্য তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয নেই। কেননা নবিজি ﷺ এটা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন।

নবিজি ﷺ-এর ইচ্ছা ছিল, তিনি খলিফা নির্ধারণ করে যাবেন না। যেন ঐক্য অবশিষ্ট থাকে এবং উম্মত নিজেরাই তাদের খলিফা নির্বাচন করে। তবে নবিজি ﷺ-এর আশা ছিল হজরত আবু বকর রা. খলিফা হওয়া। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

কারা কারা নবিজির পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত

নবিজি ﷺ-এর সকল স্ত্রীগণ আহলে বাইত তথা নবিজি ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা স্ত্রীকেই ঘরওয়ালি তথা পরিবার বলা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার হলেন হজরত খাদিজা রা.। যিনি হজরত

ফাতিমা রা.-এর মা। তার পাশাপাশি হজরত আয়েশা রা., হজরত হাফসা রা. এবং অন্যান্য সকল স্ত্রীগণ আহলে বাইত তথা নবিজি ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত এবং সকলেই আয়াতের আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী পরিপূর্ণ পবিত্রতার মর্যাদায় ভূষিত।

পরবর্তী সময়ে নবিজি ﷺ হজরত ফাতিমা রা., হজরত আলি রা. এবং হজরত হাসান ও হুসাইন রা.-কে আহলে বাইত তথা নবিজি ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এজন্য পরবর্তী সময়ে তারাও ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ তথা সম্পূর্ণ পবিত্রতার মর্যাদা লাভ করেছেন।

কিছু লোকেরা বাড়াবাড়ি করে যে, 'আযওয়াজে মুতাহ্হারাত' তথা নবিজি ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে হজরত আয়েশা রা. এবং হজরত হাফসা রা.-কে আহলে বাইত তথা নবিজি ﷺ-এর পরিবার-পরিজন থেকে বের করে দিয়েছেন এবং আরও জুলুম করেছে যে, তাদেরকে গালমন্দ করে থাকে এবং হজরত আলি রা.-কে আহলে বাইত তথা নবিজি ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে এবং তাকে এমন সম্মান করে যে, নবিদের মর্যাদার চেয়েও অধিক মর্যাদা দিয়ে দেয়। এটা মোটেও ঠিক নয়। বরং সঠিক কথা হলো, আযওয়াজে মুতাহ্হারাত তথা নবিজি ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং হজরত ফাতিমা রা., হজরত আলি রা., হজরত হাসান এবং হজরত হুসাইন রা. আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত এবং নবিজির পরিবার-পরিজন হিসেবে এরা সকলেই সমান। আহলে বাইতের মধ্যে যে নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীগণ অন্তর্ভুক্ত; এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾

"হে নবি-পত্নিগণ, তোমরা অন্য কোনো নারীর মতো নও। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে (পরপুরুষের সঙ্গে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে। আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলি যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম

করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো। হে নবি পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে, আয়াতসমূহ ও হিকমত পঠিত হয়—তা তোমরা স্মরণ রেখো। নিশ্চয় আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।"[৫১৫]

এই আয়াতে নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীগণকে প্রথমে— ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ﴾ বলে সম্বোধন করেছেন। তারপর ﴿كُنَّ﴾ উপস্থিত নারীবাচক বহুবচন ক্রিয়া দ্বারা সম্বোধন করেছেন এবং এটাও বলেছেন, হে আহলে বাইতগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান। এজন্য আল্লাহ তাআলাই স্ত্রীগণকে আহলে বাইত তথা নবিজি ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

পুরো আয়াতটি দেখুন, ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ﴾ এর পূর্বেও ﴿كُنَّ﴾ উপস্থিত নারীবাচক বহুবচন ক্রিয়া দ্বারা নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীগণকে সম্বোধন করেছেন এবং ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ এর পরেও ﴿كُنَّ﴾ উপস্থিত নারীবাচক বহুবচন ক্রিয়া দ্বারা নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীগণকে সম্বোধন করেছেন। এজন্য মাঝখানে ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ﴾ থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পুরো আয়াতটি দ্বারাই নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য এবং তারা নবিজি ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত। আর পরবর্তী সময়ে হজরত ফাতিমা রা. এবং হজরত আলি রা.-কে নবিজি ﷺ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এজন্য হজরত খাদিজা রা., হজরত আয়েশা রা., হজরত হাফসা রা. প্রমুখসহ সকল স্ত্রীগণ নবিজি ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত।

নোট : আয়াতের মাঝখানে ﴿لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ এর মধ্যে ﴿عَنكُمُ﴾ এবং ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ﴾ উপস্থিত পুরুষবাচক বহুবচন ক্রিয়া এনেছেন। এর কারণ হলো, নবিজি ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের মধ্যে নবিজি ﷺ নিজেও অন্তর্ভুক্ত। এজন্য তাঁর সম্মানে ﴿كُمْ﴾ উপস্থিত পুরুষবাচক বহুবচন ক্রিয়া এনেছেন এবং এতে সকল স্ত্রীও অন্তর্ভুক্ত।

নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীগণ যে পূর্ব থেকেই আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত, এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

---

[৫১৫]. সুরা আহযাব, ৩৩: ৩২-৩৪

عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ الخ..... فَقُلْتُ وَأَنَا مَعَكُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ وَأَنْتِ مَعَنَا

"হজরত উম্মে সালামা রা. বলেন, যখন ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ﴾ এই আয়াত অবতীর্ণ হলো... আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, আমরা স্ত্রীগণও কি আপনার সঙ্গে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত? তখন নবিজি ﷺ বললেন, তোমরাও আমার সঙ্গে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।"[৫১৬]

এই হাদিসে স্পষ্টভাবে হজরত উম্মে সালামা রা. নবিজি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা স্ত্রীগণও কি আপনার সঙ্গে আহলে বাইতের এবং এই আয়াত ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ এর অন্তর্ভুক্ত? নবিজি ﷺ তখন উত্তরে বললেন– হ্যাঁ! তোমরাও আমার সঙ্গে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بُنِيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ... فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ بَارَكَ اللهُ لَكَ، فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ، يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَائِشَةَ، وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا، قَالَتْ عَائِشَةُ

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ যখন জয়নাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করার পর রুটি আর গোশত দিয়ে ওলিমা করলেন.... নবিজি ﷺ হজরত আয়েশা রা.-এর কক্ষের সামনে গেলেন এবং বললেন, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ তখন হজরত আয়েশা রা. বললেন, وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে বারাকাহ দান করুন। আপনি আপনার আহলে বাইতকে তথা নতুন স্ত্রী জয়নাবকে কেমন পেলেন? এভাবে নবিজি ﷺ সকল স্ত্রীদের কক্ষের সামনে তাশরিফ নিয়ে গেলেন এবং প্রত্যেক স্ত্রীকেই এভাবে বললেন, যেভাবে হজরত আয়েশা

[৫১৬]. তাবারানি, *মুজামুল কাবির*, ২৩/৩৫৭ হাদিস ৮৩৯ (হাদিসটির হুবহু এই শব্দে এই গ্রন্থেই এসেছে। তবে এই শব্দে ও বাক্যে ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে বর্ণনাটি আনেননি। বরং যখন উম্মে সালামা রাদি. বললেন, وأنا معكم يا رسول الله؟ তখন জবাবে আল্লাহর রাসুল ﷺ বললেন, إنك على خير... অর্থাৎ 'তুমি কল্যাণের ওপরেই আছ।' হাদিসটির সনদ সহিহ। *মুসনাদে আহমাদ*-সহ অন্যান্য গ্রন্থেও এভাবেই আছে।) *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২৬৫০৮।

রা.-কে বলেছিলেন এবং সকল স্ত্রীই তা-ই বললেন, হজরত আয়েশা রা. যা বলেছিলেন।"[৫১৭]

এই হাদিসে সকল স্ত্রীকেই নবিজি ﷺ তাঁর আহলে বাইত তথা নবিজি ﷺ-এর পরিবার-পরিজন বলেছেন। যার দ্বারা বুঝা গেল, অবশ্যই স্ত্রীগণ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হজরত আয়েশা রা., হজরত হাফসা রা.ও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।

আরেক হাদিসে এসেছে—

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ:انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ... قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ... ثُمَّ قَالَ: وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ

"ইয়াযিদ ইবনে হাইয়ান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও হুসাইন ইবনে সাবরাহ এবং উমর ইবনে মুসলিম যায়েদ ইবনে আরকামের নিকট গেলাম... মক্কা ও মদিনার মধ্যখানে একটি পানির কূপ রয়েছে। যার নাম হলো খুম্মা। নবিজি ﷺ একদিন সেখানে খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন... অতঃপর নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আমার পরিবার-পরিজন। আমি আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। (তিনবার) হজরত যায়েদ রা.-কে হজরত হুসাইন ইবনে সাবরাহ জিজ্ঞেস করলেন, হে যায়েদ! নবিজি ﷺ-এর আহলে বাইত তথা পরিবার-পরিজন কারা? নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীগণ কি আহলে বাইত তথা পরিবার-পরিজন নয়? তখন হজরত যায়েদ রা. বললেন, নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীগণ আহলে বাইত তথা পরিবার-পরিজন। তবে এদরকে ছাড়া যে-সকল লোকদের জন্য যাকাত খাওয়া হারাম তারাও আহলে বাইত তথা নবিজি ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত।"[৫১৮]

---

৫১৭. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪৭৯৩
৫১৮. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৬২২৫

এই হাদিসে নবিজি ﷺ-এর সকল স্ত্রীকে আহলে বাইত বলা হয়েছে। এজন্য নবিজি ﷺ-এর সকল স্ত্রী আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা তাতহির তথা সম্পূর্ণ পবিত্রতার মর্যাদায় মর্যাদাবান।

নিম্নের আয়াতে আহাল দ্বারা হজরত মুসা আ.-এর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا﴾

"যখন সে আগুন দেখল, তখন নিজ পরিবারকে বলল, তোমরা অপেক্ষা করো, আমি আগুন দেখতে পেয়েছি।"[৫১৯]

এই আয়াতে আহাল দ্বারা হজরত মুসা আ.-এর স্ত্রী সাফুরা আলাইহাস সালামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এজন্য সকল স্ত্রীগণই আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।

পরবর্তী সময়ে নবিজি ﷺ হজরত আলি রা., হজরত ফাতিমা রা., হাসান রা. এবং হুসাইন রা.-কে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন

পূর্বের আয়াতের বাচনভঙ্গি থেকে বুঝা যায়, আযওয়াজে মুতাহ্হারাত তথা পবিত্র স্ত্রীগণ পূর্ব থেকেই আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে নবিজি ﷺ হজরত আলি রা., হজরত ফাতিমা রা., হাসান রা. এবং হুসাইন রা.-কে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এখন তারা সর্বদার জন্য আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। এর প্রমাণ হলো হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةً، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ একদিন সকালবেলা বের হলেন। নবিজি ﷺ-এর গায়ে তখন কালো একটি নকশা করা চাদর ছিল। ইতঃমধ্যে হজরত হাসান ইবনে আলি রা. এলেন। নবিজি ﷺ তাকে চাদরের ভেতরে প্রবেশ করালেন। তারপর হজরত হুসাইন ইবনে

---

৫১৯. সুরা ত্বহা, ২০: ১০

আলি রা. এলেন। নবিজি ﷺ তাকেও হাসান রা.-এর সঙ্গে চাদরের ভেতরে প্রবেশ করালেন। তারপর হজরত ফাতিমা রা. এলেন। নবিজি ﷺ তাকেও চাদরের ভেতরে প্রবেশ করালেন। তারপর আলি রা. এলেন। নবিজি ﷺ তাকেও চাদরের ভেতরে প্রবেশ করালেন। তারপর এই আয়াত পাঠ করলেন—

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

হে নবি পরিবার (আহলে বাইত), আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।"[৫২০]

সাধারণত আহলে বাইত তথা ঘরের বাসিন্দা বলতে মানুষ ঘরের স্ত্রীদেরকেই বুঝে থাকে। বিবাহিতা কন্যা, জামাতা এবং মেয়ের সম্পর্কীয় নাতিকে ঘরের লোক বলে না। তারা যেহেতু অন্য ঘরে থাকে, তাই কেউ তাদেরকে ঘরের লোক বলে না। এজন্য নবিজি ﷺ বাহ্যিকভাবে তাদেরকে চাদরের ভেতরে প্রবেশ করিয়েছেন এবং স্ত্রীগণের সঙ্গে হজরত আলি রা., হজরত ফাতিমা রা., হাসান রা. এবং হুসাইন রা.-কে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এখন তারা সর্বদার জন্য আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। আযওয়াজে মুতাহ্হারাত তথা পবিত্র স্ত্রীগণ যেমন তাতহির তথা সম্পূর্ণ পবিত্রতার মর্যাদায় মর্যাদাবান, তেমনইভাবে এরাও সমানভাবে তাতহির তথা সম্পূর্ণ পবিত্রতার মর্যাদায় মর্যাদাবান। এর মধ্যে কোনো কম-বেশি করা উচিত নয়।

এর একটি উপমা হলো, মদিনা হারাম তথা মর্যাদাবান ও মহিমান্বিত ছিল না। কিন্তু নবিজি ﷺ আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হারাম তথা মর্যাদাবান ও মহিমান্বিত বানিয়েছেন। ঠিক তেমনইভাবে হজরত আলি রা., হজরত ফাতিমা রা., হাসান রা. এবং হুসাইন রা. আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু নবিজি ﷺ আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তাদেরকে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং আয়াতে তাতহিরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

মদিনাকে নবিজি ﷺ হারাম তথা মর্যাদাবান ও মহিমান্বিত বানানো সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي

---

৫২০. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৪২৪; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৭৮৭

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, মদিনার দুই পাথুরে ভূমির মধ্যবর্তী স্থান আমার ঘোষণা মোতাবেক হারাম তথা মর্যাদাবান ও মহিমান্বিত হিসাবে নির্ধারিত করা হয়েছে।"[৫২১]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি ﷺ মদিনাকে হারাম তথা মর্যাদাবান ও মহিমান্বিত আখ্যা দিয়েছেন। ঠিক এমনইভাবে নবিজি ﷺ হজরত আলি রা., হজরত ফাতিমা রা., হাসান রা. এবং হুসাইন রা.-কে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পূর্বে এরা আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই তাদেরকে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

নবিজির পরিবার-পরিজনের প্রতি মহব্বত করা ঈমানের অংশ

আহলে বাইত তথা নবিজি ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের মর্যাদা কতটা গুরুত্বপূর্ণ—দৈনিক কমপক্ষে পাঁচবার ফরজ সালাত পড়া হয়ে থাকে এবং পাঁচবারই নবিজি ﷺ-এর ওপর দরুদ পাঠ করা হয়। আর নবিজি ﷺ-এর ওপর দরুদ পাঠের সঙ্গে তাঁর বংশধরদের ওপরও দরুদ পাঠ করা আবশ্যক। যার দ্বারা বুঝা যায় যে, নবিজি ﷺ-এর আহলে বাইত ও বংশধরের মর্যাদা অনেক উঁচু এবং ঈমানের অংশ। আর সালাত ব্যতীত এমনিতে যখনই দরুদ শরিফ পাঠ করা হবে, তা হবে নবিজি ﷺ-এর আহলে বাইত ও বংশধরের জন্য দুআ। আর তা কিয়ামত পর্যন্ত হতেই থাকবে। দরুদে ইবরাহিমি হলো,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

"হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর, যেরূপ রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহিম আ. ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাজিল করুন মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর, যেরূপ বরকত নাজিল করেছেন ইবরাহিম আ. ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, সম্মানিত।"[৫২২]

---

[৫২১]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১৮৬৯; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২০৩৭

[৫২২]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৩৭০; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৪০৫; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৯৭৮; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৪৮৩; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ১২৮৫

খুম্মা কূপের পাড়ে নবিজি ﷺ তিনবার সাহাবায়ে কেরামকে বলেছেন, আমার আহলে বাইত তথা পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে সতর্ক থেকো এবং সকল আহলে বাইত তথা পরিবার-পরিজনকে পুরোপুরি সম্মান করো। কিন্তু মুশকিল হলো, খারেজিরা আহলে বাইতের মধ্য হতে হজরত আলি রা.-কে গালমন্দ করে। শাম তথা সিরিয়াবাসী আহলের বাইতের মধ্য হতে হজরত হুসাইন রা.-কে শহিদ করেছে। আর বাকি কেউ কেউ আহলে বাইতের মধ্য হতে হজরত আয়েশা রা. ও হজরত হাফসা রা.-কে গালমন্দ করে। তাই নবিজি ﷺ এই শ্রেণির বাড়াবাড়ি সম্পর্কেই অবহিত করেছেন। এজন্যই তিনবার আহলে বাইত তথা নবিজি ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের সম্মান করার গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ :انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ... قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ... ثُمَّ قَالَ: وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ

“ইয়াযিদ ইবনে হাইয়ান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও হুসাইন ইবনে সাবরাহ এবং উমর ইবনে মুসলিম যায়েদ ইবনে আরকামের নিকট গেলাম... মক্কা ও মদিনার মধ্যখানে একটি পানির কূপ রয়েছে। যার নাম হলো খুম্মা। নবিজি ﷺ একদিন সেখানে খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন... অতঃপর নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আমার আহলে বাইত তথা পরিবার-পরিজন। আমি আমার আহলে বাইত তথা পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার আহলে বাইত তথা পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার আহলে বাইত তথা পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হজরত যায়েদ রা.-কে হজরত হুসাইন ইবনে সাবরাহ জিজ্ঞেস করলেন, হে যায়েদ! নবিজি ﷺ-এর আহলে বাইত তথা পরিবার-পরিজন কারা? নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীগণ কি আহলে বাইত তথা পরিবার-পরিজন নয়? তখন হজরত যায়েদ রা. বললেন, নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীগণ আহলে বাইত তথা পরিবার-পরিজন। তবে এদেরকে ছাড়া যে-সকল

লোকদের জন্য যাকাত খাওয়া হারাম তারাও আহলে বাইত তথা নবিজি ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত।"[৫২৩]

এই হাদিসে নবিজি ﷺ অত্যন্ত দরদের সঙ্গে তিনবার সাহাবায়ে কেরামকে বলেছেন, আমার আহলে বাইত তথা পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সম্মান ও ভালোবাসার আচরণ করবে।

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا، كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي

"হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, আমি নবিজি ﷺ-কে বিদায় হজের সময় আরাফাতের দিন তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীরত আরোহিত অবস্থায় বক্তৃতা দিতে দেখেছি এবং তাঁকে বলতে শুনেছি, হে লোক সকল! আমি তোমাদের মধ্যে এমন জিনিস রেখে গেলাম, তোমরা তা ধারণ বা অনুসরণ করলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তার একটি হলো, আল্লাহ তাআলার কিতাব পবিত্র কুরআন। আর অপরটি হলো, আমার ইতরাত তথা আমার আহলে বাইত বা পরিবার-পরিজন।"[৫২৪]

অর্থাৎ পবিত্র কুরআন আর আহলে বাইতকে আঁকড়ে থাকবে, তাহলে পথভ্রষ্ট হবে না।

আরেক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে মহব্বত করো। কেননা তিনি তোমাদের তাঁর নিয়ামত দ্বারা রুজি দিয়ে থাকেন। আর আল্লাহ তাআলার

---

[৫২৩]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৬২২৫

[৫২৪]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৭৮৬; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২১০৬৮। এই হাদিসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। তবে এই মর্মে অনেক হাসান ও সহিহ সনদ বিশিষ্ট হাদিস রয়েছে।

মহব্বতে তোমরা আমাকেও মহব্বত করো। আর আমার মহব্বতে আমার আহলে বাইত তথা পরিবার-পরিজনকেও মহব্বত করো।"[৫২৫]

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহে সকল আহলে বাইতকে মহব্বত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

সাইয়্যেদা হজরত ফাতিমা রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা

হজরত ফাতিমা রা. নবিজি ﷺ-এর সম্মানিতা কন্যা ও কলিজার টুকরা। সকল জান্নাতি নারীদের সরদার। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তাকে অন্তর থেকে মহব্বত করে। তিনি আমাদের মাথার তাজ। তাঁর সম্মান করা ঈমানের অংশ মনে করে। তবে এটা ভিন্ন কথা যে, সম্মানের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করে না। নিম্নে সংক্ষেপে তাঁর কিছু ফজিলত বর্ণনা করা হচ্ছে। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي

"হজরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, ফাতিমা আমার টুকরা। সুতরাং যে তাকে দুঃখ দেবে, সে যেন আমাকে দুঃখ দিলো।"[৫২৬]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ، لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً... فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ: أَمَا تَرْضَيْ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، قَالَتْ: فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ

"উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, আমরা নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীগণ নবিজি ﷺ-এর কাছেই ছিলাম। আমাদের মধ্যে কেউ নবিজি ﷺ-কে ত্যাগ করিনি... নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, হে ফাতিমা! তুমি কি এ কথার ওপর সন্তুষ্ট নও যে, তুমি মুমিন নারীদের সরদার হবে? অথবা এটা ইরশাদ করেছেন—এই উম্মতের নারীদের সরদার হবে? হজরত ফাতিমা রা. বলেন, তোমরা যারা আমাকে হাসতে দেখেছ, তা এই কারণেই হাসছি।"[৫২৭]

---

[৫২৫]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৭৮৯। সনদ হাসান।

[৫২৬]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৭১৪

[৫২৭]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৬৩১৩

এই হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী হজরত ফাতিমা রা. মুমিন নারীদের সরদার এবং নবিজি ﷺ-এর কলিজার টুকরা।

হজরত ফাতিমা রা.-কে মিরাস কেন প্রদান করা হলো না

হজরত আবু বকর রা. হজরত ফাতিমা রা.-কে মিরাস দেননি। এর কারণ ছিল—নবির মিরাস বন্টন হয় না। হজরত আলি রা.নিজেই এর সত্যায়ন করেছেন, হ্যাঁ! নবির মিরাস বন্টন হয় না। আর না হয় হজরত আয়েশা রা. এবং হজরত হাফসা রা.ও স্ত্রী হিসেবে এক অষ্টমাংশ পেতেন। এজন্য এখন কেউ হজরত আবু বকর রা.-এর ওপর অপবাদ আরোপের সুযোগ নেই। এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ :إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ يَعْنِي مَالَ اللهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ، وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ وَذَكَرَ قَرَابَتَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَحَقَّهُمْ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي

“উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হজরত ফাতিমা রা. হজরত আবু বকর রা.-এর নিকট সংবাদ পাঠালেন—আল্লাহ তাআলা যা-কিছু মালে গনিমত হিসেবে দিয়েছেন, তা থেকে মিরাস দিন। নবিজি ﷺ মদিনায় পেয়েছিলেন, ফাদাকে পেয়েছিলেন এবং খাইবারে এক অষ্টমাংশ পেয়েছিলেন। এ সবগুলোর মিরাস দিন। তখন হজরত আবু বকর রা. বললেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেছিলেন, নবির মিরাস বন্টন হয় না। আমরা যা-কিছু রেখে যাই, তা উম্মতের জন্য সাদাকাহ হয়ে থাকে। তবে হ্যাঁ! এই সম্পদ মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার-পরিজনও খাবে। খাবারের অতিরিক্ত তারা পাবে না। নবিজি ﷺ-এর যুগে যেমনটি ছিল, আমি এই সাদাকাহসমূহে কোনো প্রকার পরিবর্তন করতে পারব না। নবিজি ﷺ যেমন আমল করেছেন, আমিও এমনটিই আমল করব। এর ওপর হজরত আলি রা.সাক্ষী দিয়েছেন। (হ্যাঁ! বিষয়টি এমনই, যেমনটি তিনি বলেছেন।)

অতঃপর হজরত আলি রা.-এর বললেন, হে আবু বকর রা., আমি আপনার ফজিলত জানি। তারপর নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে আত্মীয়তার কি সম্পর্ক এবং তার কি হক তা আলোচনা করেছেন। তারপর হজরত আবু বকর রা.কথা বলেছেন। তিনি বললেন, যেই সত্তার কুদরতি হাতে আমার জীবন, ওই সত্তার কসম খেয়ে বলছি—নবিজি ﷺ-এর নৈকট্য আমার নিকট আমার আত্মীয়স্বজনের প্রতি অনুগ্রহ করার চেয়ে অধিক প্রিয়।"[৫২৮]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—নবিজি ﷺ-এর সম্পদের মিরাস বণ্টন হয় না। হজরত আলি রা.তা সত্যায়ন করেছেন। তারপর এটাও দেখুন মিরাস নেওয়া ক্ষেত্রে শুধু হজরত ফাতিমা রা. নয়; বরং স্ত্রী হিসেবে হজরত আয়েশা রা. প্রমুখদেরও এক অষ্টমাংশ পাবেন। কিন্তু হজরত আবু বকর রা.নিজের কন্যাকেও নবিজি ﷺ-এর মিরাস বণ্টন করে দেননি।

মানুষ শুধু হজরত ফাতিমা রা.-এর কথাই বলে থাকে। হজরত আয়েশা রা. এবং হজরত হাফসা রা.-এর কথা বলে না।

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—আমার উত্তরাধিকারীরা কোনো স্বর্ণ মুদ্রা এবং রৌপ্য মুদ্রা ভাগাভাগি করবে না; বরং আমি যা-কিছু রেখে গেলাম তা থেকে আমার স্ত্রীদের খরচ এবং কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা সদকাহ।"[৫২৯]

এই হাদিসেও বর্ণিত হয়েছে—নবিজি ﷺ-এর সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টন হয় না। পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ ও কর্মচারীদের পারিশ্রমিক প্রদানের পর যা-কিছু থাকবে, তা উম্মতের জন্য সদকাহ। সুতরাং এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে হজরত ফাতিমা রা.-এর ওপর জুলুম করা অনেক বড় ভুল।

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيرٍ... إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ

---

[৫২৮]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৭১১ ও ৩৭১২

[৫২৯]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ২৭৭৬; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৭৬০; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৯৭৪।

"হজরত কায়েস ইবনে কাসির থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ... নিশ্চয় নবিগণ উত্তরাধিকার হিসেবে কোনো দিনার বা দিরহাম রেখে যাননি; বরং তাঁরা রেখে গেছেন মিরাস হিসেবে ইলম।"[৫৩০]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবিদের মিরাস হয় না। এজন্য হজরত আবু বকর রা. হজরত ফাতিমা রা.-কে মিরাস দেননি। তাই এ বিষয়ে বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নেই।

আহলে বাইতকে প্রাণ উজাড় করে দান করার ওয়াদা

হজরত আবু বকর রা.ওয়াদা করেছেন—আমি মিরাস দেবো না। কেননা তা জায়েয নেই। কিন্তু নিজের পরিবার-পরিজন থেকেও নবিজি ﷺ-এর আহলে বাইত ও পরিবার-পরিজনকে অধিক দান করব। তাদের পূর্ণ দেখাশোনা করব। এজন্য হজরত আবু বকর রা.-এর বক্তব্য হলো—

عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ: ارْقُبُوا مُحَمَّدًا ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ

"হজরত আবু বকর রা. বললেন, নবিজি ﷺ-এর আহলে বাইতের পুরোপরি খেয়াল রাখব।"[৫৩১]

হজরত আবু বকর রা.-এর এই বক্তব্যে বর্ণিত হয়েছে—আমি নিজেও আহলে বাইতের পুরোপুরি খেয়াল রাখব এবং তোমরাও আহলে বাইতের পুরোপুরি খেয়াল রাখো।

হজরত আলি রা. হজরত আবু বকর রা.-এর সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন

হজরত আবু বকর রা. এবং হজরত আলি রা.-এর মতবিরোধকে মানুষ অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করে থাকে এবং এখনো মুসলমানদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টির চেষ্টা করে। অথচ বাস্তবতা হলো, হজরত আলি রা. হজরত আবু বকর রা.-এর হাতে বাইআতও দিয়েছেন এবং হজরত আবু বকর রা.-এর সঙ্গে গলাও মিলিয়েছেন। যার ওপর সকল মুসলমান আনন্দিত হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ، وَفَدَكٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ،

---

৫৩০. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২৬৮২; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২২৩। সনদ হাসান।
৫৩১. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৭১৩

إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنِ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي، وَاللَّهِ لَآتِيَنَّهُمْ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَصِيبًا حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ، وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَىٰأَبِي بَكْرٍ وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا، فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا، فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا: أَصَبْتَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ-এর কন্যা হজরত ফাতিমা রা. হজরত আবু বকর রা.-এর নিকট নবিজি ﷺ-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি মদিনা ও ফাদাকে অবস্থিত ফাই (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) এবং খাইবারের খুমুসের (পঞ্চমাংশ) অবশিষ্ট থেকে মিরাসি স্বত্ব চেয়ে পাঠালেন। তখন হজরত আবু বকর রা.উত্তরে বললেন যে, নবিজি ﷺ বলে গেছেন, আমাদের (নবিদের) কোনো ওয়ারিশ হয় না, আমরা যা ছেড়ে যাব তা সদকাহ হিসেবে গণ্য হবে। অবশ্য মুহাম্মাদ ﷺ-এর বংশধরগণ এ সম্পত্তি থেকে ভরণপোষণ চালাতে পারবেন। আল্লাহর কসম! নবিজি ﷺ-এর সদকাহ তাঁর জীবদ্দশায়

যে অবস্থায় ছিল আমি সে অবস্থা থেকে এতটুকুও পরিবর্তন করব না। এ ব্যাপারে তিনি যেভাবে ব্যবহার করে গেছেন আমিও ঠিক সেভাবেই ব্যবহার করব। এ কথা বলে আবু বকর রা. হজরত ফাতিমা রা.-কে এ সম্পদ থেকে কিছু দিতে অস্বীকার করলেন। এতে হজরত ফাতিমা রা. (মানবোচিত কারণে) হজরত আবু বকর রা.-এর ওপর নাখোশ হলেন এবং তাঁর থেকে সম্পর্কহীন থাকলেন। তাঁর মৃত্যু অবধি তিনি হজরত আবু বকর রা.-এর সঙ্গে কথা বলেননি। নবিজি ﷺ-এর পর তিনি ছয় মাস জীবিত ছিলেন। তিনি ইন্তেকাল করলে তাঁর স্বামী হজরত আলি রা.রাতের বেলা তাঁকে দাফন করেন। হজরত আবু বকর রা.-কেও এ খবর দিলেন না এবং তিনি তার জানাজার সালাত আদায় করে নেন। হজরত ফাতিমা রা.-এর জীবদ্দশায় লোকজনের মনে আলি রা.-এর মর্যাদা ছিল। হজরত ফাতিমা রা. ইন্তেকাল করলে হজরত আলি রা.লোকজনের চেহারায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন দেখতে পেলেন। তাই তিনি হজরত আবু বকর রা.-এর সঙ্গে সমঝোতা ও তাঁর নিকট বাইআতের ইচ্ছা করলেন। এই ছয় মাসে তাঁর পক্ষে বাইআত গ্রহণের সুযোগ হয়নি। তাই তিনি হজরত আবু বকর রা.-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, আপনি আমার কাছে আসুন। (এটা জানতে পেরে) হজরত উমর রা. বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি একা একা তাঁর নিকট যাবেন না। হজরত আবু বকর রা. বললেন, তাঁরা আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করবে বলে তোমরা আশঙ্কা করছ? আল্লাহর কসম! আমি তাদের নিকট যাব। তারপর হজরত আবু বকর রা. তাঁদের নিকট গেলেন। হজরত আলি রা.কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে বললেন, আমরা আপনার মর্যাদা এবং আল্লাহ তাআলা আপনাকে যা-কিছু দান করেছেন সে সম্পর্কে অবহিত। আর যে কল্যাণ (অর্থাৎ খিলাফত) আল্লাহ তাআলা আপনাকে দান করেছেন সে ব্যাপারেও আমরা আপনার ওপর হিংসা পোষণ করি না। তবে খিলাফতের ব্যাপারে আপনি আমাদের ওপর নিজস্ব মতামতের প্রাধান্য দিচ্ছেন অথচ নবিজি ﷺ-এর নিকটাত্মীয় হিসেবে খিলাফতের কাজে আমাদেরও কিছু পরামর্শ দেওয়ার অধিকার আছে। এ কথায় হজরত আবু বকর রা.-এর চোখ থেকে অশ্রু উপচে পড়ল। এরপর তিনি যখন আলোচনা আরম্ভ করলেন তখন বললেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন, আমার নিকট আমার নিকটাত্মীয়দের চেয়েও নবিজি ﷺ-এর আত্মীয়গণ অধিক প্রিয়। আর এ সম্পদগুলোতে আমার এবং আপনাদের মধ্যে যে মতবিরোধ হয়েছে সে ব্যাপারেও আমি কল্যাণকর পথ অনুসরণে পিছপা হইনি। বরং এ ক্ষেত্রেও

আমি কোনো কাজ পরিত্যাগ করিনি যা আমি নবিজি ﷺ-কে করতে দেখেছি। তারপর হজরত আলি রা. হজরত আবু বকর রা.-কে বললেন, জোহরের পর আপনার হাতে বাইআত গ্রহণের ওয়াদা রইল। জোহরের সালাত পড়ে হজরত আবু বকর রা.মিম্বারে বসে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। তারপর হজরত আলি রা.-এর বর্তমান অবস্থা এবং বাইআত গ্রহণে তাঁর দেরি করার কারণ ও তাঁর পেশকৃত আপত্তিগুলো তিনি বর্ণনা করলেন। এরপর হজরত আলি রা.দাঁড়িয়ে ইস্তিগফার করে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন এবং হজরত আবু বকর রা.-এর মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বললেন, তিনি যা-কিছু করেছেন তা হজরত আবু বকর রা.-এর প্রতি হিংসা কিংবা আল্লাহ তাআলাপ্রদত্ত তাঁর মর্যাদাকে অস্বীকার করার জন্য করেননি। (তিনি বলেন) তবে আমরা ভেবেছিলাম যে, এ ব্যাপারে আমাদেরও পরামর্শ দেওয়ার অধিকার থাকবে। অথচ তিনি (হজরত আবু বকর রা.) আমাদের পরামর্শ ত্যাগ করে স্বাধীন মতের ওপর রয়ে গেছেন। তাই আমরা মানসিক কষ্ট পেয়েছিলাম। মুসলিমগণ আনন্দিত হয়ে বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন। এরপর হজরত আলি রা. এই উত্তম কাজটির দিকে ফিরে আসার কারণে মুসলিমগণ আবার তাঁর নিকটবর্তী হতে শুরু করলেন।”[৫৩২]

এই হাদিসে হজরত আলি রা. হজরত আবু বকর রা.-কে সম্মান করেছেন এবং তার মর্যাদা বর্ণনা করেছেন এবং হজরত আবু বকর রা.-এর নিকট বাইআতও প্রদান করেছেন। যার ফলে ওই সময়ের সকল মুসলমান অনেক খুশি হয়েছেন।

কিন্তু আফসোস! হজরত আলি রা. হজরত আবু বকর রা.-কে বাইআত প্রদান করে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পরবর্তী লোকেরা তাকে প্রোপাগান্ডা বানিয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে।

সকল মতাদর্শীদের গ্রন্থসমূহে এ কথা লেখা আছে—এই বাইআতের পরে হজরত আলি রা. তিনও খলিফার যুগ পর্যন্ত কখনোই খিলাফত চাননি এবং না কখনো এর আকাঙ্ক্ষা করেছেন। বরং সকল খলিফাকে অন্তর থেকে সাহায্য করে গেছেন এবং বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে গেছেন। যেন উম্মাহ বিক্ষিপ্ত না হয়।

---

৫৩২. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪২৪০

আমরাও যদি হজরত আলি রা.-এর আদর্শের ওপর চলে উম্মাহর ঐক্যের জন্য এক থাকতাম, তাহলে কতই-না ভালো হতো। কিন্তু আফসোস! আমরা আজ কত ভাগে বিভক্ত হয়ে আছি এবং জাতির চিত্রই পালটে গেছে।

আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা

আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি ইবনে আবি তালেব রা.। উম্মতের চতুর্থ খলিফা। তিনি আহলে বাইতের সদস্য এবং তা ছাড়াও আরও অনেক মর্যাদার অধিকারী। তিনি খুবই ভালো মনের মানুষ এবং অত্যন্ত বাহাদুর সাহাবি ছিলেন। তিনি জিবালুল ইলম তথা জ্ঞানের পাহাড় ছিলেন। তিনি সফরে-হজরে (মুকিম থাকা অবস্থায়) নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে খারেজিরা ভালো আচরণ করেনি। অনেক কষ্ট দিয়েছে এবং অবশেষে তাঁকে এক খারেজি শহিদ করে দিয়েছে। যার ফলে আজও আমাদের অন্তর কাঁদছে।

তাঁর মর্যাদা অনেক। তন্মধ্য থেকে কিছু মর্যাদা হলো যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ

"নবিজি ﷺ হজরত আলি রা.-কে বললেন, তুমি আমার এবং আমি তোমার।"[৫৩৩]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى

"হজরত ইবরাহিম ইবনে সাআদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ হজরত আলি রা.-কে বললেন, তুমি কি এ কথার ওপর সন্তুষ্ট, যেভাবে হজরত হারুন আ. হজরত মুসা আ.-এর নিকট হতে মর্যাদা লাভ করেছিলেন তুমিও আমার নিকট সেই মর্যাদা লাভ করো?"[৫৩৪]

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَابُهَا؛ فَمَنْ اَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ

---

৫৩৩. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২৬৯৯

৫৩৪. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩৭০৬

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আমি হলাম ইলমের শহর এবং আলি রা.হলো তার দরজা। সুতরাং যে ইলম অর্জন করতে চায়, সে যেন এই দরজার নিকট (অর্থাৎ আলি রা.-এর নিকট) আসে।"[৫৩৫]

এই হাদিস থেকে জানা গেল, হজরত আলি রা.ইলমের অনেক উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। আর বাস্তবেও এমনই ছিলেন। তাঁর নাহজুল বালাগাহ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হজরত আলি রা.-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি এবং তাঁর প্রতি ঘৃণা করাও ধ্বংসাত্মক

হজরত আলি রা. বলেন, আমার ব্যাপারে দুই প্রকারের লোক ধ্বংস হয়ে যাবে। এক হলো, যারা আমার মহব্বতের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করবে। অতিরঞ্জিত করে নবিজি ﷺ-এর মর্যাদার চেয়েও বৃদ্ধি করে ফেলবে। আর দ্বিতীয়ত হলো, তারা, যারা আমার প্রতি হিংসা এবং শত্রুতার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করবে। যেমন, খারেজিরা করেছে।

হজরত আলি রা. বলেন,

عَنْ أَبِي حِبَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلَانِ: مُفْرِطٌ فِي حُبِّي، وَمُفْرِطٌ فِي بُغْضِي

"হজরত আবু হাবরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত আলি রা.-কে এ কথা বলতে শুনেছি—দুই প্রকার লোক ধ্বংস হবে। এক হলো, যারা আমার মহব্বতের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করবে। আর দ্বিতীয়ত হলো, তারা, যারা আমার প্রতি শত্রুতার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করবে।"[৫৩৬]

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَيُحِبُّنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِيَّ وَلَيُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِي بُغْضِي

---

৫৩৫. *মুস্তাদরাকে হাকেম*, ৩/১৩৭ পৃষ্ঠা, হাদিস নং ৪৬৩৭; *তাবরানি কাবির*, ১১/৬৫ পৃষ্ঠা; হাদিস নং ১১০২১। হাদিসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

৫৩৬. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ*, ৬/৩৭৭, হাদিস নং ৩২১২৫। শাইখ আহমাদ শাকের *মুসনাদে আহমাদ*-এর তাহকিকে এর সনদকে হাসান বলেছেন।

"হজরত আবু সাওয়্যার আল-আদবি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত আলি রা.বলেছেন, কিছু লোক আমাকে সীমাতিরিক্ত মহব্বত করার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর কিছু লোক আমার প্রতি সীমাতিরিক্ত শত্রুতা করার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৫৩৭]

এটা পুরোপুরি বাস্তব—কিছু লোক হজরত আলি রা.-এর প্রতি মহব্বতের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করেছে এবং কিছু লোক হজরত আলি রা.-এর প্রতি ঘৃণার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করেছে।

এ ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত সম্পূর্ণ হকের ওপর আছে। তারা হজরত আলি রা.-কে অন্তর থেকে মহব্বত করে থাকে। কিন্তু এতে অতিরঞ্জিত করে নবিজি ﷺ-এর চেয়েও অধিক মর্যাদা প্রদান করে না। আর তাঁর প্রতি ঘৃণা করার তো প্রশ্নই আসে না। বরং সীমাহীন মহব্বত করেন এবং নিজেদের মাথার মুকুট মনে করেন।

হজরত আলি রা. সকল মুমিনের ওলি তথা বন্ধু

কেউ কেউ নিম্নের হাদিস দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে—হজরত আলি রা. সকল সমস্যা সমাধানকারী ও সকল প্রয়োজন পূর্ণকারী। কিন্তু হাদিসের অংশ اللهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজরত আলি রা.-এর প্রতি শত্রুতা রাখবে, হে আল্লাহ আপনি তার শত্রু হয়ে যান। এর থেকে বুঝা যায় যে, এখানে مَوْلَى শব্দের অর্থ হলো, বন্ধু। সাহায্যকারী এবং সকল সমস্যার সমাধানকারী নয়।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এ গ্রন্থের "আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।" শিরোনামের বিবরণটি পাঠ করার অনুরোধ রইল।

কেউ কেউ নিম্নের হাদিসটির মাধ্যমে এটাও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, হজরত আলি রা.-কে নবিজি ﷺ প্রথম খলিফা বানিয়েছেন। কেননা হজরত আলি রা.-কে সকল মুমিনের ওলি বানিয়েছেন। কিন্তু সঠিক কথা হলো, ওলি অর্থ বন্ধু। অর্থাৎ হজরত আলি রা.সকল মুমিনের বন্ধু। প্রসিদ্ধ আরবি অভিধান *আল-মুনজিদ* এর মধ্যেও ওলি শব্দের অর্থ লিখেছেন, নিকটে এবং প্রিয়। হাদিসটি হলো—

---

[৫৩৭]. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ*, ৬/৩৭৭, হাদিস নং ৩২১২৪। সনদ সহিহ।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ، فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَمَرَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَهَذَا وَلِيُّ مَنْ أَنَا مَوْلَاهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، اَللّٰهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ

"হজরত বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে বিদায় হজে উপস্থিত ছিলাম। তিনি পথিমধ্যে এক স্থানে অবতরণ করেন, অতঃপর সালাতের জামাতে একত্র হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি হজরত আলি রা.-এর হাত ধরে বললেন, আমি কি মুমিনদের নিকট তাদের জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয় নই? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি আবার বললেন, আমি কি মুমিনদের নিকট তাদের জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয় নই? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই। তখন নবিজি ﷺ তখন ইরশাদ করেন, আমি যার বন্ধু আলিও (রা.) তার বন্ধু। হে আল্লাহ! যে তাকে ভালোবাসে আপনি তাকে ভালোবাসুন। হে আল্লাহ! যে তার সঙ্গে (হজরত আলি রা.-এর) শত্রুতা করে আপনিও তার সঙ্গে শত্রুতা করুন।"[৫৩৮]

এই হাদিসে বলা হয়েছে—আমি যার ওলি, হজরত আলি রা.-এর তার ওলি। তারপর বলেছেন, যে ব্যক্তি হজরত আলি রা.-কে মহব্বত করে, হে আল্লাহ আপনি তার মহব্বতকারী হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি হজরত আলি রা.-এর প্রতি শত্রুতা রাখবে, হে আল্লাহ আপনি তার শত্রু হয়ে যান।

নোট : ওলি শব্দের অর্থ সাহায্যকারীও হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে ওলি শব্দের অর্থ বন্ধু। ওলি অর্থ প্রথম খলিফা কিংবা সাহায্যকারী নয়। এটা আপনি দুআর বাক্যসমূহের প্রতি লক্ষ করুন।

নিম্নের আয়াতেও مَوْلًى শব্দটি বন্ধু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾

"সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোনো কাজে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।"[৫৩৯]

---

[৫৩৮]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১১৬। সনদ সহিহ।

[৫৩৯]. সুরা দুখান, ৪৪: ৪১

এই আয়াতের আলোকে ওলি শব্দটি বন্ধু অর্থে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ সঠিক।

আমিরুল মুমিনিন হজরত হাসান এবং হুসাইন রা.-এর মর্যাদা

হজরত হাসান রা. এবং হজরত হুসাইন রা.নবিজি ﷺ-এর পরিবারের সদস্য। জান্নাতের সরদার এবং আমিরুল মুমিনিনও। কিন্তু শাম তথা সিরিয়াবাসী তাকে শহিদ করে দিয়েছে। আর আজ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়ার কারণ হয়ে আছে। হায়! যদি উভয় পক্ষই মিটমাট করে এক হয়ে যেত এবং আরব দেশসমূহকে মতবিরোধ থেকে বাঁচানো যেত। এটা মনে রাখতে হবে যে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত মদিনাবাসীর সাহায্যকারী। না তারা হজরত হুসাইন রা.-কে শহিদ করার মধ্যে শরিক ছিল, না তারা কারবালায় উপস্থিত ছিল। না হজরত আলি রা.-কে শহিদ করার মধ্যে শরিক ছিল, না শহিদকারীরদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। বরং আজ পর্যন্ত এই জুলুমের ওপর আফসোস করছে। এজন্য আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতকে অপবাদকারী সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। তাদের মর্যাদা ও ফজিলত সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি হলো যেমন এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي

“হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি হজরত হাসান এবং হুসাইন রা.-কে ভালোবাসে, সে যেন আমাকেই ভালোবাসে। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে যেন আমার প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করল।”[৫৪০]

তাদেরকে ভালোবাসার অর্থ হলো, তাদেরকে সম্মান করে তাদের জীবন ও আদর্শের ওপর নিজে জীবনযাপন করা।

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا

“হজরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ তাঁকে এবং হাসান রা.-কে একসঙ্গে কোলে তুলে নিয়ে বলতেন,

---

[৫৪০]. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৪৩। সনদ সহিহ।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি এদের দুজনকে ভালোবাসি। আপনিও তাদের ভালোবাসুন।"[৫৪১]

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ... رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى، وَيَقُولُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"হজরত আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত... আমি নবিজি ﷺ-কে মিম্বারে আরোহণকৃত অবস্থায় দেখেছি—হজরত হাসান ইবনে আলি রা. তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি একবার লোকদের দিকে আরেকবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আমার এ সন্তান একজন নেতা। সম্ভবত তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের বড় দুটি দলের মধ্যে মীমাংসা করাবেন।"[৫৪২]

আর এমনটিই হয়েছে- নবিজি ﷺ দুটি বড় দলের মাঝে মীমাংসা করিয়েছেন।

অপর হাদিসে এসেছে—

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—হজরত হাসান এবং হুসাইন রা. জান্নাতি যুবকদের সরদার। আর তাদের পিতা হজরত আলি রা.তাদের দুইজন থেকে উত্তম।"[৫৪৩]

অপর হাদিসে এসেছে—

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ أَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ

---

৫৪১. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৭৪৭; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৬২৫৬

৫৪২. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ২৭০৪

৫৪৩. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১১৮। ইমাম তিরমিজি ও ইমাম ইবনু হাজার রহ.-এর সনদকে হাসান বলেছেন। (*হিদায়াতুর রুয়াত*, ৫/৪৫৭)

"হজরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. বলেন, নবিজি ﷺ হজরত আলি, হজরত ফাতিমা, হজরত হাসান এবং হজরত হুসাইন রা.-কে লক্ষ করে বলেন, যারা তোমাদের শান্তি ও স্বস্তিতে রাখবে, আমিও তাদের শান্তিতে রাখব এবং যারা তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, আমিও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব।"[৫৪৪]

মনে রাখতে হবে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত হজরত আলি রা., হজরত ফাতিমা রা., হজরত হাসান রা. এবং হজরত হুসাইন রা.—তাদের সঙ্গে কখনোই শত্রুতা পোষণ করেনি। বরং সর্বদা তাদের সঙ্গে মহব্বত ও ভালোবাসা রেখেছেন এবং তাদেরকে ইজ্জত ও সম্মান করেছেন। এজন্য তাদের প্রতি শত্রুতার অপবাদ দেওয়া সম্পূর্ণ ভুল। তবে তারা শরয়ি সীমারেখা থেকে অতিরঞ্জিত করেন না।

উম্মুল মুমিনিন হজরত খাদিজা রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা

হজরত খাদিজা রা. যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনিও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হতেন এবং আয়াতে তাতহির তথা পবিত্রতার মর্যাদায় মর্যাদাবান হতেন। কেননা তিনি নবিজি ﷺ-এর ঘরের লোক তথা পরিবারের সদস্য। আর এটা ভিন্ন কথা—তার মৃত্যুর পরে পবিত্রতার আয়াত নাজিল হয়েছে—

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

"হে নবি পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।"[৫৪৫]

এই আয়াত নাজিল হওয়ার সময় যদি তিনি জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনিও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হতেন। তিনিও সকল মুমিনের মা। তাঁর ফজিলত ও মর্যাদা সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: خَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ

"হজরত আলি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছি—খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ হলেন এই উম্মতের নারীদের মাঝে

---

[৫৪৪]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৪৫। সনদ যইফ।

[৫৪৫]. সুরা আহযাব, ৩৩: ৩৩

শ্রেষ্ঠা। আর মারইয়াম বিনতে ইমরান (হজরত ঈসা আ.-এর সম্মানিতা মা) ছিলেন (তৎকালীন উম্মতের) নারীদের মাঝে শ্রেষ্ঠা।"[৫৪৬]

বাস্তবেই হজরত খাদিজা রা. উত্তম নারী ছিলেন। তিনি নবিজি ﷺ-এর দুঃসময়ে অনেক সঙ্গ দিয়েছেন। অনেক সান্ত্বনা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন।

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা

হজরত আয়েশা রা. আহলে বাইতদের মধ্যে একজন। আর তাঁরও ততটুকুই সম্মান, যতটুকু অন্যান্য আহলে বাইতদের সম্মান। তারপর বড় কথা হলো, তিনি নবিজি ﷺ-এর প্রিয়তমা স্ত্রী এবং গোটা উম্মতের মা। এজন্য তাঁর সামান্য অপমানও জায়েয নেই।

কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর অপমান সহ্য করবে? এটা কেমন জুলুম যে, কন্যা এবং জামাতার মহব্বতে তার স্ত্রীকে গালমন্দ করছে। একটু ভাবুন তো এটা কি করছেন! নবিজি ﷺ যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে কি এটা সহ্য করতেন?

হজরত আয়েশা রা. যদি হজরত আলি রা.-এর সম্পর্কে কোনো ভুল করে থাকেন, তাহলে আমরা সেটাকে ইজতিহাদি খাতা তথা গবেষণামূলক ভুল মনে করব এবং উম্মাহর ঐক্যের জন্য তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখব এবং অন্যদের মোকাবিলায় এক হয়ে যাব। আপনি কি দেখেন না—অমুসলিমরা আপনার বিরুদ্ধে কীভাবে আক্রমণ করছে এবং আপনার দেশকে ধ্বংস করছে। হজরত আয়েশা রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ

---

[৫৪৬]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৮৭৭। ইমাম নববি এর সনদকে হাসান ও ইমাম ইবনু হাজার রহ. সহিহ বলেছেন। (*তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ২/৩৪১; *ফাতহুল বারি*, ৬/৫৪৩)।

قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

"নিশ্চয় যারা এ অপবাদ[৫৪৭] রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর মনে করো না, বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রয়েছে, যতটুকু পাপ সে অর্জন করেছে। আর তাদের থেকে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে মহাআজাব। যখন তোমরা এটা শুনলে, তখন কেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা তাদের নিজেদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করল না এবং বলল না যে, এটা তো সুস্পষ্ট

---

৫৪৭. এটি উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা.-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদের ঘটনা। ৬ষ্ঠ হিজরিতে রাসুল ﷺ বনু মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে একস্থানে রাত্রিযাপনের জন্য অবস্থান করেন। রাতের শেষভাগে আয়েশা রা. প্রাকৃতিক প্রয়োজনে একটু দূরে যান। কিন্তু পথে তিনি তাঁর গলার হারটি হারিয়ে ফেলেন। তিনি তাঁর হার খুঁজতে থাকেন। এদিকে কাফেলা রওনা হয়ে যায়। তিনি হাওদার ভেতরেই আছেন মনে করে কেউ তাঁর খোঁজ করেনি। কারণ তাঁর শারীরিক গড়ন ছিল হালকা। হার খুঁজে পেয়ে তিনি এসে দেখেন যে, কাফেলা চলে গেছে। তিনি তখন কোনো প্রকার ছোটাছুটি না করে সেখানেই বসে পড়েন। এ আশায় যে কাফেলার রেখে যাওয়া মালামালের সন্ধানে নিয়োজিত লোক আসবেন। অবশেষে এ কাজে নিয়োজিত সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রা. সকালবেলায় আয়েশা রা.-কে দেখতে পেলেন এবং নিজের উটে তাঁকে আরোহণ করিয়ে নিজে পায়ে হেঁটে উটের রশি টেনে সসম্মানে তাঁকে নিয়ে কাফেলার সাথে মিলিত হন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিন সালুল কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আয়েশা রা.-এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ রটাতে থাকে। অবশেষে দীর্ঘ এক মাস পরে আল্লাহ তাআলা এ আয়াতগুলো নাজিল করে আয়েশা রা.-কে নির্দোষ ঘোষণা করেন এবং অপবাদ রটনাকারীদের কঠোর শাস্তির কথা জানিয়ে দেন। এই ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে "ইফক" এর ঘটনা হিসেবে প্রসিদ্ধ।

অপবাদ? তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী নিয়ে এলো না? সুতরাং যখন তারা সাক্ষী নিয়ে আসেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। আর যদি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের ওপর আল্লাহর দয়া ও তাঁর অনুগ্রহ না থাকত, তবে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে, তার জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই কঠিন আজাব স্পর্শ করত। যখন এটা তোমরা তোমাদের মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং তোমরা তোমাদের মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিলে, যাতে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিল না; আর তোমরা এটাকে খুবই তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর নিকট খুবই গুরুতর। আর তোমরা যখন এটা শুনলে, তখন তোমরা কেন বললে না যে, এ নিয়ে কথা বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি অতি পবিত্র মহান, এটা এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, যদি তোমরা মুমিন হও, তাহলে আর কখনো এর পুনরাবৃত্তি করবে না। আর আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না। আর যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, (তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে) আর নিশ্চয় আল্লাহ বড় মেহেরবান, পরম দয়ালু। হে মুমিনগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করবে, নিশ্চয় সে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেবে। আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, তাহলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারত না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, পবিত্র করেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এমন কসম না করে যে, তারা নিকটাত্মীয়দের, মিসকিনদের ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। আর তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। নিশ্চয় যারা সচ্চরিত্রা সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাআজাব। যেদিন তাদের জিহ্বাগুলো, তাদের হাতগুলো ও তাদের পাগুলো তারা যা করত, সে ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। সেদিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের ন্যায্য প্রতিদান পুরোপুরি দিয়ে দেবেন,

আর তারা জানবে যে, আল্লাহই সুস্পষ্ট সত্য। দুশ্চরিত্রা নারীরা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষরা দুশ্চরিত্রা নারীদের জন্য। আর সচ্চরিত্রা নারীরা সচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষরা সচ্চরিত্রা নারীদের জন্য; লোকেরা যা বলে, তারা তা থেকে মুক্ত। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক।"[৫৪৮]

বনু মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় হজরত আয়েশা রা. পেছনে রয়ে যান। পরে হজরত সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রা. নিজের উটে করে এনে কাফেলায় শামিল হন। যার কারণে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সালুল হজরত আয়েশা রা.-এর ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেন। এ ঘটনার দীর্ঘ এক মাস পরে উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ নাজিল হয়। যেখানে হজরত আয়েশা রা.-এর পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য তাঁর ওপর ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া সুস্পষ্ট জুলুম। কেউ কি কখনো নিজের মায়ের ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ কিংবা গালমন্দ করতে পারে? এটা অনেক বড় নির্লজ্জতা। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، يَقُولُ: أَيْنَ أَنَا غَدًا، أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي، وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত– মৃত্যু রোগকালীন নবিজি ﷺ জিজ্ঞেস করতেন, আগামীকাল কার ঘরে থাকার পালা? আগামীকাল কার ঘরে? এর দ্বারা তিনি হজরত আয়েশা রা.-এর ঘরের পালার ইচ্ছা পোষণ করতেন। তাই অন্যান্য স্ত্রীগণ নবিজি ﷺ-কে যার ঘরে ইচ্ছা অবস্থান করার অনুমতি দিলেন। তখন নবিজি ﷺ হজরত আয়েশা রা.-এর ঘরে ছিলেন। এমনকি তাঁর ঘরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। হজরত আয়েশা রা. বলেন, নবিজি ﷺ আমার জন্য নির্ধারিত পালার দিন আমার ঘরে ইন্তেকাল করেন এবং আল্লাহ তাঁর রুহ কবজ করেন এ অবস্থায় যে, তাঁর মাথা আমার গণ্ড ও সিনার মধ্যে ছিল এবং আমার থুথু (তাঁর থুথুর সঙ্গে) মিশ্রিত হয়ে যায়।"[৫৪৯]

---

[৫৪৮]. সুরা আহযাব, ২৪: ১১-২৬
[৫৪৯]. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৪৪৫০

হজরত আয়েশা রা. নবিজি ﷺ-এর কতটা প্রিয় স্ত্রী ছিলেন—তাঁর পালার অপেক্ষা করতেন এবং তাঁর কোলেই জীবনের শেষ সময় অতিবাহিত করেছেন এবং তাঁর কোলেই ইন্তেকাল করেছেন। তারপরও তাঁকে গালমন্দ করা খুবই খারাপ কথা।

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

"হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছি—আয়েশা রা.-এর মর্যাদা নারীদের ওপর এমন যেমন সারিদের (আরবের প্রসিদ্ধ একটি তরল খাবার) মর্যাদা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ওপর।"[৫৫০]

এই হাদিসে হজরত আয়েশা রা.-এর উচ্চ মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

আমিরুল মুমিনিন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। সর্বাবস্থায় নবিজি ﷺ-কে সঙ্গ দিয়েছেন এবং এমন সব খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, যা আর অন্য কোনো সাহাবির ভাগ্যে জুটেনি।

তাঁর বুদ্ধিমত্তা, কর্মকৌশল, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বীরত্ব ও সাহসিকতার কারণে উম্মত দ্বিখণ্ডিত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। আর না হয় যে বিশৃঙ্খলা ও মতবিরোধ হজরত আলি রা.-এর শেষ যুগে হয়েছিল, সেই বিশৃঙ্খলা ও মতবিরোধ নবিজি ﷺ-এর ইন্তেকালের পরেই হয়ে যেত। এজন্য মানুষের স্বভাবের ওপর চিন্তা-ভাবনা করুন এবং ওই সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا﴾

"যখন কাফিররা তাকে বের করে দিলো, সে ছিল দুজনের দ্বিতীয়জন। যখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিল, সে তার সঙ্গীকে বলল, তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।"[৫৫১]

---

৫৫০. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৩৭৭০

৫৫১. সুরা তাওবা, ৯: ৪০

এই আয়াতটি হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। কেননা নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে গারে সাওরে একমাত্র তিনিই ছিলেন। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ عَازِبٍ رَحْلًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا... هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا

"হজরত বারা ইবনে আজেব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হজরত আবু বকর রা.আমার পিতা হজরত আজেব রা.হতে ১৩ দিরহাম দিয়ে একটি হাওদা ক্রয় করলেন... হে আল্লাহর রাসুল! খোঁজকারীরা তো আমাদের দেখা পেয়ে গেল। তিনি বললেন, চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।"[৫৫২]

হজরত আবু বকর রা.কতটা বুদ্ধিমান এবং নবিজি ﷺ-এর আস্থাভাজন ছিলেন—হিজরতের মতো ভয়াবহ সফরের জন্য নবিজি ﷺ হজরত আবু বকর রা.-কে নির্বাচন করেছেন। আর তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তা আঞ্জাম দিয়েছেন এবং নবিজি ﷺ-কে নিরাপদে মদিনা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এমন কসম না করে যে, তারা নিকটাত্মীয়দের, মিসকিনদের ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। আর তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষক্রটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৫৫৩]

হজরত মিসতাহ ইবনে আসাসা রা. হজরত আবু বকর রা.-এর আত্মীয় ছিলেন। হজরত আবু বকর রা. হজরত মিসতাহ ইবনে আসাসা রা.-কে অর্থনৈতিক সাহায্য করতেন। তিনিও ভুলে ইফকের ঘটনায় হজরত আয়েশা রা.-এর অপবাদের ঘটনায় শরিক ছিলেন। এজন্য হজরত আবু বকর রা.

---

[৫৫২]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৬৫২
[৫৫৩]. সুরা নুর, ২৪: ২২

কসম খেলেন, তাকে আর সাহায্য করবেন না। এর ওপর এই আয়াত নাজিল হয়েছে। এরপর হজরত আবু বকর রা. হজরত মিসতাহ ইবনে আসাসা রা.-এর সাহায্য পুনরায় চালু করে দেন।

হজরত আবু বকর রা.-এর কত উচ্চ মর্যাদা! তাঁর ব্যাপারে এই আয়াত নাজিল হয়েছে। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—আমি যদি আমার উম্মতের কাউকে যদি বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। তবে তিনি আমার ভাই ও আমার সাহাবি।"[৫৫৪]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

"হজরত হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—আমার পরে আবু বকর ও উমরের অনুসরণ করবে।"[৫৫৫]

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ، قَالَ: ثُمَّ عُمَرُ وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ: عُثْمَانُ، قُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ، قَالَ: مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার পিতা হজরত আলি রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবিজি ﷺ-এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে? তিনি বললেন, আবু বকর রা.। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কে? তিনি বললেন, উমর রা.। আমার আশঙ্কা হলো, তারপর তিনি উসমান রা.-এর নাম বলে দেবেন। এজন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কি আপনি? তিনি তখন বললেন, না, আমি তো সাধারণ মুসলমানদের একজনমাত্র।"[৫৫৬]

---

[৫৫৪]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৬৫৬

[৫৫৫]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৬৬২। হাদিসটির সনদ সহিহ।

[৫৫৬]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৬৭১; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৬২৯

সাহাবির এই বাণীটিতে হজরত আলি রা.নিজেই হজরত আবু বকর রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা স্বীকার করেছেন। তাহলে অন্যান্যরা তাঁর ফজিলত ও মর্যাদা অস্বীকার করেন কেন?

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবিজি ﷺ-এর যুগেই সাহাবায়ে কেরামগণের পারস্পরিক মর্যাদা নির্ণয় করতাম। আমরা সর্বাপেক্ষা মর্যাদা দিতাম হজরত আবু বকর রা.-কে, তাঁরপর হজরত উমর রা.-কে, তারপর হজরত উসমান রা.-কে।"[৫৫৭]

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ، لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবিজি ﷺ-এর সময়েই হজরত আবু বকর রা.-এর ন্যায় মর্যাদাবান কাউকে মনে করতাম না। তারপর হজরত উমর রা.-কে তারপর হজরত উসমান রা.-কে। এরপরে আর সাহাবিদের মধ্যে কাউকে কারও ওপর মর্যাদা দিতাম না।"[৫৫৮]

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ থেকে বুঝা গেল, প্রথম হজরত আবু বকর রা., তারপর হজরত উমর রা., তারপর হজরত উসমান রা. এবং তারপর হজরত আলি রা.-কে উত্তম মনে করা হতো। আর উম্মত এই নিয়মেই তাদেরকে খলিফা বানিয়েছেন। এ ব্যাপারে কোনো ভুল নেই এবং কারও হকও নষ্ট হয়নি।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.সকল সাহাবিদের মধ্যে সর্বোত্তম

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

فَحَمِدَ اللهَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ... فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا، وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ

---

৫৫৭. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৬৫৫

৫৫৮. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৬৯৮; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৬২৮

"হজরত আবু বকর রা. হামদ ও সানা তথা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে বললেন... হজরত উমর রা. বললেন, আমরা কিন্তু আপনার নিকট বাইআত প্রদান করব। আপনি আমাদের নেতা। আপনিই আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের মধ্যে আপনি রাসুল ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। এই বলে হজরত উমর রা. হজরত আবু বকর রা.-এর হাত ধরে বাইআত প্রদান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকল সাহাবায়ে কেরাম বাইআত প্রদান করলেন।"[৫৫৯]

সাহাবির এই বাণীটিতে হজরত উমর রা.বলেছেন, হজরত আবু বকর রা.আমাদের মধ্যেও সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন এবং রাসুল ﷺ-এরও সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন। এজন্য সকলে মিলে তাঁকে খলিফা বানিয়েছিলেন।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. হজরত ফাতিমা রা.-এর জানাজা পড়িয়েছেন

অধিকাংশ বর্ণনা মতে হজরত আবু বকর রা. হজরত ফাতিমা রা.-এর জানাজা পড়াননি। কিন্তু একটি যইফ বর্ণনায় পাওয়া যায়, হজরত আবু বকর রা. হজরত ফাতিমা রা.-এর জানাজা পড়িয়েছেন। হজরত আবু বকর রা.-এর জন্য কি এটা কম মর্যাদা যে, হজরত আলি রা. হজরত আবু বকর রা.-কে দিয়ে হজরত ফাতিমা রা.-এর জানাজা পড়িয়েছেন। বর্ণনাটি হলো,

عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ فَاطِمَةَ، رضِيَ اللهُ عَنْهَا لَمَّا مَاتَتْ دَفَنَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلًا، وَأَخَذَ بِضَبْعَيْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَدَّمَهُ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا

"হজরত শাবি বর্ণনা করেন, হজরত ফাতিমা রা.-এর ইন্তেকাল হলে হজরত আলি রা.তাঁকে রাতেই দাফন শেষ করেছেন এবং হজরত আবু বকর রা.-এর বাজু ধরে সামনে বাড়িয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ হজরত ফাতিমা রা.-এর জানাজা পড়িয়েছেন।"[৫৬০]

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এবং উমর রা. নবিজির সম্মানিত শ্বশুর

এটা অনেক বড় ফজিলত ও মর্যাদা—হজরত আবু বকর রা. এবং হজরত উমর রা.নবিজি ﷺ-এর সম্মানিত শ্বশুর। তাদের উভয়ের কন্যা নবিজি ﷺ-কে দিয়েছেন। এজন্য তাদেরকে গালমন্দ করা উচিত নয়। এটা কে সহ্য করবে যে, তার শ্বশুরকে গালমন্দ করা।

---

৫৫৯. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৬৬৮

৫৬০. *বাইহাকি*, ৪/৪৬; হাদিস নং ৬৮৯৬। বর্ণনাটি সহিহ নয়। কেননা, ইমাম বাইহাকি রহ.-এর পরেই সহিহ বর্ণনাটি এনেছেন (হাদিস : ৬৮৯৭)। যেখানে স্পষ্টই উল্লেখ আছে ফাতিমার জানাজা আলি রাযি. পড়িয়েছেন এবং তিনি কাউকে এমনকি আমিরুল মুমিনিন আবু বকরকেও এর সংবাদ দেননি এবং আবু বুকাইর থেকেও *সহিহ বুখারি*তে এই বর্ণনা এসেছে।

তাদের উভয়ের কর্মকৌশলের দ্বারা মুসলমানদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়নি। যদি তাদের উভয়ের কর্মকৌশল, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বীরত্ব ও সাহসিকতা না হতো, তাহলে যে বিশৃঙ্খলা ও মতবিরোধ হজরত আলি রা.-এর শেষ যুগে হয়েছিল, সেই বিশৃঙ্খলা ও মতবিরোধ নবিজি ﷺ-এর ইন্তেকালের পরে হজরত আবু বকর রা.-এর যুগেই হয়ে যেত। এজন্য ওই সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرُ

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে অনেক মুহাদ্দাস (যার কলবে সত্য কথা অবতীর্ণ হয়) ব্যক্তি ছিলেন। আর আমার উম্মতের মধ্যে যদি কেউ মুহাদ্দাস হন, তাহলে সেটা হলো উমর।

হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে আরও বর্ণিত আছে, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—তোমাদের পূর্বে বনি ইসরাইলের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিলেন, যাঁরা নবি ছিলেন না বটে, তবে ফেরেশতারা তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। আমার উম্মতের মধ্যে এমন কোনো লোক হলে সেটা হতো উমর।"[৫৬১]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—হজরত উমর রা. এমন যোগ্য ব্যক্তি যে, তিনি মুহাদ্দাস (যার কলবে সত্য কথা অবতীর্ণ হয়) হতেন। কিন্তু এই উম্মতের মধ্যে মুহাদ্দাসের দরজা নেই। এজন্য তিনি মুহাদ্দাস হতে পারেননি।

বাকি ফজিলত ও মর্যাদা হজরত আবু বকর রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা শিরোনামের অধীনে আলোচনা করা হয়েছে।

---

[৫৬১]. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩৬৮৯

হজরত উমর রা. হজরত আলি রা.-এর জামাতা

হজরত উমর রা.-এর একটি বড় ফজিলত ও মর্যাদা হলো, তিনি হজরত আলি রা.ও হজরত ফাতিমা রা.-এর কন্যা হজরত উম্মে কুলসুম রা.-কে ১৭ হিজরিতে বিয়ে করে হজরত আলি রা.-এর জামাতা হন। এজন্য তাকে গালমন্দ করার সুযোগ নেই। কেননা, হজরত আলি রা.তাঁকে জামাতা বানিয়েছেন। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ: بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ، فَقَالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ

"হজরত উমর রা. মদিনার নারীদের মাঝে কিছু (রেশমি) চাদর বিতরণ করলেন। বিতরণের পর একটি নতুন চাদর থেকে যায়। তখন তাঁর নিকট উপস্থিত একজন তাঁকে বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন! এই চাদরটি নবিজি ﷺ-এর নাতনি উম্মে কুলসুম বিনতে হজরত আলি রা.-কে যিনি আপনার ঘরে আছেন তাকে দিয়ে দিন। তখন হজরত উমর রা. বললেন, উম্মে সালিত রা. এর অধিক হকদার।"[৫৬২]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হজরত উম্মে কুলসুম রা. হজরত উমর রা.-এর স্ত্রী ছিলেন।

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

سَمِعْتُ نَافِعًا... وَوُضِعَتْ جِنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ، وُضِعَا جَمِيعًا وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ

"হজরত নাফে রহ. বলেন, ... হজরত আলি রা.-এর কন্যা ও হজরত উমর রা.-এর স্ত্রী হজরত উম্মে কুলসুম রা. এবং তাঁর পুত্র যায়েদ উভয়ের জানাজা একসঙ্গে রাখা হয়েছিল। আর সেদিন উক্ত জানাজার ইমাম ছিলেন হজরত সাইদ ইবনুল আস রা.।"[৫৬৩]

সাহাবির এই বাণীটিতে বর্ণিত হয়েছে—হজরত উম্মে কুলসুম রা. হজরত উমর রা.-এর স্ত্রী ছিলেন। ১৭ হিজরিতে তাদের বিয়ে হয়।

---

৫৬২. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ২৮৮১

৫৬৩. *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ১৯৮০। হাদিসটির সনদ সহিহ।

যেখানে হজরত আলি রা. হজরত উমর রা.-কে জামাতা বানিয়েছেন এবং এতটা মহব্বত করেছেন, তাহলে এখন আমাদের এটা নিয়ে কোনো হইচইয়ের কী প্রয়োজন? আর কেনই-বা আমরা এটা নিয়ে পরস্পরে ঝগড়া করব আর মুসলিম উম্মাহকে দ্বিখণ্ডিত করব?

এটা অনেক চিন্তা-ভাবনার বিষয়।

আমিরুল মুমিনিন হজরত উসমান রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ.... ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ، فَقَالَ: أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ

"উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. বলেন, নবিজি ﷺ আমার ঘরে শুয়েছিলেন। হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত উন্মুক্ত ছিল... তারপর হজরত উসমান রা. এলেন। তখন নবিজি ﷺ উঠে বসে পড়লেন এবং নিজের কাপড় ঠিক করে নিলেন। তখন নবিজি ﷺ বললেন, যাকে ফেরেশতারা লজ্জা করে, আমি কি তাকে লজ্জা করব না?।"[৫৬৪]

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، وَرَفِيقِي فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নবিরই জান্নাতে একজন রফিক তথা অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে। আর আমার রফিক তথা অন্তরঙ্গ বন্ধু হবে হজরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রা.।"[৫৬৫]

অপর হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، لَقِيَ عُثْمَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ هَذَا جِبْرِيلُ، أَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ قَدْ زَوَّجَكَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِمِثْلِ صَدَاقِ رُقَيَّةَ، عَلَى مِثْلِ صُحْبَتِهَا

---

[৫৬৪]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৪০১

[৫৬৫]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১০৯। হাদিসটির সনদ দুর্বল ও মুনকাতি। তবে কিছু দুর্বল সনদে এই হাদিসের শাহেদ পাওয়া যায়।

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ মসজিদের দরজায় হজরত উসমান রা.-এর সাক্ষাৎ পেয়ে বললেন, হে উসমান! ইনি হজরত জিবরাইল আ.। যিনি আমাকে এইমাত্র সংবাদ দিলেন, আল্লাহ তাআলা তোমার সঙ্গে উম্মে কুলসুমের বিয়ে দিয়েছেন এবং তার মোহরও রুকাইয়ার মোহরের সমান।"[৫৬৬]

উম্মে কুলসুম এবং রুকাইয়া রা. উভয়ে নবিজি ﷺ-এর সম্মানিতা কন্যা। দুজনই পূর্বে আবু লাহাবের পুত্রদ্বয় উতবা এবং রাবিয়ার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীর সাক্ষাতের পূর্বেই আবু লাহাব তার উভয় ছেলেকে বলল, মুহাম্মাদ (ﷺ) এর কন্যাদেরকে তালাক দিয়ে দাও। তাই উভয়েই তালাক দিয়ে দেয়। নবিজি ﷺ প্রথমে রুকাইয়া রা.-কে হজরত উসমান রা.-এর নিকট বিয়ে দেন। তারপর রুকাইয়া রা.-এর ইন্তেকালের পরে উম্মে কুলসুম রা.-কেও হজরত উসমান রা.-এর নিকট বিয়ে দেন। এজন্য হজরত উসমান রা.-এর উপাধি হয়েছে—'যিন-নুরাইন' তথা দুই নুর/জ্যোতি বিশিষ্ট।

হজরত উসমান রা.নবিজি ﷺ-এর এত প্রিয় ছিলেন—দ্বিতীয় কন্যাও তাঁর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرِ ابْنَتِهِ الثَّانِيَةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَلَا أَبَا أَيِّمَ أَلَا أَخَا أَيِّمَ، تَزَوَّجَهَا عُثْمَانُ، فَلَوْ كُنَّ عَشْرًا لَزَوَّجْتُهُنَّ عُثْمَانَ وَمَا زَوَّجْتُهُ إِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ السَّمَاءِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ، هَذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُخْبِرُنِي أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَّجَكَ أُمَّ كُلْثُومٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَلَى مِثْلِ صَدَاقِ رُقَيَّةَ وَعَلَى مِثْلِ صُحْبَتِهَا

"হজরত আবু হুরাইরা রা.বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ নিজের দ্বিতীয় কন্যার কবরের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। যে হজরত উসমান রা.-এর বিবাহে ছিল। নবিজি ﷺ তখন বললেন, হে বিধবার পিতা! হে বিধবার ভাই! তুমি শোনো, আমি উসমানের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলাম। আমার যদি ১০টি কন্যাও থাকত, তাহলে আমি তাদেরকে উসমানের নিকট বিয়ে দিতাম। আমি তো আসমানের ওহির কারণে তার বিয়ে দিয়েছি। এ কথাও রয়েছে—মসজিদের

---

[৫৬৬]. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১১০। এই সনদেও উসমান ইবুন খালেদ যইফ রাবি। উপরন্তু এর কোনো শাহেদও নেই।

দরজায় হজরত উসমান রা.-এর সঙ্গে নবিজি ﷺ-এর সাক্ষাৎ হয়। নবিজি ﷺ তখন ইরশাদ করেন, হে উসমান! ইনি জিবরাইল আ.। যিনি আমাকে এইমাত্র সংবাদ দিলেন, আল্লাহ তাআলা রুকাইয়ার মোহরের সমপরিমাণ মোহরের বিনিময়ে তোমার সঙ্গে উম্মে কুলসুমের বিয়ে দিয়েছেন। শর্ত হলো তুমি তাকেও (উম্মে কুলসুমকে) রুকাইয়ার মতোই আদর-যত্নে রাখবে।"[৫৬৭]

এই হাদিসে তিনটি শিক্ষা রয়েছে। যথা :

১. হজরত উম্মে কুলসুম রা.-এর বিয়ে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন।

২. হজরত উসমান রা.কত উত্তম ব্যক্তি ছিলেন যে, নবিজি ﷺ বলেছেন, আমার যদি ১০টি কন্যাও থাকত, তাহলে আমি তাদের সকলকে একের পর এক উসমান রা.-এর নিকট বিয়ে দিতাম।

৩. হজরত উসমান রা. হজরত রুকাইয়া রা.-কে কেমন আদর-যত্নে রেখেছিলেন যে, নবিজি ﷺ বলেছেন, রুকাইয়া রা.-কে যেমন আদর-যত্নে রেখেছিলে, উম্মে কুলসুম রা.-কেও তেমন আদর-যত্নের আশায়ই আমি এই বিবাহ তোমার নিকট দিলাম।

এই আলোচনা আমি এজন্য করেছি—কেউ কেউ বর্তমানে এই প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে যে, হজরত উসমান রা.নবিজি ﷺ-এর দুই কন্যাকেই কষ্ট দিয়েছেন। নাউজুবিল্লাহি! যদি এমনটিই হতো, তাহলে নবিজি ﷺ নিজের দ্বিতীয় কন্যাকেও হজরত উসমান রা.-এর নিকট কেন বিয়ে দিলেন? আর এ কথাই বা কেন বললেন, আমার যদি ১০টি কন্যাও থাকত, তাহলে আমি তাদের সকলকে একের পর এক উসমান রা.-এর নিকট বিয়ে দিতাম।

এগুলো সব হলো, সাহাবিদের ওপর বিনা কারণে অপবাদ আরোপ। আমাদেরকে অবশ্যই এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

নবিজির সকল আত্মীয়স্বজনকে মহব্বত করার গুরুত্ব

নবিজি ﷺ-এর যে-সকল আত্মীয়স্বজন ঈমানের ওপর ইন্তেকাল করেছেন, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আন্তরিকভাবে মহব্বত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। যেহেতু আয়াতের মধ্যে এর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, সুতরাং এটা ঈমানের অংশ। এর মধ্য থেকে কোনো একজনকেও বের করে দেওয়া ঠিক নয়। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

---

৫৬৭. তাবরানি কাবির, মুসনাদে উম্মে কুলসুম বিনতে রাসুল ﷺ, ২২/৪৩৬ হাদিস নং ১০৬৩। এই সনদেও উসমান ইবনু খালেদ রয়েছে। যিনি মাতরুকুল হাদিস।

﴿قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا﴾

"বলো আমি এর জন্য তোমাদের কাছে আত্মীয়তার সৌহার্দ ছাড়া অন্য কোনো প্রতিদান চাই না। যে উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য তাতে কল্যাণ বাড়িয়ে দিই।"[৫৬৮]

কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা শুধু আহলে বাইতগণ উদ্দেশ্য। কিন্তু সঠিক কথা হলো القُرْبَىٰ শব্দটি ব্যাপক। সুতরাং নবিজি ﷺ-এর ওই সকল আত্মীয়স্বজন উদ্দেশ্য, যারা ঈমানের সঙ্গে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন।

নবিজির যে-সকল আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বিশেষভাবে আন্তরিক মহব্বত রাখা জরুরি

নবিজি ﷺ-এর সকল সম্মানিতা স্ত্রীগণ। হজরত খাদিজা রা., হজরত আয়েশা রা., হজরত হাফসা রা. প্রমুখদের প্রতি মহব্বত করা। কেননা তারা নবিজি ﷺ-এর সম্মানিতা স্ত্রী।

নবিজি ﷺ-এর সকল সম্মানিতা কন্যাগণ। ফাতিমা, জয়নাব, রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম রা.—সকলকে মহব্বত করবে। কেননা তারা নবিজি ﷺ-এর সম্মানিতা কন্যা।

নবিজি ﷺ-এর সকল সম্মানিত পুত্রগণ। ইবরাহিম, আবদুল্লাহ ও কাসিমকেও মহব্বত করবে। কেননা তারা নবিজি ﷺ-এর পুত্র।

নবিজি ﷺ-এর দুই জামাতা হজরত আলি রা. এবং হজরত উসমান রা.-কেও মহব্বত করবে। কেননা, তারা নবিজি ﷺ-এর সম্মানিত জামাতা।

নবিজি ﷺ-এর নাতি হজরত হাসান ও হজরত হুসাইন রা.-কে মহব্বত করবে। কেননা, তারা নবিজি ﷺ-এর আদরের নাতি।

নবিজি ﷺ-এর দুই শ্বশুর হজরত আবু বকর রা. এবং হজরত উমর রা.-কে মহব্বত করবে। কেননা তারা নবিজি ﷺ-এর সম্মানিত শ্বশুর।

উপর্যুক্ত সকলেই যাবিল কুরবা তথা নবিজি ﷺ-এর নিকটাত্মীয়ের অন্তর্ভুক্ত। আয়াতটি লক্ষ করুন—এই অর্থ তখনই হবে, যখন নবিজি ﷺ-এর আত্মীয়দেরকে অন্তর্ভুক্ত করবে। যেমনটি কোনো কোনো মুফাসসিরগণ করেছেন। আর না হয় অর্থ হবে— নবিজি ﷺ-কে এটা বলা হয়েছে যে, হে মক্কাবাসী! তোমাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক। তার প্রতি সম্মান করে তোমরা আমাকে কষ্ট দিয়ো না। বরং উত্তম হলো, তোমরা আমার ওপর ঈমান নিয়ে আসো।

---

৫৬৮. সুরা শুরা, ৪২: ২৩

উনবিংশ অধ্যায়

খিলাফতের সমস্যা

এ আকিদা সম্পর্কে ৪৩টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

খিলাফতের সমস্যাও অনেক বড় একটি সমস্যা। যার মধ্যে উম্মতের দুটি শ্রেণি জড়িয়ে আছে। আর বর্তমানে তো গোটা আরবেই এ পরিমাণ যুদ্ধ চলছে যে, সিরিয়া, ইরাক, ইয়ামান ও লিবিয়া ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

এই সমস্যা ছিল সাহাবায়ে কেরামের যুগের। বর্তমানে না সেই খিলাফত আছে, না খিলাফতের সমস্যা আছে। কিন্তু ওই যুগের বিষয়টিকেই আঁকড়ে ধরে আছে এবং তা বিনা কারণে উসকে দিয়ে উম্মতের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করছে। হায়! যদি এ বিষয়টিকে ভুলিয়ে দেওয়া যেত এবং সবাই মিলে নিজ নিজ দেশের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হতো, তাহলে কতই-না ভালো হতো। যে মুহূর্তে গোটা ইউরোপ মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে খুব সহজেই বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করছে, সেই মুহূর্তে মুসলমানরা বসে কোনো সমস্যা সমাধান করতে পারে না বরং যখনই বসে, তখনই আরও কোনো নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে বৈঠক থেকে উঠে।

খিলাফতের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

খিলাফতের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, রাজতন্ত্রের মতো কোনো ব্যক্তিকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় না। বরং প্রজাতন্ত্র অবশিষ্ট থাকবে এবং মুসলমান ঐকমত্যের ভিত্তিতে নিজেরাই নিজেদের খলিফা নির্বাচন করবে। তবে বিভিন্ন সময়ে নবিজি ﷺ ইশারা করেছেন—হজরত আবু বকর রা.উম্মতের জন্য অধিক উত্তম। তাঁর মধ্যে ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা অনেক উত্তম।

হজরত আলি রা. নিজেই বলেছেন, আমাকে খিলাফতের ওসিয়ত করেননি

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ :هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ، فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

"হজরত আবু জুহাইফা রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হজরত আলি রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের নিকট কি (নবিজি ﷺ-এর) কিছু লিপিবদ্ধ আছে? তিনি বললেন, না। শুধু আল্লাহর কিতাব (কুরআন) রয়েছে। আর একজন মুসলমানকে যে জ্ঞান দান করা হয় সেই বুদ্ধি ও বিবেক। এ ছাড়া কিছু এ সহিফাতে (পুস্তিকায়) রয়েছে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ সহিফায় (পুস্তিকায়) কী আছে? তিনি বললেন, ক্ষতিপূরণ ও বন্দিমুক্তির বিধান। আর এ বিধানটিও যে, মুসলিমকে কাফির হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না।"[৫৬৯]

এই হাদিসে প্রশ্নকারী স্পষ্টই জিজ্ঞেস করেছেন, খিলাফতের ব্যাপারে কি আপনার নিকট কোনো লিখিত আছে? তখন তিনি তা অস্বীকার করে বলেছেন যে, আমার নিকট খিলাফতের ব্যাপারে কোনো লিখিত নেই।

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ؟ , فَغَضِبَ عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ، وَقَالَ: مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ، غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي، بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَأَنَا وَهُوَ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ

"হজরত আমের ইবনে ওয়াসিলা রা. বলেন, জনৈক ব্যক্তি হজরত আলি রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, নবিজি ﷺ কি আপনাকে গোপনে এমন কোনো কথা বলেছেন যা অন্য কাউকে বলেননি? তখন (এ কথার কারণে) হজরত আলি রা.-এর চেহারা রাগে লাল হয়ে গেল এবং বললেন, তোমাদেরকে বাদ দিয়ে আমাকে চারটি কথা ব্যতীত আর কোনো কথা বলেননি। তখন আমি আর নবিজি ﷺ একটি ঘরে ছিলাম। আর তখন নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির ওপর লানত করেন, যে ব্যক্তি নিজের মাতা-পিতার ওপর লানত করে। আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির ওপরও লানত করেন, যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে জবাই করে। আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির ওপর

---

৫৬৯. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১১১

লানত করেন, যে ব্যক্তি কোনো বিদআতিকে আশ্রয় দেয় ও সাহায্য-সহযোগিতা করে। আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির ওপরও লানত করেন, যে ব্যক্তি জমিনের সীমানার নিশানা পরিবর্তন করে।"[৫৭০]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করেছেন যে, আপনাকে কি নবিজি ﷺ বিশেষ কোনো কথা বলেছেন? তখন হজরত আলি রা.বলেছেন, উপর্যুক্ত চারটি কথা ব্যতীত আর কোনো বিশেষ কথা বলেননি। যার উদ্দেশ্য ছিল, খিলাফতের ওসিয়ত সম্পর্কে আমাকে কিছু বলেননি।

যেখানে হজরত আলি রা.নিজেই কঠোরভাবে বলেছেন, আমার জন্য খিলাফতের ওসিয়ত করেননি, তাহলে অন্য লোকেরা কেন অপপ্রচার করে যে, হজরত আলি রা.প্রথম খলিফা এবং নবিজি ﷺ তাঁর জন্য খিলাফতের ওসিয়ত করেছেন। এর দ্বারাও এ কথার সত্যায়ন হয় যে, হজরত আবু বকর রা.-এর নিকট বাইআত প্রদানের পরে কখনো খিলাফতের দাবি করেননি। আর হজরত উসমান রা.-এর শাহাদাতের পরে যখন লোকেরা হজরত আলি রা.-কে খিলাফতের দায়িত্ব দিতে চাইলেন, তখন তিনি স্পষ্টভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করলেন। তারপর অনেক অনুরোধের পরে তা গ্রহণ করেন। যার দ্বারা বুঝা গেল, তিনি খলিফা হতে ইচ্ছুক ছিলেন না। শুধু অনিচ্ছা সত্ত্বেও উম্মতের উপকারের স্বার্থে অনেক অনুরোধের পরে তা গ্রহণ করেছেন। এজন্য এই অপপ্রচার করা যে, নবিজি ﷺ হজরত আলি রা.-এর জন্য খিলাফতের ওসিয়ত করেছেন, তা সঠিক নয়। বিশেষ করে বর্তমানে চৌদ্দশ বছর পরে এই সমস্যা নিয়ে মুসলমানদেরকে দ্বিখণ্ডিত করা তো মোটেও উচিত নয়।

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ

"হজরত আয়েশা রা. বলেন, নবিজি ﷺ মিরাস হিসেবে কোনো দিনার ও দিরহাম রেখে গেছেন, না কোনো বকরি ও উট রেখে গেছেন এবং না কোনো বস্তুর ওসিয়ত করেছেন।"[৫৭১]

---

[৫৭০]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৯৭৮; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ৪৪২৭
[৫৭১]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৬৩৫

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا، فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي، أَوْ قَالَتْ حَجْرِي؟، فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟

"হজরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ রা. থেকে বর্ণিত, লোকেরা হজরত আলি রা. খলিফা হওয়ার ওসিয়ত সম্পর্কে হজরত আয়েশা রা.-এর সামনে আলোচনা করলেন। হজরত আয়েশা রা. তখন বললেন, এই ওসিয়ত কখন করেছেন? নবিজি ﷺ তো আমার সিনার সঙ্গে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন অথবা বলেছেন, আমার কোলেই ছিলেন। নবিজি ﷺ তখন কুলি করার পাত্র তালাশ করেছেন। তারপর আমার কোলেই ঢলে পড়েছেন। আমি তো বুঝতেও পারিনি যে, নবিজি ﷺ কখন ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং হজরত আলি রা. খলিফা হওয়ার ব্যাপারে কখন ওসিয়ত করলেন?।"[৫৭২]

এই দুটি হাদিস থেকে বুঝা গেল—নবিজি ﷺ হজরত আলি রা. খলিফা হওয়ার ব্যাপারে ওসিয়ত করেননি।

নবিজি ﷺ ইঙ্গিত করেছেন—আমার পরে আবু বকর রা.-কে খলিফা নির্বাচন করে নিলে উত্তম হবে

নবিজি ﷺ স্পষ্টভাবে খলিফা বানানোর জন্য কাউকে নির্বাচন করেননি। কিন্তু কয়েকটি হাদিসে ইঙ্গিত করেছেন—হজরত আবু বকর রা.-কে খলিফা নির্বাচন করে নিলে উত্তম হবে। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَيْئًا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ؟ قَالَ أَبِي: كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ

"হজরত যুবাইর ইবনে মুতইম রা. থেকে বর্ণিত, জনৈক মহিলা নবিজি ﷺ-এর নিকট কিছু জানতে চাইলেন। নবিজি ﷺ তখন বললেন, আবার এসো। তখন সেই মহিলা আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি এসে যদি আপনাকে না পাই? (অর্থাৎ আপনার যদি ইন্তেকাল হয়ে যায়?) নবিজি

---

৫৭২. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৬৩৬

ﷺ তখন বললেন, তুমি যদি আমাকে না পাও, তাহেলে আবু বকরের নিকট এসো।"[৫৭৩]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ: ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ، وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ، وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ

"হজরত আয়েশা রা. বলেন, নবিজি ﷺ অসুস্থাবস্থায় আমাকে বললেন, তোমার পিতা আবু বকর এবং তোমার ভাইকে আমার নিকট ডাকো। তাহলে আমি একটি পত্র লিখে দেবো। আমি আশঙ্কা করছি কোনো আকাঙ্ক্ষাকারী আকাঙ্ক্ষা করবে অথবা কোনো দাবিকারী দাবি করবে—আমি অধিক উত্তম তথা খলিফা হওয়ার অধিক যোগ্য। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এবং মুমিনগণ আবু বকরকেই (খিলাফতের জন্য) পছন্দ করবে।"[৫৭৪]

এই হাদিস থেকে দুটি বিষয় বুঝা যায়। এক হলো, নবিজি ﷺ অসুস্থাবস্থায় যে পত্র লিখতে চেয়েছিলেন, তা হজরত আবু বকর রা.-এর খলিফা হওয়া সম্পর্কে লিখতে চেয়েছিলেন। হজরত আলি রা. খলিফা হওয়ার ব্যাপারে নয়। এজন্য হজরত আবু বকর রা. এবং তাঁর ছেলেকে ডাকতে বলেছেন। দ্বিতীয়ত হলো, নবিজি ﷺ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, আল্লাহ তাআলা এবং মুমিনগণ হজরত আবু বকর রা.-কেই খলিফা বানাবে। আর নবিজি ﷺ-এর এই আশা পূর্ণও হয়েছিল। তবুও নবিজি ﷺ কারও জন্য খলিফা হওয়ার ওসিয়ত করেননি।

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَعَادَتْ، فَقَالَ: مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ

---

৫৭৩. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২৩৮৬

৫৭৪. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২৩৮৭

"হজরত আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ-এর অসুস্থতা যখন বৃদ্ধি পেল, তখন নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—আবু বকরকে (রা.) বলো, সে যেন লোকদেরকে সালাত পড়িয়ে দেয় (অর্থাৎ সালাতের ইমামতি করে)। তখন হজরত আয়েশা রা. বললেন, তিনি কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি যখন আপনার স্থানে (ইমামতির জন্য) দাঁড়াবেন, তখন লোকদেরকে সালাত পড়ানো সম্ভব হবে না। তারপরও নবিজি ﷺ বললেন, আবু বকরকেই (রা.) বলো, সে যেন লোকদেরকে সালাত পড়িয়ে দেয় (অর্থাৎ সালাতের ইমামতি করে)। তখন হজরত আয়েশা রা. পুনরায় একই ওজর পেশ করলেন। তখন নবিজি ﷺ পুনরায় বললেন, আবু বকরকেই (রা.) বলো, সে যেন লোকদেরকে সালাত পড়িয়ে দেয় (অর্থাৎ সালাতের ইমামতি করে)। হজরত আয়েশা রা. তখন পুনরায় হজরত আবু বকর রা.-এর ওজর পেশ করলেন। তখন নবিজি ﷺ পুনরায় বললেন, আবু বকরকেই (রা.) বলো, সে যেন লোকদেরকে সালাত পড়িয়ে দেয় (অর্থাৎ সালাতের ইমামতি করে) তোমরা হজরত ইউসুফ আ.-এর সাথি মহিলাদের মতোই। অবশেষে একজন সংবাদদাতা হজরত আবু বকর রা.-এর নিকট সংবাদ নিয়ে এলেন এবং হজরত আবু বকর রা.নবিজি ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই সাহাবায়ে কেরামের সালাতের ইমামতি করলেন।"[৫৭৫]

এই হাদিসে নবিজি ﷺ তিনবার জোর দিয়ে হজরত আবু বকর রা.-কে সালাতের জামাতে ইমামতি করার জন্য বলেছেন। যা এ কথারই ইঙ্গিত যে, আমার পরেও হজরত আবু বকর রা.-ই সালাতের জামাতে ইমামতি করবে এবং আমির নিযুক্ত হবে। আর এ প্রকার হাদিসসমূহের ওপর ভিত্তি করেই সাহাবায়ে কেরাম হজরত আবু বকর রা.-কে খলিফা নির্বাচন করেছেন।

মানুষ বৃদ্ধদের কথা মেনে নেয়

আরও একটি কথা স্মরণ রাখবেন—মানুষের মধ্যে বিভিন্ন স্বভাবের মানুষ হয়ে থাকে। এজন্য মানুষ কারও নির্দেশ মানার ক্ষেত্রে একটু বেশি বয়সের লোকদের কথা মেনে নেয়। হজরত আলি রা.ইলমের পাহাড় ছিলেন। আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন যুবক। নবিজি ﷺ-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৩ বছর। এজন্য অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম সহজে তাঁর কথা মানত না। আর হজরত আবু বকর রা.-এর বয়স

---

[৫৭৫]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬৭৮

ছিল তখন ৬১ বছর। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ। এজন্য সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কথা খুব সহজেই মেনে নিতেন। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল অন্যদের তুলনায় অধিক। এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে খলিফা নির্বাচন করেছেন। এই তথ্যটির ওপরও গবেষণা করুন।

মতবিরোধের সময় খুলাফায়ে রাশেদিনদের অনুসরণ করা

হাদিস শরিফে বলা হয়েছে যে, মতবিরোধের সময় খুলাফায়ে রাশেদিনদের অনুসরণ করা উচিত। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

“হজরত ইরবাজ বিন সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ একদিন ফজরের সালাতের পর আমাদেরকে মর্মস্পর্শী ওয়াজ শুনালেন, যাতে আমাদের সকলের চোখে পানি চলে এলো এবং অন্তর কেঁপে উঠল। কোনো একজন বলল, এ তো বিদায়ী ব্যক্তির নসিহতের মতো। হে আল্লাহর রাসুল! এখন আপনি আমাদেরকে কী উপদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার এবং (আমিরের আদেশ) শ্রবণ ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (আমির) হাবশি ক্রীতদাসই হয়ে থাকে। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা বহু মতভেদ প্রত্যক্ষ করবে। তখন তোমরা নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করা হতে দূরে থাকবে। কেননা তা গোমরাহি বা ভ্রষ্টতা। তোমাদের মধ্যে কেউ সে যুগ পেলে সে যেন আমার সুন্নাতে ও সৎপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাতে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকে। তোমরা এসব সুন্নাতকে চোয়ালের দাঁতের সাহায্যে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো।”[৫৭৬]

---

৫৭৬. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২৬৭৬; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৬০৭; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৪২। সনদ সহিহ।

এই হাদিসে নবিজি ﷺ বলেছেন, আমার পরে অনেক মতবিরোধ হবে। ওই সময়ে খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। এজন্য তাদেরকে গালি দেওয়া উচিত নয়।

সকল সাহাবা সম্মিলিতভাবে হজরত আবু বকর রা.-কে খলিফা নির্বাচন করেছেন

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

فَحَمِدَ اللَّهَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ... فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا، وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ

"হজরত আবু বকর রা. হামদ ও সানা তথা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে বললেন... হজরত উমর রা. বললেন, আমরা কিন্তু আপনার নিকট বাইআত প্রদান করব। আপনি আমাদের নেতা। আপনিই আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের মধ্যে আপনি রাসুল ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। এই বলে হজরত উমর রা. হজরত আবু বকর রা.-এর হাত ধরে বাইআত প্রদান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকল সাহাবায়ে কেরাম বাইআত প্রদান করলেন।"[৫৭৭]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—সকল সাহাবায়ে কেরাম সম্মিলিতভাবে সন্তুষ্টচিত্তে হজরত আবু বকর রা.-এর নিকট বাইআত প্রদান করেছেন। এজন্য তাঁকে সকলে সর্বসম্মতিক্রমে খলিফা বানিয়েছিলেন এবং তিনি সকলের ঐকমত্যের আমির ছিলেন। সুতরাং এটা বলা সঠিক নয়—হজরত আবু বকর রা.জোর করে খলিফা হয়েছেন।

সাহাবির এই বাণীটিতে এটাও বর্ণিত হয়েছে—হজরত আবু বকর রা.সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন এবং রাসুল ﷺ-এরও সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন এবং বৃদ্ধ হওয়ার কারণে সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতাও অধিক ছিল। এজন্য সকলে মিলে তাঁকে খলিফা বানানোটা সর্বদিক থেকে উত্তম ছিল।

হজরত আলি রা.-ও হজরত আবু বকর রা.-এর নিকট বাইআত প্রদান করেছেন

পরবর্তী সময়ে হজরত আলি রা.-এর হজরত আবু বকর রা.-এর নিকট বাইআত প্রদান করেছেন। হাদিস শরিফে এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

---

৫৭৭. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৬৬৮

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ؛ وَفَدَكٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ: لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ، وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنِ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي، وَاللَّهِ لَآتِيَنَّهُمْ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَصِيبًا حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ، وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ وَلَكِنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا، فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا، فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا: أَصَبْتَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ

“হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ-এর কন্যা হজরত ফাতিমা রা. হজরত আবু বকর রা.-এর নিকট নবিজি ﷺ-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি মদিনা ও ফাদাকে অবস্থিত ফাই (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) এবং খাইবারের খুমুসের (পঞ্চমাংশ) অবশিষ্ট থেকে মিরাসি স্বত্ব চেয়ে পাঠালেন। তখন হজরত আবু বকর রা.উত্তরে বললেন যে, নবিজি ﷺ বলে গেছেন, আমাদের (নবিদের)

কোনো ওয়ারিশ হয় না, আমরা যা ছেড়ে যাব তা সদকাহ হিসেবে গণ্য হবে। অবশ্য মুহাম্মাদ ﷺ-এর বংশধরগণ এ সম্পত্তি থেকে ভরণপোষণ চালাতে পারবেন। আল্লাহর কসম! নবিজি ﷺ-এর সদকাহ তাঁর জীবদ্দশায় যে অবস্থায় ছিল আমি সে অবস্থা থেকে এতটুকুও পরিবর্তন করব না। এ ব্যাপারে তিনি যেভাবে ব্যবহার করে গেছেন আমিও ঠিক সেভাবেই ব্যবহার করব। এ কথা বলে আবু বকর রা. হজরত ফাতিমা রা.-কে এ সম্পদ থেকে কিছু দিতে অস্বীকার করলেন। এতে হজরত ফাতিমা রা. (মানবোচিত কারণে) হজরত আবু বকর রা.-এর ওপর নাখোশ হলেন এবং তাঁর থেকে সম্পর্কহীন থাকলেন। তাঁর মৃত্যু অবধি তিনি হজরত আবু বকর রা.-এর সঙ্গে কথা বলেননি। নবিজি ﷺ-এর পর তিনি ছয় মাস জীবিত ছিলেন। তিনি ইন্তেকাল করলে তাঁর স্বামী হজরত আলি রা.রাতের বেলা তাঁকে দাফন করেন। হজরত আবু বকর রা.-কেও এ খবর দিলেন না এবং তিনি তার জানাজার সালাত আদায় করে নেন। হজরত ফাতিমা রা.-এর জীবদ্দশায় লোকজনের মনে আলি রা.-এর মর্যাদা ছিল। হজরত ফাতিমা রা. ইন্তেকাল করলে হজরত আলি রা.লোকজনের চেহারায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন দেখতে পেলেন। তাই তিনি হজরত আবু বকর রা.-এর সঙ্গে সমঝোতা ও তাঁর নিকট বাইআতের ইচ্ছা করলেন। এই ছয় মাসে তাঁর পক্ষে বাইআত গ্রহণের সুযোগ হয়নি। তাই তিনি হজরত আবু বকর রা.-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, আপনি আমার কাছে আসুন। (এটা জানতে পেরে) হজরত উমর রা. বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি একা একা তাঁর নিকট যাবেন না। হজরত আবু বকর রা. বললেন, তাঁরা আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করবে বলে তোমরা আশঙ্কা করছ? আল্লাহর কসম! আমি তাদের নিকট যাব। তারপর হজরত আবু বকর রা. তাঁদের নিকট গেলেন। হজরত আলি রা. কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে বললেন, আমরা আপনার মর্যাদা এবং আল্লাহ তাআলা আপনাকে যা-কিছু দান করেছেন সে সম্পর্কে অবহিত। আর যে কল্যাণ (অর্থাৎ খিলাফত) আল্লাহ তাআলা আপনাকে দান করেছেন সে ব্যাপারেও আমরা আপনার ওপর হিংসা পোষণ করি না। তবে খিলাফতের ব্যাপারে আপনি আমাদের ওপর নিজস্ব মতামতের প্রাধান্য দিচ্ছেন অথচ নবিজি ﷺ-এর নিকটাত্মীয় হিসেবে খিলাফতের কাজে আমাদেরও কিছু পরামর্শ দেওয়ার অধিকার আছে। এ কথায় হজরত আবু বকর রা.-এর চোখ থেকে অশ্রু উপচে পড়ল। এরপর তিনি যখন আলোচনা আরম্ভ করলেন তখন বললেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন, আমার নিকট আমার

নিকটাত্মীয়দের চেয়েও নবিজি ﷺ-এর আত্মীয়গণ অধিক প্রিয়। আর এ সম্পদগুলোতে আমার এবং আপনাদের মধ্যে যে মতবিরোধ হয়েছে সে ব্যাপারেও আমি কল্যাণকর পথ অনুসরণে পিছপা হইনি। বরং এ ক্ষেত্রেও আমি কোনো কাজ পরিত্যাগ করিনি যা আমি নবিজি ﷺ-কে করতে দেখেছি। তারপর হজরত আলি রা. হজরত আবু বকর রা.-কে বললেন, জোহরের পর আপনার হাতে বাইআত গ্রহণের ওয়াদা রইল। জোহরের সালাত পড়ে হজরত আবু বকর রা.মিম্বারে বসে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। তারপর হজরত আলি রা.-এর বর্তমান অবস্থা এবং বাইআত গ্রহণে তাঁর দেরি করার কারণ ও তাঁর পেশকৃত আপত্তিগুলো তিনি বর্ণনা করলেন। এরপর হজরত আলি রা. দাঁড়িয়ে ইস্তিগফার করে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন এবং হজরত আবু বকর রা.-এর মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বললেন, তিনি যা-কিছু করেছেন তা হজরত আবু বকর রা.-এর প্রতি হিংসা কিংবা আল্লাহ তাআলাপ্রদত্ত তাঁর মর্যাদাকে অস্বীকার করার জন্য করেননি। (তিনি বলেন) তবে আমরা ভেবেছিলাম যে, এ ব্যাপারে আমাদেরও পরামর্শ দেওয়ার অধিকার থাকবে। অথচ তিনি (হজরত আবু বকর রা.) আমাদের পরামর্শ ত্যাগ করে স্বাধীন মতের ওপর রয়ে গেছেন। তাই আমরা মানসিক কষ্ট পেয়েছিলাম। মুসলিমগণ আনন্দিত হয়ে বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন। এরপর হজরত আলি রা. এই উত্তম কাজটির দিকে ফিরে আসার কারণে মুসলিমগণ আবার তাঁর নিকটবর্তী হতে শুরু করলেন।"[৫৭৮]

এই হাদিসে দুটি শিক্ষা রয়েছে। একটি হলো, হজরত আলি রা.পরবর্তী সময়ে হজরত আবু বকর রা.-এর নিকট বাইআত প্রদান করেছেন। দ্বিতীয়ত হজরত আলি রা. হজরত আবু বকর রা.-এর সম্মান ও মর্যাদার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন এবং হজরত আবু বকর রা.-এর হজরত আলি রা.-এর সম্মান ও মর্যাদার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। এটা কতই-না উত্তম ব্যাপার ছিল।

তারা উভয়ে পরস্পরে মীমাংসা করে নিয়েছেন। এজন্য বর্তমানে আমাদেরও উক্ত মীমাংসার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত। কেননা আমরা যতি সেটাকেই আঁকড়ে থাকি, তাহলে আমরা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাব এবং অন্যান্য জাতি আমাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বে। আর বর্তমানে হচ্ছেও তাই।

---

[৫৭৮]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪২৪০

খলিফা নির্বাচন হওয়ার পরে বিনা কারণে তাঁর সঙ্গে মতবিরোধ করা জায়েয নেই

খিলাফতের বাইআত প্রদানের পরে বিনা কারণে তাঁর সঙ্গে মতবিরোধ করা জায়েয নেই। কেননা এতে বিশৃঙ্খলা হবে। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ.... وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ

"হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবদি রাব্বিল কাবা রহ. থেকে বর্ণিত... নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি ইমামের হাতে হাত দিয়ে অন্তরের একনিষ্ঠতার সঙ্গে বাইআত প্রদান করেছে, তার জন্য উচিত হলো, যথাসাধ্য তার আনুগত্য করা। আর যদি দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি খলিফা হওয়ার জন্য ঝগড়া করে, তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দাও তথা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলো।"[৫৭৯]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরে তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করা উচিত।

সুতরাং এত সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরেও যে-সকল লোকেরা মতবিরোধের বিষয়টি বারবার সম্মুখে নিয়ে আসে, এটা মোটেও ঠিক নয়। এতে বিনা কারণে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ হয় এবং মুসলিম জাতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমাদের কোনো সম্মান ও মর্যাদা থাকে না।

পাঁচ খলিফার খিলাফতের সময়কাল

হাদিস শরিফে এসেছে—খেলাফতে রাশেদার সময়কাল হবে ৩০ বছর। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ سَفِينَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ قَالَ سَعِيدٌ: قَالَ لِي سَفِينَةُ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ أَبَا بَكْرٍ سَنَتَيْنِ، وَعُمَرُ عَشْرًا، وَعُثْمَانُ اثْنَيْ عَشْرَةَ وَعَلِيٌّ كَذَا، قَالَ سَعِيدٌ: قُلْتُ لِسَفِينَةَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَام لَمْ يَكُنْ بِخَلِيفَةٍ، قَالَ: كَذَبَتْ أَسْتَاهُ بَنِي الزَّرْقَاءِ، يَعْنِي بَنِي مَرْوَانَ

---

[৫৭৯]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৮৪৪

"হজরত সাফিনা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আল খিলাফাতু আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ তথা নবুয়তের ভিত্তিতে পরিচালিত খিলাফত ৩০ বছর অব্যাহত থাকবে। তারপর আল্লাহ তাআলার যাকে ইচ্ছা বা তাঁর রাজত্ব দান করবেন। হজরত সাইদ রহ. বলেন, আমাকে হজরত সাফিনা রা. এর বিস্তারিত বলেছেন। হজরত আবু বকর রা.-এর খিলাফতকাল দুই বছর। হজরত উমর রা.-এর খিলাফতকাল ১০ বছর। হজরত উসমান রা. খিলাফতকাল ১২ বছর। এমনইভাবে হজরত আলি রা.-এরও খিলাফত ছিল। হজরত সাইদ রহ. বলেন আমি হজরত সাফিনা রা.-কে বললাম, এরা ধারণা করে যে, হজরত আলি রা. খলিফা ছিলেন না। তখন হজরত সাফিনা রা. বললেন, বনু যারকা তথা মারওয়ানের বংশধরগণ মিথ্যা বলেছে।"[৫৮০]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আল খিলাফাতু আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ তথা নববি খিলাফতের সময়কাল ৩০ বছর হবে।

হজরত আবু বকর রা.-এর খিলাফতকাল ২ বছর ৩ মাস ১০ দিন। ১২ রবিউল আউয়াল ১১ হিজরি মোতাবেক ৭ জুন ৬৩২ ঈসায়ি থেকে ২২ জমাদিউস সানি ১৩ হিজরি মোতাবেক ২৩ আগস্ট ৬৩৪ ঈসায়ি পর্যন্ত।

হজরত উমর রা.-এর খিলাফতকাল ১০ বছর ৬ মাস ৪ দিন। ২২ রবিউস সানি ১৩ হিজরি মোতাবেক ২৩ আগস্ট ৬৩৪ ঈসায়ি থেকে ২৬ জিলহজ ২৩ হিজরি মোতাবেক ৩ নভেম্বর ৬৪৪ ঈসায়ি পর্যন্ত।

হজরত উসমান রা.-এর খিলাফতকাল ১১ বছর ১১ মাস ২২ দিন। ৩ মহররম ২৪ হিজরি মোতাবেক ৯ নভেম্বর ৬৪৪ ঈসায়ি থেকে ২৫ জিলহজ ৩৫ হিজরি মোতাবেক ২৪ জুন ৬৫৬ ঈসায়ি পর্যন্ত।

হজরত আলি রা.-এর খিলাফতকাল ৪ বছর ৮ মাস ২৫ দিন। ২৬ জিলহজ ৩৫ হিজরি মোতাবেক ২৫ জুন ৬৫৬ ঈসায়ি থেকে ২১ রমজান ৪০ হিজরি মোতাবেক ২৮ জানুয়ারি ৬৬১ ঈসায়ি পর্যন্ত।

হজরত হাসান রা.-এর খিলাফতকাল ৬ মাস ৩ দিন।

২২ রমজান ৪০ হিজরি মোতাবেক ২৯ জানুয়ারি ৬৬১ ঈসায়ি থেকে ২৫ রবিউল আউয়াল ৪১ হিজরি মোতাবেক ২৯ জুলাই ৬৬১ ঈসায়ি পর্যন্ত।

খিলাফতের মেয়াদকাল সর্বমোট ৩০ বছর।

---

[৫৮০]. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৬৪৬। হাদিসটির সনদ হাসান। এ ছাড়াও এর অনেক সহিহ শাহেদ রয়েছে।

ওলি কাকে বলে

এ আকিদা সম্পর্কে ৪টি আয়াত এবং ৫টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

যে লোক আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান রাখেন। শরিয়তের ওপর পুরোপুরি আমল করেন এবং মুত্তাকি ও পরহেজগার। মানুষের সঙ্গে অনেক ভালো সম্পর্ক রাখেন। নিয়মিত সালাত আদায় করেন ও সিয়াম পালন করেন। সম্পদের যাকাত দেন এবং সকল প্রকার হারাম কাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকেন। আল্লাহ তাআলাকে যথাযথ ভয় করেন। তাকে ওলি বলে।

আর যে লোক শরিয়তের ওপর আমল করেন না এবং বেলায়েতের দাবি করে, সে ওলি নয় ধোঁকাবাজ। বর্তমানে তো জন্ম থেকে নেংটা অনেক বাবাকেও ওলি মনে করা হয়। এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ... أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ الْمُصَلُّونَ مَنْ يُقِيمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْهِ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَحْتَسِبُ صَوْمَهُ يَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ حَقٌّ، وَيُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ يَحْتَسِبُهَا، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا

"হজরত উবাইদ ইবনে উমায়ের থেকে বর্ণিত... নবিজি ﷺ বিদায় হজের সময় ইরশাদ করেন—শোনে রাখো! আল্লাহর ওলি হলো সে, যে সালাত পড়ে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যা আল্লাহ তাআলা তার ওপর ফরজ করেছেন, তা প্রতিষ্ঠিত করে। রমজানের সিয়াম পালন করে। তা শুধু আল্লাহর জন্যই পালন করে এবং এটা মনে করে যে, সিয়াম পালন করা তার ওপর আল্লাহ তাআলার হক। আর শুধু সাওয়াবের আশায় নিজ সম্পদের যাকাত প্রদান করে। আল্লাহ তাআলা যে-সকল কবিরা গুনাহসমূহ নিষেধ করেছেন, সেগুলো থেকে বেঁচে থাকে।"[৫৮১]

---

[৫৮১]. *মুস্তাদরাকে হাকিম কিতাবুল ঈমান*, ১/১২৭ হাদিস নং ১৯৭; *সুনানে বায়হাকি*, ৩/৫৭৩ হাদিস নং ৬৭২৩। সনদ হাসান।

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে, যাকাত প্রদান করে এবং কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, সে আল্লাহর ওলি। আর যে এ সকল কাজ করে না এবং কবিরা গুনাহ ত্যাগ করে না, সে কখনো ওলি নয়। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

"শুনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের (ওলিদের) কোনো ভয় নেই, আর তারা পেরেশানও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত। তাদের জন্যই সুসংবাদ দুনিয়াবি জীবনে এবং আখিরাতে। আল্লাহর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসফলতা।"[৫৮২]

এই আয়াতে দুটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এক হলো, ওলিদের (আল্লাহর বন্ধুদের) কোনো প্রকার ভয় এবং পেরেশানি নেই। আর দ্বিতীয় হলো, ওলি হলো সে ব্যক্তি, যে ঈমান এনেছে এবং পুরো জীবন তাকওয়ার ওপর চলেছে। এজন্য যে ব্যক্তি মুমিন নয় বরং কাফির, সে কখনো ওলি হতে পারে না এবং যে ব্যক্তি তাকওয়ার ওপর ও শরিয়ত অনুযায়ী চলে না, সেও ওলি হতে পারে না।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে, তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াসম্পন্ন।"[৫৮৩]

এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—যে ব্যক্তি যত অধিক মুত্তাকি, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট তত অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।

ওলির আলামত হলো, তাকে দেখে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ হবে

যে ব্যক্তি সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন এবং তাকে দেখে দুনিয়ার কথা স্মরণ হয়, সে ওলি নয়। সে দুনিয়াদার। আর যার সরলতা, পরহেজগারি ও আল্লাহ তাআলার ভয় দেখে আখিরাতের কথা স্মরণ হয়, সে হলো আল্লাহর ওলি। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

---

৫৮২. সুরা ইউনুস, ১০: ৬২-৬৪
৫৮৩. সুরা হুজুরাত, ৪৯: ১৩

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ... سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اَوْلِيَاءَ اللهِ؟ قَالَ الَّذِيْنَ اِذَا رَؤُا ذَكَرَ اللهَ

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত... নবিজি ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, আল্লাহর ওলি কে? নবিজি ﷺ বললেন, যাকে দেখলে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ হয়।"[৫৮৪]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

"হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছি—আমি কি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কথা জানিয়ে দেবো না? তারা বললেন, হ্যাঁ! বলুন হে আল্লাহর রাসুল! নবিজি ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যাদের দেখলে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ হয়।"[৫৮৫]

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী উত্তম ব্যক্তি হলো সে, আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ হয়।

যে ব্যক্তি শরিয়তের অনুগামী নয়, সে ওলি নয়

বর্তমানে বহু লোক ওলি হওয়ার দাবি করে থাকে। কিন্তু তারা না সালাত আদায় করে। না সিয়াম পালন করে। না সম্পদের যাকাত প্রদান করে। বরং মানুষকে ধোঁকা দিয়ে তাদের থেকে অর্থ উপার্জন করে থাকে। এমন লোকদেরকে ওলি মনে করা উচিত নয় এবং তার ষড়যন্ত্র থেকে বেঁচে থাকা চাই।

কোনো ওলি যতই বড় হোক, সে কখনো নবি এবং সাহাবির থেকে উত্তম হতে পারে না

মনে রাখতে হবে—ওলির মর্যাদা সাহাবির মর্যাদা থেকেও কম। কেননা সাহাবি ঈমানের সঙ্গে নবিজি ﷺ-কে দেখেছে এবং নবিজি ﷺ-কে সাহায্য করেছে। আর ওলি নবিজি ﷺ-কে দেখেনি। এজন্য ওলি কখনো কোনো সাহাবি থেকে উত্তম হতে পারে না।

---

[৫৮৪]. *সুনানে নাসায়ি কুবরা*, ১০/১২৪ হাদিস নং ১১১৭১। হাদিসটির সনদ হাসান। এ ছাড়াও এই সনদের ও মতনের অনেক শাওয়াহেদ রয়েছে।

[৫৮৫]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৪১১৯। সনদ সহিহ লি গাইরিহি।

দ্বিতীয়ত হলো, নবিজি ﷺ সকল সাহাবির এমন ফজিলত ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন, যা কোনো ওলির নেই। এজন্য একজন ওলি সে যত বড়ই হোক, সে কখনো কোনো সাহাবির মর্যাদার সমতুল্য হতে পারে না।

কোনো কোনো লোক ওলিদের এমন ফজিলত ও মর্যাদা বর্ণনা করে থাকে— তাদের মর্যাদা সাহাবিদের মর্যাদার চেয়েও অধিক বাড়িয়ে ফেলে। এটা ঠিক নয়। যেমন হাদিস শরিফ ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي، اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ، وَمَنْ آذَى اللهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, হুঁশিয়ার! আমার সাহাবিদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। আমার পরে তোমরা তাদেরকে (গালি ও বিদ্রুপের) লক্ষ্যবস্তু বানিও না। যেহেতু যে ব্যক্তি তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করল, সে আমার প্রতি ভালোবাসার খাতিরেই তাদেরকে ভালোবাসল। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করল, সে আমার প্রতি শত্রুতা ও হিংসাবশেই তাদের প্রতি শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করল। যে ব্যক্তি তাদেরকে কষ্ট দিলো, সে যেন আমাকেই কষ্ট দিলো। আর যে আমাকে কষ্ট দিলো, সে যেন আল্লাহ তাআলাকেই কষ্ট দিলো। আর যে আল্লাহ তাআলাকে কষ্ট দিলো, শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা তাকে পাকড়াও করবেন।"[৫৮৬]

নবিজি ﷺ অত্যন্ত দরদের সঙ্গে নিজের সাহাবিদের ব্যাপারে বলেছেন যে, তোমরা তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানিও না।

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِي، أَوْ رَأَى مَنْ رَآنِي

"হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছি— জাহান্নামের আগুন এমন মুসলিম ব্যক্তিকে

---

[৫৮৬]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৮৬২; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২০৫৫০। হাদিসটির সনদ সহিহ লি গাইরিহি।

স্পর্শ করবে না, যে ব্যক্তি আমাকে দেখেছে অথবা আমার দর্শনলাভকারীকে দেখেছে (অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামকে) দেখেছে।"[৫৮৭]

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহে সাহাবিদের ফজিলত ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। যা কোনো ওলি কখনোই অর্জন করতে পারবে না। এজন্য যেকোনো একজন নগণ্য সাহাবিও সকল ওলিদের চেয়ে উত্তম।

ওলির থেকে অলৌকিক বিষয় প্রকাশ হলে তাকে কারামত বলা হয়

নবির থেকে কোনো অলৌকিক বিষয় প্রকাশ হলে তাকে মুজিযা বলা হয়। আর ওলির থেকে কোনো অলৌকিক বিষয় প্রকাশ হলে তাকে কারামত বলা হয়। আর যদি কোনো অমুসলিম থেকে কোনো অলৌকিক বিষয় প্রকাশ হয়, তাহলে তাকে বলা হয় ইস্তিদরাজ।

ওলির থেকেও অলৌকিক বিষয় তথা কারামত প্রকাশ হতে পারে। তবে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে, অনেক লোক কারামতের দাবি করে থাকে কিন্তু তাতে কোনো বাস্তবতা নেই। এজন্য বর্তমানে এ বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত। কারামত অবশ্যই সত্য। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا﴾

"যখনই যাকারিয়া তার কাছে তার কক্ষে প্রবেশ করত, তখনই তার নিকট খাদ্যসামগ্রী পেত।"[৫৮৮]

এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—হজরত মারইয়াম আ. যিনি নবি ছিলেন না। ওলিয়া ছিলেন। তাঁর নিকট বে মৌসুমের ফল থাকত। যা একটি কারামত।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান রাখে না, সে ওলি হতে পারে না

বর্তমান পৃথিবীতে অনেক লোক আছে, যারা আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান রাখে না। তার মধ্যে তাওহিদ নেই। অথবা কুফর কিংবা শিরকে লিপ্ত। আর সে দাবি করে—আমি ওলি ও কামিল ব্যক্তি। সে বিভিন্ন সাধনাও করে। মানুষকে তাবিজ ও তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে ঝাড়ফুঁকও করে। কখনো কখনো আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এতে কারও কারও একটু-আধটু উপকারও হয়ে থাকে। যার ফলে সাধারণ মানুষ মনে করে—সে আল্লাহর ওলি। আর তাই সাধারণ

---

[৫৮৭]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৮৫৮। হাদিসটির সনদ হাসান।
[৫৮৮]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ৩৭

মানুষ তার অনুসারী হয়ে যায়। কিন্তু এ কথা বুঝতে হবে—যার নিকট তাওহিদ নেই। যার নিকট ঈমান নেই। আল্লাহ তাআলার সকল বিধানের ওপর যে আমল করে না। সে আল্লাহর ওলি নয়। এটা তার জন্য ছাড় দেওয়া এবং ইস্তিদরাজ। তার নিকট কখনো মুরিদ হওয়া উচিত নয়। তার থেকে বেঁচে থাকা চাই। হতে পারে—তার নিকট আসা-যাওয়ার ফলে আপনার ঈমান ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এজন্য পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

"শুনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের (ওলিদের) কোনো ভয় নেই, আর তারা পেরেশানও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত। তাদের জন্যই সুসংবাদ দুনিয়াবি জীবনে এবং আখিরাতে। আল্লাহর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসফলতা।"[৫৮৯]

এই আয়াতে দুটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এক হলো, ওলিদের (আল্লাহর বন্ধুদের) কোনো প্রকার ভয় এবং পেরেশানি নেই। আর দ্বিতীয় হলো, ওলি হলো সে ব্যক্তি, যে ঈমান এনেছে এবং পুরো জীবন তাকওয়ার ওপর চলেছে। এজন্য যে ব্যক্তি মুমিন নয় বরং কাফির, সে কখনো ওলি হতে পারে না এবং যে ব্যক্তি তাকওয়ার ওপর ও শরিয়ত অনুযায়ী চলে না, সেও ওলি হতে পারে না।

[৫৮৯]. সুরা ইউনুস, ১০: ৬২-৬৪

একবিংশ অধ্যায়

ফেরেশতাদের বর্ণনা

এ আকিদা সম্পর্কে ৯টি আয়াত এবং ৩টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

ঈমানের অধ্যায়ে আসবে—ছয়টি বিষয়ের ওপর ঈমান রাখার দ্বারা মানুষ মুমিন হয়ে থাকে। তার মধ্যে একটি বিষয় হলো, ফেরেশতাদের ওপর ঈমান রাখা। এজন্য ফেরেশতাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে। আকিদাবিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *আকিদাতুত তহাবি*-এর ইবারত তথা মূলপাঠ হলো—

وَالْإِيمَانُ: هُوَ الْإِيمَانُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ

অর্থাৎ ঈমান হলো আল্লাহ তাআলার ওপর, তাঁর ফেরেশতাদের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর, তাঁর রাসুলগণের ওপর, কিয়ামতের দিনের ওপর এবং তাকদিরের ওপর বিশ্বাস করা।"[৫৯০]

এই ইবারত তথা মূলপাঠে বলা হয়েছে ছয় বস্তুর ওপর ঈমান আনার দ্বারা মানুষ মুমিন হয়। তন্মধ্যে একটি হলো, ফেরেশতাদের ওপর ঈমান আনা।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ঈমানের অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ফেরেশতাদের সৃষ্টি হলো নুর দ্বারা

ফেরেশতা হলো আল্লাহ তাআলার নিষ্পাপ এক মাখলুক। যাদের সৃষ্টি হলো নুর দ্বারা। এর দলিল হলো হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

---

৫৯০. *আকিদাতুত তহাবি*, আকিদা নং ৬৬ পৃষ্ঠা- ১৫

"উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, ফেরেশেতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে নুর দ্বারা। আর জিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের লেলিহান দ্বারা। আর হজরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করা হয়েছে ওই বস্তু দ্বারা যা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মাটি দ্বারা।"[৫৯১]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—ফেরেশতাদের নুর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জিনদের আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

সবচেয়ে বড় ফেরেশতা হলো চারজন

অসংখ্য ফেরেশতা রয়েছে। যার সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় ফেরেশতা হলো চারজন। যথা :

হজরত জিবরাইল আ., হজরত মিকাইল আ., হজরত ইসরাফিল আ., হজরত আজরাইল আ.।

নিম্নের আয়াতসমূহে হজরত জিবরাইল আ. এবং হজরত মিকাইল আ.-এর আলোচনা রয়েছে।

হজরত জিবরাইল আ.-কে সবচেয়ে বড় ফেরেশতা মনে করা হয় এবং তাঁর কাজ হলো—নবিদের নিকট ওহি নিয়ে আসা। আর হজরত মিকাইল আ.-এর কাজ হলো—বৃষ্টি বর্ষণ করা। এ কাজ তাঁরা আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। এজন্য বৃষ্টি বর্ষণের জন্য হজরত মিকাইল আ.-এর নিকট প্রার্থনা করা জায়েয নেই। একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট বৃষ্টি চাইতে হবে। অনেক অমুসলিমরা বৃষ্টির জন্য তাদের দেবীর পূজা করে থাকে। তারা মনে করে—বৃষ্টি বর্ষণ করা দেবীর ক্ষমতাধীন। এজন্য তারা দেবী ও দেবতাকে ডাকে। ইসলামে এটা হারাম। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ﴾

"যে শত্রু হবে আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রাসুলগণের, জিবরাইলের ও মিকাইলের তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের শত্রু।"[৫৯২]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

---

[৫৯১]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৯৯৬

[৫৯২]. সুরা বাকারা, ২: ৯৮

“বলো, যে জিবরাইলের শত্রু হবে (সে অনুশোচনায় মরুক) কেননা জিবরাইল তা আল্লাহর অনুমতিতে তোমার অন্তরে নাজিল করেছে।”[৫৯৩]

এই দুই আয়াতে হজরত জিবরাইল আ. এবং হজরত মিকাইল আ.-এর আলোচনা করা হয়েছে।

হজরত আজরাইল আ. (মালাকুল মাউত)-এর আলোচনা

হজরত আজরাইল আ.-এর কাজ হলো, মানুষের মৃত্যু ঘটানো। এ কাজটিও সে আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই করে থাকে। মৃত্যু দেওয়া এবং জীবন দেওয়া একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাজ। তবে আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই সে এ কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে। এজন্য জীবিত রাখার জন্য একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই দুআ করা হয়। ফেরেশতার নিকট নয়। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ يَتَوَفّٰىكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾

“বলো, তোমাদেরকে মৃত্যু দেবে মৃত্যুর ফেরেশতা যাকে তোমাদের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। তারপর তোমাদের রবের নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।”[৫৯৪]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿حَتّٰى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾

“অবশেষে যখন তোমাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায়। আর তারা কোনো ত্রুটি করে না।”[৫৯৫]

এই আয়াতে বলা হয়েছে—যখন মৃত্যুর সময় এসে যায়, তখন একমুহূর্তও বিলম্ব করা হয় না।

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে মালাকুল মাউতের আলোচনা করা হয়েছে।

হজরত ইসরাফিল আ.-এর আলোচনা

হজরত ইসরাফিল আ.-কে নিয়োগ করা হয়েছে শিঙায় ফুঁক দেওয়ার জন্য। সে কিয়ামাতের দিন শিঙায় ফুঁক দেবেন। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন—

---

[৫৯৩]. প্রাগুক্ত, ৯৭

[৫৯৪]. সুরা আস-সাজদা, ৩২: ১১

[৫৯৫]. সুরা আনআম, ৬: ৬১

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ﴾

"আর শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করেন তারা ছাড়া আসমানসমূহে যারা আছে এবং পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তারপর আবার শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।"[৫৯৬]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ صَاحِبَيِ الصُّورِ بِأَيْدِيهِمَا أَوْ فِي أَيْدِيهِمَا قَرْنَانِ, يُلَاحِظَانِ النَّظَرَ مَتَى يُؤْمَرَانِ

"হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, শিঙাধারী দুই ফেরেশতা তাদের দুই হাতে দুটি শিঙা নিয়ে অপেক্ষায় আছেন—কখন তাদের প্রতি (ফুৎকারের) নির্দেশ আসে।"[৫৯৭]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিসে শিঙায় ফুঁক দেওয়া ফেরেশতা হজরত মিকাইল আ.-এর কথা আলোচনা করা হয়েছে।

কিরামান-কাতিবিনের আলোচনা

কিরামান-কাতিবিন নামে দুজন ফেরেশতা আছে। একজন ডান দিকে এবং বাম দিকে থাকে। এরা উভয়ে আমাদের সকল আমল লিপিবদ্ধ করে। ডান দিকের ফেরেশতা নেক আমল লিপিবদ্ধ করে এবং বাম দিকের ফেরেশতা বদ আমল লিপিবদ্ধ করে। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾

"আর নিশ্চয় তোমাদের ওপর সংরক্ষকগণ রয়েছে। সম্মানিত লেখকবৃন্দ (কিরামান-কাতিবিন)। তারা জানে, যা তোমরা করো।"[৫৯৮]

এই আয়াতে কিরামান-কাতিবিন ফেরেশতার আলোচনা করেছেন।

---

[৫৯৬]. সুরা যুমার, ৩৯: ৬৮

[৫৯৭]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৪২৭৩। ইমাম বুসিরি এর সনদ যইফ বলেছেন। এবং ইমাম ইরাকিও এই সনদের রাবি 'হাজ্জাজ ইবুন আরতাহ'কে 'মুখতালাফ ফিহি' বলেছেন। (*যাওয়াদে ইবনু মাজাহ*, ৪/২৫৩; *তাখরিজুল এহইয়া*, ৫/২৭০)

[৫৯৮]. সুরা ইনফিতার, ৮২: ১০-১২

মুনকার-নাকিরের আলোচনা

এই দুইজনও ফেরেশতা। যখন কোনো মানুষকে কবরে শায়িত করা হয়, তখন এই দুই ফেরেশতা এসে মৃতব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করে থাকে। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ ، أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيرُ

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কিংবা তোমাদের মধ্যে কাউকে যখন কবরের মধ্যে হয়, তখন তার নিকট কালো বর্ণের এবং নীল চোখ বিশিষ্ট দুইজন ফেরেশতা আসে। তাদের মধ্যে একজনকে মুনকার এবং অপরজনকে নাকির বলা হয়।"[৫৯৯]

এই হাদিসে মুনকার-নাকির ফেরেশতার আলোচনা করা হয়েছে।

ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশের অনুগামী হয়

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾

"বরং তারা (ফেরেশতারা) সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর আগ বাড়িয়ে কোনো কথা বলে না, তাঁর নির্দেশেই তো তারা কাজ করে।"[৬০০]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

"আর আল্লাহকেই সিজদা করে আসমানসমূহে যা আছে এবং জমিনে যে প্রাণী আছে, আর ফেরেশতারা এবং তারা অহংকার করে না। তারা তাদের উপরস্থ রবকে ভয় করে এবং তাদেরকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা তা করে।"[৬০১]

---

৫৯৯. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ১০৭১। এর সনদ সহিহ। ইমাম বুখারি রহ.-এর মতে এর সনদের রাবিগণ (বর্ণনাকারী) *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থের রাবি (বর্ণনাকারী)। [*কাশফুল মানাহিজি ওয়াত তানাকিহ ফি তাখরিজি আহাদিসিল মাসাবিহ*, ১/১১৯]

৬০০. সুরা আম্বিয়া, ২১: ২৬-২৭

৬০১. সুরা নাহল, ১৬: ৪৯-৫০

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে—ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে না। বরং একমাত্র আল্লাহ তাআলার নির্দেশের ওপর চলে। এটাই তাদের স্বভাব।

আমাদের আকিদা হলো, মানুষ ফেরেশতাদের থেকে উত্তম। আর নবিজি ﷺ সকল ফেরেশতা ও নবি-রাসুল থেকেও উত্তম। আর আল্লাহ তাআলার পরে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা হলো নবিজি ﷺ-এর। এর বিস্তারিত আলোচনা নুর ও বাশার অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।
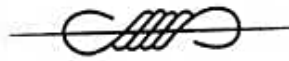
জিনের বর্ণনা

এ আকিদা সম্পর্কে ৮টি আয়াত এবং ২টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

আয়াত থেকে বুঝা যায়—মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তাআলা জিনদের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সমূহ কল্যাণার্থে আল্লাহ তাআলা পরবর্তী সময়ে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে জমিন আবাদ করেছেন।

জিনদেরকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ﴾

"আর ইতঃপূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছি উত্তপ্ত অগ্নিশিখা থেকে।"[৬০২]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ﴾

"আর তিনি জিনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা থেকে।"[৬০৩]

উপর্যুক্ত দুই আয়াতে বলা হয়েছে—জিনদেরকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দ্বারা

মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তার দলিল হলো পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا﴾

---

৬০২. সুরা হিজর, ১৫: ২৭

৬০৩. সুরা আর-রাহমান, ৫৫: ১৫

"তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন কাদা মাটি থেকে তারপর নির্ধারণ করেছেন একটি কাল।"[৬০৪]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾

"আর আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপর শুক্রবিন্দু থেকে তারপর তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।"[৬০৫]

এই আয়াতসমূহে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে—মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

কোনো কোনো জিন নেককার হয় আবার কোনো কোনো জিন বদকার হয়

জিনদের মধ্যে কেউ কেউ নেককারও হয় এবং কেউ কেউ বদকারও হয়ে থাকে। তবে যেহেতু তার জন্ম আগুন থেকে এজন্য ভালো কম হয় এবং খারাপই বেশি হয়ে থাকে।

জিনদের মধ্যে কিছু জিন নেককার হয়। এর দলিল হলো পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾

"বলো, আমার প্রতি ওহি করা হয়েছে যে, নিশ্চয় জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে। অতঃপর বলেছে, আমরা তো বিস্ময়কর কুরআন শুনছি, যা সত্যের দিকে হিদায়াত করে; অতঃপর আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের সঙ্গে কাউকে শরিক করব না।"[৬০৬]

এই আয়াতে বলা হয়েছে—কিছু জিন ঈমান এনেছে।

জিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য। যেমন অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

---

[৬০৪]. সুরা আনআম, ৬: ২

[৬০৫]. সুরা ফাতির, ৩৫: ১১

[৬০৬]. সুরা জিন, ৭২: ১-২

"আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে।"[৬০৭]

জিনরা মানুষকে কষ্ট দেয় কিন্তু এতটা নয়, যতটা এ নিয়ে বর্তমানে বাড়াবাড়ি রয়েছে

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—গতকাল রাতে এক অবাধ্য জিন হঠাৎ আমার সামনে প্রকাশ পেল। বর্ণনাকারী বলেন, অথবা তিনি অনুরূপ কোনো কথা বলেছেন, যেন সে আমার সালাতে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে তার ওপর ক্ষমতা দিলেন।"[৬০৮]

এই হাদিস থেকে জানা গেল, জিনরা মানুষকে কষ্ট দেয়।

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَتِ اسْتَهْوَتِ الْجِنُّ زَوْجَهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ

"হজরত উসমান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একজন মহিলা হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর নিকট এলো। যার স্বামীকে জিনে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। হজরত উমর রা.তখন সেই মহিলাকে চার বছর পর্যন্ত ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিলেন।"[৬০৯]

সাহাবির এই বক্তব্য থেকে বুঝা গেল, জিনেরা মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে।

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ থেকে বুঝা গেল, জিনেরা মানুষকে কষ্ট দিতে পারে।

জিনের কবিরাজদের থেকে সতর্ক থাকা উচিত

বর্তমানের অবস্থা হলো, সাধারণত তাবিজ দাতা এবং জিনের কবিরাজদের কোনো ইলম নেই। তারা নিজের উস্তাদ থেকে তাবিজের চেয়ে বেশি শিখেছে ধোঁকাবাজি। এজন্য যেই কবিরাজের কাছেই আপনি যাবেন, সে পরস্পরের

---

[৬০৭]. সুরা যারিয়াত, ৫১: ৫৬

[৬০৮]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪৬১; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৫৪১

[৬০৯]. *দারে কুতনি*, ৩/২১৭ পৃষ্ঠা হাদিস নং ৩৮৪৮। হাদিসটির সনদ হাসান।

ভেতরের কথা বলবে। যেমন, সে বলবে—তোমাকে তোমার কাছের মানুষ জাদু করেছে। তোমার ওপর জিনের আছর আছে। অর্থাৎ জিন থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে।

এখন সে তার তাবিজ দিলো। আপনি দুই মাসে কোনো ফলাফল পেলেন না। আপনি তখন আবার দ্বিতীয়বার তার নিকট গেলেন। তখন বলে দিলো—আমি তো দুটি জিনকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। এখন সেই জিনের বংশের আরও পাঁচটি জিন আক্রমণ করেছে। এখন এগুলোকে তাড়ানোর জন্য আরও দুই মাস লাগবে এবং ৫ হাজার টাকা লাগবে। এভাবে সে কয়েক মাস যাবৎ টাকা-পয়সা নিতে থাকে এবং সাধারণ মানুষ পেরেশান থাকে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। এমনও দেখা গেছে—কবিরাজ অন্তরে জিনের এমন ভয় ঢুকিয়ে দেয়, যা খুব সহজে কাটেও না। এজন্য এমন ভণ্ড কবিরাজদের থেকে সাবধান থাকা চাই।

শয়তানের সৃষ্টিও আগুন দিয়ে

শয়তানও জিনদের বংশধর এবং তাকেও আগুন দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে অনেক ইবাদত করার কারণে সে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। যখন ফেরেশতাদেরকে সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন শয়তানও বুঝেছে—আমাকেও সিজদা করার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু সে সিজদা করেনি। দলিল দিয়েছে—আমার জন্ম হলো, আগুন থেকে। সুতরাং আমার মর্যাদা মানুষ থেকে বেশি। এজন্য আমি মানুষকে সিজদা করব না। এর দলিল হলো, পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾

"তিনি বললেন, কীসে তোমাকে বাধা দিয়েছে যে, সিজদা করছ না, যখন আমি আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছি? সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে।"[৬১০]

এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—শয়তানকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে। পরবর্তীকালে তাকে চিরদিনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।

---

[৬১০]. সুরা আরাফ, ৭: ১২

মানুষ শয়তান এবং তার বংশধরকে দেখতে পায় না

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾

"নিশ্চয় সে ও তার দলবল তোমাদের দেখে যেখানে তোমরা তাদের দেখো না।"[৬১১]

এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—আমরা শয়তানকে দেখতে পাই না। এজন্য তার থেকে বাঁচার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে।

৬১১. প্রাগুক্ত: ২৭
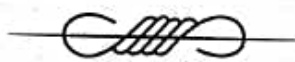
হাশরের ময়দান কায়েম করা হবে

এ আকিদা সম্পর্কে ১৬টি আয়াত এবং ২টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

কিছু মানুষ মনে করে—আমাদের মৃত্যুর পরে বরযখ তথা কবরে জীবিত করা হবে না এবং কোনো প্রকার হিসাব-নিকাশও হবে না। বরং মৃত্যুর পরে আমরা মাটি হয়ে যাব এবং ধ্বংস হয়ে যাব। নাস্তিক-মুরতাদদের এটাই বিশ্বাস। এর ওপর আল্লাহ তাআলা বলেন, না বিষয়টি এমন নয়। বরং মৃত্যুর পরে দ্বিতীয়বার জীবিত করা হবে। তাকে কিয়ামতের ময়দানে নিজের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। অতঃপর কৃতকর্ম অনুযায়ী তাকে জান্নাত কিংবা জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

হাশরের অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা কবরে মানুষকে জীবিত করবেন। তারপর তাকে হাশর ময়দানে নিয়ে যাবেন এবং সেখানে তার গোটা জীবনের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾

"যেদিন শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে, আর সেদিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব।"[৬১২]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾

"আর স্মরণ করো সেদিনের কথা, যেদিন প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত তাদেরকে আমি দলে দলে সমবেত করব। অতঃপর তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।"[৬১৩]

---

[৬১২]. সুরা ত্ব-হা, ২০: ১০২
[৬১৩]. সুরা নামাল, ২৭: ৮৩

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا﴾

"স্মরণ করো সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে করব সঞ্চালিত এবং পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর; সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কাউকে অব্যাহতি দেবো না। আর তাদেরকে তোমার রবের সামনে উপস্থিত করা হবে কাতারবদ্ধ করে। (আল্লাহ বলেন) তোমরা আমার কাছে এসেছ তেমনভাবে, যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম; বরং তোমরা তো ভেবেছিলে আমি তোমাদের জন্য কোনো প্রতিশ্রুত মুহূর্ত রাখিনি।"[৬১৪]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল, কিয়ামত কায়েম হবে।

মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে

মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে। তাদেরকে কিয়ামতের ময়দানে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাদের থেকে তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾

"তারপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে।"[৬১৫]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"এটি এজন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনিই সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"[৬১৬]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"তিনিই মৃতকে জীবিত করেন আর তিনিই সকল বিষয়ে সর্বক্ষমতাবান।"[৬১৭]

---

[৬১৪]. সুরা কাহাফ, ১৮: ৪৭-৪৮

[৬১৫]. সুরা মুমিন, ২৩: ১৬

[৬১৬]. সুরা হজ, ২২: ৬

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾

"সে বলে, হাড়গুলো জরাজীর্ণ হওয়া অবস্থায় কে সেগুলো জীবিত করবে? বলো, যিনি প্রথমবার এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই সেগুলো পুনরায় জীবিত করবেন। আর তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কেই সর্বজ্ঞাত।"[৬১৮]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে—মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে।

আল্লাহ তাআলা হাশর ময়দানের মালিক

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾

"যিনি বিচার দিবসের মালিক।"[৬১৯]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾

"আজ রাজত্ব কার? প্রবল প্রতাপশালী এক আল্লাহর।"[৬২০]

এই আয়াতসমূহে বলা হয়েছে—আল্লাহ তাআলা হাশরের দিনের মালিক। আর কেউ এর মালিক হবে না।

হাশর ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তির হিসাব নেওয়া হবে

হাশর ময়দানে পরিপূর্ণ হিসাব নেওয়া হবে এবং জীবনে যত পাপ-পুণ্য করেছিল, সবগুলোর আমলনামা বা বিবরণী মানুষের সামনে পেশ করা হবে। যে ব্যক্তি হিসাব দিতে সফল হবে, তাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাত দান করবেন। আর যে ব্যক্তি হিসাব দিতে ব্যর্থ হবে, তাকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

এজন্য মানুষের কখনো এটা ভাবা উচিত নয়—আমার হিসাব হবে না। এই ভুলে লিপ্ত থাকা উচিত নয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

---

৬১৭. সুরা শুরা, ৪২: ৯

৬১৮. সুরা ইয়াসিন, ৩৬: ৭৮-৭৯

৬১৯. সুরা ফাতিহা, ১: ৪

৬২০. সুরা গাফির, ৪০: ১৬

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

"আর আমলনামা রাখা হবে। তখন তুমি অপরাধীদেরকে দেখতে পাবে ভীত, তাতে যা রয়েছে তার কারণে। আর তারা বলবে, হায় ধ্বংস আমাদের! কী হলো এ কিতাবের! তা ছোট-বড় কিছুই ছাড়ে না, শুধু সংরক্ষণ করে এবং তারা যা করেছে, তা হাজির পাবে। আর তোমার রব কারও প্রতি জুলুম করেন না।"[৬২১]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾

"অতঃপর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে; অত্যন্ত সহজভাবেই তার হিসাব-নিকাশ করা হবে।"[৬২২]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾

"পাঠ করো তোমার কিতাব, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশকারী হিসেবে যথেষ্ট।"[৬২৩]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

"এটা এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন, আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।"[৬২৪]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾

"আর তোমরা যদি প্রকাশ করো যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে অথবা গোপন করো, আল্লাহ সে বিষয়ে তোমাদের হিসাব নেবেন।"[৬২৫]

---

[৬২১]. সুরা কাহাফ, ১৮: ৪৯
[৬২২]. সুরা ইনশিকাক, ৮৪: ৭-৮
[৬২৩]. সুরা বনি ইসরাইল, ১৭: ১৪
[৬২৪]. সুরা ইবরাহিম, ১৪: ৫১
[৬২৫]. সুরা বাকারা, ২: ২৮৪

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা গেল—কিয়ামতের দিন সকল মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়া হবে।

কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের হাতে আমলনামা প্রদান করা হবে

কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের হাতে আমলনামা প্রদান করা হবে। যারা নেককার ও জান্নাতি হবে, তাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে। আর যারা গুনাহগার ও জাহান্নামি হবে, তাদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا﴾

"অতঃপর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে; অত্যন্ত সহজভাবেই তার হিসাব-নিকাশ করা হবে। আর সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে আনন্দিত হয়ে ফিরে যাবে। আর যাকে তার আমলনামা পিঠের পেছনে দেওয়া হবে, অতঃপর সে ধ্বংস আহ্বান করতে থাকবে।"[৬২৬]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ﴾

"তখন যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে সে বলবে, নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো।"[৬২৭]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ﴾

"কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে সে বলবে, হায়, আমাকে যদি আমার আমলনামা দেওয়া না হতো।"[৬২৮]

এই আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে—কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের হাতে আমলনামা প্রদান করা হবে।

---

[৬২৬]. সুরা ইনশিকাক, ৮৪: ৭-১১
[৬২৭]. সুরা হাক্কাহ, ৬৯: ১৯
[৬২৮]. প্রাগুক্ত, ২৫

পুলসিরাত কায়েম করা হবে

কিয়ামতের ময়দানে পুলসিরাত কায়েম করা হবে এবং মানুষকে তার ওপর দিয়ে অতিক্রম করে যেতে হবে। যে ব্যক্তি নেককার হবে, সে তা অতিক্রম করে চলে যাবে এবং জান্নাতে পৌঁছে যাবে। আর যে গুনাহগার হবে, সে তা অতিক্রম করতে পারবে না এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾

“আর তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করতে হবে, এটি তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।”[৬২৯]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُمَا... فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ

“হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত... নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, জাহান্নামের ওপর একটি সেতু (পুলসিরাত) স্থাপন করা হবে। আর রাসুলদের মধ্যে আমিই প্রথম আমার উম্মতকে নিয়ে তা অতিক্রম করব।”[৬৩০]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: شِعَارُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الصِّرَاطِ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ

“হজরত মুগিরা ইবনে শুবা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, পুলসিরাত পার হওয়ার সময় মুমিনদের নিদর্শন হবে— رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ তথা হে আমার রব! আমাকে নিরাপদ রাখুন। আমাকে নিরাপদ রাখুন।”[৬৩১]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ থেকে জানা গেল, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের ওপর পুলসিরাত কায়েম করা হবে।
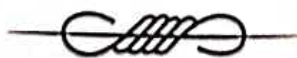
[৬২৯]. সুরা মারইয়াম, ১৯: ৭১

[৬৩০]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৮০৬।

[৬৩১]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২৪৩২। সনদ যইফ। তবে *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে এই মর্মের হাদিস বর্ণিত আছে। কিন্তু সেখানে মুমিনদের স্থলে নবিজির বর্ণনা রয়েছে।

মিজান সত্য

এ আকিদা সম্পর্কে ২টি আয়াত এবং ১টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

কিয়ামতের দিন বান্দার আমল পরিমাপের জন্য মিজান তথা পাল্লা কায়েম করা হবে। আমল পরিমাপের এই পাল্লা কেমন হবে তার বিস্তারিত জানা নেই। এর ইলম তথা জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই রয়েছে। কিন্তু কুরআন ও হাদিস থেকে এটা জানা যায়—কিয়ামতের দিন বান্দার আমল পরিমাপের জন্য মিজান তথা পাল্লা কায়েম করা হবে। পূর্ববর্তী যুগের দার্শনিকগণ এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন—আমলের তো দেহ নেই। তাহলে কীভাবে পরিমাপ করা হবে। কিন্তু বর্তমান আধুনিক যুগে জ্বর এবং হার্টের স্পন্দন পরিমাপ করা হয় এবং অতি সূক্ষ্ম বস্তুও পরিমাপ করা যায়। এজন্য বর্তমানে আর এই প্রশ্ন অবশিষ্ট নেই। মিজানের দ্বারা আমল পরিমাপ করা হবে। এর দলিল হলো পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾

“আর কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না। কারও কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা হাজির করব। আর হিসাবগ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।”[৬৩২]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾

৬৩২. সুরা আম্বিয়া, ২১: ৪৭

"আর সেদিন পরিমাপ হবে যথাযথ। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে সেসব লোক, যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কারণ তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি (অস্বীকার করার মাধ্যমে) জুলুম করত।"[৬৩৩]

এই আয়াতসমূহে মিজান তথা পাল্লার কথা উল্লেখ রয়েছে। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ، فَبَكَتْ... فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ، فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيزَانِ، حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ

"উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, একদা তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদলেন... নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—অবশ্যই তিনটি জায়গায় কেউ কাউকে মনে রাখবে না। তন্মধ্যে একটি হলো, মিজানের নিকট। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জানতে পারবে যে, তার আমলের পরিমাণ কম হবে নাকি বেশি।"[৬৩৪]

এই হাদিসে মিজান এবং আমল পরিমাপের কথা উল্লেখ রয়েছে।
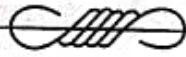
[৬৩৩]. সুরা আরাফ, ৭: ৮-৯

[৬৩৪]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৭৫৫। হাদিসটির সনদ সহিহ তবে মুরসাল। এ ছাড়াও ইমাম ইরাকি এর সনদকে জাইয়্যিদ বলেছেন। (*তাখরিজুল এহইয়া*, ৫/২৮০)

আল্লাহ তাআলা জান্নাত সৃষ্টি করেছেন

এ আকিদা সম্পর্কে ১৪টি আয়াত এবং ৩টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

পূর্বে কিছুটা মতবিরোধ ছিল, জান্নাত-জাহান্নাম এখনো সৃষ্টি করেছেন কি না? কিছু লোকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, জান্নাত-জাহান্নাম এখনো সৃষ্টি করেননি। বরং কিয়ামতের পরে সৃষ্টি করবেন। কেননা এখন তো এর প্রয়োজন নেই। কিন্তু কুরআনুল কারিমের আয়াতের প্রতি লক্ষ করলে বুঝা যায়—আল্লাহ তাআলা জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করে ফেলেছেন। জান্নাত সৃষ্টি করার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

“আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও জমিনের সমান, যা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।”[৬৩৫]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾

“আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি করেছেন জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে।”[৬৩৬]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ﴾

“আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যা তলদেশে নদী প্রবাহিত।”[৬৩৭]

---

[৬৩৫]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৩৩

[৬৩৬]. সুরা তাওবা, ৯: ৮৯

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু তৈরি করে রেখেছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো ব্যক্তির মন কল্পনা করেনি।"[৬৩৮]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিসে— أَعْدَدْتُ অতীতকাল বাচক ক্রিয়ার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। যার দ্বারা বুঝা গেল, জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়ে গেছে।

আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾

"তাহলে আগুনকে ভয় কর যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।"[৬৩৯]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

"আর আল্লাহ তাদের ওপর রাগ করেছেন এবং তাদেরকে লানত করেছেন, আর তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জাহান্নাম; এবং গন্তব্য হিসেবে তা কতই-না নিকৃষ্ট!"[৬৪০]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾

"আর তোমরা আগুনকে ভয় করো, যা কাফিরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।"[৬৪১]

---

[৬৩৭]. প্রাগুক্ত, ১০০

[৬৩৮]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪৭৮০; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৮২৪

[৬৩৯]. সুরা বাকারা, ২: ২৪

[৬৪০]. সুরা ফাতহ, ৪৮: ৬

[৬৪১]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৩১

এ সকল আয়াত থেকে বুঝা গেল, জাহান্নামও তৈরি করে ফেলা হয়েছে।

জান্নাত-জাহান্নামকে আল্লাহ তাআলা চিরকাল অবশিষ্ট রাখবেন

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾

“অচিরেই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা হবে স্থায়ী।”[৬৪২]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾

“অচিরেই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা হবে স্থায়ী। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে?।”[৬৪৩]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾

“বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ করো, তাতেই স্থায়ীভাবে থাকার জন্য।”[৬৪৪]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾

“আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে।”[৬৪৫]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায়, জান্নাতও চিরস্থায়ী এবং জাহান্নামও চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাআলা এগুলোকে নিঃশেষ করবন না।

জান্নাত হলো আরাম-আয়েশের স্থান

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾

---

[৬৪২]. সুরা নিসা, ৪: ৫৭
[৬৪৩]. প্রাগুক্ত, ১২২
[৬৪৪]. সুরা যুমার, ৩৯: ৭২
[৬৪৫]. সুরা জিন, ৭২: ২৩

"আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি করেছেন জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে।"[৬৪৬]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ○ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ○ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ﴾

"নিশ্চয় জান্নাতবাসীরা আজ আনন্দে মশগুল থাকবে। তারা ও তাদের স্ত্রীরা ছায়ার মধ্যে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফল-ফলাদি এবং থাকবে তারা চাইবে তাও।"[৬৪৭]

জাহান্নাম হলো শাস্তির স্থান

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾

"তাহলে আগুনকে ভয় করো যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।"[৬৪৮]

এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াত রয়েছে। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

জান্নাতে প্রবেশকারীগণ চিরদিন জান্নাতে থাকবে

যে একবার জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে জান্নাতে চিরদিন থাকবে। কখনো সেখান থেকে তাকে বের করা হবে না। কিন্তু যে ঈমানদার তবে কোনো গুনাহের শাস্তির জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করানো হয়েছে, তাকে কোনো একসময় নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। জান্নাতিরা জান্নাতে চিরদিন থাকবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾

"আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি করেছেন জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে।"[৬৪৯]

---

[৬৪৬]. সুরা তাওবা, ৯: ৮৯
[৬৪৭]. সুরা ইয়াসিন, ৩৬: ৫৫-৫৭
[৬৪৮]. সুরা বাকারা, ২: ২৪
[৬৪৯]. সুরা তাওবা, ৯: ৮৯

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾

"অচিরেই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা হবে স্থায়ী। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে?।"[৬৫০]

ঈমানদারদের কোনো একদিন নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمَّوْنَ: الْجَهَنَّمِيِّينَ

"হজরত ইমরা ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন— একটি দল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুপারিশে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে জাহান্নামি বলেই সম্বোধন করা হবে।"[৬৫১]

এই হাদিস থেকে বুঝা গেল, ঈমানদারদের কোনো একদিন নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

কারা জান্নাত কিংবা জাহান্নামে যাবে, তা আল্লাহ তাআলার ইলমের মধ্যে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত আছে

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ... قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، قَالَ: أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ، ثُمَّ قَرَأَ: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى

[৬৫০]. সুরা নিসা, ৩: ১২২

[৬৫১]. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬৫৬৬

"হজরত আলি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা বাকিউল গারকাদ (কবরস্থানে) একটি জানাজায় উপস্থিত ছিলাম...নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন— তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, অথবা বললেন, এমন কোনো সৃষ্ট প্রাণী নেই, যার জন্য জান্নাত ও জাহান্নামে জায়গা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়নি আর এ কথা লিখে দেওয়া হয়নি যে, সে দুর্ভাগা হবে কিংবা ভাগ্যবান। তখন এক ব্যক্তি আরজ করল, হে আল্লাহর রাসুল! তাহলে কি আমরা আমাদের তাকদির তথা ভাগ্যলিপির ওপর ভরসা করে আমল করা ছেড়ে দেবো না? কেননা আমাদের মধ্যে যারা ভাগ্যবান তারা অচিরেই ভাগ্যবানদের আমলের দিকে ধাবিত হবে। আর যারা দুর্ভাগা তারা অচিরেই দুর্ভাগাদের আমলের দিকে ধাবিত হবে। তিনি বললেন, যারা ভাগ্যবান, তাদের জন্য সৌভাগ্যের আমল সহজ করে দেওয়া হয়। আর ভাগ্যাহতদের দুর্ভাগ্যের আমল সহজ করে দেওয়া হয়। অতঃপর নবিজি ﷺ সুরাতুল লাইলের ৫ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন।[৬৫২]

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾

অর্থাৎ সুতরাং যে দান করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে আর উত্তমকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে।"

এই হাদিস থেকে বুঝা গেল, কারা জান্নাত কিংবা জাহান্নামে যাবে, তা আল্লাহ তাআলার ইলমের মধ্যে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত আছে।

৬৫২. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১৩৬২
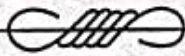
কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম বা বাণী

এ আকিদা সম্পর্কে ১৩টি আয়াত এবং ৪টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

নোট : কালাম বা বাণী তিন প্রকার। যথা :

ক. এক প্রকার কালাম বা বাণী হলো, যা আল্লাহ তাআলার সত্তাগত গুণ। এটা চিরস্থায়ী। এটা অস্থায়ী নয়। কেননা তা আল্লাহ তাআলার গুণ। সুতরাং এটাও আল্লাহ তাআলার সত্তার মতোই চিরস্থায়ী।

খ. দ্বিতীয় প্রকার কালম বা বাণী হলো, মানুষের কালম বা বাণী অথবা ফেরেশতাদের কালাম বা বাণী। এটা অস্থায়ী। কেননা মানুষ এবং ফেরেশতা অস্থায়ী। সুতরাং তাদের থেকে নির্গত বস্তুও অস্থায়ী।

গ. তৃতীয় প্রকার কালাম বা বাণী হলো, কুরআন। যা আল্লাহ তাআলার কালাম বা বাণী। এই কালাম বা বাণী যদি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তাহলে এটা চিরস্থায়ী। আর এই কালাম বা বাণী যদি ফেরেশতা কিংবা মানুষ পাঠ করে, তাহলে এটা অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। কেননা আমাদের পাঠ করাটা অস্থায়ী।

পূর্বযুগ থেকে কুরআন স্থায়ী না অস্থায়ী এই নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলে আসছে। কিন্তু যদি এই পার্থক্য মেনে নেওয়া হয়—আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে কালাম বা বাণী, সেটা চিরস্থায়ী। আর মানুষ যে কুরআন পাঠ করে অথবা লিখে, এটা অস্থায়ী। তাহলে আর কোনো ঝগড়া থাকে না।

আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে কালাম বা বাণী, সেটা চিরস্থায়ী আর আমরা যে কুরআন পাঠ করি, এটা অস্থায়ী এবং ধ্বংসশীল

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *ফিকহে আকবার* গ্রন্থে লিখেন—

وَلَفْظُنَا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ وَكِتَابَتُهُ لَنَا مَخْلُوقَةٌ، وَقِرَاءَتُنَا لَهُ مَخْلُوقَةٌ وَالْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ

অর্থাৎ আমরা যে কুরআন পাঠ করি, এটা মাখলুক। আমরা যে কুরআন লিখি, এটা মাখলুক এবং আমরা যে কুরআন (এর কপি) পাঠ করি, তা মাখলুক অর্থাৎ এটা অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। আর যে কুরআন আল্লাহ তাআলার প্রকৃত কালাম বা বাণী, সেটা মাখলুক নয়। অর্থাৎ অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল নয়।[৬৫৩]

وَالْقُرْآن كَلَام الله تَعَالَى فَهُوَ قديم لَا كَلَامهم

অর্থাৎ যে কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম বা বাণী, সেটা কাদিম তথা চিরস্থায়ী। আর মানুষ যে কুরআন পাঠ করে, এটা কাদীম তথা চিরস্থায়ী নয়।[৬৫৪]

وَ كَلَامُ اللهِ تَعَالَي غَيْرُ مَخْلُوْقٍ

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কালাম বা বাণী মাখলুক নয় তথা অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল নয়। বরং তা কাদিম তথা চিরস্থায়ী।[৬৫৫]

এখানে তিনটি ইবারত বা মূলপাঠ পেশ করা হলো। যার সারকথা হলো, যে কালাম বা বাণী আল্লাহ তাআলার এবং যেটা আল্লাহ তাআলার গুণ তা কাদিম তথা চিরস্থায়ী। আর মানুষ যে কুরআন পাঠ করে, তা অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল।[৬৫৬]

কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম বা বাণী

কুরআনের দুটি অবস্থা। একটি হলো, যা আল্লাহ তাআলার কালাম বা বাণী। এটা আল্লাহ তাআলার গুণ এবং এটা চিরস্থায়ী। আর দ্বিতীয়টি হলো, আমরা যে কুরআন পাঠ করি। এটা অস্থায়ী এবং ধ্বংসশীল।

কুরআন যে আল্লাহ তাআলার কালাম এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾

"আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনে।"[৬৫৭]

---

৬৫৩. *ফিকহুল আকবার*, পৃষ্ঠা, ৫০
৬৫৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৫২
৬৫৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৫৮
৬৫৬. কেননা সৃষ্টির কথা ও উচ্চারণ সৃষ্টির কর্ম এবং সৃষ্টির সকল কর্মই অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল।
৬৫৭. সুরা তাওবা, ৯: ৬

এখানে আল্লাহর কালাম দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআনুল কারিম।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾

"আর নিশ্চয় তুমি প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানীর পক্ষ থেকে আল-কুরআনপ্রাপ্ত।"[৬৫৮]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَلَامُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ مَا عَطَفْتُمُوهُ عَلَى أَهْوَائِكُمْ

"হজরত উমর রা. বলেন, এই কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম। সুতরাং এ কথা যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে যে, তোমরা নিজের প্রবৃত্তির কারণে তা থেকে দূরে চলে যেতে হয়।"[৬৫৯]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিসে কুরআনকে আল্লাহ তাআলার কালাম বলা হয়েছে।

এই কুরআন লৌহে মাহফুজেও সংরক্ষিত রয়েছে

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾

"নিশ্চয় এটি মহিমান্বিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে।"[৬৬০]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾

"বরং তা সম্মানিত কুরআন। সুরক্ষিত ফলকে (লিপিবদ্ধ)।"[৬৬১]

এই আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল—কুরআন লৌহে মাহফুজে সংরক্ষিত রয়েছে।

কুরআন লৌহে মাহফুজ থেকে একটু একটু করে নাজিল করেছেন

কুরআনকে ২৩ দীর্ঘ ২৩ বছরে একটু একটু করে নবিজি ﷺ-এর ওপর নাজিল করা হয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

---

[৬৫৮]. সুরা নামাল, ২৭: ৬

[৬৫৯]. *সুনানে দারেমি*, ২/৫৩৩ হাদিস নং ৩৩৫৫। সনদটি যইফ।

[৬৬০]. সুরা ওয়াকিয়া, ৫৬: ৭৭-৭৮

[৬৬১]. সুরা বুরুজ, ৮৫: ২১-২২

﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا﴾

"আর কুরআন আমি নাজিল করেছি কিছু কিছু করে, যেন তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ধীরে ধীরে এবং আমি তা নাজিল করেছি পর্যায়ক্রমে।"[৬৬২]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"তা সৃষ্টিকুলের রবের কাছ থেকে নাজিলকৃত।"[৬৬৩]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾

"আর নিশ্চয় এ কুরআন সৃষ্টিকুলের রবেরই নাজিলকৃত। বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরাইল আ.) এটা নিয়ে অবতরণ করেছে—তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।"[৬৬৪]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল, কুরআন নবিজি ﷺ-এর ওপর একটু একটু করে নাজিল করা হয়েছে।

যে কুরআনকে মানুষের কালাম বলবে, সে কাফির

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾

"এটা তো মানুষের কথামাত্র। অচিরেই আমি তাকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাব।"[৬৬৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন, কুরআনকে মানুষের কালাম বললে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। কেননা এ কথা বলার দ্বারা সে কাফির হয়ে গেছে।

---

৬৬২. সুরা বনি ইসরাইল, ১৭: ১০৬
৬৬৩. সুরা ওয়াকিয়া, ৫৬: ৮০
৬৬৪. সুরা শুআরা, ২৬: ১৯২-১৯৪
৬৬৫. সুরা মুদ্দাসসির, ৭৪: ২৫-২৬

দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা কালাম করেন, তা হয়তো ওহির মাধ্যমে করেন নয়তো পর্দার আড়াল থেকে করেন

দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা কালাম করেন, তা হয়তো ওহির মাধ্যমে করেন নয়তো পর্দার আড়াল থেকে করেন। কেননা মানুষের তখন এমন শক্তি নেই—আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সরাসরি কথা বলবে। তবে হ্যাঁ! আখিরাতে সেই শক্তি সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾

“কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন, ওহির মাধ্যম, পর্দার আড়াল অথবা কোনো দূত পাঠানো ছাড়া। তারপর আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে তিনি যা চান তাই ওহি প্রেরণ করেন।”[৬৬৬]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾

“আর আল্লাহ মুসার সঙ্গে সুস্পষ্টভবে কথা বলেছেন।”[৬৬৭]

হজরত মুসা আ.-এর সঙ্গেও পর্দার আড়াল থেকেই কথাবার্তা হয়েছে।

কুরআনে কোনো প্রকার পরিবর্তন হয়নি এবং হবেও না

যখন থেকে কুরআন নাজিল হয়েছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত কুরআনে কোনো প্রকার পরিবর্তন হয়নি। তাই আপনি পুরো দুনিয়ার কুরআন একত্র করে দেখে নিন। একটি হরফ বা আক্ষরেরও পার্থক্য পাবেন না।

একই রকম কুরআন দুনিয়ার লক্ষ-কোটি হাফেজদের সিনায় সংরক্ষিত আছে এবং সংরক্ষিত থাকবে। এজন্য যারা দাবি করে যে, কুরআন পরিবর্তন হয়েছে, তারা ভুল বলে। কারণ কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজ জিম্মায় নিয়েছেন। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

---

৬৬৬. সুরা শুরা, ৪২: ৫১
৬৬৭. সুরা নিসা, ৪: ১৬৪

"নিশ্চয় আমি কুরআন নাজিল করেছি, আর আমিই তার হেফাজতকারী।"[৬৬৮]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি কুরআন নাজিল করেছি এবং আমিই কিয়ামত পর্যন্ত তা হেফাজত করব। তাই আজ পর্যন্ত কুরআন তেমনই সংরক্ষিত আছে, যেমন প্রথম দিন সংরক্ষিত ছিল। এজন্য কেউ যদি বলে যে, কুরআন পরিবর্তন হয়েছে, তা সরাসরি ভুল।

সাত কেরাত (পাঠ্যরীতি) অনুযায়ী কুরআন পড়ার অনুমতি ছিল

হ্যাঁ! এইটুকু হয়েছে, যখন কুরআন নাজিল হয়েছে; তখন আরবের সাতটি গোত্র প্রসিদ্ধ ছিল এবং প্রত্যেকের উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা একই আয়াতকে সাতটি উচ্চারণে পড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে হজরত উসমান রা. যখন কুরআন গ্রন্থ আকারে একত্রিত করেন, তখন শুধু কুরাইশের উচ্চারণেই একত্রিত করেছেন। কেননা এই উচ্চারণই সবচেয়ে উত্তম এবং বর্তমানেও কুরআন সেই উচ্চারণ ও লিখিতরূপেই বিদ্যমান। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ... إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ

"হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত... নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন— নিশ্চয় কুরআন সাত কেরাতে (পাঠ্যরীতি) নাজিল হয়েছে। সুতরাং যে কেরাত (পাঠ্যরীতি) তোমাদের জন্য সহজ হয়, সেই কেরাতেই (পাঠ্যরীতিতেই) পড়ো।"[৬৬৯]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—আয়াত ও হুকুম একই, তবে তা পাঠ করার জন্য সাত কেরাত বা পাঠ্যরীতির ব্যবহার করা যাবে।

আখিরাতে আল্লাহ তাআলা জান্নাতিদের সঙ্গে কালাম করবেন

আখিরাতে আল্লাহ তাআলা জান্নাতিদের সঙ্গে কালাম করবেন। কিন্তু সেই কালাম করার ধরন কী হবে, তা শুধু আল্লাহ তাআলাই জানেন। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ﴾

---

৬৬৮. সুরা হিজর, ১৫: ৯

৬৬৯. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ২৪১৯; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৮১৮

"অসীম দয়ালু রবের পক্ষ থেকে বলা হবে, সালাম।"[৬৭০]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"আর আল্লাহ কিয়ামতের দিনে তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।"[৬৭১]

এই আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন জান্নাতিদের সঙ্গে কথা বলবেন। এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ فَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ، فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، قَالَ: وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ

"হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, জান্নাতবাসীরা তাদের ভোগ-বিলাসে মশগুল থাকবে, এমতাবস্থায় তাদের সামনে একটি নুরের আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হবে। তারা তাদের মাথা তুলে দেখতে পাবে যে, তাদের মহান রব তাদের ওপর দিক থেকে উদ্ভাসিত হয়েছেন। তিনি বলবেন, হে জান্নাতিরা! আস্‌সালামু আলাইকুম (তোমাদের ওপর অনন্ত শান্তি বর্ষিত হোক)। নবিজি ﷺ বলেন, এটাই হলো সুরা ইয়াসিনের ৫৮ নং আয়াত ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ﴾ তথা 'অসীম দয়ালু রবের পক্ষ থেকে বলা হবে, সালাম'—এর তাফসির।"[৬৭২]

এই হাদিস থেকে জানা গেল, আল্লাহ তাআলা জান্নাতিদের সালাম করবেন।

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ

"হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতিদের বলবেন, হে জান্নাতিরা! জান্নাতিরা তার

---

৬৭০. সুরা ইয়াসিন, ৩৬: ৫৮
৬৭১. সুরা বাকারা, ২: ১৭৪
৬৭২. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৮৪। সনদ যইফ।

উত্তরে বলবে, لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ তথা হে আমাদের রব! আমরা উপস্থিত, আপনার খেদমতে উপস্থিত হতে পেরে আমরা ভাগ্যবান। আপনার হাতেই সকল কল্যাণ।"[৬৭৩]

এই হাদিসে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার এই কালাম (কথাবার্তা) কিন্তু মানুষের কালামের (কথাবার্তা) মতো নয়। বরং এটা কাদিম তথা চিরস্থায়ী এবং সর্বপ্রকার ধরন থেকে পবিত্র। কেননা আল্লাহ তাআলার এই কালাম (কথাবার্তা) জগতের কারও কালামের (কথাবার্তা) মতো নয়। কেননা পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তাঁর মতো কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"[৬৭৪]

এই আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলির মতো কোনো সত্তা ও গুণাবলি নেই।

[৬৭৩]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৭৫১৮

[৬৭৪]. সুরা শুরা, ৪২: ১১
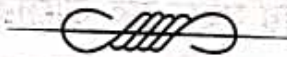
আল্লাহ তাআলা কোথায়?

এ আকিদা সম্পর্কে ৩৮টি আয়াত এবং ৬টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

আল্লাহ তাআলার সত্তা সম্পর্কে চারটি কথা স্মরণ রাখা জরুরি। যথা :

১. আল্লাহ তাআলার সত্তা হলো ওয়াজিবুল ওজুদ তথা অত্যাবশ্যকীয় সত্তা। তিনি চিরদিন ছিলেন এবং চিরদিন থাকবেন। তিনি সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। তাঁর সত্তার কোনো প্রকার ধ্বংস নেই। এজন্য তাঁর গুণাবলিতেও কোনো প্রকার ধ্বংস নেই।

২. তিনি সর্বপ্রকার দিক হতে পবিত্র। তিনি কোনো দিকে নেই। অর্থাৎ ওপর-নিচ, ডান-বাম কোনো দিকেই নেই।

৩. তিনি আকার-আকৃতি থেকে পবিত্র। অর্থাৎ মানুষ ও বিভিন্ন বস্তুর যেমন বিভিন্ন আকার-আকৃতি রয়েছে, আল্লাহ তাআলার মধ্যে তা নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা নিজেই তো আকার-আকৃতির সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তাঁর আকার-আকৃতি কীভাবে হবে।

৪. আল্লাহ তাআলার মতো কোনো বস্তু নেই। না গুণাবলির ক্ষেত্রে তাঁর কোনো উপমা আছে, না সত্তাগতভাবে তাঁর কোনো উপমা আছে।

এজন্য কোনো গুণাবলির ব্যাপারে যদি বলা হয় যে, এটা আল্লাহ তাআলার গুণাবলির মতো, তাহলে এর অর্থ হলো—শাব্দিকভাবে এটা আমাদের গুণাবলির মতো মনে হলেও প্রকৃত অর্থে তা অন্যকিছু। যা আমরা অনুভব করতে পারছি না এবং না আমাদের তার কল্পনা আছে। এজন্য আল্লাহ তাআলার যেকোনো গুণাবলিকে কখনোই মাখলুকের গুণাবলির ওপর ধারণা করবে না। যেমন কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তাঁর মতো কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"[৬৭৫]

---

৬৭৫. সুরা শুরা, ৪২: ১১

এই আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলির মতো কোনো সত্তা ও গুণাবলি নেই। তাহলে আমরা কীভাবে ধারণা করতে পারি যে, তিনি আমাদের মতো কুরসির ওপর বসেছেন অথবা তাঁর আমাদের মতো হাত-পা আছে অথবা আমাদের গুণের মতো তাঁর গুণ। এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلْهَ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু তৈরি করে রেখেছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো ব্যক্তির মন কল্পনা করেনি। এসব ছাড়া যা-কিছুই তোমরা দেখছ, তার কোনো মূল্যই নেই। তারপর নবিজি ﷺ—

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"তারপর কোনো ব্যক্তি জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তারা যা করত, তার বিনিময়স্বরূপ।" সুরা আস-সাজদাহের ১৭ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন।"[৬৭৬]

এই হাদিসে এসেছে—জান্নাতের নিয়ামতসমূহ না কোনো চোখ কখনো দেখেছে, না কোনো কান কখনো শুনেছে এবং না কোনো মানুষের অন্তর কখনো তা কল্পনা করেছে। যেখানে জান্নাতের নিয়ামতেরই এ অবস্থা, যা মাখলুক তথা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি, তাহলে আমরা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলির আকার-আকৃতির কল্পনা কীভাবে করতে পারি। এজন্য আল্লাহ তাআলার সত্তা কোথায় এবং তাঁর আকার-আকৃতি কেমন, এ সম্পর্কে নিজের মতো প্রতিষ্ঠিত করবে না এবং তাঁকে মাখলুকের ওপর ধারণা করবে না।

আল্লাহ তাআলা কোথায়! এ সম্পর্কে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। আর এর কারণ হলো, এ সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন হাদিস রয়েছে। সুতরাং

---

[৬৭৬]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪৭৮০; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৮২৪

কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করা কঠিন। এজন্য এ ব্যাপারে ৬টি দল হয়ে গেছে। যথা :

১. প্রথম দল

প্রথম দলের মত হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু কি আকৃতিতে বিরাজমান সত্তাগতভাবে বিরাজমান নাকি জ্ঞানগত ও শক্তিগত ও দৃষ্টিগতভাবে বিরাজমান এ সম্পর্কে তারা কোনো তর্ক-বিতর্ক করে না। কেননা আল্লাহ তাআলার সত্তা সর্বপ্রকার দিক ও আকৃতি-প্রকৃতি থেকে পবিত্র। তাদের দলিল হলো পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

"আর তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।"[৬৭৭]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾

"এর চেয়ে কম কিংবা বেশি হোক, তিনি (আল্লাহ) তো তাদের সঙ্গেই আছেন।"[৬৭৮]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

"সে তার সঙ্গীকে বলল, তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।"[৬৭৯]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾

"অতএব তোমরা হীনবল হয়ো না ও সন্ধির আহ্বান জানিও না এবং তোমরাই প্রবল। আর আল্লাহ তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন।"[৬৮০]

---

[৬৭৭]. সুরা হাদিদ, ৫৭: ৪
[৬৭৮]. সুরা মুজাদালাহ, ৫৮: ৭
[৬৭৯]. সুরা তাওবা, ৯: ৪০
[৬৮০]. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ৩৫

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾

"আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী।"[৬৮১]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

"এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আর আমি তার গলার ধমনী হতেও অধিক কাছে।"[৬৮২]

এই আয়াতে বলা হয়েছে—আল্লাহ তাআলা মানুষের গলার ধমনী হতেও অধিক নিকটে।

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

"আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সে দিকেই আল্লাহর চেহারা। নিশ্চয় আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[৬৮৩]

উপর্যুক্ত ৭টি আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলা সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু কোনো স্থান ও আকার-আকৃত ব্যতীত।

এ দলটি একটি সূক্ষ্ম প্রশ্নও উত্থাপন করে থাকে—আমরা যদি আল্লাহ তাআলাকে আরশের ওপর ইস্তিওয়া মেনে নিই এবং বলি যে, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর ইস্তিওয়া আছেন, তাহলে এখানে প্রশ্ন আসে যে, আরশ বানানোর পূর্বে আল্লাহ তাআলা কোথায় ছিলেন?[৬৮৪]

২. দ্বিতীয় দল

দ্বিতীয় দলের মত হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী আরশের ওপরে রয়েছেন। কিন্তু কীভাবে আছেন এ সম্পর্কে তারা কোনো তর্ক-বিতর্ক

---

৬৮১. সুরা বাকারা, ২: ১৮৬

৬৮২. সুরা ক্বাফ, ৫০: ১৬

৬৮৩. সুরা বাকারা, ২: ১১৫

৬৮৪. আল্লাহ তাআলা সর্বত্র বিরাজমান হওয়া মতটি ভ্রান্ত। আল্লাহর ইলম ও কুদরত সর্বত্র বিরাজমান হলেও সত্তাগতভাবে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা নয়। বরং জাহমিয়্যাহ, নাজ্জারিয়া, মুতাযিলা ও কাররামিয়্যাহদের মত; ভ্রান্ত ফিরকারা এই মত পোষণ করে।

করেন না। কেননা আল্লাহ তাআলার সত্তা সর্বপ্রকার দিক ও আকৃতি-প্রকৃতি থেকে পবিত্র।

তারা বলেন, আল্লাহ তাআলা ৭টি আয়াতে বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপরে রয়েছেন। তাই আমরা এটা মেনে নিয়েছি এবং উক্ত আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাখি এবং এর কোনো ব্যাখ্যা করা সংগত মনে করি না।

এই দলের অনুসারিরা ওপরে বর্ণিত ৭টি আয়াত, যেখানে বলা হয়েছে—আল্লাহ তাআলা সর্বত্র বিরাজমান। এ কথার জবাবে বলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর জ্ঞানগত ও দৃষ্টিগত এবং শক্তিগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু সত্তাগতভাবে আল্লাহ তাআলা আরশে সমাসীন। তাদের দলিল হলো, পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى﴾

"পরম করুণাময় আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন।"[৬৮৫]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ﴾

"নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমূহ ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন।"[৬৮৬]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ﴾

"নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমূহ ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন।"[৬৮৭]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ﴾

"আল্লাহ, যিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ উঁচু করেছেন যা তোমরা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন।"[৬৮৮]

---

[৬৮৫]. সুরা ত্ব-হা, ২০: ৫
[৬৮৬]. সুরা আরাফ, ৭: ৫৪
[৬৮৭]. সুরা ইউনুস, ১০: ৩

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾

“যিনি আসমান, জমিন ও উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন।”[৬৮৯]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾

“যিনি আসমান, জমিন ও উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন।”[৬৯০]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾

“তিনিই আসমানসমূহ ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন।”[৬৯১]

এই ৭টি আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন।

এজন্য এই দ্বিতীয় দলটি এ কথার প্রবক্তা—আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন। বাকি কীভাবে ইস্তিওয়া করেছেন তা জানা নেই। ব্যস! আল্লাহ তাআলার মর্যাদা অনুযায়ী ইস্তিওয়া করেছেন।

﴿اسْتَوَى﴾ শব্দটি আরবি শব্দ। যার অর্থ হলো সোজা হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া, কর্তৃত্ব পাওয়া। আবার কোনো কোনো সময় তার অর্থ বসাও হয়। এই শব্দটি অস্পষ্ট একটি শব্দ। এজন্য আল্লাহ তাআলার জন্য তার কোনো অর্থ নির্ধারণ করা কঠিন। কেননা তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে পবিত্র (অনুরূপভাবে তিনি বসা এবং স্থানান্তরিত হওয়া থেকেও পবিত্র)। তিনি সর্বপ্রকার আকার-আকৃতি থেকেও পবিত্র।

---

৬৮৮. সুরা রাদ, ১৩: ২
৬৮৯. সুরা ফুরকান, ২৫: ৫৯
৬৯০. সুরা আস-সাজদাহ, ৩২: ৪
৬৯১. সুরা হাদিদ, ৫৭: ৪

আরশ অনেক বড় একটি মাখলুক বা সৃষ্টি

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾

"আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তিনি মহাআরশের রব।"[৬৯২]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾

"তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। আমি তাঁরই ওপর তাওয়াক্কুল করেছি। আর তিনিই মহাআরশের রব।"[৬৯৩]

উপর্যুক্ত দুটি আয়াতসহ আরও অনেক আয়াত থেকে জানা যায়—আরশ অনেক বড় ও মহান একটি মাখলুক। যা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন।

কুরসি

কুরসিও আল্লাহ তাআলার একটি মাখলুক বা সৃষ্টি। কিন্তু আরশের তুলনায় কুরসি খুবই ছোট। যেমন, মরুভূমিতে একটি কড়াই নিক্ষেপ করে দেওয়া হলো। তাহলে মরুভূমির তুলনায় সামান্য একটি কড়াই যেমন ক্ষুদ্র ঠিক তেমনইভাবে আরশের তুলনায় কুরসিও তেমন ক্ষুদ্র। বাকি এটা কেমন, তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। কিন্তু তারপরও কুরসি এত বড়—সমস্ত জমিন ও আসমানকে বেষ্টন করে আছে। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

"তাঁর আসন (কুরসি) আসমান ও জমিনব্যাপী হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয় না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান।"[৬৯৪]

৩. তৃতীয় দল

তৃতীয় দলের মত হলো, আল্লাহ তাআলা এ জগতে তাঁর জ্ঞান, শক্তি ও দৃষ্টিগতভাবে বিরাজমান। সত্তাগতভাবে জগতে বিরাজমান নয়। বাকি তিনি কোথায়—এ ব্যাপারে তারা চুপ। তাদের দলিল হলো, তারা বলে যে, এ

---

৬৯২. সুরা নামাল, ২৭: ২৬
৬৯৩. সুরা তাওবা, ৯: ১২৯
৬৯৪. সুরা বাকারা, ২: ২৫৫

জগৎ তো আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। তাহলে তিনি এ জগতে কীভাবে বিরাজমান থাকবে। দ্বিতীয় কথা হলো, এ জগৎ হলো ধ্বংসশীল। সুতরাং যদি আল্লাহ তাআলার সত্তা এ জগতে বিরাজমান হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলার সত্তাও ধ্বংসশীল হয়ে যায়। এজন্য বলা হয় তিনি এ জগতে তাঁর জ্ঞান, শক্তি ও দৃষ্টিগতভাবে বিরাজমান। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾

"আর আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী।"[৬৯৫]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾

"নিশ্চয় তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।"[৬৯৬]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾

"আর তারা যা করে, আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন।"[৬৯৭]

এই তিন আয়াতে বলা হয়েছে—আল্লাহ তাআলা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। এজন্য তিনি জ্ঞানগতভাবে জগতে বিরাজমান। সত্তাগতভাবে নয়।

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"তিনিই জীবন দেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। আর তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।"[৬৯৮]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"নিশ্চয় তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"[৬৯৯]

---

[৬৯৫]. সুরা নিসা, ৪: ১২৬
[৬৯৬]. সুরা ফুসসিলাত, ৪১: ৫৪
[৬৯৭]. সুরা আনফাল, ৮: ৪৭
[৬৯৮]. সুরা হাদিদ, ৫৭: ২

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।"[৭০০]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾

"এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"[৭০১]

উপর্যুক্ত ৭টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—আল্লাহ তাআলা তাঁর শক্তিগত ও রাজত্বগতভাবে গোটা জগৎকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

এজন্য তৃতীয় দলের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলা এ জগতে তাঁর জ্ঞান, শক্তি ও দৃষ্টিগতভাবে বিরাজমান। সত্তাগতভাবে জগতে বিরাজমান নয়।

৪. চতুর্থ দল

চতুর্থ দলের মত হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী সর্ব উর্ধ্বে বিরাজমান। এ দলটি কোনো বড় দল নয়। আল্লাহ তাআলা কত উর্ধ্বে বিরাজমান, তারা এ ব্যাপারে কোনো সীমা-রেখা নির্ধারণ করেন না। তবে তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী তিনি সর্ব উর্ধ্বে বিরাজমান। তাদের দলিল হলো, পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

"তারা তাদের উপরস্থ রবকে ভয় করে এবং তাদেরকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা তা-ই করে।"[৭০২]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾

"তাঁরই পানে উত্থিত হয় ভালো কথা আর নেক আমল তা উন্নীত করে।"[৭০৩]

---

[৬৯৯]. সুরা আহকাফ, ৪৬: ৩৩
[৭০০]. সুরা মুলক, ৬৭: ১
[৭০১]. সুরা শুরা, ৪২: ৫০
[৭০২]. সুরা নাহল, ১৬: ৫০
[৭০৩]. সুরা ফাতির, ৩৫: ১০

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾

"ফেরেশতাগণ ও রুহ এমন একদিনে আল্লাহর পানে ঊর্ধ্বগামী হয়, যার পরিমাণ ৫০ হাজার বছর।"[৭০৪]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾

"তিনি আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত সকল কার্য পরিচালনা করেন। তারপর তা একদিন তাঁর কাছেই উঠবে। যেদিনের পরিমাণ হবে তোমাদের গণনায় হাজার বছর।"[৭০৫]

এই চার আয়াতে তার ইঙ্গিত রয়েছে—আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী সর্ব ঊর্ধ্বে বিরাজমান।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ؛ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—আমাদের রব যিনি বরকতময় ও মহামহিম প্রতিরাতের শেষ-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন—কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। কে আছে এমন যে, আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে দান করব। কে আছে এমন, যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।"[৭০৬]

---

[৭০৪]. সুরা মাআরিজ, ৭০: ৪

[৭০৫]. সুরা আস-সাজদাহ, ৩২: ৫

[৭০৬]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১১৪৫; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৭৫৮; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ১৩১৫; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৪৪৬

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন।[৭০৭] যা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি সর্ব ঊর্ধ্বে বিরাজমান।

এজন্য এই চতুর্থ দলের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী সর্ব ঊর্ধ্বে বিরাজমান। বাকি কী আকৃতিতে বিরাজমান এ সম্পর্কে তারা কোনো প্রকার তর্ক-বিতর্ক করে না। মোটকথা তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী বিরাজমান।

৫. পঞ্চম দল

পঞ্চম দলের মত হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী আসমানে বিরাজমান। এরাও কোনো বড় দল নয়; বরং কয়েকজন ব্যক্তির মতামতমাত্র। আর এই মতটিও ওপরের মতের কাছাকাছিই। তাদের দলিল হলো, হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ... قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ، تَرْعَى غَنَمًا لِي... قَالَ: ائْتِنِي بِهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

"হজরত মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে সালাত পড়ছিলাম... আমার এক দাসী ছিল যে আমার বকরি চড়াত... নবিজি ﷺ বললেন, দাসীকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি তখন দাসীকে নবিজি ﷺ-এর নিকট নিয়ে এলাম। নবিজি ﷺ তখন দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? দাসী উত্তর দিলো, আসমানে। নবিজি ﷺ তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? দাসী উত্তর দিলো, আপনি আল্লাহর রাসুল। নবিজি ﷺ তখন বললেন এই দাসীকে আজাদ করে দাও। সে ঈমানদার মহিলা।"[৭০৮]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, দাসী বলেছে যে, আল্লাহ তাআলা আসমানে। আর তার এ কথা নবিজি ﷺ কবুল করেছেন। এজন্য এই পঞ্চম দলের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী আসমানে বিরাজমান।

---

[৭০৭]. সত্তাগতভাবে আল্লাহ তাআলার অবতরণ করা কিংবা স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়টি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা নয়; বরং এ ক্ষেত্রে বলা যায় আল্লাহর রহমত, নুসরত, বরকত ইত্যাদি বিশেষভাবে এই সময়ে অবতরণ করে।

[৭০৮]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৫৩৭; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৯৩০; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ১২১৮

বাকি কীভাবে আছেন বিরাজমান—এ সম্পর্কে তারা কোনো প্রকার তর্ক-বিতর্ক করে না। মোটকথা তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী বিরাজমান।

৬. ষষ্ঠ দল

ষষ্ঠ দলের মত হলো, 'ইস্তিওয়া আলাল আরশ' তথা আল্লাহ তাআলা আরশে সমাসীন, আল্লাহ তাআলা কোথায়? আল্লাহ তাআলার চেহারা, আল্লাহ তাআলার হাত, আল্লাহ তাআলার পা, আল্লাহ তাআলার আঙুল, আল্লাহ তাআলার অবতরণ ইত্যাদি সব হলো মুতাশাবিহাত তথা অস্পষ্ট বাক্য। এজন্য তাঁর সম্পর্কে এটাই বলা হবে– এগুলোর অর্থ জানা আছে কিন্তু আকৃতি জানা নেই। এগুলোর ওপর ঈমান রাখা ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যক। কিন্তু এগুলো সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করা বিদআত। এজন্য এগুলোর ব্যাপারে চুপ থাকাই উত্তম। তাদের নিকট ইমাম মালেক রহ.-এর বক্তব্যটি খুবই প্রসিদ্ধ। বক্তব্যটি হলো–

سمعت يحي بن يحيي قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله، ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾، فكيف استوى؟ قال فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج.

আমরা মালেক ইবনু আনাসের নিকট ছিলাম এমন সময় একজন ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, হে আবু আবদুল্লাহ, রহমান তো আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন, তাহলে সেই ইসতিওয়ার ধরন কী? (এ কথা শুনে) ইমাম মালেক রহ. তার মাথা নিচু করে দিলেন, এমনকি কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, ইসতিয়াও তো আর অজানা নয়। তবে ইসতিওয়ার ধরন ও প্রকৃতি অবোধগম্য। কিন্তু এর ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব। আর এই ব্যাপারে (অনর্থক) প্রশ্ন করা বিদআত। আর আমি মনে করি তুমি বিদআতি। অতঃপর তিনি ওই লোকটিকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন।[৭০৯]

শাইখ রহ. বলেন, (অর্থাৎ ইমাম বাইহাকি রহ. এই বক্তব্য ইমাম মালেক থেকে বর্ণনা করার পর বলেন)

قال الشيخ: و على مثل هذا درج أكثر علمائنا في مسألة الإستوى، و في مسألة المجي، و الإتيان، والنزول.

---

[৭০৯]. *কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত*, ২/৩০৫

আমাদের আলেমগণ আল্লাহ তাআলার আসা ও অবতরণের বিষয়টিও ইসতিওয়ার বিধানেই শামিল করেছেন। (অর্থাৎ এগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন করা বিদআত)।[৭১০]

আমাদের উলামায়ে কেরাম আল্লাহ তাআলার আসা ও অবতরণ করার বিষয়টিও এই ইস্তিওয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা বিদআত। উপর্যুক্ত ইবারত বা মূলপাঠে ইমাম মালেক রহ. ইস্তিওয়ার ব্যাপারে প্রশ্নকারীকে বিদআতি আখ্যা দিয়েছেন। তাদের দলিল হলো পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

"তিনিই তোমার ওপর কিতাব নাজিল করেছেন, তার মধ্যে আছে মুহকাম (সুস্পষ্ট) আয়াতসমূহ। সেগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট)। ফলে যাদের অন্তরে রয়েছে সত্যবিমুখ প্রবণতা, তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ব, তারা বলে, আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে। আর বিবেক সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে।"[৭১১]

এই আয়াতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) বাক্যের পেছনে না পড়ার। বরং এমতাবস্থায় এ সকল আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনা এবং চুপ থাকার। এজন্য আমরা ইস্তিওয়ার বিশ্লেষণের পেছনে না পড়ে চুপ থাকি।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত

এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত হলো, এটা বলা হবে যে, এর অর্থ জানা আছে কিন্তু আকৃতি-প্রকৃতি জানা নেই। কেননা আকৃতি-প্রকৃতির জ্ঞান আমাদের নেই। তাঁর আকিদাবিষয়ক প্রসিদ্ধ *শরহে ফিকহে আকবার* গ্রন্থে লিখেন—

---

[৭১০] *আল-ইতেকাদ ওয়াল-হিদায়া ইলা সাবিলির রশাদ*, বাইহাকি, পৃ. ১১৯

[৭১১]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ৭

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن فما ذكره الله تعالى في القرآن من الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة،وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفاته تعالى بلا كيف

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার হাত, চেহারা যেমনটি পবিত্র কুরআনুল কারিমে উল্লেখ আছে (তার ওপর ঈমান রাখতে হবে)। সুতরাং আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে যা উল্লেখ করেছেন চেহারা, হাত, নফস ইত্যাদি এগুলো আল্লাহ তাআলার গুণ। কিন্তু কোনো প্রকার আকৃতি-প্রকৃতি ব্যতীত। আর এটা বলা যাবে না যে, আল্লাহ তাআলার হাতের অর্থ তাঁর কুদরত অথবা তাঁর নিয়ামত। কেননা এই ব্যাখ্যা করার দ্বারা আল্লাহ তাআলার গুণকে বাতিল করা হয়। কাদরিয়া ও মুতাজিলা সম্প্রদায়ের অভিমত এটাই যে, আল্লাহ তাআলার হাতের অর্থ তাঁর কুদরত অথবা তাঁর নিয়ামত। কিন্তু মূলকথা হলো, আল্লাহ তাআলার হাতের অর্থ তাঁর গুণ। তবে কোনো প্রকার আকৃতি-প্রকৃতি ব্যতীত। আল্লাহ তাআলার রাগ এবং সন্তুষ্টি দুটোই আল্লাহ তাআলার গুণ। কিন্তু কোনো প্রকার আকৃতি-প্রকৃতি ব্যতীত।[৭১২, ৭১৩]

মুফাসসিরগণ ﴿الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى﴾ কেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ ইস্তিওয়া তথা সমাসীনের অর্থ জানা আছে। কিন্তু কি আকৃতি-প্রকৃতিতে আল্লাহ তাআলা আরশে ইস্তিওয়া তথা সমাসীন তা জানা নেই। কোনো আয়াত কিংবা হাদিস থেকে তার আকার-আকৃতি বুঝা যায় না। এজন্য এটা মুতাশাবিহাত তথা অস্পষ্ট আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ ব্যাপারে চুপ থাকাই উচিত।

ইমাম গাজালি রহ.-এর অভিমত

ইমাম গাজালি রহ. বলেন, ইস্তিওয়া অর্থ আরশে স্থির হওয়া কিংবা বসা নয়। বরং এর অর্থ হলো, আরশের হেফাজত করেছে, আরশকে জব্দ করেছে, আরশকে বাকি রেখেছে। কারণ, ﴿عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى﴾ এর অর্থ যদি আরশের হেফাজত করেছে, আরশকে জব্দ করেছে, আরশকে বাকি রেখেছে করা হয়, তাহলে এতে আল্লাহ তাআলার আকৃতি-প্রকৃতির বিষয় আসে না। সুতরাং

---

৭১২. *শরহে ফিকহে আকবার*, পৃষ্ঠা, ৬৬-৬৮

৭১৩. এ সকল বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের প্রসিদ্ধ ও অধিকাংশ আলেমরা 'তাফবিজ' করেন। অর্থাৎ এর আসল অর্থ ও প্রকৃতি মহান আল্লাহই জানেন।

পূর্বের অর্থের মধ্যে আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করার প্রয়োজন নেই।[৭১৪]

ইমাম তহাবি রহ.-এর অভিমত

ইমাম তহাবি রহ. এই মত অবলম্বন করেছেন—আরশ এবং কুরসি সত্য। তবে আল্লাহ তাআলা আরশ এবং কুরসি থেকে অমুখাপেক্ষী।[৭১৫]

এই ছয় দল ও চারজন মনীষীর অভিমত আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এখন আপনারাই ভেবে দেখুন।

নিম্নের বাক্যসমূহও মুতাশাবিহাত তথা অস্পষ্ট বাক্যের অন্তর্ভুক্ত

ইস্তিওয়া আলাল আরশ তথা আল্লাহ তাআলা আরশে সমাসীন বাক্যটি ছাড়াও আরও ৯টি বাক্য মুতাশাবিহাত তথা অস্পষ্ট বাক্যের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে—

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

"তাঁর মতো কিছু নেই।"[৭১৬]

এজন্য আল্লাহ তাআলার হাত, চেহারা ইত্যাদি আমাদের হাত ও চেহারার মতো হতে পারে না। এগুলোর প্রকৃত অর্থ একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। তাই এ সকল বাক্য ও অঙ্গসমূহ মুতাশাবিহাত তথা অস্পষ্ট বাক্যের অন্তর্ভুক্ত। আর মুতাশাবিহাত তথা অস্পষ্ট বাক্যের ব্যাপারে অধিক ঘাঁটাঘাঁটি করা কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে। এজন্য এই বাক্যসমূহের ওপর ঈমান আনব কিন্তু অধিক ঘাঁটাঘাঁটি করা থেকে বিরত থাকব।

মুফাসসিরগণ স্থান ও জায়গাভেদে এ সকল বাক্যের বিভিন্ন অর্থ করেছেন। যা এগুলোর প্রকৃত অর্থ নয়। শুধু মানুষকে বুঝানোর জন্য উক্ত বাক্যসমূহের নিকটবর্তী অর্থ বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। সেই ৯টি বাক্য হলো—

১. আল্লাহ তাআলার হাত।

২. আল্লাহ তাআলার চেহারা।

৩. আল্লাহ তাআলার নফস।

৪. আল্লাহ তাআলার চক্ষু।

---

৭১৪. *কাওয়াইদুল আকাইদ*, পৃষ্ঠা : ১৬৭

৭১৫. *আকিদাতুত তহাবি*, আকিদা নং ৪৯-৫০ পৃষ্ঠা : ১৩

৭১৬. সুরা শুরা, ৪২: ১১

৫. আল্লাহ তাআলার ডান হাত।

৬. আল্লাহ তাআলার আঙুল।

৭. আল্লাহ তাআলার পা।

৮. আল্লাহ তাআলার অবতরণ।

৯. হজরত আদম আ.-কে নিজের আকৃতিতে সৃষ্টি করা।

১. আল্লাহ তাআলার হাত।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

“আর ইহুদিরা বলে, আল্লাহর হাত বাঁধা। তাদের হাতই বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং তারা যা বলেছে, তার জন্য লানতগ্রস্ত হয়েছে। বরং তার দুহাত প্রসারিত। যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন।”[৭১৭]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾

“নিশ্চয় যারা তোমার কাছে বাইআত গ্রহণ করে, তারা শুধু আল্লাহরই কাছে বাইআত গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর।”[৭১৮]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾

“অতএব পবিত্র মহান তিনি, যার হাতে রয়েছে সবকিছুর রাজত্ব।”[৭১৯]

এই তিন আয়াতে আল্লাহ তাআলার হাতের কথা উল্লেখ রয়েছে।

২. আল্লাহ তাআলার চেহারা।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

“আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সে দিকেই আল্লাহর চেহারা। নিশ্চয় আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।”[৭২০]

---

৭১৭. সুরা মায়িদা, ৫: ৬৪

৭১৮. সুরা ফাতহ, ৪৮: ১০

৭১৯. সুরা ইয়াসিন, ৩৬: ৮৩

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾

"এবং তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করো, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই। আর তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করো।"[৭২১]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾

"আর তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাকো আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পদ প্রাপ্ত।"[৭২২]

এই তিনও আয়াতে وَجْهٌ তথা আল্লাহ তাআলার চেহারার কথা উল্লেখ রয়েছে।

৩. আল্লাহ তাআলার নফস।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾

"আমার অন্তরে যা আছে তা আপনি জানেন, আর আপনার অন্তরে যা রয়েছে, তা আমি জানি না।"[৭২৩]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলার নফসের কথা উল্লেখ রয়েছে।

৪. আল্লাহ তাআলার চক্ষু।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾

"যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও।"[৭২৪]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলার চোখের কথা উল্লেখ রয়েছে।

৫. আল্লাহ তাআলার ডান হাত।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

---

৭২০. সুরা বাকারা, ২: ১১৫
৭২১. সুরা বাকারা, ২: ২৭২
৭২২. সুরা রুম, ৩০: ৩৯
৭২৩. সুরা মায়িদা, ৫: ১১৬
৭২৪. সুরা ত্ব-হা, ২০: ৩৯

﴿وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾

"আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে।"[৭২৫]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলার ডান হাতের কথা উল্লেখ রয়েছে।

৬. আল্লাহ তাআলার আঙুল।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ

"নিশ্চয় সকল মানুষের অন্তর রহমান তথা আল্লাহ তাআলার দুই আঙুলের মাঝখানে।"[৭২৬]

এই হাদিসে আল্লাহ তাআলার আঙুলের কথা উল্লেখ রয়েছে।

৭. আল্লাহ তাআলার পা।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

يُقَالُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ؟، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟، فَيَضَعُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيْهَا، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ

"জাহান্নামকে বলা হবে, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? জাহান্নাম তখন বলবে, আরও আছে কি? তখন আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের ওপর নিজের পা রাখবেন। তখন জাহান্নাম বলবে, আর নয়, আর নয়।"[৭২৭]

এই হাদিসে আল্লাহ তাআলার পায়ের কথা উল্লেখ রয়েছে।

৮. আল্লাহ তাআলার অবতরণ।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ؛ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আমাদের রব যিনি বরকতময় ও মহামহিম প্রতিরাতের শেষ-তৃতীয়াংশ

---

[৭২৫]. সুরা যুমার, ৩৯: ৬৭

[৭২৬]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৬৫৪; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৬৫৬৯

[৭২৭]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪৮৪৯; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৮৪৮; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২৫৫৭

অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, কে আছে এমন যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। কে আছে এমন যে, আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে দান করব। কে আছে এমন যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।"[৭২৮]

এই হাদিসে আল্লাহ তাআলার অবতরণের কথা উল্লেখ রয়েছে।

৯. হজরত আদম আ.-কে নিজের আকৃতিতে সৃষ্টি করা।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা আদম আ.-কে নিজের আকৃতিতে বানিয়েছেন। তার উচ্চতা ছিল ৬০ হাত।"[৭২৯]

এই হাদিসে হজরত আদম আ.-কে নিজের আকৃতিতে সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

এ সকল বাক্য ও অঙ্গসমূহ মুতাশাবিহাত তথা অস্পষ্ট বাক্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই এগুলোর মর্ম উদ্ধারের জন্য অধিক ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিত নয়।

---
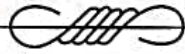
[৭২৮]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১১৪৫; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৭৫৮; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ১৩১৫; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৪৪৬

[৭২৯]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬২২৭; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৮৪১

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

কলমের বর্ণনা

এ আকিদা সম্পর্কে ৪টি আয়াত এবং ২টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

কুরআন ও হাদিস থেকে জানা যায়—আল্লাহ তাআলা লেখার জন্য কলম সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে লেখতে নির্দেশ দিলেন। কলম তখন ওই সকল বস্তু লেখে ফেলল, যা তাকে লেখতে বলা হয়েছে। কিন্তু তার এই লেখার ধরন কেমন তা জানা নেই। সেটা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾

"নুন, কলমের কসম এবং তারা যা লেখে তার কসম!"[৭৩০]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾

"পড়ো, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।"[৭৩১]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِابْنِهِ... سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، يَا بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي

"হজরত উবাদা বিন সামিত রা. তার ছেলেকে বললেন, ... আমি নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছি—আল্লাহ তাআলা প্রথম যে বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা হচ্ছে কলম। তারপর তিনি তাকে বললেন, লিখো! কলম বলল, হে আমার

[৭৩০]. সুরা কালাম, ৬৮: ১
[৭৩১]. সুরা আলাক, ৯৬: ৩-৪

রব! কি লিখব? তিনি বললেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর তাকদির লিখো। অতঃপর হজরত উবাদা বিন সামিত রা. নিজের পুত্রকে বললেন, হে আমার পুত্র! আমি নবিজি ﷺ থেকে এটাও বলতে শুনেছি—যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস ছাড়া মারা যায় সে আমার (উম্মতের) নয়। অর্থাৎ মুসলমান নয়।"[৭৩২]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে জানা যায়, কলম আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ বস্তু। যা তিনি প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এবং তার পরবর্তীকালে সংঘটিত সকল বিষয়কে লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। আর কলম এ সকল বিষয় লিখে দিয়েছে। কিন্তু এই কলম আমাদের কলমের মতো নয়। এটা কেমন তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন।

লৌহের বর্ণনা

লৌহের অর্থ হলো, তখতা। কিন্তু এটা কেমন লৌহ তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। শয়তান এবং জিনেরা এই লৌহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তাই তাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনও শয়তান এবং জিনেরা করতে পারে না। এই লৌহের মধ্যে কুরআন লিপিবদ্ধ ছিল এবং এখনো আছে। তা থেকে বের করেই নবিজি ﷺ-এর প্রতি নাজিল করা হয়েছে যা বর্তমানে আমাদের সামনে বিদ্যমান। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾

"বরং তা সম্মানিত কুরআন। যা লৌহে মাহফুজে (লিপিবদ্ধ)।"[৭৩৩]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾

"নিশ্চয় এটি মহিমান্বিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে।"[৭৩৪]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ... قَالَ كَانَ اللهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ؛ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ؛ وَكَتَبَ فِي اللَّوْحِ ذِكْرَ كُلِّ شَيْءٍ

---

[৭৩২]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৭০০; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২১৫৫। সনদ সহিহ।

[৭৩৩]. সুরা বুরুজ, ৮৫: ২১-২২

[৭৩৪]. সুরা ওয়াকিয়া, ৫৬: ৭৭-৭৮

"হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন... প্রথম আল্লাহ তাআলা ছিলেন এবং আল্লাহ তাআলার আরশ পানির ওপর ছিল। আর সকল বস্তুর আলোচনা লৌহে মাহফুজে লেখা রয়েছে।"[৭৩৫]

উক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে জানা গেল, কুরআন লৌহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ ছিল এবং সেখান থেকেই নবিজি ﷺ-এর প্রতি নাজিল করা হয়েছে এবং এটা জানা গেল—লৌহে মাহফুজে সকল বস্তুরই উল্লেখ রয়েছে।
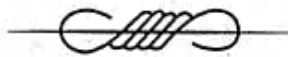
[৭৩৫]. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৯৮৭৬। সনদ সহিহ। এই মর্মে সহিহ বুখারি (৩০২০)-তে হাদিস বর্ণিত আছে।

উনত্রিংশ অধ্যায়

ঈমানের বর্ণনা

এ আকিদা সম্পর্কে ১৪টি আয়াত এবং ৬টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

কোনো ব্যক্তি ছয়টি বস্তুর প্রতি ঈমান আনলে তাকে মুমিন আখ্যা দেওয়া হবে। এই ছয়টি বস্তু থেকে কোনো একটি বস্তু অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু যদি ছয়টি বস্তু থেকে কোনো একটি বস্তু অস্বীকার না করে, তাহলে সে মুসলিমই থাকবে। এজন্য সামান্য ছোটখাটো বিষয়ে কুফরের ফতোয়া দেওয়া জায়েয নেই। উক্ত ছয়টি বস্তু হলো :

১. আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান

২. রাসুলগণের প্রতি ঈমান

৩. কিতাব তথা কুরআনুল কারিমের প্রতি ঈমান

৪. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

৫. আখিরাত তথা কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান

৬. তাকদিরের প্রতি ঈমান

আকিদাবিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *আকিদাতুত তহাবি*-এর ইবারত তথা মূলপাঠ হলো :

وَالْإِيمَانُ: هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ

অর্থাৎ ঈমান হলো, আল্লাহ তাআলার ওপর, তাঁর ফেরেশতাদের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর, তাঁর রাসুলগণের ওপর, কিয়ামতদিবসের ওপর এবং তাকদিরের ওপর বিশ্বাস করা।"[৭৩৬]

এই ইবারত তথা মূলপাঠে বলা হয়েছে—ছয় বস্তুর ওপর ঈমান আনার দ্বারা মানুষ মুমিন হয়। উপর্যুক্ত ছয়টি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার দলিল হলো পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

---

৭৩৬. *আকিদাতুত তহাবি*, আকিদা নং ৬৬ পৃষ্ঠা- ১৫

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾

"রাসুল তাঁর নিকট তাঁর রবের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসুলগণের ওপর, আমরা তাঁর রাসুলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না।"[৭৩৭]

এই আয়াতে চারটি বস্তুর ওপর ঈমান আনার কথা উল্লেখ রয়েছে।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾

"বরং যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবিদের প্রতি।"[৭৩৮]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ

"নবিজি ﷺ কে বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। নবিজি ﷺ তখন বললেন, আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনা, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসুলগণের প্রতি, কিয়ামতের দিনের প্রতি এবং তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান আনা। ফেরেশতা বললেন, আপনি সত্য বলেছেন।"[৭৩৯]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ابْنَ صَائِدٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ... فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْتَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

"হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কোনো একদিন মদিনার একটি গলিতে নবিজি ﷺ-এর ইবনে সাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো...

---

[৭৩৭]. সুরা বাকারা, ২: ২৮৫

[৭৩৮]. প্রাগুক্ত, ১৭৭

[৭৩৯]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৮

ইবনে সাইদ বললেন, আপনি কি এ কথার সাক্ষ্য দেন—আপনি আল্লাহর রাসুল? নবিজি ﷺ তখন বললেন, আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ তাআলার ওপর, তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহে ও তাঁর রাসুলগণের ওপর এবং পরকালের ওপর।"[৭৪০]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহে ছয়টি বস্তুর প্রতি ঈমান আনার কথা উল্লেখ রয়েছে। এজন্য কোনো ব্যক্তি ছয়টি বস্তুর প্রতি ঈমান আনলে তাকে মুমিন আখ্যা দেওয়া হবে। আর না তাকে মুমিন বলা যাবে না।

আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমানের অর্থ

আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমানের অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলাকে এক মানা।

কাফির : এখন যদি কেউ আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টিকর্তাই না মানে, সে বলে—গোটা দুনিয়া নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে যেমনটি বর্তমানের নাস্তিক-মুরতাদরা বলে থাকে তাহলে এমন ব্যক্তিকে কাফির বলা হয়।

মুশরিক : যদি আল্লাহ তাআলাকে মানে। দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তাও মানে কিন্তু একাধিক স্রষ্টা মানে, তাহলে তাকে মুশরিক বলা হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা শিরকের অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

কুরআনকে মানার অর্থ

কুরআনকে মানা ৩ প্রকার। যথা :

১. কুরআনকে মানার অর্থ হলো, তার প্রতিটি আয়াতকে এমনভাবে মানা যে, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আয়াত। এর মধ্যে কোনো একটি আয়াতকেও যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

২. সুস্পষ্ট আয়াত থেকে যদি কোনো বিধান প্রমাণিত হয়, তাহলে সেটা মানাও জরুরি। কেউ যদি তা অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। যেমন : সালাত, সিয়াম সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। কেউ যদি তা অস্বীকার করে, যেমন কেউ যদি বলে আমি সালাতকে মানি না কিংবা সিয়ামকে মানি না, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা সে আয়াতকেই অস্বীকার করল।

ফিকহের কিতাবসমূহে এ কথাটিকেই বলা হয়েছে—যে কেউ যদি উমুরে দ্বীনিয়া তথা দ্বীনের কোনো বিধানকে অস্বীকার করে, তাহলে সে কাফির হয়ে

---

[৭৪০]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২২৪৭। সনদ সহিহ। এই মর্মে *সহিহ বুখারি* (২৮৯০) গ্রন্থে হাদিস বর্ণিত আছে।

যাবে। অর্থাৎ ওই উমুরে দ্বীনিয়া তথা দ্বীনের কোনো বিধান যা সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, তা অস্বীকার করা সরাসরি উক্ত আয়াতকে অস্বীকারের নামান্তর। এজন্য সে কাফির হয়ে যাবে। তবে কোনো ব্যক্তি যদি সালাত ফরজ, সিয়াম ফরজ মানে। তার ফরজিয়াতকে অস্বীকার করে না কিন্তু অলসতার কারণে সালাত পড়ে না কিংবা সিয়াম পালন করে না, তাহলে সে কাফির হবে না। তবে তাকে ফাসিক তথা পাপাচারি বলা হবে।

অস্পষ্ট আয়াতের তাফসির মানার উসুল

৩. আয়াতটি অস্পষ্ট তবে তার অর্থ সুস্পষ্ট নয় এবং কোনো সুস্পষ্ট হাদিসেও তার অর্থ বর্ণনা করা হয়নি। দুই মুফাসসির দুই অর্থ বর্ণনা করেছেন। এখন কোনো ব্যক্তি আয়াতকে তো মানে যে, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আয়াত কিন্তু অর্থের ক্ষেত্রে এক মুফাসসিরের তাফসিরকে মানে এবং অপর তাফসিরের হিসেবে যে অর্থ হয় কিংবা তাফসিরের হিসেবে যে বিধান সাব্যস্ত হয়, তা মানে না। তাহলেও সে ব্যক্তি কাফির হবে না। কেননা সে তো আয়াতকে মানে কিন্তু তার অস্পষ্ট তাফসিরকে মানে না। এজন্য সে কাফির হবে না। এই নিয়মটি মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি। আর না হয় অনেক মতাবলম্বী এমন করে—অস্পষ্ট আয়াতের অর্থ এক তাফসিরের হিসেবে করে থাকে এবং অপর মতাবলম্বী তা না মানার কারণে তাদেরকে কাফির আখ্যা দিয়ে দেয়। আর এ ক্ষেত্রে এতটা কঠোরতা করে থাকে যে, তাদের পেছনে সালাত পড়ে না এবং কেউ তার জানাজা পড়ালে জানাজার ইমাম ও মুসল্লি সবাইকে কাফির আখ্যা দিয়ে দেয় এবং তাদের সকলের বিয়ে ভেঙে দেয়।

এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যে, এমন ফতোয়ার কারণে মুসলমান কত ভাগে বিভক্ত হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহর কী অবস্থা। আয়াতের অস্বীকার করলে যে কাফির হয়ে যাবে তার দলিল হলো, পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾

“নিশ্চয় যারা অস্বীকার করে আল্লাহর আয়াতসমূহ, তাদের জন্যই রয়েছে কঠিন আজাব।”[৭৪১]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

---

[৭৪১]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ৪

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতসমূহের সঙ্গে কুফরি করে, নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।"[৭৪২]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾

"নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের সঙ্গে কুফরি করে এবং অন্যায়ভাবে নবিদেরকে হত্যা করে।"[৭৪৩]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾

"বরং জালিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে।"[৭৪৪]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, যে আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহকে না মানে সে কাফির।

আয়াতের অস্বীকারের অর্থ পূর্বে বর্ণনা কারা হয়েছে—কেউ যদি কুরআনের কোনো একটি আয়াতকে অস্বীকার করে অথবা আয়াত থেকে প্রমাণিত সুস্পষ্ট কোনো বিধানকে অস্বীকার করে, তাহলে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে।

কিতাবসমূহ এবং রাসুলগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থ

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾

"রাসুল তাঁর নিকট তাঁর রবের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসুলগণের ওপর, আমরা তাঁর রাসুলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না।"[৭৪৫]

আয়াতের মধ্যে كُتُبِهِ শব্দটি বহুবচন ক্রিয়া। যার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা যতগুলো কিতাব নাজিল করেছেন, সবগুলোই সত্য। আমরা উক্ত সবগুলোর

---

৭৪২. প্রাগুক্ত, ১৯
৭৪৩. প্রাগুক্ত, ২১
৭৪৪. সুরা আনআম, ৬: ৩৩
৭৪৫. সুরা বাকারা, ২: ২৮৫

প্রতিই ঈমান রাখি—উক্ত কিতাবসমূহ নিজ নিজ যুগ অনুযায়ী পথপ্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট ছিল। আর সেগুলোতেও ঈমানের উপর্যুক্ত ছয়টি বিষয় বিদ্যমান ছিল, যেগুলোর ওপর আমাদের জন্য ঈমান আনা জরুরি। তবে তার শাখাগত মাসআলা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। বর্তমানে সেগুলোর ওপর আমল করা জায়েয নেই। কেননা উক্ত মাসআলা বর্তমানে রহিত হয়ে গেছে। বর্তমানে নবিজি ﷺ-এর শরিয়তের ওপরই আমল করতে হবে। এ সকল আসমানি কিতাবসমূহকে সম্মান করতে হবে এবং অন্তর থেকে মহব্বত করতে হবে।

আয়াতের মধ্যে وَرُسُلِهِ শব্দটি বহুবচন ক্রিয়া। যার অর্থ হলো, আমরা সকল রাসুলদের প্রতি ঈমান রাখি—তারা নিজ নিজ যুগে সত্য নবি ও রাসুল ছিলেন। তাদের শরিয়ত সত্য ছিল। উক্ত শরিয়তে ঈমানের এই ছয়টি বিষয়ও ছিল। (আল্লাহ, রাসুল, কিতাব, ফেরেশতা, আখিরাত ও তাকদিরের প্রতি ঈমান আনা) এগুলো সকল নবির একই ছিল। তবে তাদের শাখাগত কিছু মাসআলা ভিন্ন ছিল। যেমন : সালাতের পদ্ধতি, সিয়ামের পদ্ধতি ইত্যাদি ভিন্ন ছিল। এজন্য আমরা তাদের শাখাগত মাসআলার ওপর আমল করব না।

পূর্বের রাসুলগণের শরিয়তেও উপর্যুক্ত ছয়টি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা জরুরি ছিল

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾

"রাসুল তাঁর নিকট তাঁর রবের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসুলগণের ওপর, আমরা তাঁর রাসুলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না।"[৭৪৬]

পূর্বের রাসুলগণের ব্যাপারে ঈমান আনব—তাঁরা সত্য রাসুল এবং সত্য নবি। তাঁদের সম্মান করাও জরুরি। তাঁদেরকে অন্তর থেকে মহব্বত করতে হবে। এতে সামান্য পরিমাণ কম-বেশি করা জায়েয নেই। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

---

৭৪৬. সুরা বাকারা, ২: ২৮৫

কেউ এই ছয়টি বিষয়ের কোনো একটিকে অস্বীকার করলে, সে কাফির হয়ে যাবে

কেউ যদি এই ছয়টি বিষয়ের যেকোনো একটিকে অস্বীকার করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি এই ছয়টি বিষয়ের যেকোনো একটিকে অস্বীকার না করে, তাহলে সে কাফির হবে না। মুসলমানই থাকবে। এজন্য সামান্য ছোটখাটো বিষয়ে কুফরের ফতোয়া দেওয়া জায়েয নেই। এর দলিল হলো *আকিদাতুত তহাবির* এই ইবারত বা মূলপাঠ—

وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যে-সকল বস্তুসমূহের প্রতি ঈমান আনার কারণে ঈমানে প্রবেশ করিয়েছেন, ওই সকল বস্তু অস্বীকার করলে সে ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে।[৭৪৭]

এই ইবারত তথা মূলপাঠে বলা হয়েছে—যেহেতু এই ছয়টি বস্তুর স্বীকারোক্তির দ্বারা মানুষ মুসলমান হয়, তাই এই ছয় বস্তুর যেকোনো একটিকে অস্বীকার করার দ্বারা সে ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এই ছয় বস্তুর যেকোনো একটিকে অস্বীকার না করে, তাহলে সে মুমিনই থাকবে। এমনইভাবে গুনাহে কবিরা করার দ্বারাও সে কাফির হবে না। তবে হ্যাঁ! যদি কবিরা গুনাহকে হালাল মনে করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা কবিরা গুনাহকে হালাল মনে করার অর্থ হলো, সে কবিরা গুনাহসংক্রান্ত আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছে।

আন্তরিক সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম ঈমান

যখন কোনো ব্যক্তি ঈমানের জন্য যে ছয়টি বস্তু জরুরি তার সবগুলোর প্রতি আন্তরিক সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদান করবে—আমি মুসলমান, তখন সে মুমিন হবে। আর যদি সে আন্তরিক সত্যায়ন না করে শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তাহলে সে মুমিন নয়। শরিয়তে তাকে মুনাফিক বলা হয়। আর কোনো কোনো কিতাবে এটাও বলা হয়েছে—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করতে হবে।

মৌখিক স্বীকারোক্তি এজন্য জরুরি—যেন তার ওপর দুনিয়াবি বিধান চালু করা যায়। যেমন, তার ওপর জানাজা পড়া হবে। তার নিকট মুসলমান নারীর বিয়ে দেওয়া হবে। কেননা সে যদি ইসলামের স্বীকারোক্তি না দেয়, তাহলে দুনিয়াবাসী কীভাবে জানবে যে, সে মুসলমান এবং তার ওপর

---

৭৪৭. *আকিদাতুত তহাবি*, আকিদা নং ৬১ পৃষ্ঠা- ১৫

ইসলামি বিধানসমূহ চালু করা হবে। *আকিদাতুত তহাবির* ইবারত বা মূলপাঠ হলো—

وَالْإِيمَانُ: هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ

অর্থাৎ ঈমান হলো, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আন্তরিক সত্যায়নের নাম।[৭৪৮]

এই ইবারত তথা মূলপাঠে বলা হয়েছে—আন্তরিকভাবে সত্যায়ন করা ও মৌখিকভাবে স্বীকার করার নামই ঈমান।

হত্যার ভয়ে ঈমানের অস্বীকার

যদি অন্তরে ঈমান বিদ্যমান রেখে হত্যার ভয়ে আল্লাহকে অস্বীকার করা হয়, তাহলেও সে মুমিন থাকবে। কেননা প্রকৃত ঈমান হলো আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলাকে এক মানা। এর দলিল হলো, পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

“যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরি দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের ওপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাআজাব। ওই ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরি করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত।”[৭৪৯]

এই আয়াতে দুটি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হলো, যদি অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলাকে না মানে, তাহলে মৌখিকভাবে স্বীকার করলেও আল্লাহ তাআলার নিকট সে মুমিন নয়। অপরটি হলো, অন্তরে ঈমান লুক্কায়িত আছে। কিন্তু কোনো অপারগতার কারণে মৌখিকভাবে আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করেছে, তাহলে সে মুমিন। তার ওপর কুফরির ফতোয়া লাগানো সঠিক নয়।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾

---

৭৪৮. প্রাগুক্ত, আকিদা নং ৬২ পৃষ্ঠা- ১৫

৭৪৯. সুরা নাহল, ১৬: ১০৬

"এরাই, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন।"[৭৫০]

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়—অন্তরে আল্লাহ তাআলার তাওহিদ তথা একত্ববাদের দৃঢ়বিশ্বাস লালনের নামই প্রকৃত ঈমান।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ বলবে আর তার অন্তরে শস্য পরিমাণও পুণ্য বিদ্যমান থাকবে, তাকে (একদিন না একদিন) জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রদান করা হবে।"[৭৫১]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ....ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ বলবে আর তার অন্তরে শস্য পরিমাণও পুণ্য বিদ্যমান থাকবে, তাকে (একদিন না একদিন) জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রদান করা হবে।"[৭৫২]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে জানা গেল, কারও যদি এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকে তাহলে সে একদিন (নিজ গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পর) জান্নাতে প্রবেশ করবে। যার অর্থ হলো, অন্তরের বিশ্বাসের নামই প্রকৃত ঈমান।

আমরা অন্তরের যাচাই-বাছাইয়ের প্রতি আদিষ্ট নই

কেউ যদি মৌখিকভাবে ঈমানের স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তাহলে আমরা এ বিষয়ে আদিষ্ট নই—এটা জিজ্ঞাসাবাদ করব যে, সে অন্তর থেকে বলেছে কিনা? বরং আমরা তাকে মুমিন মনে করে তার ওপর ইসলামের বিধানসমূহ জারি করে দেবো। তবে হ্যাঁ! সে যদি প্রকাশ্যে কোনো কুফর অথবা শিরকি কাজ করে, তাহলে তাকে কাফির মনে করা হবে। যেমন, সে ঈমানের

৭৫০. সুরা মুজাদালাহ, ৫৮: ২২

৭৫১. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪৪

৭৫২. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৭৪১০; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৯৩; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১২১৫৩

স্বীকারোক্তিও প্রদান করে এবং মূর্তির সামনে সিজদাও করে, তাহলে এখন তাকে কাফির মনে হবে। কেননা আমলের দিক থেকে সে কুফরি করেছে।

আমরা যে অন্তরের যাচাই বাছাইয়ের প্রতি আদিষ্ট নই তার দলিল হলো হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.... فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَقَتَلْتَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ، قَالَ: أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ، حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ

"হজরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত... আমার সঙ্গে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলো। সে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ বলতে লাগল। তারপরও আমি তাকে তাকে হত্যা করে ফেললাম। তার কথা যখন আমার স্মরণ হলো, তখন আমি নবিজি ﷺ-এর নিকট তা ব্যক্ত করলাম। নবিজি ﷺ তখন আমাকে বললেন, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করে ফেললে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! সে তো অস্ত্রের ভয়ে এমনটি বলেছে। নবিজি ﷺ তখন বললেন, তুমি কি তার অন্তর ছিঁড়ে দেখেছ যে তুমি জানবে সে সত্যি বলেছে কি না? নবিজি ﷺ এ কথাটি বারবার এমনভাবে বলতেছিলেন যে, আমার মনে হচ্ছিল যে, আমি যদি আজই মুসলমান হতাম, তাহলে ভালো ছিল।"[৭৫৩]

এই হাদিস থেকে জানা গেল—কেউ যদি মৌখিকভাবে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ বলে, তাহলে তারপর অন্তরে ঈমান আছে কি না তা যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন নেই। এটা আল্লাহ তাআলা জানেন। আমরা তাকে মুসলিমই মনে করব এবং তার ওপর ইসলামি বিধান জারি করব। বর্তমানে তো সামান্য ছোটখাটো বিষয়ে অন্যকে কাফির, মুশরিক হওয়ার ফতোয়া দিয়ে দেয় এবং এর ওপর কঠোরতা করে। এটা হাদিসের বিরোধী।

আমল করাও ঈমানের একটি অংশ

আমল করাও ঈমানের একটি অংশ। এজন্য কোনো কোনো গ্রন্থে وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ তথা উক্ত বিশ্বাসকে আমলে রূপান্তর করার কথাও লিখা আছে। তবে একটি

---

৭৫৩. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৯৬; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৬৪০।

কথা মনে রাখতে হবে, কেউ যদি প্রকৃত ঈমানবিরোধী কোনো আমল করে, তাহলে তাকে অবশ্যই কাফির বলে গণ্য করা হবে। যেমন কুরআনুল কারিমে এসেছে—আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করো না। আর সে বিভিন্ন মূর্তির সামনে সিজদা করল, তাহলে এই আমলের কারণে সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা সে সুস্পষ্ট আয়াতের বিরোধী আমল করেছে। আমলও যে ঈমানের অংশ তার দলিল হলো পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾

"আর অবশ্যই আমি তার প্রতি ক্ষমাশীল, যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎ পথে চলতে থাকে।"[৭৫৪]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

"তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।"[৭৫৫]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾

"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও শেষদিনের প্রতি এবং নেক কাজ করেছে—তবে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান।"[৭৫৬]

এই আয়াতসমূহে বলা হয়েছে—ঈমান এনছে এবং নেক আমল করেছে। যা থেকে বুঝা যায়, নেক আমল করাও ঈমানের অংশ।

আমরা যে কালিমা পাঠ করি, তা হলো দুটি আয়াতের সমন্বিত রূপ

কালিমায়ে তাইয়্যেবা হলো দুটি আয়াতের দুটি অংশের সমন্বিত রূপ। একটি হলো, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ অপরটি হলো, مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ। আর উক্ত আয়াতদুটি হলো যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ﴾

---

৭৫৪. সুরা ত্ব-হা, ২০: ৮২
৭৫৫. সুরা আসর, ১০৩: ৩
৭৫৬. সুরা বাকারা, ২: ৬২

"অতএব জেনে রাখো; নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা চাও তোমার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য।"[৭৫৭]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾

"তাদের যখন বলা হতো, আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; তখন নিশ্চয় তারা অহংকার করত।"[৭৫৮]

আর অপর অংশের আয়াত হলো যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সঙ্গে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়।"[৭৫৯]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—ইসলামের রুকন বা মূল ভিত্তি হলো পাঁচটি। এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো মাবুদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসুল।"[৭৬০]
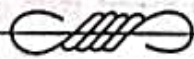
[৭৫৭]. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ১৯

[৭৫৮]. সুরা সাফফাত, ৩৭: ৩৫

[৭৫৯]. সুরা ফাতহ, ৪৮: ২৯

[৭৬০]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৮; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২১; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২৬০৯; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ৫০০১; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৪৭৯৮

তাকদির তথা ভাগ্যের বর্ণনা

এ আকিদা সম্পর্কে ২টি আয়াত এবং ৬টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

তাকদির তথা ভাগ্য অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা কারও ভাগ্যে কোনো বস্তু লেখা থাকলে তা ঘটবেই। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তির সবকিছু পূর্বেই লেখে দিয়েছেন। অতঃপর যে ব্যক্তি নেককার সে নিজ খুশিতে এবং নিজের ইচ্ছাতেই নেক কাজ করে থাকে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে। আর গুনাহগার ব্যক্তি নিজ খুশিতে এবং নিজের ইচ্ছাতেই গুনাহের কাজ করে থাকে এবং এর কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করে। এই প্রবেশ করাটা নিজ আমলের কারণে। যদিও তাকদির তথা ভাগ্যে পূর্ব থেকেই লেখা ছিল।

মানুষের জন্য এই তাকদির তথা ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা ফরজ। ঈমানের ছয়টি ভিত্তির মধ্যে এটি অন্যতম একটি। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾

"তোমার রব থেকে গোপন থাকে না জমিনের বা আসমানের অণু পরিমাণ কিছুই এবং তা থেকে ছোট বা বড়, তবে (এর সবকিছুই) রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।"[৭৬১]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ﴾

"আর তারা যা করেছে, সবকিছুই 'আমলনামায়' রয়েছে। আর ছোট বড় সবকিছুই লিখিত আছে।"[৭৬২]

---

৭৬১. সুরা ইউনুস, ১০: ৬১

এই আয়াতগুলোতে তাকদির তথা ভাগ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য তাকদিরের প্রতি ঈমান আনা জরুরি।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِابْنِهِ... سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، يَا بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي

"হজরত উবাদা বিন সামিত রা. তার ছেলেকে বললেন, ... আমি নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছি—আল্লাহ তাআলা প্রথম যে বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা হচ্ছে কলম। তারপর তিনি তাকে বললেন, লিখো! কলম বলল, হে আমার রব! কি লিখব? তিনি বললেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর তাকদির লিখো। অতঃপর হজরত উবাদা বিন সামিত রা. নিজের পুত্রকে বললেন, হে আমার পুত্র! আমি নবিজি ﷺ থেকে এটাও বলতে শুনেছি—যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস ছাড়া মারা যায় সে আমার (উম্মতের) নয়। অর্থাৎ মুসলমান নয়।"[৭৬৩]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে মাখলুকের তাকদির তথা ভাগ্য লিখেছেন।"[৭৬৪]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ

---

[৭৬২]. সুরা কামার, ৫৪: ৫২-৫৩

[৭৬৩]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৭০০; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২১৫৫। সনদ সহিহ।

[৭৬৪]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৬৫৩

"হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—কোনো বান্দাই মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না সে তাকদির তথা ভাগ্য ও তার ভালো-মন্দের ওপর ঈমান আনবে। এমনকি তার নিশ্চিত বিশ্বাস থাকতে হবে যে, যা-কিছু ঘটছে তা কিছুতেই অঘটিত থাকত না এবং যা-কিছু ঘটে নাই তা কখনো তাকে স্পর্শ করবে না।"[৭৬৫]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী তাকদির তথা ভাগ্য সত্য এবং এর প্রতি ঈমান আনা জরুরি।

তাকদিরের প্রকার

তাকদির তথা ভাগ্য দুই প্রকার। যথা :

তাকদিরে মুবরাম এবং তাকদিরে মুআল্লাক।

তাকদিরে মুবরাম অর্থ হলো, এই তাকদির পরিবর্তন হয় না। এটা অকাট্য। যেমন, যায়েদের তাকদিরে লেখা হয়েছে যে, সে ৫০ বছর বয়সে মারা যাবে। তাহলে এটা নির্ধারিত যে, সে ৫০ বছর বয়সে মারা যাবে।

তাকদিরে মুআল্লাক অর্থ হলো, কোনো কাজ করার ওপর তা সম্পৃক্ত। আর উক্ত কাজ করার দ্বারা এই তাকদির পরিবর্তন হতে পারে। যেমন, বলা হয় যে, তুমি যদি তোমার মায়ের সেবা করো, তাহলে এর দ্বারা তোমার হায়াত বৃদ্ধি পাবে। তাহলে এখানে সেবার দ্বারা হায়াত বৃদ্ধি হলো। এটা তাকদিরে মুআল্লাক। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইলমের মধ্যে আছে যে, এই ব্যক্তি মায়ের সেবা করবে কি না এবং তার হায়াত বাড়বে কি না। এটা তাকদিরে মুবরাম। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ.

"হজরত সালমান রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—দুআ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই তাকদির তথা ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে না এবং সৎকাজ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই হায়াত বা আয়ু বাড়াতে পারে না।"[৭৬৬]

এই হাদিসে বলা হয়েছে—দুআর দ্বারা আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হতে পারে কিংবা নেক আমলের দ্বারা হায়াত বা আয়ু বৃদ্ধি হতে পারে। এটা

---

৭৬৫. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২১৪৪। সনদ সহিহ।
৭৬৬. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২১৩৯। সনদ হাসান।

তাকদিরে মুআল্লাকে হয়ে থাকে। তবে সে এমনটি করবে কি না এ কথা আল্লাহ তাআলার ইলমের মধ্যে চিরকাল থেকেই বিদ্যমান। যাকে তাকদিরে মুবরাম বলা হয়।

যে যেমন হয়ে থাকে, সে তেমন কাজের তাওফিকই লাভ করে থাকে

নবিজি ﷺ বলেছেন, তাকদির তথা ভাগ্য সত্য। কিন্তু যে ব্যক্তি নেককার হয়ে থাকে, তার নেক কাজ করারই তাওফিক হয়ে থাকে। আর সে তার নেক কাজের কারণে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি গুনাহগার হয়ে থাকে, তার গুনাহের কাজ করারই তাওফিক হয়ে থাকে। তারপর সে উক্ত গুনাহের কাজের কারণে জাহান্নামে যাবে। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ... قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، قَالَ: أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ، ثُمَّ قَرَأَ: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى.

"হজরত আলি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা বাকিউল গারকাদ (কবরস্থানে) একটি জানাজায় উপস্থিত ছিলাম... নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই; অথবা বললেন, এমন কোনো সৃষ্ট প্রাণী নেই, যার জন্য জান্নাত ও জাহান্নামে জায়গা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়নি আর এ কথা লিখে দেওয়া হয়নি যে, সে দুর্ভাগা হবে কিংবা ভাগ্যবান। তখন এক ব্যক্তি আরজ করল, হে আল্লাহর রাসুল! তাহলে কি আমরা আমাদের তাকদির তথা ভাগ্যলিপির ওপর ভরসা করে আমল করা ছেড়ে দেবো না? কেননা আমাদের মধ্যে যারা ভাগ্যবান তারা অচিরেই ভাগ্যবানদের আমলের দিকে ধাবিত হবে। আর যারা দুর্ভাগা তারা অচিরেই দুর্ভাগাদের আমলের দিকে ধাবিত হবে। তিনি বললেন, যারা ভাগ্যবান তাদের জন্য সৌভাগ্যের আমল সহজ করে দেওয়া হয়। আর ভাগ্যাহতদের দুর্ভাগ্যের আমল সহজ করে দেওয়া হয়। অতঃপর নবিজি ﷺ সুরাতুল-লাইলের ৫ নং আয়াত فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ অর্থাৎ "সুতরাং যে দান করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে আর উত্তমকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে"—তিলাওয়াত করেন।"[৭৬৭]

---

৭৬৭. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১৩৬২

এই হাদিস থেকে জানা গেল, যার তাকদির তথা ভাগ্যে নেকি লেখা আছে, সে নেক কাজ করবে এবং যার তাকদির তথা ভাগ্যে গুনাহ লেখা আছে, সে গুনাহের কাজ করবে।

তাকদির তথা ভাগ্যের ব্যাপারে অধিক তর্ক করা উচিত নয়

তাকদির বা ভাগ্যকে বুঝা কঠিন। এজন্য এ সম্পর্কে অধিক তর্ক করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ، فَقَالَ: أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ، أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِيهِ

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ কোনো একসময় আমাদের সামনে এসে দেখলেন যে, আমরা তাকদির তথা ভাগ্যবিষয়ক তর্কে-বিতর্কে লিপ্ত রয়েছি। তিনি ভীষণ রাগান্বিত হলেন, এতে তাঁর মুখমণ্ডল এমন লালবর্ণ ধারণ করল যেন তাঁর দুই গালে ডালিম নিঙড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি এজন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছ, না আমি তোমাদের প্রতি এটা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি? এ বিষয়ের তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ যখনই বাক্‌বিতণ্ডা করেছে তখনই তারা ধ্বংস হয়েছে। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সঙ্গে তোমাদের বলছি, তোমরা এ বিষয়ে কখনো যেন বিতর্কে লিপ্ত না হও।"[৭৬৮]

[৭৬৮]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ১৩৬২। সনদ হাসান।
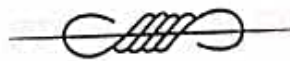
সামর্থ্য লাভ, সৃষ্টি ও উপার্জনের বর্ণনা

এ আকিদা সম্পর্কে ৮টি আয়াত এবং ২টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

এ অধ্যায়ে তিনটি বিষয় রয়েছে। সামর্থ্য লাভ করা, সৃষ্টি ও উপার্জন। এ তিনটি বিষয় বুঝা খুবই জরুরি।

সামর্থ্যের সংজ্ঞা

সামর্থ্য লাভের অর্থ হলো, আপনার নিকট সেই কাজটি করার সর্বপ্রকার সহজলভ্যতা বিদ্যমান থাকা। সকল উপকরণের ব্যবস্থা হওয়া। এগুলো সব আল্লাহ তাআলার হুকুম বা নির্দেশের ওপর নির্ভর।

হুকুম বা নির্দেশ পালনের জন্য নিম্নের চারটি বিষয় বিদ্যমান থাকলে তাকে সামর্থ্য লাভ করা বলে। যথা :

১. উক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য এতটুকু সুস্থ হওয়া যেন সে ইবাদত করতে পারে।

২. উক্ত কাজ করার শক্তি।

৩. উক্ত কাজের ক্ষমতা।

৪. উক্ত কাজ করার জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকা।

এই চারটি বিষয় যদি বিদ্যমান থাকে, তাহলে উক্ত কাজটি মানুষের ওপর ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যক হয়ে যায়। এটাকে বলে কুদরতে মুয়াসসারা তথা সহজ ব্যবস্থা।

উক্ত চারটি বিষয় বিদ্যমান হওয়ার পরে কাজের পূর্বে যদি ব্যক্তি উক্ত কাজের ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা উক্ত কাজটি করিয়ে দেবেন এবং উক্ত কাজকে সৃষ্টি করে দেবেন। এটাকে বলে তাওফিক। আর এই সৃষ্টি করাকে বলে তাখলিক তথা সৃষ্টি। যা একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাজ।

এ সম্পর্কে *আকিদাতুত তহাবির* ইবারত তথা মূলপাঠ হলে :

وَالِاسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْفِعْلُ، مِنْ نَحْوِ التَّوْفِيقِ الَّذِي لا يجوز أن يُوصَفَ الْمَخْلُوقُ بِهِ - تَكُونُ مَعَ الْفِعْلِ. وَأَمَّا الِاسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْوُسْعِ، وَالتَّمْكِينِ وَسَلَامَةِ الْآلَاتِ - فَهِيَ قَبْلَ الْفِعْلِ، وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ، وَهُوَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

অর্থাৎ সামর্থ্য দুপ্রকার, একটি হলো এমন সামর্থ্য যার সঙ্গে কর্ম পাওয়া যায়। যেমন, এমন তাওফিক যার সঙ্গে বান্দা বা মাখলুক গুণান্বিত হওয়া জায়েজ নেই। আর এই সামর্থ্যটি কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো, ওই সামর্থ্য যা সুস্থতা, সক্ষমতা এবং উপায়-উপকরণের নিরাপত্তার দিক থেকে হয়ে থাকে। আর তা কর্মের পূর্বে পাওয়া যায়। আর এ সামর্থ্যের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ সম্পৃক্ত থাকে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

আল্লাহ তাআলা সামর্থ্যের অধিক কাজের জিম্মাদারি দেন না।[৭৬৯]

এই ইবারত তথা মূলপাঠে দুই প্রকার সামর্থ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম প্রকার সামর্থ্য হলো, এমন সামর্থ্য যার সঙ্গে কর্ম পাওয়া যায়। অর্থাৎ কর্মকে সৃষ্টি করা। এটা আল্লাহ তাআলার গুণ। যা কোনো মাখলুক তথা সৃষ্টির হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকার সামর্থ্য হলো, যা সুস্থতা, সক্ষমতা এবং উপায় উপকরণের নিরাপত্তার দিক থেকে হয়ে থাকে। আর তা কর্মের পূর্বে পাওয়া যায়। আর এ সামর্থ্যের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ সম্পৃক্ত থাকে।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾

“এবং সামর্থ্যবান মানুষের ওপর আল্লাহর জন্য বাইতুল্লাহর হজ করা ফরজ।”[৭৭০]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

---

৭৬৯. *আকিদাতুত তহাবি*, আকিদা নং ৮৫ পৃষ্ঠা- ১৮

৭৭০. সুরা আলে ইমরান, ৩: ৯৭

"আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন-মুমিন নারীদের বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না, সে (বিবাহ করবে) তোমাদের মুমিন যুবতীদের মধ্য থেকে, তোমাদের হাত যাদের মালিক হয়েছে।"[৭৭১]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

"হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অর্শ্ব রোগ ছিল। তাই নবিজি ﷺ-এর খেদমতে সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, তার সামর্থ্য না থাকলে বসে, যদি তাও না পার তাহলে শুয়ে।"[৭৭২]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে জানা গেল, সকল উপায়-উপকরণ ব্যবস্থা হওয়াকে সামর্থ্য বলে। আর এর ওপরই বিধান নির্ভর করে।

উপার্জনের সংজ্ঞা

উপার্জন অর্থ হলো, কামাই করা। আপনি কোনো কর্মের ইচ্ছা পোষণ করেন। তারপর উক্ত কর্মের জন্য উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেন। উক্ত কর্মটি নিজ ইচ্ছায় সম্পাদন করেন। এই কর্মটি সম্পাদন করাকে উপার্জন বলে। আর এর ওপর শাস্তি এবং পুরস্কার নির্ভর করে। কেননা আপনার নিজ ইচ্ছায় কর্মটি সম্পাদন করেছেন। যদিও কর্মটি করার জন্য আল্লাহ এই কর্মটিকে সৃষ্টি করে দেন। নিম্নের আয়াতসমূহে উপার্জনের কথা উল্লেখ রয়েছে। আর এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, তোমাদের উপার্জনের ফলেই এই শাস্তি কিংবা পুরস্কার দেওয়া হবে। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

"আর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেওয়া হবে এবং তাদের ওপর জুলুম করা হবে না।"[৭৭৩]

---

[৭৭১]. সুরা নিসা, ৪: ২৫

[৭৭২]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১১১৭

[৭৭৩]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ২৫

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

"অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরোপুরি দেওয়া হবে যা সে উপার্জন করেছে এবং তাদের ওপর জুলুম করা হবে না।"[৭৭৪]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾

"হ্যাঁ, যে মন্দ উপার্জন করবে এবং তার পাপ তাকে বেষ্টন করে নেবে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে হবে স্থায়ী।"[৭৭৫]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল, আমরা যা নিজ ইচ্ছায় উপার্জন করি, তার প্রতিদান দেওয়া হবে এবং এর ওপরই নির্ভর করে শাস্তি কিংবা পুরস্কার।

সৃষ্টি

সৃষ্টি অর্থ হলো, কোনো বস্তুকে সৃজন করা। এটা আল্লাহ তাআলার কাজ। এমনকি যা-কিছু আমরা নিজেরা করি, তাও আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেন। কিন্তু যেহেতু আমরা উপার্জন করে থাকি অর্থাৎ ভালো কিংবা মন্দ কর্মের ইচ্ছা পোষণ করে থাকি, অতঃপর তা নিজ ইচ্ছায় তা সম্পাদন করি। যার ফলে আল্লাহ তাআলা আমাদের উক্ত কর্মটি সৃষ্টি করে দেন। অর্থাৎ তা সৃজন করে দেন। তাই এই উপার্জন করার কারণেই পুরস্কার কিংবা শাস্তি দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলাই সকল কর্মের সৃষ্টিকর্তা। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

"আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক।"[৭৭৬]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾

"তিনি আল্লাহ, তোমাদের রব; সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই।"[৭৭৭]

---

[৭৭৪]. প্রাগুক্ত, ৩: ১৬১

[৭৭৫]. সুরা বাকারা, ২: ৮১

[৭৭৬]. সুরা যুমার, ৩৯: ৬২

এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টিকর্তারই সৃষ্টি। এজন্য আমাদের উপার্জনের পরে যে কর্ম সৃষ্টি হবে, তাও আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেন।

এই মাসআলার ব্যাপারে পূর্ববর্তী যুগ থেকেই অনেক মতবিরোধ রয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনা "আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা" শিরোনামের অধীনে দেখুন।

'আলাসতু'-এর অঙ্গীকার

সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ তাআলা হজরত আদম আ.-এর সন্তানদের পিঠ থেকে বের করেছেন এবং সকলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ তথা আমি কি তোমার রব নই? সকলে বলল, হ্যাঁ! আপনি আমাদের রব। উক্ত অঙ্গীকারকেই 'আলাসতু' বলা হয়। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾

"আর স্মরণ করো, যখন তোমার রব বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের ওপর সাক্ষী করলেন যে, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল হ্যাঁ! আমরা সাক্ষ্য দিলাম। যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, নিশ্চয় আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম।"[৭৭৮]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِنَّ اللهَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنَعْمَانَ - يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا، فَنَثَرَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلًا، قَالَ: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ الخ

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—আল্লাহ তাআলা না'মান তথা আরাফার স্থানে হজরত আদম আ.-এর পিঠ থেকে বের করে এই অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং নিজের সামনে তাদের

---

[৭৭৭]. সুরা গাফির, ৪০: ৬২

[৭৭৮]. সুরা আরাফ, ৭: ১৭২

ক্ষুদ্র বালু কণার ন্যায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। তারপর তাদের সকলের সঙ্গে কথা বলেছেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তারপর ওপরের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।"[৭৭৯]

এই আয়াত এবং হাদিসে— ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।
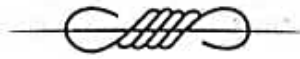
[৭৭৯]. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২৪৫৫। ইমাম হাকেম রহ.-এর সনদকে সহিহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবি রহ. এতে সমর্থন করেছেন।

শিরক সকল আসমানি কিতাবেই নিষিদ্ধ

এ আকিদা সম্পর্কে ৩৪টি আয়াত এবং ৬টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কুফর ও শিরক। এজন্য এই দুই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি। পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও তাদের শরিয়তে শিরক না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ﴾

"বলো, হে কিতাবিগণ, তোমরা এমন কথার দিকে এসো, যেটি আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত না করি। আর তার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসাবে গ্রহণ না করি।"[৭৮০]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾

"আর অবশ্যই তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে ওহি পাঠানো হয়েছে যে, তুমি শিরক করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবেই। আর অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। বরং তুমি আল্লাহরই ইবাদত করো এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।"[৭৮১]

---

৭৮০. সুরা আলে ইমরান, ৩: ৬৪

৭৮১. সুরা যুমার, ৩৯: ৬৫-৬৬

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

"বলো, নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে আমি তাদের প্রথম হই। আর তুমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"[৭৮২]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ﴾

"বলো আমাকে কেবল আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেন আমি আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁর সঙ্গে শরিক না করি। আমি তাঁরই দিকে দাওয়াত দিই এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তনস্থল।"[৭৮৩]

এ সকল আয়াতে বলা হয়েছে—কখনো শিরক করো না।

আরবের বাসিন্দারা এক আল্লাহকে মানত কিন্তু শিরকও করত

আরবের বাসিন্দারা এক আল্লাহকে মানত কিন্তু তাঁর গুণাবলিতে অন্যদেরকেও শরিক করত। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

"বলো, আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদের রিজিক দেন? অথবা কে (তোমাদের) শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে সব বিষয় পরিচালনা করেন? তখন তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। সুতরাং তুমি বলো, তারপরও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?"[৭৮৪]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾

---

[৭৮২]. সুরা আনআম, ৬: ১৪
[৭৮৩]. সুরা রাদ, ১৩: ৩৬
[৭৮৪]. সুরা ইউনুস, ১০: ৩১

"আর তুমি যদি তাদের প্রশ্ন করো, কে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তা দ্বারা জমিনকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না।"[৭৮৫]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ﴾

"আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, কে তাদের সৃজন করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।"[৭৮৬]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾

"আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদত করি যে, তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।"[৭৮৭]

শিরকের গুনাহ আল্লাহ তাআলা কখনো ক্ষমা করবেন না

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرٰى إِثْمًا عَظِيْمًا﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে।"[৭৮৮]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ﴾

"আর অবশ্যই তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে ওহি পাঠানো হয়েছে যে, তুমি শিরক করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবেই। আর অবশ্যই

[৭৮৫]. সুরা আনকাবুত, ২৯: ৬৩
[৭৮৬]. সুরা যখরুফ, ৪৩: ৮৭
[৭৮৭]. সুরা যুমার, ৩৯: ৩
[৭৮৮]. সুরা নিসা, ৪: ৪৮

তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। বরং তুমি আল্লাহরই ইবাদত করো এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।"[৭৮৯]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

"নিশ্চয় যে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে, তার ওপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।"[৭৯০]

এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে—কেউ যদি শিরকে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং মৃত্যুর পূর্বে উক্ত গুনাহ থেকে তাওবা না করে, তাহলে আল্লাহ তাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। বরং চিরকাল তাকে জাহান্নামে জ্বলতে হবে।

আল্লাহ তাআলার সত্তার সঙ্গে কাউকে শরিক করা হারাম

শিরকের অনেক প্রকার রয়েছে। কিন্তু তন্মধ্যে দুটি প্রকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি হলো, আল্লাহ তাআলার সত্তার সঙ্গে কাউকে শরিক করা। অর্থাৎ একাধিক আল্লাহ মানা। আর দ্বিতীয়টি হলো, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত-উপাসনা করা। এজন্য শুধু এক আল্লাহই মানতে হবে। তাতে কাউকে শরিক করা যাবে না। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾

"আর আল্লাহ বলেছেন, তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনি তো কেবল এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো।"[৭৯১]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾

"তোমরাই কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সঙ্গে রয়েছে অন্যান্য উপাস্য? বলো, আমি সাক্ষ্য দিই না। বলো, তিনি কেবল এক ইলাহ আর তোমরা যা শরিক করো আমি নিশ্চয় তা থেকে মুক্ত।"[৭৯২]

---

[৭৮৯]. সুরা যুমার, ৩৯: ৬৫-৬৬
[৭৯০]. সুরা মায়িদা, ৫: ৭২
[৭৯১]. সুরা নাহল, ১৬: ৫১

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾

"অবশ্যই তারা কুফরি করেছে, যারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ তিনজনের তৃতীয়জন। যদিও এক ইলাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই।"[৭৯৩]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ﴾

"আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোনো কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি অতি দয়াময়, পরম দয়ালু।"[৭৯৪]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾

"যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।"[৭৯৫]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"আর আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই হলেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাপূর্ণ।"[৭৯৬]

প্রায় ১৪০টি আয়াতে বলা হয়েছে—আল্লাহ এক। তাঁকে ব্যতীত অন্য কোনো (সত্য) ইলাহ নেই।

আল্লাহ তাআলার ইবাদতে শরিক করা হারাম

যত প্রকার ইবাদত রয়েছে, সিজদা করা, রুকু করা, ইবাদতের মতো করে তার সামনে দাঁড়ানো কিংবা তাকে সম্মান করা ইত্যাদি আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও সামনে এগুলো করা শিরক এবং হারাম। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

---

[৭৯২]. সুরা আনআম, ৬: ১৯
[৭৯৩]. সুরা মায়িদা, ৫: ৭৩
[৭৯৪]. সুরা বাকারা, ২: ১৬৩
[৭৯৫]. সুরা আম্বিয়া, ২১: ২২
[৭৯৬]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ৬২

﴿وَقَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ﴾

"আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না।"[৭৯৭]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنِّيْ نُهِيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَّبِّيْ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

"বলো, যেহেতু আমার রবের পক্ষ থেকে আমার কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসেছে, তাই তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের আহ্বান করো, নিশ্চয় তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর সৃষ্টিকুলের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি।"[৭৯৮]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾

"আপনারই আমরা ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট আমরা সাহায্য চাই।"[৭৯৯]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا اللهَ﴾

"যেন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করো না।"[৮০০]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا اللهَ﴾

"যেন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত না করো।"[৮০১]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا اللهَ﴾

"তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করো না।"[৮০২]

---

[৭৯৭]. সুরা বনি ইসরাইল, ১৭: ২৩
[৭৯৮]. সুরা গাফির, ৪০: ৬৬
[৭৯৯]. সুরা ফাতিহা, ১: ৫
[৮০০]. সুরা হুদ, ১১: ২
[৮০১]. সুরা হুদ, ১১: ২৬
[৮০২]. সুরা ফুসসিলাত, ৪১: ২৪

এ সকল আয়াতে বলা হয়েছে—কখনো আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করবে না। আর সিজদা করা, রুকু করা, ইবাদতের জন্য সম্মানের সঙ্গে দাঁড়ানো এগুলো সবই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। তাই এ সকল কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এগুলোর কারণেও মানুষ মুশরিক হয়ে যায়। যার পরিণাম হলো, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা কখনো ক্ষমা করবেন না এবং তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। মানুষ এগুলোর ব্যাপারে অনেক অবহেলা করে থাকে।

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা ও রুকু করা জায়েজ নেই

ইবাদতের মতো করে কারও সামনে সিজদা করার দ্বারা মানুষ মুশরিক হয়ে যায়। আর সম্মান করে কারও সামনে সিজদা করা হারাম। এমনইভাবে ইবাদতের মতো করে কারও সামনে রুকু করাও জায়েজ নেই। কেননা এগুলোও সালাত এবং ইবাদতের অংশ। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ﴾

"তোমরা না সূর্যকে সিজদা করবে, না চাঁদকে। আর তোমরা আল্লাহকে সিজদা করো যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো।"[৮০৩]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু করো, সিজদা করো, তোমাদের রবের ইবাদত করো।"[৮০৪]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا﴾

"সুতরাং তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করো এবং ইবাদত করো।"[৮০৫]

---

[৮০৩]. সুরা ফুসসিলাত, ৪১: ৩৭
[৮০৪]. সুরা হজ, ২২: ৭৭
[৮০৫]. সুরা নাজম, ৫৩: ৪৩

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

"হে মারইয়াম, তোমার রবের জন্য অনুগত হও। আর সিজদা করো এবং রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু করো।"[৮০৬]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

"আর তোমরা সালাত কায়েম করো, জাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু করো।"[৮০৭]

এ সকল আয়াতে বলা হয়েছে—একমাত্র আল্লাহর জন্যই রুকু এবং সিজদা করো। এজন্য আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও জন্য সিজদা করা জায়েজ নেই এবং ইবাদতের মতো করে কারও সামনে রুকু করাও জায়েজ নেই।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ، فَقُلْتُ: رَسُولُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ، فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ.

"হজরত কায়েস ইবনে সাদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি (কুফার) আল-হিরা শহরে এসে দেখি, সেখানকার লোকেরা তাদের নেতাকে সিজদা করছে। আমি ভাবলাম, (তাহলে তো) রাসুল ﷺ-ই সিজদার অধিক হকদার। তারপর আমি নবিজি ﷺ-এর খেদমতে এসে বলি যে, আমি আল-হিরা শহরে গিয়ে দেখে এসেছি, সেখানকার লোকেরা তাদের নেতাকে সিজদা করে। সুতরাং হে আল্লাহর রাসুল! (ﷺ) আপনিই তো এর অধিক হকদার যে, আমরা আপনাকে সিজদা করি? তিনি বললেন, যদি (মৃত্যুর পর) তুমি আমার কবরের পাশ দিয়ে যাও তখন কি তুমি সেটাকে সিজদা করবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সাবধান! তোমরা এরূপ করবে

---

৮০৬. সুরা আলে ইমরান, ৩: ৪৩
৮০৭. সুরা বাকারা, ২: ৪৩

না। আমি যদি কোনো মানুষকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে স্ত্রীদের নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীদের সিজদা করতে। কেননা আল্লাহ স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের অধিকার দিয়েছেন।"[৮০৮]

এই হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে সম্মানসূচক সিজদা করাও হারাম।

কাউকে নিশ্চিতভাবে জান্নাতি অথবা জাহান্নামি বলা নিষেধ

কারও সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় না—সে জান্নাতি নাকি জাহান্নামি। যতক্ষণ পর্যন্ত না কুরআন অথবা হাদিসে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা না পাওয়া যায়।

কুরআন অথবা হাদিসে যদি কারও নাম নিয়ে বলা হয়ে থাকে যে, সে জান্নাতি অথবা জাহান্নামি, তাহলে তার সম্পর্কেই কেবল বলা যাবে যে, সে জান্নাতি অথবা জাহান্নামি। কিন্তু যদি কারও নাম নিয়ে না বলা হয় যে, সে জান্নাতি অথবা জাহান্নামি, তাহলে অনেক সম্ভাবনা থেকে যায় যে, বাহ্যিকভাবে সে জান্নাতি কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে সে আল্লাহ তাআলার নিকট জাহান্নামি। অথবা বাহ্যিকভাবে সে জাহান্নামি কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে সে আল্লাহ তাআলার নিকট জান্নাতি। কেননা ঈমান ও সত্যবাদিতার বিষয়টি অন্তরের বিষয়। আর অন্তরের খবর একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। তবে হ্যাঁ! কারও মধ্যে যদি কুফরের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহলে এটা বলা যাবে যে, তার মধ্যে কুফরের নিদর্শন রয়েছে। এজন্য সে কাফির হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং তার ওপর কাফিরের বিধান প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে তাকে কাফির বলা যাবে না।

এজন্য যে-সকল লোকেরা নিজেদের বয়ান-বক্তৃতায় নাম নিয়ে নিয়ে কাউকে কাফির অথবা কাউকে জান্নাতি বলে বেড়ায়, এটা মোটেও উচিত নয়।

আকিদাতুত তহাবিতে এসেছে—

وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَّلَا نَارًا، وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَّلَا بِنِفَاقٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِّنْ ذٰلِكَ، وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى.

অর্থাৎ আমরা কোনো কিবলাপন্থী মুমিনকে জান্নাতে বা জাহান্নামে অবতরণ করি না এবং তাদের কাউকে কুফর, শিরক এবং নিফাকের সাক্ষ্য প্রদান

---

[৮০৮]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২১৪০; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৮৫৩। সনদ সহিহ।

করি না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের থেকে এ ধরনের কোনো কিছু প্রকাশ না পাবে। আর আমরা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি আল্লাহর ওপর ন্যাস্ত করব।[৮০৯]

এই ইবারাত বা মূলপাঠ থেকে বুঝা গেল– আমরা কারও সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে জান্নাতি কিংবা জাহান্নামি বলতে পারি না। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾

“হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয় কোনো কোনো অনুমান তো পাপ।”[৮১০]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾

“হে ঈমানদারগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অপর কোনো সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম।”[৮১১]

এই আয়াতগুলোতে অনুমান করতে নিষেধ করা হয়েছে। যার দ্বারা বুঝা গেল কাউকে নিশ্চিতভাবে জান্নাতি অথবা জাহান্নামি বলা যাবে না।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ؟ قَالَ: أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا، وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ.

“উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল ﷺ একটি আনসার নাবালক বাচ্চার জানাজায় উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হলেন। এরপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল (ﷺ)! এ নাবালকটি তো সৌভাগ্যবান। সে তো জান্নাতের চড়ুই পাখিদের থেকে একটি চড়ুই পাখি। সে পাপকর্ম করেনি এবং পাপ তাকে স্পর্শ করেনি। তিনি বললেন, এ ছাড়া

৮০৯. আকিদাতুত তহাবি, আকিদা নং ৭০ পৃষ্ঠা- ১৬
৮১০. সুরা হুজুরাত, ৪৯: ১২
৮১১. প্রাগুক্ত, ৪৯: ১১

আরও কিছু আছে, হে আয়েশা! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জন্য উপযুক্ত অধিবাসী সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে, যাদেরকে সে উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে, অথচ তখন তারা বাপ দাদাদের ঔরসে ছিল। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন যাদেরকে জাহান্নামের জন্য তাদের সে উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন আর তারা তখন তাদের বাপ দাদাদের ঔরসে ছিল।"[৮১২]

কবিরা গুনাহ ও সগিরা গুনাহর সংজ্ঞা

কবিরা গুনাহ হলো, ওই গুনাহ যে গুনাহের ওপর শাস্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এসেছে অথবা দুনিয়াতে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে এবং অনেক কঠিন ধমক দেওয়া হয়েছে, তাকে কবিরা গুনাহ বলে।

তাওবা করলে কবিরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এর পূর্বে মাফ হয় না। হ্যাঁ! আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে কারও কবিরা গুনাহও মাফ করে দিতে পারেন। তবে শিরক এমন কবিরা গুনাহ, যা তাওবা ব্যতীত আল্লাহ তাআলা মাফ করবেন না। কবিরা গুনাহ করলে মানুষ মুশরিক অথবা কাফির হয়ে যায় না। কেননা তার অন্তরে ঈমান এবং অন্তরের সত্যায়ন বিদ্যমান। তবে এটা অনেক বড় গুনাহ। সর্বাবস্থায় এটা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। আর কখনো হয়ে গেলে হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে নেওয়া উচিত।

সগিরা গুনাহ হলো, যে গুনাহের ওপর শাস্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি, তাকে কবিরা গুনাহ বলে।

সগিরা গুনাহ ছোট ছোট নেক কাজ করার দ্বারাও মাফ হয়ে যায়। সগিরা গুনাহ আল্লাহ তাআলা চাইলে তাওবা ছাড়াও মাফ করে দিতে পারেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾

"তোমরা যদি সেসব কবিরা গুনাহ পরিহার করো, যা থেকে তোমাদের বারণ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদের প্রবেশ করাব সম্মানজনক প্রবেশস্থলে।"[৮১৩]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾

---

[৮১২]. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৭৬৮
[৮১৩]. সুরা নিসা, ৪: ৩১

"যারা ছোটখাটো দোষ-ত্রুটি ছাড়া বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে, নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমার ব্যাপারে উদার।"[৮১৪]

এই আয়াতগুলোতে ইঙ্গিত রয়েছে—বড় বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে তো হতে পারে আল্লাহ তাআলা ছোট ছোট গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

কবিরা গুনাহকারী জান্নাতে যাবে

কেউ যদি শিরক এবং কুফর ব্যতীত অন্যান্য কবিরা গুনাহ করে এবং তাওবা ব্যতীত মারা যায়, তাহলে হতে পারে যে, সে গুনাহের শাস্তি ভোগ করবে এবং দীর্ঘ একটি সময় জাহান্নামে থাকতে হবে। কিন্তু শাস্তি ভোগ করার পরে কখনো না কখনো জান্নাতে যাবে। কেননা তার অন্তরে ঈমান আছে। আর মুমিন কখনো না কখনো জান্নাতে যাবে। আর যদি কবিরা গুনাহ থেকে তাওবা করে নেয় এবং তার তাওবা কবুল হয়ে যায়, তাহলে শাস্তি ভোগ করা ছাড়াই জান্নাতে যাবে। কেননা সে তাওবা করেছে এবং তার তাওবা কবুলও হয়েছে। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي أَوْ قَالَ بَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ.

"হজরত আবু যর গিফারি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—একজন আগন্তুক (হজরত জিবরাইল আ.) আমার রবের নিকট হতে এসে আমাকে সংবাদ দিলেন অথবা তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক না করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদিও সে জিনা করে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে? তিনি বললেন, যদিও সে জিনা করে থাকে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে।"[৮১৫]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—কেউ যদি মুশরিক অবস্থায় মারা না যায়, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এজন্য কবিরা গুনাহকারীও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

---

[৮১৪]. সুরা নাজম, ৫৩: ৩২

[৮১৫]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১২৩৭; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৯৪

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ... ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً.

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ বের করা হবে, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ মাত্র ঈমান আছে।"[৮১৬]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে জানা গেল, কারও অন্তরে যদি সামান্য অণু পরিমাণও ঈমান থাকে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যার অর্থ হলো, কবিরা গুনাহকারীও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

কেউ যদি কবিরা গুনাহকে হালাল মনে করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে

অলসতা কিংবা অপারগ হয়ে কবিরা গুনাহ করে ফেলেছে। তাহলে সে যদি এই গুনাহকে গুনাহ মনে করে করে থাকে, তাহলে তার শাস্তি হবে। তবে তাতে সে কাফির হবে না। কিন্তু এমন কবিরা গুনাহ, যা স্পষ্ট আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ। আর কেউ উক্ত কবিরা গুনাহকে হালাল মনে করে করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা যখন সে হালাল মনে করে গুনাহ করল, তখন সে স্পষ্ট আয়াতকে অস্বীকার করল। যে আয়াতে তার এই গুনাহকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে—ঈমানের ছয়টি স্তম্ভের মধ্যে একটি হলো, কুরআন ও কুরআনের আয়াতসমূহকে মানা। আর সে আয়াতকে অস্বীকার করেছে। এজন্য সে কাফির হয়ে যাবে। যেমন, জিনা হারাম হওয়ার বিষয়টি আয়াতে বিদ্যমান। এখন যদি কেউ হালাল মনে করে জিনা করে, তাহলে সে যেন জিনার আয়াতকেই অস্বীকার করল। এজন্য সে কাফির হয়ে যাবে। আর যখন সে তা থেকে তাওবা করবে তখন সে মুসলিম হবে।

আকিদাতুত তহাবিতে এসেছে—

وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ.

অর্থাৎ আমরা কোনো পাপের কারণে কোনো কিবলাপন্থী মুসলমানকে কাফির বলি না; যতক্ষণ পর্যন্ত সে গুনাহকে হালাল মনে না করবে।[৮১৭]

---

৮১৬. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৭৪১০; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৯৩; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২৫৯৩; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১২১৫৩

এই ইবারত বা মূলপাঠে مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ -এর অর্থ হলো, গুনাহকে হালাল মনে করবে। যার কারণে স্পষ্ট আয়াতের অস্বীকার হয়ে যায় এবং এর ফলে তাকে কাফির আখ্যা দেওয়া হবে।

কবিরা গুনাহর সংখ্যা

কবিরা গুনাহর সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। তবে কুফর, শিরক, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, জিনা করা, কারও ওপর জিনার অপবাদ দেওয়া, চুরি করা, মদ পান করা ও নেশা করা, সুদি লেনদেন করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা কসম খাওয়া, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা ও ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করা ইত্যাদি সব কবিরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। এর দলিল হলো পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾

"আর যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ যে নফসকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর যারা ব্যভিচার করে না। আর যে তা করবে সে আজাবপ্রাপ্ত হবে।"[৮১৮]

এই আয়াতে তিনটি কবিরা গুনাহর কথা উল্লেখ রয়েছে।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বেঁচে থাকো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলো কী? নবিজি ﷺ বললেন,

১. আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কাউকে শরিক করা।

---

[৮১৭]. *আকিদাতুত তহাবি*, আকিদা নং ৫৭; পৃষ্ঠা- ১৪

[৮১৮]. সুরা ফুরকান, ২৫: ৬৮

২. জাদু করা।

৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা।

৪. সুদ খাওয়া।

৫. ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করা।

৬. যুদ্ধ থেকে পলায়ন করা

৭. মুমিন নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা।"[৮১৯]

এই হাদিসে সাত প্রকারের কবিরা গুনাহর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ.

"নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, সবচেয়ে কঠিন কবিরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।"[৮২০]

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

"আর যে ইচ্ছাকৃত কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ তার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লানত করবেন এবং তার জন্য বিশাল আজাব প্রস্তুত করে রাখবেন।"[৮২১]

এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—কেউ যদি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তাহলে তার শাস্তি হলো চিরকালের জন্য জাহান্নাম। কিন্তু এটা সতর্কতার জন্য বলা হয়েছে। আর না হয় ঈমান থাকার কারণে কখনো না কখনো জান্নাতে যাবে।

---
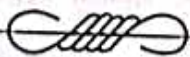
[৮১৯]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৮৯

[৮২০]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬৯১৯; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৮৭; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২৩০১

[৮২১]. সুরা নিসা, ৪: ৯৩

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

একজন মুসলিম কখন মুরতাদ হয়

এ আকিদা সম্পর্কে ১টি আয়াত এবং ৮টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

ঈমানের অধ্যায়ে অলোচনা করা হয়েছে—কোনো ব্যক্তি ছয়টি বস্তুর ওপর ঈমান আনলে মুমিন হয়। আর উক্ত ছয়টি বস্তু হলো :

১. আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান

২. রাসুলগণের প্রতি ঈমান

৩. কিতাব তথা কুরআনুল কারিমের প্রতি ঈমান

৪. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

৫. আখিরাত তথা কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান

৬. তাকদিরের প্রতি ঈমান

কোনো ব্যক্তি এই ছয়টি বস্তু থেকে যেকোনো একটি অস্বীকার করলে, সে মুরতাদ হয়ে যায়। এর দলিল হলো আকিদাবিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *আকিদাতুত তহাবিতে* এসেছে—

وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيْمَانِ إِلَّا بِجُحُوْدِ مَا أَدْخَلَهُ فِيْهِ.

অর্থাৎ বান্দা ঈমান হতে বের হবে না। কিন্তু ওইসব বিষয় অস্বীকার করার কারণে বের হবে যেগুলো তাকে ঈমানের আওতাভুক্ত করেছে।[৮২২]

এই ইবারত বা মূলপাঠে বলা হয়েছে—যখন এই ছয়টি বস্তু স্বীকার করার দ্বারা কোনো ব্যক্তি মুসলিম হয়, এগুলো থেকে যেকোনো একটিকে অস্বীকার করলে সে ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এগুলো থেকে কোনো একটিকে অস্বীকার না করে, তাহলে সে মুমিনই থাকবে।

---

[৮২২]. *আকিদাতুত তহাবি*, আকিদা নং ৬১; পৃষ্ঠা- ১৫

মুসলিম বিচারক শরয়ি দণ্ডবিধির শাস্তি দেবেন

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

"আর যে তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, বস্তুত এদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।"[৮২৩]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ، فَأَحْرَقَهُمْ... لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

"হজরত আলি রা.-এর নিকট একদল যিন্দিককে (নাস্তিক ও ধর্মত্যাগীকে) আনা হলো। তিনি তাদের আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন... কারণ নবিজি ﷺ-এর নির্দেশ নির্দেশ আছে, যে কেউ দার দ্বীন বদলে ফেলে তাকে তোমরা হত্যা করো।"[৮২৪]

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ... وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟، قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُتِلَ.

"হজরত আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন... ঘটনাক্রমে তার নিকট একজন লোক শেকলে বাঁধা ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওই লোকটি কে? আবু মুসা আশআরি রা. বললেন, সে প্রথমে ইহুদি ছিল এবং মুসলিম হয়েছিল। কিন্তু আবার সে ইহুদি হয়ে গেছে। আবু মুসা আশআরি রা. বললেন, বসুন। মুআজ রা. বললেন, না বসব না। যতক্ষণ না তাকে হত্যা করা হবে। এটাই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ফায়সালা। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। এরপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হলো এবং তাকে হত্যা করা হলো।"[৮২৫]

---

৮২৩. সুরা বাকারা, ২: ২১৭

৮২৪. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬৯২২; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ১৪৫৮; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৩৫১

৮২৫. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং হাদিস নং ৬৯২৩

মুরতাদকে হত্যার শর্ত তিনটি

মুরতাদকে হত্যা করার জন্য ৩টি শর্ত রয়েছে। যথা :

১. প্রথম শর্ত হলো, ইসলামি রাষ্ট্র হওয়া।

মুরতাদকে হত্যা করার জন্য প্রথম শর্ত হলো, ইসলামি রাষ্ট্র হওয়া। তাহলে হত্যা করা হবে, যেন অন্য মুসলিমরাও মুরতাদ না হয়ে যায়। যেমন সাহাবির বাণী রয়েছে—

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي دَارِ الْحَرْبِ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ أَهْلُهَا بِالْعَدُوِّ.

"হজরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, দারুল হারবে (এমন রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানদের ধর্মীয় বিধিবিধান পালনে বাধা প্রদান করা হয়) শরয়ি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা হবে না। এই আশঙ্কায় যে, যার ওপর দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা হবে সে হারবিদের (যুদ্ধরত শত্রুদের) সঙ্গে মিলে যেতে পারে।"[৮২৬]

অপর এক সাহাবির বাণী রয়েছে—

عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ كَتَبَ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَإِلَى عُمَّالِهِ، أَنْ لَا يُقِيمُوا حَدًّا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ حَتَّى يَخْرُجُوا إِلَى أَرْضِ الْمُصَالَحَةِ.

"হজরত হাকিম রহ. উমায়ের ও তার কর্মচারীদের নির্দেশ পাঠালেন, দারুল হারবে (এমন রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানদের ধর্মীয় বিধিবিধান পালনে বাধা প্রদান করা হয়) কোনো মুসলিমের ওপর শরয়ি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করবে না। যতক্ষণ না তারা কোনো চুক্তিবদ্ধ ভূমিতে না আসে।"[৮২৭]

সাহাবিদের এই বাণীসমূহে বলা হয়েছে—মুসলিম শাসক হলেও দারুল হারবে (এমন রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানদের ধর্মীয় বিধিবিধান পালনে বাধা প্রদান করা হয়) শরয়ি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা হবে না। তাহলে যেখানে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থাও নেই, সেখানে শরয়ি দণ্ডবিধি কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

---

[৮২৬]. *সুনানে কুবরা লিল বায়হাকি*, ৯/১৭৮ হাদিস নং ১৮২২৫; *সিয়ারু ফিল আরদিল হারব*, ৭/৪৬২। হাদিসটির সনদ গরিব এ ছাড়াও হাদিসটি মুনকাতি। তবে ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এই হাদিস দ্বারা দলিল দিয়েছেন। এবং এই মর্মে অনেক হাসান পর্যায়ের হাদিস বর্ণিতও রয়েছে।

[৮২৭]. *সুনানে কুবরা লিল বায়হাকি*, ৯/১৭৮ হাদিস নং ১৮২২৬। হাদিসটিকে আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ.-এর সনদকে হাসান সালেহ বলেছেন। (*ইলাউস সুনান*, ১১/৬০৩)।

২. দ্বিতীয় শর্ত হলো, শরয়ি কাজি তথা মুসলিম বিচারক হতে হবে যিনি দণ্ডবিধির ফায়সালা করবেন।

মুরতাদকে হত্যা করার জন্য দ্বিতীয় শর্ত হলো, শরয়ি কাজি তথা মুসলিম বিচারক হওয়া। যিনি সবকিছু যাচাইবাছাই করে হত্যার রায় প্রদান করবেন। তখন হত্যা করা হবে। এটা সাধারণ জনগণের কাজ নয়। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، أُتِيَ بِنُعَيْمَانَ أَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ وَهُوَ سَكْرَانُ، فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ.

"হজরত উকবাহ ইবনে হারিস রা. থেকে বর্ণিত, একবার নুআইমান অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) নুআইমানে পুত্রকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নবিজি ﷺ-এর নিকট আনা হলো। তার অবস্থা দেখে তিনি দুঃখিত হলেন। তখন ঘরের ভেতরে যারা ছিল তিনি তাদের হুকুম করলেন তাকে মারার জন্য। তাই তারা তাকে গাছের ডাল এবং জুতা দিয়ে মারল। বর্ণনাকারী বলেন, যারা তাকে মেরেছিল, আমিও তাদের মাঝে ছিলাম।"[৮২৮]

অপর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخَمْرِ، بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ.

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মদপানের অপরাধে নবিজি ﷺ গাছের ডাল এবং জুতা দিয়ে পিটিয়েছেন।"[৮২৯]

উপর্যুক্ত দুটি হাদিসেই দেখা গেল, নবিজি ﷺ দণ্ডবিধির ফায়সালা করেছেন। যিনি তখনকার সময়ের রাষ্ট্রপ্রধান ও বিচারক ছিলেন। এজন্য শরয়ি কাজি তথা বিচারকের রায়ের মাধ্যমেই শরয়ি দণ্ডবিধির শাস্তি দিতে হবে।

এজন্য যেখানে শরয়ি কাজি নেই সেখানে শরয়ি দণ্ডবিধির শাস্তি হবে না। আর না হয় জনসাধারণের মাঝে বিশৃঙ্খলা হবে। তবে সেখানের রাষ্ট্র প্রধানের নিকট দাবি জানানো যেতে পারে—এমন ধৃষ্টতাকারীকে যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে।

---

[৮২৮]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬৭৭৫।

[৮২৯]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬৭৭৬।

৩. তৃতীয় শর্ত হলো, তিন দিন পর্যন্ত তাওবার সুযোগ দেওয়া।

মুরতাদকে হত্যা করার জন্য তৃতীয় শর্ত হলো, তিন দিন পর্যন্ত তাওবার সুযোগ দেওয়া। ওই ব্যক্তিকে বারবার বুঝানো হবে এবং ইসলামের সত্যতা স্পষ্ট করা হবে। তিন দিন পর্যন্ত বুঝানোর পরেও যদি না মানে, তখন গিয়ে তাকে হত্যা করা হবে। তিন দিন পর্যন্ত বুঝানোর দলিল হলো সাহাবির এই বাণী—

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا.

"হজরত আলি রা. বলেন, মুরতাদকে তাওবার জন্য তিন দিন পর্যন্ত সুযোগ দেওয়া হবে।"[৮৩০]

হজরত উমর রা. তিন দিন পর্যন্ত সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে কঠোরতা করতেন—

لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَتْحُ تُسْتَرَ، وَتُسْتَرُ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ، سَأَلَهُمْ: هَلْ مِنْ مُغْرِبَةٍ ؟ قَالُوا : رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَخَذْنَاهُ، قَالَ : فَمَا صَنَعْتُمْ بِهِ؟ قَالُوا : قَتَلْنَاهُ، قَالَ : أَفَلَا أَدْخَلْتُمُوهُ بَيْتًا، وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، ثُمَّ اسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قَتَلْتُمُوهُ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ لَمْ أَشْهَدْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي، أَوْ قَالَ : حِينَ بَلَغَنِي.

"হজরত উমর রা.-এর নিকট যখন তাস্তুর বিজয়ের সংবাদ এলো। তাস্তুর হলো বসরার একটি এলাকা। হজরত উমর রা. জিজ্ঞেস করলেন, পশ্চিমা কোনো ব্যক্তি আছে? লোকেরা বলল, একজন মুসলমান ব্যক্তি মুশরিক হয়ে গেলে আমরা তাকে গ্রেপ্তার করেছি। হজরত উমর রা. জিজ্ঞেস করলেন, তার সঙ্গে কি আচরণ করেছ? লোকেরা বলল, আমরা তাকে হত্যা করে ফেলেছি। হজরত উমর রা. তখন বললেন, তাকে ঘরে বন্দি করে রাখতে এবং প্রতিদিন রুটি খাওয়াতে। তারপর তিন দিন পর্যন্ত তাকে তাওবা করার জন্য বলতে। যদি তাওবা করে নিত, তাহলে ছেড়ে দিতে আর তাওবা করতে অস্বীকার করলে, তখন গিয়ে হত্যা করতে। অতঃপর হজরত উমর রা. বললেন, আল্লাহ তাআলা সাক্ষী! আমি এই লোকদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিইনি এবং যখন তার হত্যার সংবাদ পৌছল, তখন আমি তার ওপর সন্তুষ্টও ছিলাম না।"[৮৩১]

---

[৮৩০]. *সুনানে কুবরা লিল বায়হাকি*, ৬/৩৫৯ হাদিস নং ১৬৮৮৯। সনদ যইফ। তবে এর পক্ষে অনেক সহিহ বর্ণনাও আছে। ফলে ফুকাহায়ে কেরাম এই হাদিসের দলিল দিয়ে ফতোয়া দিয়েছেন।

[৮৩১]. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা*, ৬/৪৪৪ পৃষ্ঠা হাদিস নং ৩২৭৪৪; *সুনানে বায়হাকি*, ৮/৩৫৯ পৃষ্ঠা হাদিস নং ১৬৮৮৭।

সাহাবির এই বাণীতে দেখা যায়—তিন দিনের পূর্বে হত্যা করার কারণে হজরত উমর রা. বললেন, আল্লাহ তাআলা সাক্ষী! আমি এদের মধ্যে উপস্থিতও ছিলাম না এবং এই লোকদেরকে হত্যা করার নির্দেশও দিইনি এবং যখন তার হত্যার সংবাদ পৌঁছল, তখন আমি তার ওপর সন্তুষ্টও ছিলাম না।

এই শর্তগুলোর ওপর আমল করা বর্তমানে এজন্য জরুরি যে, দেখা গেল—এক ব্যক্তি কারও ওপর শিরক কিংবা গোস্তাখির অপবাদ দিলো আর অমনি তার শাস্তির জন্য এক ভিড় লেগে যায় এবং তারা দাবি করে যে, এই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিন, আমরা তাকে শাস্তি দেবো এবং প্রকাশ্যে রাস্তার ওপর পিটিয়ে মারব এবং আইনকে নিজের হাতে তুলে নেব। এই পরিস্থিতির কারণে গোটা দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং মিডিয়া এটাকে লুফে নেয় যে, দেখো ইসলাম কত ভয়ংকর ধর্ম।

এজন্য এটা বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন যে, দণ্ডবিধির শাস্তি বাস্তবায়নের জন্য শরয়ি কাজি তথা মুসলিম বিচারক হওয়া জরুরি। এটা সাধারণ জনগণের কাজ নয়।

অর্ধেক বাক্যের দ্বারা মুশরিক বানানো যাবে না

বর্তমানে অনেক দেশেই এটা দেখা গেছে—কারও অর্ধেক বাক্য নিয়ে কিংবা কারও কথাকে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে উপস্থাপন করে দিলো। অথবা কারও বক্তৃতার সময় এমন কোনো কথা বলে ফেলল, যা কোনো ক্ষুদ্র অংশের বিরুদ্ধে ছিল। তা লোকেরা রেকর্ড করে ফেলেছে। এখনো ওইটা নিয়ে বসে আছে এবং তাকে হত্যার দাবি জানানো হচ্ছে। এখন সে লক্ষবার তা অস্বীকার করে অথবা তাওবা করে। তবুও মানে না। তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েই ক্ষান্ত হয়। এ সকল কর্মকাণ্ডসমূহ অমুসলিম দেশগুলো বারবার মিডিয়াতে দেখায় এবং মানুষকে বুঝায় যে, ইসলাম সন্ত্রাসের ধর্ম এবং মুসলিমরা হলো সন্ত্রাসী। কেউ নিজের ইচ্ছায় কোনো ধর্ম গ্রহণ করলে, তার ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা হয় এবং তাকে প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলায়। অথচ বর্তমান অবস্থা হলো, প্রকৃত মুরতাদ হওয়া সত্ত্বেও যদি সে তাওবা করে নেয় তাহলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আমি একটি কিতাব দেখেছি যা খতমে নবুয়ত প্রমাণ করার জন্য রচনা করা হয়েছে এবং লেখক নবিজি ﷺ-কে সকল মানুষ, জিন ও ফেরেশতাদের এবং গোটা দুনিয়ার জন্য সর্বশেষ নবি প্রমাণ করেছেন। কিছু কোনো কোনো

হজরতদের দেখলাম, কোথাও কোথাও থেকে বাক্য কেটে ছেঁটে এটা প্রমাণ করেছে যে, এই লেখক খতমে নবুয়তের অনুসারী নয়। আর এটা এমনভাবে ছড়িয়েছে যে, অনেক মানুষ মনে করছে যে, বাস্তবেই সেই লেখক খতমে নবুয়তের অনুসারী নয়। আমি মূল কিতাবটি অধ্যয়ন করে আশ্চর্য হয়ে গেছি যে, কীভাবে বিভিন্ন বাক্য কেটে ছেঁটে দুর্নাম করা হয়েছে।

এজন্য এ ধরনের ফায়সালার জন্য জরুরি হলো, অস্বীকারকারীদের (মুরতাদদের) তিন দিন পর্যন্ত বুঝানো। কোনো না কোনোভাবে যদি মুসলমান প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে হত্যা না করা। আর না হয় সীমাহীন বিশৃঙ্খলা হয় এবং ইসলামের দুর্নাম হয়।

বর্তমান মিডিয়াগুলো এই প্রশ্নটি অনেক বেশি করে থাকে ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ তথা দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। তাহলে মুরতাদ নিজ ইচ্ছায় অন্য দ্বীন গ্রহণ করলে তাকে হত্যা করা হবে কেন?

তাদের বুঝাতে হবে যে, এটা ওই দেশসমূহে করা হবে, যেখানে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা রয়েছে। এই মাসআলা শুধু ইউরোপ ও আমেরিকার জন্যই নয়। এজন্য এ সম্পর্কে তর্ক করা বৃথা।

তাজির কী?

পবিত্র কুরআনুল কারিমে বেশ কিছু অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অমুসলিম দেশসমূহে শরয়ি কাজি না থাকার কারণে সেই শাস্তি বাস্তবায়ন করা যায় না। এজন্য নির্দিষ্ট শাস্তির চেয়ে কম অর্থাৎ ৪০ বেত্রাঘাতের স্থলে ৩৯ বেত্রাঘাত লাগানোর দাবি জানানোকে তাজির বলা হয়। অথবা অপরাধীকে সুবিধামতো জরিমানা করাকে তাজির বলে। অমুসলিম দেশসমূহে তা দাবি করা জায়েজ।

মুরতাদকে শাস্তি দেওয়ার রহস্য কী?

মুরতাদের শাস্তির মূল রহস্য হলো, ইসলামি রাষ্ট্রে যদি এই অবকাশ দেওয়া হয়, তাহলে অন্যান্যরা কুফর অবলম্বন করার সুযোগ পেয়ে যাবে। আর তাতে তাদের পরকাল ধ্বংস হয়ে যাবে। চিরকালের জন্য জাহান্নামি হয়ে যাবে। এজন্য তাদের পরকাল রক্ষার্থে এই কার্যক্রম করা হয়। এতে স্বয়ং মুরতাদেরও উপকার। যা সে বুঝছে না।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়
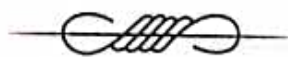
আহলে কিবলা কে?

এ আকিদা সম্পর্কে ২টি আয়াত এবং ৫টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

নবিজি ﷺ-এর আনিত সকল বিষয়কে অন্তর থেকে মানার নাম হলো আহলে কিবলা।

আকিদাতুত তহাবিতে এসেছে—

وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَرِفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ.

অর্থাৎ আহলে কিবলাদের (যারা কিবলামুখী হয়ে সালাত পড়ে) আমরা তাদের মুসলমান ও মুমিন আখ্যা দিই। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নবিজি ﷺ-এর আনিত কথার ওপর বিশ্বাসী থাকবে এবং তাঁর বলা ও সংবাদ দেওয়া কথাগুলো সত্যায়ন করবে।[৮৩২]

এই ইবারত বা মূলপাঠে বলা হয়েছে—নবিজি ﷺ যা-কিছু নিয়ে আসছেন, তা স্বীকার করে যে, এগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এবং নবিজি ﷺ যা-কিছু বলেছেন, তা যদি অন্তর থেকে সত্যায়ন করে, তাহলে সে মুমিন, মুসলমান ও আহলে কিবলা। এর প্রমাণ হলো, হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ.

"হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলামুখী হয় আর জবাই করা প্রাণী খায়, সেই মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ

---

৮৩২. *আকিদাতুত তহাবি*, আকিদা নং ৫৪; পৃষ্ঠা- ১৪

ও তাঁর রাসুল জিম্মাদার। সুতরাং তোমরা আল্লাহর জিম্মাদারিতে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।"[৮৩৩]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

"হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আমাকে লোকের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্বীকার করবে। যখন তারা তা স্বীকার করে নেয়, আমাদের মতো সালাত আদায় করে, আমাদের মতো কিবলামুখী হয় এবং আমাদের জবাই করা প্রাণী খায়, তখন তাদের জীবন ও সম্পদ আমাদের জন্য হারাম হয়ে যায়। অবশ্য রক্তের বা সম্পদের দাবির কথা ভিন্ন। আর তাদের হিসাব আল্লাহর নিকট।"[৮৩৪]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ؟ فَقَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ.

"কীসে মানুষের জীবন ও সম্পদ হারাম হয়? তিনি জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দেয়, আমাদের মতো কিবলামুখী হয় এবং আমাদের জবাই করা প্রাণী খায়, সেই মুসলিম। অন্য মুসলমানদের মতোই তাকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে।"[৮৩৫]

এই তিনও হাদিসেই বর্ণিত হয়েছে—যদি আহলে কিবলা হয়, তাহলে সে মুসলমান। তাকে না কাফির বলো, না তার সঙ্গে কাফিরের মতো আচরণ করো।

আহলে কিবলার পরিচয়

যে ব্যক্তি নিম্নের ছয়টি বস্তুকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করে তাকে আহলে কিবলা বলা হয়। তা হলো :

---

[৮৩৩]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৯১
[৮৩৪]. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৩৯২
[৮৩৫]. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৩৯৩

১. আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান

২. রাসুলগণের প্রতি ঈমান

৩. কিতাব তথা কুরআনুল কারিমের প্রতি ঈমান

৪. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

৫. আখিরাত তথা কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান

৬. তাকদিরের প্রতি ঈমান

আকিদাবিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *আকিদাতুত তহাবি*-এর মূলপাঠ হলো :

وَالْإِيمَانُ: هُوَ الْإِيمَانُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ.

অর্থাৎ ঈমান হলো, আল্লাহ তাআলার ওপর, তাঁর ফেরেশতাদের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর, তাঁর রাসুলগণের ওপর, কিয়ামতের দিনের ওপর এবং তাকদিরের ওপর বিশ্বাস করা।"[৮৩৬]

এ সকল বস্তুর ওপর ঈমান আনার দলিল ঈমানের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের শুরুতেও বলা হয়েছে—নবিজি ﷺ যা-কিছু নিয়ে আসছেন, তা স্বীকার করে যে, এগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এবং নবিজি ﷺ যা-কিছু বলেছেন, তা যদি অন্তর থেকে সত্যায়ন করে, তাহলে সে মুমিন, মুসলমান ও আহলে কিবলা। শুধু আমাদের জবাই করা প্রাণী খেলেই আহলে কিবলা হবে না।

ঈমানের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাপাচারী ব্যক্তির ইমামতি জায়েজ তবে মাকরুহ (অপছন্দনীয়)

কাউকে নিজ ইচ্ছায় ইমাম বানালে মুত্তাকি তথা আল্লাহভীরু ও পরহেজগার তথা দ্বীনদার ব্যক্তিকে ইমাম বানাবে। কিন্তু কোথাও যদি বাধ্য হয়ে কোনো পাপাচারীর পেছনে সালাত পড়তে হয়, তাহলে তার পেছনে সালাত পড়ে নাও। যাতে জামাতের সঙ্গে সালাত আদায় হয়ে যায় এবং আপনার জামাত ছুটে যাওয়ার আফসোস না হয়।

---

[৮৩৬]. *আকিদাতুত তহাবি*, আকিদা নং ৬৬ পৃষ্ঠা- ১৫

আজকাল সামান্য সামান্য বিষয়ে মতবিরোধ করে বসে এবং সালাত পড়ে না। প্রবাসে ঐক্য ঠিক রাখার স্বার্থে এটা ত্যাগ করা উচিত।

পাপাচারীর ইমামতি সম্পর্কে *আকিদাতুত তহাবিতে* এসেছে—

وَنَرَ الصَّلٰوةَ خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلٰى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ.

অর্থাৎ আমরা মুসলমানদের মধ্যে যেকোনো সৎ ও অসৎ ব্যক্তির ইকতিদা করাকে জায়েজ মনে করি। মুসলমানদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তাদের জানাজার সালাত পড়াকে জায়েজ মনে করি।[৮৩৭]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—যেকোনো মুসলমানের ইমামতিতে ফরজ সালাত আদায় করা ওয়াজিব, নেককার হোক বা বদকার হোক, এমনকি কবিরা গুনাহের কাজে জড়িত থাকলেও।"[৮৩৮]

এই হাদিসে বলা হয়েছে—মানুষ নেককার হোক বা বদকার হোক, তার পেছনে সালাত জায়েজ। শর্ত হলো কাফির ও মুশরিক না হওয়া।

যদি নেককার ইমাম পাওয়া যায় তাহলে স্থায়ীভাবে তাকেই নিয়োগ দেওয়া উত্তম

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ... أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا يَؤُمَّن أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ.

"হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন... নারী পুরুষের, বেদুইন মুহাজিরের এবং পাপাচারী মুমিনের ইমামতি করবে না। তবে স্বৈরাচারী ও চাবুকের ভয় থাকলে স্বতন্ত্র কথা।"[৮৩৯]

---

[৮৩৭]. *আকিদাতুত তহাবি*, আকিদা নং ৬৯ পৃষ্ঠা- ১৬

[৮৩৮]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৫৯৪। হাদিসটির সনদ সহিহ না হলেও এই ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর সকল ইমামগণ একমত।

[৮৩৯]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১০৮১। হাদিসটির সনদ যইফ। তবে এর মতন ও মূল বক্তব্য সহিহ।

আর যদি ইমাম আকিদা ও বিশ্বাসগতভাবে মুশরিক হয়, তাহলে তার ইমামতি জায়েজ নেই। কেননা সে তো মুসলমানই না।

বর্তমান অবস্থা হলো, অনেক জায়গায় এক মতাদর্শীগণ অন্য মতাদর্শীদের পেছনে সালাত পড়ে না। যার ফলে এত বিশৃঙ্খলা যে, বহু জাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন।

ইসলামে অতি কঠোরতা ও নম্রতা নেই

ইসলামে অতি কঠোরতা নেই, আবার অতি নম্রতাও নেই; বরং ইসলাম হলো উভয়টির মাঝামাঝি ধর্ম।

আকিদাতুত তহাবিতে এসেছে—

وَهُوَ بَيْنَ الغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ، وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ، وَبَيْنَ الجَبْرِ والقَدَرِ، وَبَيْنَ الأَمْنِ وَالإِيَاسِ.

অর্থাৎ এই দ্বীন ইসলাম অতিরঞ্জন ও সংকোচন, তাশবিহ ও তাতিল (আল্লাহ তাআলাকে কারও সাদৃশ্য আখ্যা দেওয়া ও আল্লাহ তাআলাকে নির্গুণ ও বেকার মনে করা), জবর ও কদর (আল্লাহ তাআলাকে অক্ষম মনে করা ও মানুষকে সক্ষম মনে করা) এবং নিশ্চিন্ততা ও নৈরাশ্যের (গুনাহ থেকে নির্ভয় হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ তাআলা থেকে একেবারে নিরাশ হয়ে যাওয়া) মধ্যবর্তী এক ধর্ম।[৮৪০]

এই মূলপাঠে বলা হয়েছে—অতি কঠোরতা করা ঠিক নয় আবার অতি নম্রতাও ঠিক নয়; বরং উভয়টির মাঝামাঝি ধর্ম। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾

"হে কিতাবিগণ, তোমরা তোমাদের দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর ওপর সত্য ছাড়া অন্যকিছু বলো না।"[৮৪১]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

---

৮৪০. *আকিদাতুত তহাবি*, আকিদা নং ১০৪ পৃষ্ঠা- ২২

৮৪১. সুরা নিসা, ৪: ১৭১

"হে মুমিনগণ, আল্লাহ যে সব পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তোমরা তা হারাম করো না এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"[৮৪২]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ، فقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا: كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي، وَأَنَامُ، وَأَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، فَلَيْسَ مِنِّي.

"হজরত আনাস রা. বলেন, কিছু সাহাবি নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীদের নিকট নবিজি ﷺ-এর ঘরের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারপর একজন বলল, আমি কখনো নারীদের বিয়ে করব না। আরেকজন বলল, আমি কখনো গোশত খাব না। আরেকজন বলল, আমি কখনো বিছানায় ঘুমাব না। তখন নবিজি ﷺ হামদ-সানার পর ইরশাদ করেন—লোকদের কী হয়ে গেল যে, এমন কথা বলে। অথচ আমি তো সালাতও পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। সিয়ামও পালন করি এবং ইফতারও করি (কখনো সিয়াম পালনে বিরতিও দিই) এবং নারীদের বিয়েও করি। (এটা আমার সুন্নত) যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার উম্মত নয়।"[৮৪৩]

এই হাদিসে বলা হয়েছে—এ পরিমাণ কঠোরতাও না করা যে, মানুষ দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়; আবার এ পরিমাণ উদারও না হওয়া যে, মানুষ হারামে লিপ্ত হয়ে যায়।

---

[৮৪২]. সুরা মায়িদা, ৫: ৮৭

[৮৪৩]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৪০১
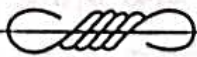
পির-মুরিদি বা আত্মশুদ্ধি

এ আকিদা সম্পর্কে ৩টি আয়াত এবং ৭টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

পির-মুরিদি বা আত্মশুদ্ধির উপকার হলো, পির যদি মুখলিস হয়, মুরিদকে মানুষ বানানোর দরদ থাকে এবং সে নিজেও মানুষ হয়, তাহলে এর দ্বারা মুরিদের উপকার হয়। সেও ভালো মানুষ হয়ে যায়। যেমন, উস্তাদ যদি ভালো হয়, মুখলিস হয় এবং ভালোভাবে পাঠদান করে, তাহলে তাতে ছাত্রও অনেক ভালো হয়ে বের হয়। ঠিক একই অবস্থা পির-মুরিদেরও। কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো, মুরিদের মধ্যেও নেকি অর্জনের যোগ্যতা থাকতে হবে এবং সে ভালো হওয়ার জন্য পুরোপুরি মেহনত করতে হবে। তাহলে সে ভালো হতে পারবে। আর না হয় শূন্যই থাকতে হবে।

এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির জন্য পিরের হাতে হাত দিয়ে যে অঙ্গীকার করে থাকে—আমি অঙ্গীকার করছি, আপনার উপদেশ মেনে চলব এবং শরিয়তের বিধিবিধানের ওপর নিয়মিত আমল করব। এই অঙ্গীকারের নামই হলো বাইআত।

পির নিজের মুরিদকে নিম্নের চারটি উপকার করতে পারে

নবিজি ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা এই চারটি কাজের জন্য প্রেরণ করেছেন। সুতরাং একজন খাঁটি পিরেরও একই কাজ। আর তা হলো নিজের মুরিদকে এই চারটি কাজ শেখানো। চারটি কাজ হলো :

১. উম্মতের সামনে বিশুদ্ধভাবে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা।

২. তাদেরকে বিশুদ্ধভাবে কুরআনুল কারিম শেখানো।

৩. হিকমত শেখানো।

৪. আত্মশুদ্ধি করা।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

"তিনিই উম্মিদের মাঝে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তিলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র (আত্মশুদ্ধি) করে এবং তাদের শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহিতে ছিল।"[৮৪৪]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾

"হে আমাদের রব, তাদের মধ্য থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করুন, যে তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে আর তাদের পবিত্র (আত্মশুদ্ধি) করবে।"[৮৪৫]

এই আয়াতে বলা হয়েছে—নবিজি ﷺ-কে চারটি কাজের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। যথা :

১. কুরআনুল কারিমের বিশুদ্ধ তিলাওয়াতে জন্য।

২. বিশুদ্ধভাবে কুরআনুল কারিম শেখানোর জন্য।

৩. হিকমত শেখানোর জন্য।

৪. আত্মশুদ্ধি করার জন্য।

পির সাহেব যদি ভালো হয়, তাহলে সেও মুরিদদের এই চার কাজ শেখায় এবং মুরিদেরও এই চারটি উপকার হয়।

তাফসিরে ইবনে আব্বাস গ্রন্থে তাজকিয়াহ অর্থ লিখেছেন—পির সাহেব মুরিদকে তাওহিদ বুঝিয়ে শিরক থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে এবং তাওবা করিয়ে গুনাহ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। এটাই ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ এর অর্থ।

এর অর্থ মোটেও এটা নয় যে, পির সাহেব বিশেষ কোনো প্রক্রিয়ায় মুরিদের অন্তর পরিচ্ছন্ন করে দেবে। যেমনটি অনেকেই মনে করে থাকেন। যদি এমনটিই হতো, তাহলে পির সাহেব প্রথম নিজের সন্তানদেরই তাজকিয়া

---

৮৪৪. সুরা জুমুআ, ৬২: ২

৮৪৫. সুরা বাকারা, ২: ১২৯

করে নিতেন এবং প্রত্যেক পির সাহেবের সন্তানই ওলিয়ে কামেল হতো। অথচ আমরা দেখি যে, অনেক পিরের সন্তানই অযোগ্য হয়ে থাকে।

তাফসিরে ইবনে আব্বাস গ্রন্থের মূলপাঠ হলো :

وَيُزَكِّيهِمْ : يطهرهم بِالتَّوْحِيدِ من الشرك وَيُقَال بِالزَّكَاةِ وَالتَّوْبَة من الذُّنُوب أي يَدعُوهُم إِلَى ذَلِك.

অর্থ : মানুষকে আত্মশুদ্ধি করে। অর্থাৎ তাওহিদের মাধ্যমে পবিত্র করার চেষ্টা করে। কোনো কোনো মুফাসসির এটাও বলেছেন, পবিত্র করার অর্থ হলো, গুনাহ থেকে তাওবা করায়। তাওবা করার দিকে মানুষকে আহ্বান করে।[৮৪৬]

এই তাফসিরে বলা হয়েছে—তাওহিদের মাধ্যমে মুরিদদের শিরক থেকে পবিত্র করার চেষ্টা করবে এবং গুনাহ থেকে তাওবা করানোর চেষ্টা করবে। এজন্য ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾-এর অর্থ এটা নয় যে, অন্তরের বিশেষ কোনো পরিচ্ছন্নতা করবে।

আর এই শিরক থেকে পবিত্রতাও তখনই হয়, যখন মুরিদের মধ্যে যোগ্যতা থাকে এবং মুরিদ নিজেও শিরক থেকে বাঁচার মেহনত করবে। সে যদি নিজে মেহনত না করে তাহলে পির সাহেব শত চেষ্টা করলেও কিছুই হবে না।

পির যদি আল্লাহভীরু হয় তাহলে তার অনেক প্রভাব পড়ে

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا، ذُكِرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

"হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—আমি কি তোমাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কথা জানিয়ে দেবো না? তারা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল! তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যাদের দেখলে মহান আল্লাহ তাআলার স্মরণ হয়।"[৮৪৭]

এই হাদিসে বলা হয়েছে—যাকে দেখে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ হয়, সেই হলো ভালো লোক। এজন্য পির এমন আল্লাহওয়ালা হবেন, যাকে দেখে

---

৮৪৬. *তাফসিরে ইবনে আব্বাস*, সুরা জুমুআর ২ নং আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

৮৪৭. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৪১১৯। হাদিসটির সনদ হাসান।

আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ হয়। আর যদি পিরের মান-মর্যাদা দেখে দুনিয়া স্মরণ হয়, অথবা তার ধোঁকাবাজি দেখে আপনার অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়, সেই পিরের নিকট বসে আপনি কি পাবেন?

এই হাদিসে বলা হয়েছে—ভালো লোক হলে তার নিকট বসার প্রভাব হবে, আপনার অন্তরে পরকালের চিন্তা আসবে। আর যদি মন্দ লোক হয় কিংবা ধোঁকাবাজ পির হয়, তাহলে তার নিকট বসলে তার প্রভাব হবে; দুনিয়াদারির কথাই অন্তরে আসবে।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، وَكِيرِ الْحَدَّادِ، لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ، إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ، أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً.

"হজরত আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উপমা হলো, মিসক বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতাদের থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবে না। হয় তুমি আতর ক্রয় করবে, না হয় তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে।"[৮৪৮]

এই হাদিসে বলা হয়েছে—ভালো লোকের এবং মন্দ লোকের প্রভাব অবশ্যই পড়ে।

এই হাদিস থেকে জানা গেল, পির সাহেব যদি ভালো হয় এবং মুখলিস হয় এবং তার থেকে উপকৃত হতে ইচ্ছুক লোকটিও যদি মুখলিস হয় এবং নিয়মিত সম্পর্ক রক্ষা করে লেগে থাকে, তাহলে ওপরে বর্ণিত চারটি উপকার অবশ্যই অর্জন হবে।

দুনিয়া অর্জনের জন্য পির অথবা মুরিদ বানানো ভালো কাজ নয়

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنَ ابْنِ

---

৮৪৮. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ২১০১; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৬২৮

السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণির লোকের প্রতি আল্লাহ তাআলা দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এক ব্যক্তি, যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রয়েছে অথচ সে মুসাফিরকে তা দিতে অস্বীকার করে। অন্য একজন সে ব্যক্তি, যে ইমামের হাতে একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে বাইআত হয়। যদি ইমাম তাকে কিছু দুনিয়াবি সুযোগ দেন, তাহলে সে খুশি হয়, আর যদি না দেন তবে সে অসন্তুষ্ট হয়। অন্য একজন সে ব্যক্তি, যে আসরের সালাত আদায়ের পর তার জিনিসপত্র (বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে) তুলে ধরে আর বলে যে, আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, আমার এই দ্রব্যের মূল্য এত এত দিতে আগ্রহ করা হয়েছে। (কিন্তু আমি বিক্রি করিনি) এতে এক ব্যক্তি তাকে বিশ্বাস করে (তা ক্রয় নেয়)। এরপর নবিজি ﷺ সুরা আলে ইমরানের ৭৭ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করেন—

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾

"নিশ্চয় যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে।"[৮৪৯]

এই হাদিসে বলা হয়েছে—দুনিয়ার জন্য যে বাইআত করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

বর্তমান যুগে কথিত কিছু পিরগণ মুরিদ করাকেও একটি ধান্ধা বানিয়ে ফেলেছে। বিত্তশালী মুরিদদের থেকে মুরিদ করা এবং খেলাফত প্রদানের নামে অনেক সম্পদ লুটে নিচ্ছে। এমন পির থেকে সাবধান থাকা জরুরি। এরা দ্বীনের জন্য এবং আত্মশুদ্ধির জন্য মুরিদ বানায় না। বরং অর্থ উপার্জনের জন্য পির-মুরিদি তথা আত্মশুদ্ধির ফাঁদ পাতে। এমন পির থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

---

৮৪৯. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ২৩৫৮

মনে রাখবেন! দুনিয়াতে ভালো পিরও অনেক আছেন। যারা মানুষকে আত্মশুদ্ধি করেন। আমার এক উস্তাদ ছিলেন, যিনি পির ছিলেন। তিনি আরও উলটো আমাদের পয়সা দিতেন। অনেক মুখলিস ছিলেন। অনেক বড় একজন মুফতি হওয়া সত্ত্বেও গোটা জীবন কাটিয়েছেন অনেক অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে। আমি আজও তার দ্বারা প্রভাবিত।

আমার জীবনে দুই-তিনজন পির এমন পেয়েছি—যারা গোটা জীবন কাটিয়েছেন অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে এবং মুরিদদের আত্মশুদ্ধির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ফালিল্লাহিল হামদ।

আমি কারও প্রতি বিদ্বেষের কারণে নয় বরং মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য এসব লিখছি। আপনারা আমার অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হন।

বাইআত চার প্রকার

ইসলামে বাইআত মোট চার প্রকার। যথা :

১. ঈমানের ওপর অটল-অবিচল থাকার বাইআত করা।

২. জিহাদের জন্য বাইআত করা।

৩. খিলাফতের জন্য বাইআত করা।

৪. নক আমল করা ও তাতে উন্নতির জন্য বাইআত করা।

১. ঈমানের ওপর অটল-অবিচল থাকার বাইআত করা।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"হে নবি, যখন মুমিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাইআত করে যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছু শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না, তারা জেনেশুনে কোনো অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাইআত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৮৫০]

---

[৮৫০]. সুরা মুমতাহিনা, ৬০: ১২

এই আয়াতে নবিজি ﷺ-কে ঈমানের ওপর অটল-অবিচল থাকার বাইআত করতে বলা হয়েছে।

২. জিহাদের জন্য বাইআত করা।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

"আর যারা তোমার কাছে বাইআত গ্রহণ করে, তারা শুধু আল্লাহরই কাছে বাইআত গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর; অতঃপর যে কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলে তার ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম বর্তাবে তারই ওপর। আর যে আল্লাহকে দেওয়া ওয়াদা পূরণ করবে অচিরেই আল্লাহ তাকে মহাপুরস্কার দেবেন।"[৮৫১]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

"অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কী ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের ওপর প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে।"[৮৫২]

এই দুই আয়াতে জিহাদের ওপর বাইআতের করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

৩. খিলাফতের জন্য বাইআত করা।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

فَحَمِدَ اللهَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ... فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا، وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ.

---

৮৫১. সুরা ফাতহ, ৪৮: ১০

৮৫২. সুরা ফাতহ, ৪৮: ১৮

"হজরত আবু বকর রা. হামদ ও সানা তথা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে বললেন... হজরত উমর রা. বললেন, আমরা কিন্তু আপনার নিকট বাইআত প্রদান করব। আপনি আমাদের নেতা। আপনিই আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের মধ্যে আপনি রাসুল ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। এই বলে হজরত উমর রা. হজরত আবু বকর রা.-এর হাত ধরে বাইআত প্রদান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকল সাহাবা বাইআত প্রদান করলেন।"[৮৫৩]

এই হাদিসের দ্বারা খিলাফতের জন্য বাইআত করা প্রমাণিত হয়।

৪. নেক আমল করা ও তাতে উন্নতির জন্য বাইআত করা।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

"হজরত জারির রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ-এর হাতে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ তথা "আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো (সত্য) ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসুল।" এ কথার সাক্ষ্য দেওয়ার, সালাত কায়েম করার, জাকাত দেওয়ার, আমিরের কথা শুনার ও মেনে চলার এবং প্রত্যেক মুসলমানের হিত কামনা করার ওপর বাইআত করেছিলাম।"[৮৫৪]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—সাহাবায়ে কেরাম নেক আমল করা ও তাতে উন্নতির জন্য নবিজি ﷺ-এর হাতে বাইআত হয়েছেন।

নবিজি নারীদের বাইআত করাতেন কিন্তু তাদের হাত স্পর্শ করতেন না

নবিজি ﷺ নারীদের বাইআত করাতেন কিন্তু তাদের হাত স্পর্শ করতেন না। পর্দার ভেতর থেকেই বাইআত করাতেন। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ الخ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ، لَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ،

---

[৮৫৩]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৬৬৮

[৮৫৪]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ২১৫৭

غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ، وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ: يَقُولُ لَهُنَّ: إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا.

"হজরত উরওয়াহ ইবনে যুবাইর রহ. থেকে বর্ণিত, উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. বলেন, কোনো ঈমানদার নারী যখন হিজরত করে নবিজি ﷺ-এর নিকট আসত, তখন তিনি আল্লাহর এ নির্দেশ—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কাছে মুমিন নারীরা হিজরত করে এলে তোমরা তাদের পরীক্ষা করে দেখো। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে অধিক অবগত। অতঃপর যদি তোমরা জানতে পারো যে, তারা মুমিন নারী, তাহলে তাদের আর কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিও না। তারা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররাও তাদের জন্য হালাল নয়। তারা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের ফিরিয়ে দাও। তোমরা তাদের বিয়ে করলে তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না, যদি তোমরা তাদের তাদের মোহর প্রদান করো। আর তোমরা কাফির নারীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রেখো না, তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা তোমরা ফেরত চাও, আর তারা যা ব্যয় করেছে, তা যেন তারা চেয়ে নেয়। এটা আল্লাহর বিধান। তিনি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৮৫৫]

আয়েশা রা. বলেন, ঈমানদার নারীদের মধ্যে যারা (আয়াতে উল্লিখিত) শর্তাবলি মেনে নিত, তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতো। তাই যখনই তারা এ সম্পর্কে মুখে স্বীকারোক্তি করত তখনই রাসুল ﷺ তাদের বলতেন যাও, আমি তোমাদের বাইআত গ্রহণ করেছি। আল্লাহর কসম! কথার দ্বারা বাইআত গ্রহণ ব্যতীত রাসুল ﷺ-এর হাত কখনো কোনো নারীর স্পর্শ করেনি। আল্লাহর কসম! তিনি কেবল সেসব বিষয়ে বাইআত গ্রহণ করার

---

৮৫৫. সুরা মুমতাহিনা, ৬০: ১০

জন্য আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। বাইআত গ্রহণ শেষে তিনি বলতেন, আমি কথার দ্বারা তোমাদের বাইআত গ্রহণ করলাম।"[৮৫৬]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—নারীদের শুধু কথার দ্বারা বাইআত করিয়েছেন। তাদের হাত স্পর্শ করেননি।

বর্তমানে দেখা যায়, নারী মুরিদ পির সাহেবের সামনে নিঃসংকোচে বসে থাকে এবং বেহায়াপনার এমন সব কাজকর্ম করে থাকে যা একদমই উচিত নয়। সুতরাং এগুলো থেকে সর্বাবস্থায় বেঁচে থাকা চাই।

পির সাহেব আপনাকে অভ্যন্তরীণ কোনো প্রাচুর্য এনে দেবে এমন নয়

কোনো কোনো পির সাহেব এমনটি বুঝিয়ে থাকে যে, আমার খেদমত করলে আমি তোমাকে অভ্যন্তরীণ প্রাচুর্য এনে দেবো। আর মুরিদ তা অর্জন করার জন্য বছরের পর বছর তার খেদমতে লেগে থাকে। তারা নিম্নের হাদিস দিয়ে দলিল দিয়ে থাকে। কিন্তু মনে রাখবেন—এই অভ্যন্তরীণ বস্তু প্রদানের ঘটনাটি শুধু একবারই ঘটেছে। যা ছিল মুজিযা। তারপর আর কখনো তা প্রকাশ পায়নি। নাহয় পির তার সন্তানকেই প্রথম এই অভ্যন্তরীণ প্রাচুর্য এনে দিত। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ... وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَوْمًا لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا، فَبَسَطْتُ نَمِرَةً لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرُهَا حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ ﷺ مَقَالَتَهُ، ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন... একদিন নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—তোমাদের যে কেউ আমার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত তার চাদর বিছিয়ে রাখবে এবং আমার কথা শেষ হলে চাদরখানা তার বুকের সঙ্গে মিলাবে, তাহলে সে আমার কথা কখনো ভুলবে না। তাই আমি আমার পশমি চাদরটা নবিজি ﷺ-এর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিছিয়ে রাখলাম। সে চাদর ছাড়া আমার গায়ে আর কোনো চাদর ছিল না। নবিজি ﷺ-এর কথা শেষ হওয়ার পর আমি তা আমার বুকের সঙ্গে মিলালাম। সে সত্তার

---

৮৫৬. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৫২৮৮

কসম! যিনি তাঁকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আজ পর্যন্ত আমি তাঁর একটি কথাও ভুলিনি।"[৮৫৭]

এই হাদিসে বর্ণিত ঘটনাটি হলো, নবিজি ﷺ-এর মুজিযা। যা জীবনে একবারই হয়েছিল। সর্বদা এমনটি হয়নি। না হয় তো নবিজি ﷺ বারবারই এই বরকত দিতেন।

[৮৫৭]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ২৩৫০
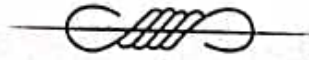
তাবিজ ব্যবহার

এ আকিদা সম্পর্কে ৪টি আয়াত এবং ২৯টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

তাবিজ মোট সাত প্রকার। যথা :

১. যদি কুরআন ও হাদিসের জায়েজ তাবিজ জায়েজ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় অথবা দেওয়া হয়, তাহলে তা জায়েজ।

২. তাবিজ অথবা মন্ত্রের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তাহলে তা হারাম।

৩. তাবিজ অথবা মন্ত্রের মধ্যে এমন বাক্য ব্যবহার করা হয়, যার অর্থ বুঝা যায় না। তাহলে হতে পারে যে, তাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। তাহলে এটাও জায়েজ নেই।

৪. বদ-নজর লাগা।

৫. জাদু। এটা করা হারাম।

৬. আর্‌রাফ তথা জ্যোতিষী। যে গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ জানার দাবি করে থাকে। তার নিকট যাওয়া হারাম।

৭. জিন দূর করা।

তাবিজ করার পদ্ধতি দুটি

১. এক হলো, কুরআন ও হাদিস পাঠ করে ফুঁক দেওয়া। তা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

২. দ্বিতীয়ত হলো, আয়াত কিংবা হাদিস লিখে গলায় ঝুলানো। হাদিসে তার নিষিদ্ধতা বুঝা যায়। প্রত্যেকটির সম্পর্কে সামনে আয়াত এবং হাদিস আসছে।

কবিরাজদের ধোঁকাবাজি

দুনিয়াতে ভালো মানুষও আছে। কিন্তু কিছু লোক এমনটি করে থাকে, সকলে না।

কোনো কোনো কবিরাজ অস্পষ্ট ও রহস্যময় কথাবার্তা বলে থাকে। এরা সুস্পষ্ট বলে না যে, জিনের আছর আছে, আবার তা অস্বীকারও করে না। বরং এরা বলে—তার ওপর জিনের ছায়া আছে। অর্থাৎ জিন আছেও আবার নাইও। আর তা ছাড়ানোর জন্য অনেক টাকা-পয়সা আদায় করে নেয়। কয়েক মাস পরে যখন ছাড়ে না তখন বলে যে, আমি একটি জিনকে ছাড়িয়ে দিয়েছি কিন্তু এখন তার বংশের অন্য জিন এসে ধরেছে। এখন তাকে ছাড়াতে হলে আরও টাকা-পয়সা লাগবে।

আবার কখনো এটাও বলে থাকে—আপনার কাছের লোকেরা আপনাকে জাদু করেছে অথবা তাবিজ করেছে। আর কাছের মানুষের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিবেশী কোনো নারী, ভাবি, শাশুড়ি কিংবা ননদই হয়ে থাকে। তাই তাদের মধ্যে কোনো একজনের সঙ্গে গোটা জীবনের জন্য ভেতরে ভেতরে শত্রুতা তৈরি হয়ে যায় এবং কোনো কোনো সময় অনেক বড় ঝগড়াও হয়ে যায়। আর এ সবই করায় সেই তাবিজদাতা কবিরাজ। বস্তুত কবিরাজের নিজেরও এগুলো কোনো কিছুর খবর নাই। এজন্য এমন কবিরাজ ও জাদুকর থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

“এরপরও তারা এদের কাছ থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারও কোনো ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া।”[৮৫৮]

এই আয়াতে বলা হয়েছে—এই কবিরাজ ও জাদুকররা সধারণত এমন তদবির করে থাকে যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝেও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। কোনো কোনো সময় এরা আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও শত্রুতা সৃষ্টি করে দেয়। বাস্তবেই কোনো কোনো কবিরাজ আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও মতানৈক্য তৈরি করে দেয়।

হাদিস শরিফে এও এসেছে—এই কবিরাজরা যদি একটি বিষয় জানতে পারে, তাহলে রোগীকে এটার সঙ্গে আরও শত শত মিথ্যা বলে থাকে। যেন

---

৮৫৮. সুরা বাকারা, ২: ১০২

রোগীর তা বিশ্বাস হয় এবং তার এই বাণিজ্য খুব চলে। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قالت: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّيْءِ، فَنَجِدُهُ حَقًّا، قَالَ: تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ.

"হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবিজি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! গণক আমাদের এমন কিছু কথা বলে যা আমরা সত্যিই পেয়ে থাকি। তখন নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—জিনেরা কোনো একটি কথা কোথাও পেলে তা তাদের বন্ধুদের (গণক ও জ্যোতিষী) নিকট বলে দেয়। আর তারা এর সঙ্গে শত মিথ্যা মিলিয়ে মানুষকে বলে থাকে।"[৮৫৯]

যে পরিবারে তাবিজের প্রথা চালু হয়, তা আর সহজে কখনো বন্ধ হয় না

প্রায়ই দেখা যায়, যে পরিবারে একবার তাবিজের প্রথা চালু হয়ে যায়, সেই পরিবারের লোকেরা এমন সন্দেহপ্রবণ হয়ে যায়—যেকোনো বিপদ-আপদ এলেই তারা মনে করে যে, কেউ জাদু করেছে। এমনকি হঠাৎ করে যদি তাদের হাত থেকে কোনো পাত্র পড়ে ভেঙে যায়, তাহলেও তারা মনে করে যে, কেউ জাদু কিংবা তাবিজ করার কারণেই পাত্রটি ভেঙেছে। তাদেরকে যতই বুঝানো হোক যে, পাত্রটি হঠাৎ এমনিতেই ভেঙেছে কিংবা এটা ব্যথা অথবা অসুস্থতার কারণেই হয়েছে, তারা তা বুঝে না। কেননা তাদের বিবেকে তাবিজ ও জাদুর ভূত সওয়ার হয়ে আছে। তারপর এই জাদুকে নষ্ট করার জন্য কবিরাজের নিকট যায়। আর কবিরাজ অস্পষ্ট ও রহস্যময় কথাবার্তা বলে অনেক বড় খাসি ও অর্থ আদায় করতে থাকে এবং গোটা জীবনের ফাঁসিয়ে রাখে। কেননা তার তো অর্থ কামাতে হবে এবং এ ব্যাপারে তার প্রসিদ্ধি অর্জন করতে হবে।

এজন্য প্রিয় পাঠকদের প্রতি বিনীত অনুরোধ হলো, আপনারা এ ধরনের সন্দেহপ্রবণতা থেকে দূরে থাকবেন। আর এজন্যই নবিজি ﷺ কোনো কোনো তাবিজ ও জাদুকে নিষেধও করেছেন। যার বর্ণনা সামনে আসছে।

[৮৫৯]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২২২৮

তাবিজ দ্বারা সাময়িকভাবে সামান্য মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়

এক কবিরাজ আমাকে চারটি কথা বলেছেন। আর তা হলো,

১. যাকে আমরা ঝাড়ফুঁক করি সে সাধারণত মানসিক রোগী হয়ে থাকে। অথবা সে অনিদ্রার রোগী। অথবা সে মানসিকভাবে ভীত। যার ফলে সে সর্বদা ভয় পায়। তাই কোনো আওয়াজ হলেই সে মনে করে যে, এটা জিন্নাত কিংবা শয়তানের আওয়াজ এবং এখন এটা তার ওপর আক্রমণ করবে। এই ভয়ে কিংবা এই সন্দেহে সে সর্বদা ভীত থাকে। যার ফলে সে মনে করে যে, আমার ওপর জিনেরা ভর করেছে। আর এ কারণে সে অস্থির হয়ে যায়। বস্তুত কোনো জিন নেই। জিনের সেই সময় কোথায় যে, তার ওপর ভর করবে এবং নিজের কাজ ছেড়ে এখানে অবস্থান করবে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, ভয়ের কারণে অথবা ঘরোয়া পেরেশানির কারণে তার ঘুম আসে না। যার ফলে শরীর-স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

যখন আমার কাছে কোনো রোগী আসে তখন আমি বুঝে যাই যে, তার পেরেশানি আছে, তাই তার ঘুম হয় না। কিন্তু সোজাভাবে বললে তো আর কাজ হবে না। এজন্য একটু ঘুরিয়ে এভাবে বলি যে, এই তাবিজটা নিন। এতে সকল জিন চলে যাবে। আর ঝাড়ফুঁক দ্বারা রোগীর এই সান্ত্বনা হয়ে যায় যে, জিন ও জাদু একদম চলে গেছে। যার ফলে তার ভয় দূর হয়ে যায়। তাই এখন সে আরামে ঘুমিয়ে যায়। আর এই ঘুমিয়ে যাওয়ার ফলে তার রোগও দূর হয়ে যায়। এজন্য আমাদের তাবিজ হলো রোগীর এক প্রকার মানসিক সান্ত্বনা।

২. তিনি দ্বিতীয় কথা বলেছেন, মূলত আমাদের হাতে কোনো কারিশমা নেই। আমরা শুধু বিভিন্ন প্রকার দুআ-কালাম লিখে দিই। এতে প্রভাব সৃষ্টি করা বা কোনো ফলাফল প্রদান করা একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাজ। তিনি যদি চান, তাহলে তাতে আরোগ্য লাভ হয়। আর যদি তিনি না চান, তাহলে তাতে কিছুই হয় না। সুতরাং আমাদের হাতে কোনো কারিশমা নেই।

৩. তৃতীয় কথা তিন বলেছেন, সাধারণত আমাদের হাতে কোনো জিন বা মক্কেল বশ হয় না। সাধারণ মানুষের এই ধারণাটি পুরোপুরি সঠিক নয়। হয়তো এটা হতে পারে, কিন্তু আমার জানামতে কোনো জিন বশ হয় না। টাকা-পয়সা কামানোর জন্য অনেক লোক এই আজগুবি কথাটি ছড়িয়ে দেয় যে, আমার নিকট মক্কেল আছে। যদি এমনই হতো, তাহলে সরাসরি উক্ত

মক্কেলকে দিয়ে টাকা-পয়সা জমা না করে অন্য লোকদের থেকে কেন টাকা-পয়সা চেয়ে বেড়ায়?

৪. চতুর্থ কথা তিনি বলেছেন, আমরা গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদও জানি না। আমরা এটা করি যে, রোগীকে এদিক-সেদিক থেকে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞেস করে নেই। এতেই ধারণা হয়ে যায়। তারপর নিজের থেকে এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অস্পষ্ট ও রহস্যময় কথাবার্তা বুঝাতে থাকি। আর এটার প্রভাবেই মানুষ মনে করে যে, আমরা গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ জানি। অথবা রোগী সম্পর্কে জিনেরা আমাদের সবকিছু জানিয়ে দিয়েছে। যেহেতু তারা সাধারণ লোক, তাই আমাদের কথা খুব সহজেই বিশ্বাস করে নেয় এবং মনে করে যে, আমাদের ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ সম্পর্কে জানি। অথবা আমরা অভিজ্ঞ বাবা। যে রোগ সম্পর্কে সব কথা জানে।

আর যদি কোনো মেধাবী লোক এসে যায় এবং সে আমাদের কথা যাচাইবাছাই করতে শুরু করে, তাহলে আমরা তার সঙ্গে বেশি কথা বলি না। বরং তার থেকে কেটে পড়ি। যেন আমাদের যশখ্যাতি ধুলোয় মিশে না যায় এবং আমাদের এই অর্থ উপার্জনের পথ বন্ধ না হয়ে যায়। কেননা আমারে নিকট অর্থ উপার্জনের জন্য এটা একটি ভালো ব্যবসা। যেখানেই যাই অনেক টাকা আসে। কোনো খরচ নেই।

এই মুখলিস কবিরাজের কথা কতটুকু সঠিক তা সে-ই জানে। তবে তার কথায় কিছুটা হলেও বাস্তবতা রয়েছে। আপনিও কথাগুলো ভাবুন এবং ধোঁকা খাওয়া থেকে বাঁচুন।

১. কুরআন ও হাদিসের জায়েজ তাবিজ

যদি তাবিজ দ্বারা মানুষের পেরেশানি দূর করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ঠিক আছে। আর যদি এজন্য তাবিজ দ্বারা কাউকে কষ্ট দেওয়া হয় অথবা স্বামী-স্ত্রী কিংবা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের মাঝে পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটানো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এমন তাবিজ জায়েজ নেই। বরং তা অনেক বড় গুনাহ হবে।

তাবিজের মধ্যে যদি এমন বাক্য হয়, যাতে একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তাহলে তা জায়েজ। বরং তাবিজের মধ্যে যদি এমন বাক্য হয়, যা দিয়ে নবিজি ﷺ তাবিজ দিয়েছেন, তাহলে তা আরও উত্তম। যেহেতু নবিজি ﷺ-এর বরকতময় বাক্য সুতরাং তার প্রভাব

আরও বেশি হবে এবং সাওয়াবও হবে। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنَسٌ :أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

"হজরত আবদুল আজিজ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং হজরত সাবিত রা. হজরত আনাস ইবনে মালেক রা.-এর নিকট গেলাম। তখন হজরত সাবিত রা. বললেন, হে আবু হামজা! (এটা হজরত আনাস ইবনে মালেক রা.-এর উপনাম) আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তখন হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বললেন, আমি কি তোমাকে নবিজি ﷺ যা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করেছিলেন তা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করে দেবো? হজরত সাবিত রা. বললেন, হ্যাঁ! অবশ্যই করুন। তখন হজরত আনাস রা. এই দুআ পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করলেন—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

অর্থ : হে আল্লাহ, তুমি মানুষের রব! রোগ নিরাময়কারী, আরোগ্য দান করো, তুমি আরোগ্য দানকারী। তুমি ব্যতীত আর কেউ আরোগ্য দানকারী নেই। এমন আরোগ্য দাও, যা কোনো রোগ অবশিষ্ট রাখে না।"[৮৬০]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—একমাত্র আল্লাহ তাআলাই আরোগ্য দানকারী। এজন্য শুধু তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত।

তাবিজ করার পদ্ধতি দুটি

১. এক হলো, তাবিজের বাক্য পাঠ করে ফুঁক দেওয়া। এটা জায়েজ আছে। কেননা নবিজি ﷺ অসুস্থ ব্যক্তিকে ঝাড়ফুঁক করেছেন।

২. দ্বিতীয়ত হলো, তাবিজের বাক্য কাগজে লিখে গলায় কিংবা বাজুতে ঝুলানো। এটা এততটা ভালো নয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে।

নবিজি ﷺ তাবিজের বাক্য পাঠ করে অসুস্থ ব্যক্তিকে ঝাড়ফুঁক করেছেন

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

---

৮৬০. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৫৭৪২

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যখন আমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হতো নবিজি ﷺ তখন তাঁর ডান হাত দ্বারা অসুস্থ ব্যক্তির শরীর মাসেহ করতেন আর এই দুআ পাঠ করতেন—

أَذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

অর্থ : হে মানুষের রব, তুমি রোগ দূর করে দাও এবং আরোগ্য দান করো। তুমিই তো আরোগ্যদানকারী, তোমার আরোগ্য ভিন্ন আর কোনো আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য দাও, যারপর কোনো রোগ থাকে না।"[৮৬১]

অন্য এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنَسٌ :أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

"হজরত আবদুল আজিজ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং হজরত সাবিত রা. হজরত আনাস ইবনে মালেক রা.-এর নিকট গেলাম। তখন হজরত সাবিত রা. বললেন, হে আবু হামজা! (এটা হজরত আনাস ইবনে মালেক রা.-এর উপনাম) আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তখন হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বললেন, আমি কি তোমাকে নবিজি ﷺ যা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করেছিলেন তা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করে দেবো? হজরত সাবিত রা. বললেন, হ্যাঁ! অবশ্যই করুন। তখন হজরত আনাস রা. এই দুআ পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করলেন—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

অর্থ : হে আল্লাহ, তুমি মানুষের রব! রোগ নিরাময়কারী, আরোগ্য দান করো, তুমি আরোগ্য দানকারী। তুমি ব্যতীত আর কেউ আরোগ্য দানকারী নেই। এমন আরোগ্য দাও, যা কোনো রোগ অবশিষ্ট রাখে না।"[৮৬২]

---

[৮৬১]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৫৭৫০; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২১৯১; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩৮৮৩; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৬১৯; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৫৬৫

নবিজি ﷺ কুরআনের আয়াত পাঠ করেও ঝাড়ফুঁক করতেন। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ.

"হজরত আলি রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, উত্তম ওষুধ হলো কুরআনুল কারিম।"[৮৬৩]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا ثَقُلَ، كُنْتُ أَنَا أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ فَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا، فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ: كَيْفَ كَانَ يَنْفِثُ؟، قَالَ: يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ.

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ যে রোগে ইন্তেকাল করেন, সে রোগে তিনি সুরা নাস ও সুরা ফালাক পাঠ করে নিজের ওপর ফুঁক দিতেন। যখন রোগ বৃদ্ধি পেল, তখন আমি সেগুলো পাঠ করে ফুঁক দিতাম এবং তাঁর হাত বুলিয়ে দিতাম বারাকাতের আশায়। বর্ণনাকারী (মা'মার রহ.) বলেন, আমি ইবনু শিহাবকে জিজ্ঞেস করলাম, নবিজি ﷺ কীভাবে ফুঁক দিতেন? তিনি বললেন, নিজের দুহাতে ফুঁক দিতেন, তারপর তা দিয়ে চেহারা মুছে নিতেন।"[৮৬৪]

আরেক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفُثُ فِي الرُّقْيَةِ.

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ কিছু পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করতেন।"[৮৬৫]

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ থেকে আমরা তিনটি কথা জানতে পারলাম। যথা :

১. আয়াত এবং হাদিসের বাক্য দ্বারা তাবিজ দেওয়া জায়েজ আছে।

২. তাবিজের মধ্যে শুধু আল্লাহ তাআলার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। তিনিই একমাত্র আরোগ্যদাতা। তিনি ছাড়া অন্য আর কারও নিকট

---

[৮৬২]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৫৭৪২

[৮৬৩]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৩৫৩৩। এই সনদে হাসের আল আওয়ার যঈফ রাবি।

[৮৬৪]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৫৭৫১

[৮৬৫]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৩৫২৮। সনদ সহিহ।

কখনো আরোগ্য কামনা করা জায়েজ নেই। বরং কখনো কখনো তা শিরক হয়ে যায়।

৩. তাবিজের বাক্য পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করা জায়েজ আছে।

পাগলের চিকিৎসার জন্য হাদিস শরিফে এই দুআটি এসেছে

নবিজি ﷺ নিম্নের আয়াতসমূহ পাঠ করে পাগলকে ঝাড়ফুঁক করেছেন এবং পাগল ভালোও হয়ে গেছে। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي لَيْلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: إِنَّ لِي أَخًا وَجِعًا، قَالَ: مَا وَجَعُ أَخِيكَ؟ قَالَ: بِهِ لَمَمٌ، قَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِ، قَالَ: فَذَهَبَ فَجَاءَ بِهِ، فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَمِعْتُهُ: عَوَّذَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَأَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ، وَآيَتَيْنِ مِنْ وَسَطِهَا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سورة البقرة آية ١٦٣ , وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ خَاتِمَتِهَا، وَآيَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سورة آل عمران آية ١٨ وَآيَةٍ مِنَ الْأَعْرَافِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ سورة الأعراف آية ٥٤ وَآيَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ سورة المؤمنون آية ١١٧ وَآيَةٍ مِنَ الْجِنِّ: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا سورة الجن آية ٣ وَعَشْرِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الصَّافَّاتِ، وَثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ الْحَشْرِ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ والمعوذتين، فَقَامَ الْأَعْرَابِيُّ، قَدْ بَرَأَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

"হজরত আবু লায়লা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবিজি ﷺ-এর নিকট বসে থাকা অবস্থায় এক বেদুইন তাঁর নিকটে এসে বলল, আমার এক অসুস্থ ভাই আছে। তিনি বললেন, তোমার ভাই কী রোগে আক্রান্ত? সে বলল, (কোনো কিছুর) কুপ্রভাব (আছর)। তিনি বললেন, তুমি যাও এবং তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আবু লায়লা রা. বলেন, সে গিয়ে তার ভাইকে নিয়ে এলে তিনি তাকে নিজের সামনে বসান। আমি শুনতে পেলাম, তিনি সুরা ফাতিহা—

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ﴾

সুরা বাকারার প্রথম চার আয়াত—

﴿الٓمٓ ○ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ○ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ؕ﴾

মধ্যখানের দুই আয়াত (১৬৩-১৬৪ নং আয়াত)

﴿وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ﴾

আয়াতুল কুরসি (২৫৫ নং আয়াত)

﴿اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ﴾

এবং শেষ তিন আয়াত (২৮৪-২৮৬ নং আয়াত)

﴿لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ﴾

সুরা আলে ইমরানের একটি আয়াত, আমার মনে হয় তিনি ১৮ নং আয়াত পড়েছিলেন—

﴿شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾

এবং সুরা আরাফের এক আয়াত (৫৪ নং আয়াত)

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ۟ یُغْشِی الَّیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهٗ حَثِیْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ﴾

সুরা মুমিনুনের এক আয়াত (১১৭ নং আয়াত)

﴿وَمَنْ یَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ﴾

সুরা জিন-এর এক আয়াত (৩ নং আয়াত)

﴿وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰی جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ﴾

সুরা সাফ্ফাত-এর প্রথম ১০ আয়াত

﴿وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ ○ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ ○ فَالتّٰلِیٰتِ ذِكْرًا ۙ ○ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ ○ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ ○ اِنَّا زَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْیَا بِزِیْنَةِ ۨالْكَوَاكِبِ ۙ ○ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَیْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ ○ لَا یَسَّمَّعُوْنَ اِلَی الْمَلَاِ الْاَعْلٰی وَیُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ ○ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ ○ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾

সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত (২২-২৪ নং আয়াত)

﴿هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ○ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ○ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۚ﴾

সুরা ইখলাস

﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ ○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ ○ لَمْ یَلِدْ ۙ۬ وَلَمْ یُوْلَدْ ۙ ○ وَلَمْ یَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ﴾

সুরা ফালাক

﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ ○ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ ○ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ ○ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ۙ ○ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۚ﴾

সুরা নাস

﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ ○ مَلِكِ النَّاسِ ۙ ○ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ ○ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ۬ الْخَنَّاسِ ۪ۙ ○ الَّذِیْ

﴿يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ ○ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ﴾

পাঠ করে ফুঁক দিলেন। তাতে বেদুইন এমনভাবে সুস্থ হয়ে দাঁড়াল যে, তার কোনো রোগই অবশিষ্ট নেই।"[৮৬৬]

এই হাদিসে দেখা গেল, নবিজি ﷺ এতগুলো আয়াত পাঠ করে পাগলের চিকিৎসা করেছেন এবং বাস্তবেও সে সুস্থও হয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমানে পাগলের চিকিৎসায় অনেক মেধাবী লোকের আগমন ঘটেছে। এদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

২. আয়াত কিংবা হাদিস লিখে গলায় ঝুলানো

আরবের বাসিন্দাগণ কড়িকে সুতায় গেঁথে মালা বানাতেন এবং তা রোগীর গলায় ঝুলাতেন। কোনো কোনো সময় আল্লাহ তাআলা ব্যতীত জিন-ভূত ও শয়তানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতেন। কড়ির এমন মালাকে 'তামিমা' বলা হয়। নবিজি ﷺ এমন তামিমা ব্যবহার করা শিরক বলেছেন। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ.

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—জাদু, তামিমা ও অবৈধ প্রেম ঘটানোর মন্ত্র শিরকের অন্তর্ভুক্ত।"[৮৬৭]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا؟ قَالَ: إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيْمَةً، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ: مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ.

"হজরত উকবা ইবনে আমের আল-জুহানি রা. বলেন, নবিজি ﷺ-এর নিকট একটি প্রতিনিধি দল এলো। নবিজি ﷺ তখন নয় ব্যক্তির বাইআত গ্রহণ করলেন এবং এক ব্যক্তির বাইআত গ্রহণ করলেন না। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি সকলের বাইআত গ্রহণ করলেন আর একজনের বাইআত গ্রহণ করলেন না কেন? নবিজি ﷺ তখন বললেন,

---

৮৬৬. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৩৫৪৯। সনদ যঈফ।

৮৬৭. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩৮৮৩; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৩৫৩০। সনদ সহিহ।

এ ব্যক্তি তামিমা পরিধান করে আছে। সে ব্যক্তি তখন তার হাত (জামার ভেতর) প্রবেশ করে উক্ত তামিমা খুলে ফেলল। তারপর নবিজি ﷺ তার বাইআত গ্রহণ করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তামিমা ঝুলাল সে শিরক করল।"[৮৬৮]

এই হাদিসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি তামিমা ঝুলাল সে শিরক করল।

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ ... وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ وَعَقْدَ التَّمَائِمِ.

"ইবনে মাসউদ রা. বলতেন, নবিজি ﷺ ১০টি বিষয় অপছন্দ করতেন... মুআব্বিজাত তথা সুরা নাস ও ফালাক ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা এবং তামিমা ঝুলানো।"[৮৬৯]

তাবিজ ব্যবহার না করে ধৈর্যধারণ করা তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا... فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ، فَقِيلَ هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَمَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ... فَقَالَ: هُمُ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

"হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ একদিন আমাদের নিকট এলেন... আমি দেখলাম বিরাট বিরাট দল দিগন্তজুড়ে ছেয়ে আছে। আমাকে বলা হলো, ওই সবই আপনার উম্মত এবং ওদের সঙ্গে ৭০ হাজার লোক এমন আছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে... নবিজি ﷺ বললেন, তাঁরা (হবে) ওই সব লোক যারা অবৈধভাবে মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করে না, ঝাড়ফুঁক করে না এবং আগুনে পোড়ানো লোহার দাগ লাগায় না, আর তাঁরা তাদের রবের ওপর একমাত্র ভরসা রাখে।"[৮৭০]

নিম্নের আয়াতেও একমাত্র আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—

---

৮৬৮. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৭৪২২। সনদ সহিহ।

৮৬৯. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪২২২। বর্ণিত সনদ বিতর্কিত হলেও এর পক্ষে অনেক সহিহ শাহেদ আছে।

৮৭০. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৫৭৫২

﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾

"এবং তাঁরই কাছে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করো।"[৮৭১]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিসে এটাই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে—তাবিজ ব্যবহার না আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করাই উত্তম। আসলে ঘটনা হলো, ওই সময়ে তাবিজদাতা কবিরাজরা সাধারণ মানুষকে অনেক বোকা বানাতো এবং অনেক অর্থ লুটে নিত।

কখনো মাঝেমধ্যে সান্ত্বনার জন্য তাবিজ ব্যবহারের সামান্য সুযোগ রয়েছে

হাদিসে তাবিজ ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু সাহাবা ও তাবেয়িদের বাণী ও আমলের দ্বারা তার সামান্য সুযোগ রয়েছে বলে বুঝা যায়। এজন্য কখনো মাঝেমধ্যে যদি তাবিজ ব্যবহার করা হয় এবং তাতেও আল্লাহ তাআলার ওপরই ভরসা করা হয় আর মনে করা হয় যে, তাবিজের দ্বারা কিছুই হবে না, যা হওয়ার একমাত্র আল্লাহ তাআলার সত্তা থেকেই হবে, তাহলে তা করা যেতে পারে। তাতে অন্তরের সান্ত্বনা লাভ হবে।

তাবিজ ব্যবহার নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের আমল সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو يُلَقِّنُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَكٍّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ.

"হজরত আমর ইবনে শুআইব রা. থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে সে যেন বলে—

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

অর্থ : আমি আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা আশ্রয় চাই তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের খারাবি হতে, শয়তানদের কুমন্ত্রণা হতে এবং আমার নিকট যারা হাজির হয় সেগুলো হতে।

---

৮৭১. সুরা হুদ, ১১: ১২৩

তাহলে সেগুলো তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তার সন্তানদের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্কদের উক্ত দুআ শিখিয়ে দিতেন। আর নাবালেগদের উক্ত দুআ কাগজের টুকরায় লিখে তাদের গলায় ঝুলিয়ে দিতেন।"[৮৭২]

তাবেয়ির বাণী হলো—

عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَلَّقَ الْقُرْآنُ.

"হজরত আতা রহ. বলেন, কুরআনের কোনো অংশ যদি তাবিজ আকারে ঝুলানো হয় তাতে কোনো ক্ষতি নেই।"[৮৭৩]

আরেকটি বাণী—

عَنِ الضَّحَّاكِ لَمْ يَكُنْ بَأْسًا اَنْ يُعَلِّقَ الرَّجُلُ الشَّئَ مِنْ كِتَابِ اللهِ اِذَا وَضَعَهُ عِنْدَ الْغُسْلِ وَ عِنْدَ الْغَائِطِ.

"হজরত জাহ্হাক রহ. বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি কুরআনের কোনো অংশকে তাবিজ আকারে ঝুলায়, তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। তবে শর্ত হলো, গোসলের সময় ও ইস্তিঞ্জায় যাওয়ার সময় খুলে রাখতে হবে।"[৮৭৪]

আরেকটি বাণী—

عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الصِّبْيَانِ؟ فَرَخَّصَ فِيهِ.

"হজরত ইউনুস রহ. বলেন, আমি বাচ্চাদের জন্য তাবিজ ব্যবহার সম্পর্কে হজরত জাফর রহ.-কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি তার সম্মতি দিলেন।"[৮৭৫]

হাদিসে তাবিজ ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু তা পাঠ করে ফুঁক দেওয়া জায়েজ। তবে এ সকল তাবেয়িদের বাণী থেকে বুঝা যায়, তাবিজ ব্যবহারের কিছুটা সুযোগ রয়েছে। কিন্তু তাকে ধান্ধা বানানো যাবে না।

তাবিজের বিনিময় গ্রহণ

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

---

[৮৭২]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৫২৮। সনদ হাসান।

[৮৭৩]. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা*, ৫/৪৩ (১২/৭৫ হাদিস নং ২৪০১৬ শাইখ আওয়ামার তাহকিককৃত)

[৮৭৪]. প্রাগুক্ত, ২৪০১৮

[৮৭৫]. প্রাগুক্ত, ২৪০১৭

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَانُوا فِي سَفَرٍ، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ... فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ... ثُمَّ قَالَ: خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ.

"হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ-এর সাহাবাদের মধ্য থেকে কিছু লোক সফরে ছিলেন এবং আরবের কোনো গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন... তারপর সে উক্ত রোগীর নিকট এসে সুরা ফতিহা পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করলে সে সুস্থ হয়ে যায়। বিনিময়ে তারা তাকে কিছু বকরি দিলেন... নবিজি ﷺ বললেন, বকরিগুলো নিয়ে নাও এবং তাতে আমার অংশ রেখো।"[৮৭৬]

এই হাদিস থেকে বুঝা গেল, কখনো কখনো তাবিজের সামান্য বিনিময় গ্রহণ করা যায়।

তাবিজকে পেশা বানিয়ে নেওয়া উচিত নয়

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهَا؟، فَقَالَ: إِنْ سَرَّكَ، أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا.

"হজরত উবাদাহ ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আহলে সুফ্‌ফার কিছুসংখ্যক লোকদের কুরআনুল কারিম ও লেখা শিখেয়েছি। তাঁদের একজন আমাকে একটি ধনুক উপহার দেয়। আমি (মনে মনে) বললাম, এটি তেমন উল্লেখযোগ্য মাল নয়। এটির সাহায্যে আমি আল্লাহর পথে তির মারতে পারব। আমি রাসুল ﷺ-কে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তোমাকে জাহান্নামের জিঞ্জির পরানো হলে তাতে তুমি খুশি হতে পারলে এটি গ্রহণ করো।"[৮৭৭]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

---

[৮৭৬]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৫৭৩৬; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২২০১

[৮৭৭]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২১৫৭; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩৪১৬; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২২১৮১। সনদ যইফ।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَرَدَدْتُهَا.

"হজরত উবাই ইবনে কাব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন শিক্ষা দিলে সে আমাকে একটি ধনুক উপহার দেয়। আমি তা রাসুল ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, তুমি এটি গ্রহণ করলে (জানবে যে), তুমি জাহান্নামের একটি ধনুক গ্রহণ করেছ। অতএব, আমি তা ফেরত দিলাম।"[৮৭৮]

কুরআন পড়ানোর বিনিময়ে তির-ধনুক গ্রহণ করাটা যেন আগুনকে গ্রহণ করা। এজন্য তাবিজের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

ওষুধ ব্যবহার করা জায়েজ

অসুস্থ হলে ওষুধ ব্যবহার করা এবং তার চিকিৎসা করা সুন্নাত। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, প্রত্যেক রোগেরই চিকিৎসা আছে। রোগের সঠিক ওষুধ পাওয়া গেলে আল্লাহ তাআলার হুকুমে উক্ত রোগ ভালো হয়ে যায়।"[৮৭৯]

২. তাবিজ অথবা মন্ত্রের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তাহলে তা হারাম।

৩. তাবিজ অথবা মন্ত্রের মধ্যে এমন বাক্য ব্যবহার করা হয়, যার অর্থ বুঝা যায় না। তাহলে হতে পারে যে, তাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। তাহলে এটাও জায়েজ নেই।

অমুসলিমরা যে-সকল তন্ত্র-মন্ত্র করে থাকে, সেগুলোতে সাধারণত তাদের নিজের দেব-দেবীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে এবং তাতে শিরকি বাক্য থাকে। এজন্য তাদের মাধ্যমে কোনো তন্ত্র-মন্ত্র করানো কিংবা তাবিজ ব্যবহার করা উচিত নয়। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

---

[৮৭৮]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২১৫৮। সনদ সহিহ।

[৮৭৯]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২২০৪

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟، فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا.

"হজরত আউফ ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা ঝাড়ফুঁক করতাম। তারপর আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, তোমাদের ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থাগুলো আমার সামনে পেশ করো; তবে যেসব ঝাড়ফুঁক শিরকের পর্যায়ে পড়ে না, তাতে কোনো দোষ নেই।"[৮৮০]

এই হাদিস থেকে বুঝা গেল, শিরকি বাক্য দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা জায়েজ নেই। তবে হ্যাঁ! ঝাড়ফুঁকের মধ্যে যদি আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তাহলে উক্ত তাবিজ কিংবা ঝাড়ফুঁকে কোনো অসুবিধা নেই।

৪. বদ-নজর লাগা

বদ-নজর সত্য। বদ-নজর হলো, কারও প্রতি কারও এমন নজর লাগা, যা দ্বারা তার ক্ষতি হয়।

যে ব্যক্তির নজর লাগে, তাতে ওই ব্যক্তির কোনো হাত নেই। নিজে নিজেই নজর লেগে যায়। এজন্য উক্ত ব্যক্তিকে মন্দ বলা উচিত নয়। কেননা এতে তার কোনো হাত নেই।

যে ব্যক্তির নজর লাগে, তার উচিত হলো, যখন সে কোনো আশ্চর্যজনক বস্তু দেখবে তখন সঙ্গে সঙ্গে 'মাশাআল্লাহ' বলা। তাহলে আর তার নজর লাগবে না।

বদ নজরের চিকিৎসা হলো, যে ব্যক্তির নজর লেগেছে তাকে গোসল দিয়ে উক্ত গোসলের পানি যার ওপর বদ-নজর লেগেছে তার ওপর ছিটিয়ে দিলে বদ-নজর খতম হয়ে হয়ে যাবে। যেমন এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, বদ নজর লাগা সত্য। আর তিনি উল্কি অঙ্কন করতে নিষেধ করেছেন।"[৮৮১]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

---

[৮৮০]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২২০০; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩৮৮৬।

[৮৮১]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৫৭৪০।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا.

"হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, বদ নজর লাগা সত্য। কোনো কিছু যদি তাকদির থেকে অগ্রগামী হয়ে থাকে, তাহলে সেটা হচ্ছে বদ নজর লাগা। আর যদি তোমাদের কেউ গোসল করতে বলে, তাহলে গোসল করে নাও।"[৮৮২]

এই হাদিসে বলা হয়েছে—যে ব্যক্তির বদ-নজর লেগেছে, তাকে যদি গোসল করতে বলা হয়, তাহলে গোসল করে নেবে।

৫. জাদু করা হারাম

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾

"আর সুলাইমান কুফরি করেনি; বরং শয়তানরা কুফরি করেছে। তারা মানুষকে জাদু শেখাত।"[৮৮৩]

এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—জাদু করা কুফরি।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বেঁচে থাকো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলো কী? নবিজি ﷺ বললেন,

১. আল্লাহ তাআলার সথে কাউকে শরিক করা।

২. জাদু করা।

৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা।

---

৮৮২. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২১৮৮

৮৮৩. সুরা বাকারা, ২: ১০২

৪. সুদ খাওয়া।

৫. ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করা।

৬. যুদ্ধ থেকে পলায়ন করা।

৭. মুমিন নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা।"[৮৮৪]

এই হাদিসে বলা হয়েছে—জাদু করা কবিরা গুনাহ।

জাদুর বাস্তবতা

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ﴾

"তারপর জাদুর প্রভাবে মুসার কাছে মনে হলো যেন তাদের রশি ও লাঠিগুলো ছোটাছুটি করছে।"[৮৮৫]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنّ النَّبِيَّ ﷺ: سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ.

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি রা.-কে জাদু করা হয়েছিল। ফলে তিনি ধারণা করতেন যে, তিনি এ কাজ করেছেন অথচ তিনি তা করেননি।"[৮৮৬]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قالت: سَحَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، قَالَتْ: حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ.

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, যুরাইক গোত্রের লাবিদ ইবনে আসাম নামক এক ইহুদি নবিজি ﷺ-কে জাদু করেছে। যার প্রভাবে তিনি ধারণা করতেন যে, তিনি এ কাজ করেছেন অথচ বাস্তবে তিনি তা করেননি।"[৮৮৭]

---

[৮৮৪]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৮৯

[৮৮৫]. সুরা ত্ব-হা, ২০: ৬৬

[৮৮৬]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩১৭৫

[৮৮৭]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২১৮৯

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়—জাদুর বাস্তবতা রয়েছে এবং নবিজি ﷺ-এর ওপরও তার প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রত্যেক কবিরাজ জাদু এবং জিনের যেসব আছরের কথা বলে থাকে তার অধিকাংশই মিথ্যা হয়।

৬. আর্‌রাফ তথা জ্যোতিষী। যে গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ জানার দাবি করে থাকে। তার নিকট যাওয়া হারাম।

কিছু লোক দাবি করে থাকে—আমি গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ জানি। আর কিছু লোক সরাসরি দাবি করে না কিন্তু এমনভাবে প্রভাবিত করে থাকে—আমার রোগীর ব্যাপারে সবকিছু জানা আছে। এমন লোকদের আর্‌রাফ তথা জ্যোতিষী বলা হয়।

সাধারণত দেখা যায়, যে-সকল লোক তাবিজ ও জাদুর দোকান নিয়ে বসে, তারা তাদের নিকট আগত লোকদের এভাবে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে যে, আমার সবকিছু জানা হয়ে গেছে। অস্পষ্ট ও রহস্যময় কথাবার্তা বলে উপস্থিত লোকদের অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেয় যে, সে বাস্তবেই গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ জানেন এবং আমাদের অবস্থা তার জানা আছে। সুতরাং সে জাদু নষ্ট করে দিতে পারবে। আর এজন্য সে অনেক অর্থকড়িও প্রদান করে থাকে। বর্তমান যুগে এটাও এক প্রকার গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ জানা জ্যোতিষী। এজন্য তাদের ধোঁকায় পড়া উচিত নয়।

জ্যোতিষীর কথাকে বিশ্বাস করা জায়েজ নেই

আকিদাতুত তহাবিতে এসেছে—

وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا وَلَا مَنْ يَدَّعِيْ شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَاِجْمَاعَ الْأُمَّةِ.

অর্থাৎ আমরা কোনো জ্যোতিষী ও গণক এবং এমন ব্যক্তি যে সর্বদা কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মত তথা উম্মতের ঐকমত্যের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাদের বিশ্বাস করি না।[৮৮৮]

জ্যোতিষীর নিকট গেলে ৪০ দিনের ইবাদত কবুল হয় না

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

৮৮৮. আকিদাতুত তহাবি, আকিদা নং ১০১ পৃষ্ঠা- ২১

"নবিজি ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ নবিজি ﷺ থেকে বর্ণনা করেন—যে ব্যক্তি কোনো গণক কিংবা জ্যোতিষীর নিকট গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করল এবং তার বলা কোনো কথা বিশ্বাস করল তাহলে ৪০ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবুল হবে না।"[৮৮৯]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ، قَالَ: فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ، قَال، قُلْتُ: كُنَّا نَتَطَيَّرُ، قَالَ: ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ، فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ.

"হজরত মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! জাহেলি যুগে আমরা কিছু কাজ করতাম। যেমন, আমরা গণকের নিকট যেতাম। তখন নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, এখন আর গণকের নিকট যেয়ো না। আমি বললাম, আমরা কুলক্ষণ গ্রহণ করতাম। তখন নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, এটা হলো ওই খেয়াল যা তোমাদের অন্তরে উদয় হয়। কিন্তু এই কুলক্ষণ যেন তোমাদেরকে তোমাদের কোনো কাজ থেকে বিরত না রাখে।"[৮৯০]

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো গণক কিংবা জ্যোতিষীর নিকট যায় এবং তার কথাকে বিশ্বাস করে তাহলে সে ওই দ্বীনের সঙ্গে কুফরি করল যে দ্বীন মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।"[৮৯১]

এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো গণক কিংবা জ্যোতিষীর নিকট যায় এবং তার কথাকে বিশ্বাস করে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে।

---

[৮৮৯]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২২৩০

[৮৯০]. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৫৮১৩

[৮৯১]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩৯০৪; *সুনানে তিরমিযি*, হাদিস নং ১৩৫; *ইবনু মাজাহ*, হাদিস নং ৬৩৯। সনদ সহিহ।

আজকাল কত কবিরাজ রয়েছে যারা গণক ও জ্যোতিষীর মতো গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ জানার দাবি করে। আর মানুষ তা বিশ্বাসও করে। এবার বলুন তো তাদের ঈমানের অবস্থা কি হবে? এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকা চাই।

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قالت: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّيْءِ، فَنَجِدُهُ حَقًّا، قَالَ: تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ.

“হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবিজি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! গণক আমাদের এমন কিছু কথা বলে যা আমরা সত্যিই পেয়ে থাকি। তখন নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—জিনেরা কোনো একটি কথা কোথাও পেলে তা তাদের বন্ধুদের (গণক ও জ্যোতিষী) নিকট বলে দেয়। আর তারা এর সঙ্গে শত মিথ্যা মিলিয়ে মানুষকে বলে থাকে।”[৮৯২]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—গণক ও জ্যোতিষীরা শত মিথ্যা মিলিয়ে মানুষকে বলে থাকে।

৭. জিন দূর করা

মানুষ বলে, কবিরাজ জিন দূর করে থাকে। কিন্তু কীভাবে দূর করে আমার তা জানা নেই। আর না এ সম্পর্কে কোনো হাদিস আছে অথবা না কোনো সাহাবির বাণী আমি পেয়েছি। আমার এটাও জানা নেই—জিন কারও ওপর ভর করে কি না। শুধু এমনিতেই গুজব ছড়িয়ে থাকে। এজন্য এ ব্যাপারে আমি অক্ষম।

---

[৮৯২]. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২২২৮
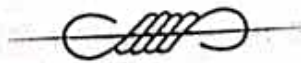
কবর বা মাজার জিয়ারত

এ আকিদা সম্পর্কে ২২টি আয়াত এবং ৪৩টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

পূর্ববর্তী জাতিসমূহ নিম্নের ৪টি বিষয়ে শিরকে লিপ্ত হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা তাদের ধ্বংস করেছেন। বিষয়গুলো হলো

১. আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যদের উপাস্য মানা।

২. আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যদের সামনে সিজদা করা।

৩. আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।

৪. আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যদের প্রয়োজন পূর্ণকারী মনে করা।

উপর্যুক্ত চারটি বিষয়ের প্রচলন হয়েছে এভাবে—প্রথম প্রথম নিজেদের মৃত বুজুর্গদের সম্মান করেছে। তারপর ধীরে ধীরে সিজদা করতে শুরু করেছে এবং তাতে লিপ্ত হয়ে গেছে।

নিজেদের বুজুর্গদের সম্পর্কে এ আকিদা পোষণ করে—তারা আমাদের কথা শুনেন এবং আমাদের সাহায্য করতে সক্ষম। এজন্য নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য তাদের মূর্তি বানিয়েছে। তারপর তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য তাদের সামনে নত হয়েছে। তারপর সিজদা করেছে এবং এভাবে ধীরে ধীরে তাদেরকে মাবুদ বা উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। আর এটা শিরক। যা আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না।

এজন্য আমাদের বুজুর্গদের এমন সম্মান করা উচিত নয় যা থেকে ধীরে ধীরে শিরকের সূচনা হয়।

হিন্দুদের প্রথাসমূহের ওপর চিন্তা-ভাবনা করুন

হিন্দুদের সকল প্রথাসমূহের ওপর চিন্তা-ভাবনা করুন। তাদের মূর্তি বানানো, মূতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা এবং মূর্তির সামনে পূজা করার ওপর চিন্তা-ভাবনা করুন। তাহলে এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে—তারা নিজেদের

বুজুর্গদের সীমাতিরিক্ত সম্মান করেছে। তারপর ধীরে ধীরে শিরকে লিপ্ত হয়েছে।

হিন্দুরাও এক আল্লাহকে মানে। যাকে তারা তাদের ভাষায় ঈশ্বর বলে। আর তাদের তাদের মধ্যে কোনো কোনো পণ্ডিত শুধু তাঁকেই মানে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক ঈশ্বরকে মানা সত্ত্বেও মূর্তির পূজা করে থাকে। এরা যত মূর্তি বানায় তা তাদের বুজুর্গদের সেবাই মনে করে।

তারা এটা জানে—এগুলো মাটির তৈরি মূর্তি। কিন্তু তাদের বিশ্বাস হলো, তাদের বুজুর্গদের রুহ বা আত্মা অথবা তাদের দেব-দেবীদের রুহ বা আত্মা এই মূর্তিসমূহের মধ্যে আসে। এরা তাদের কথা শুনে এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতাও করে থাকে। এরা তাদের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে। এজন্য তারা এ সকল মূর্তির পূজা করে এবং মন দিয়ে এদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। যাকে শরিয়তের পরিভাষায় শিরক বলে।

নবিজি ﷺ কবরকে মাত্রাতিরিক্ত সম্মান করতে নিষেধ করেছেন

যেহেতু আল্লাহ তাআলা এ বিষয়টি জানতেন—মুসলমানরাও নিজেদের বুজুর্গদের নিকট প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করবে অথবা তাদের মূর্তি বানাবে এবং তাদের সামনে সিজদা করবে, এজন্য নবিজি ﷺ কখনো কখনো কবরের নিকট যাওয়া অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু বারবার এই বলে সতর্ক করেছেন, কবরের নিকট সিজদা করবে না। কবরে শায়িত মৃতব্যক্তির নিকট প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করবে না। কবরকে মেলা বা অনুষ্ঠানের স্থান বানাবে না। কবরের ওপর ঘর বা মাজার বানাবে না। বরং শুধু কবরে শায়িত মৃতব্যক্তিকে সালাম দিয়ে তার জন্য দুআ করে চলে আসবে।

আসুন এ সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহর বিস্তারিত বিবরণ জানার চেষ্টা করি।

কবর কাকে বলে?

মৃতব্যক্তির দাফনের পর থেকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত যে সময়টুকু—সেটাকে কবর বলে। চাই মৃতব্যক্তি দেহ জমিনে হোক কিংবা জ্বালিয়ে ফেলা হোক অথবা তা কোনো প্রাণী খেয়ে ফেলুক এ সবগুলোকেই এই মৃতব্যক্তির কবর বলা হয়। আর এই সময়টিকে বরযখও বলা হয়। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّآ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

"অবশেষে যখন তাদের কারও মৃত্যু কাছে চলে আসে, সে বলে, হে আমার রব, আমাকে ফেরত পাঠান। যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ।"[৮৯৩]

এই আয়াতে বলা হয়েছে—মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে কবর থেকে উঠানো পর্যন্ত সময়কে বরযখ বলে। তখনকার অবস্থা দুনিয়ার অবস্থা থেকে ভিন্ন।

পরকালের স্মরণের উদ্দেশ্যে কবর বা মাজারে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে

কবরের নিকট গেলে যদি আখিরাত বা পরকাল ও মৃত্যুর স্মরণ হয়, তাহলে বুঝবে যে, এখানে আসার দ্বারা উপকার হয়েছে। আর যদি এখানে আসার উদ্দেশ্য হয়—নিছক শুধু বিনোদন অথবা আনন্দভ্রমণ করা কিংবা অর্থ উপার্জন করা, তাহলে এগুলোর কোনোটাই কবরের নিকট যাওয়ার উপকারিতা নয় এবং এ সকল উদ্দেশ্যে কবরের নিকট যাওয়া মোটেও উচিত নয়। এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর জিয়ারত করো। কেননা তা দুনিয়াবিমুখ বানায় এবং আখিরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৮৯৪]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ.

---

৮৯৩. সুরা মুমিন, ২৩: ৯৯-১০০

৮৯৪. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৫৭১। সনদ সহিহ।

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ তাঁর মায়ের কবর জিয়ারত করেন। তিনি কান্নাকাটি করেন এবং তাঁর সঙ্গের লোকদেরও কাঁদান। তারপর তিনি বলেন, আমি আমার রবের নিকট তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। আমি রবের নিকট তার কবর জিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দেন। অতএব, তোমরা কবর জিয়ারত করো। কেননা তা তোমাদের মৃত্যু স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৮৯৫]

এই হাদিসসমূহে তিনটি কথা রয়েছে। যথা :

১. প্রথম কথা হলো, কবরের নিকট যদি এমনিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কান্না চলে আসে, তাহলে এটা জায়েজ। চিৎকার করে কাঁদা জয়েজ নেই।

২. দ্বিতীয় কথা হলো, মাঝেমধ্যে কবর জিয়ারত করা উচিত। কেননা নবিজি ﷺ জীবনে একবার মায়ের কবর জিয়ারত করেছেন। তবে রাত-দিন সেখানে ভিড় লাগিয়ে রাখা উচিত নয়।

৩. তৃতীয় কথা হলো, একমাত্র মৃত্যুর স্মরণের জন্য কবর জিয়ারত করা। আনন্দভ্রমণের জন্য কবর জিয়ারত না করা।

বর্তমানে অনেক লোক বিনোদন ও আনন্দভ্রমণের জন্য কবর বা মাজার যায়। যা জায়েজ নেই।

কবর বা মাজারে যাওয়ার শর্ত ৭টি

নিম্নের ৭টি শর্তে কবর বা মাজারে যাওয়া যাবে। এ ছাড়া যাওয়া যাবে না। শর্তগুলো হলো,

১. আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারও ইবাদত করবে না।

প্রথম শর্ত হলো, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও ইবাদতই করবে না। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾

"বলো, নিশ্চয় আমাকে নিষেধ করা হয়েছে তাদের ইবাদত করতে, যাদের তোমরা ডাকো আল্লাহ ছাড়া।"[৮৯৬]

---

[৮৯৫]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৯৭৬; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ২০৩৪; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩২৩৪; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৫৭২; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৯৩৯৫

[৮৯৬]. সুরা আনআম, ৬: ৫৬

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾

“বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করো না।”[৮৯৭]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾

“তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করো না।”[৮৯৮]

আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾

“বলো, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করবে, যা তোমাদের জন্য কোনো ক্ষতি ও উপকারের ক্ষমতা রাখে না?”[৮৯৯]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾

“আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে।”[৯০০]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾

“অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই।”[৯০১]

এই ছয়টি আয়াতে একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করো। এজন্য অন্য আর কারও ইবাদত করা জায়েজ নেই।

---

[৮৯৭]. সুরা ইউসুফ, ১২: ৪০
[৮৯৮]. সুরা ফুসসিলাত, ৪১: ১৪
[৮৯৯]. সুরা মায়িদা, ৫: ৭৬
[৯০০]. সুরা বায়্যিনাহ, ৯৮: ৫
[৯০১]. সুরা তাওবা, ৯: ৩১

২. কবরবাসীর নিকট প্রার্থনা না করা।

দ্বিতীয় শর্ত হলো, কবরবাসীর নিকট প্রার্থনা না করা। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

"আপনারই আমরা ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট আমরা সাহায্য চাই।"[৯০২]

দিনে-রাতে ফরজ সালাত ১৭ রাকাত। আর এই ১৭ রাকাতে দৈনিক কমপক্ষে ১৭ বার একজন মুমিনকে দিয়ে বলানো হয়, আমরা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। এজন্য অন্য আর কারও ইবাদত করাও জায়েজ নেই এবং অন্য কারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাও জায়েজ নেই।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾

"আর তাঁকে ছাড়া তোমরা যাদের ডাকো তারা তোমাদের সাহায্য করতে পারে না এবং তারা নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না।"[৯০৩]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ﴾

"তবে কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? বরং তাকেই তোমরা ডাকবে।"[৯০৪]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

"আর নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে ডেকো না।"[৯০৫]

---

[৯০২]. সুরা ফাতিহা, ১: ৪

[৯০৩]. সুরা আরাফ, ৭: ১৯৭

[৯০৪]. সুরা আনআম, ৬: ৪০-৪১

[৯০৫]. সুরা জিন, ৭২: ১৮

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾

"আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা ডাকো তারা তোমাদের মতো বান্দা।"[৯০৬]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾

"আর আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকো তারা খেজুরের আঁটির আবরণেরও মালিক নয়।"[৯০৭]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾

"বলো, নিশ্চয় আমি আমার রবকে ডাকি এবং তার সঙ্গে কাউকে শরিক করি না।"[৯০৮]

এই সাতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে ডাকো। সুতরাং অন্য আর কাউকে ডাকা এবং তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা একদমই জায়েজ নেই। এজন্য কবর বা মাজারের নিকট গেলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য আর কারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে না এবং কবরবাসী চাই সে ওলি হোক কিংবা নবি হোক তার নিকটও সাহায্য প্রার্থনা করবে না।

বর্তমানে অনেক লোক মাজার ও কবরস্থানে শুধু কবরবাসীর নিকট প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করার জন্যই গিয়ে থাকে। এটা জায়েজ নেই। দান করার সত্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা "আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও নিকট প্রার্থনা করা" শিরোনামের অধীনে দ্রষ্টব্য।

৩. কবরের ওপর সিজদা না করা।

তৃতীয় শর্ত হলো, কবরের ওপর সিজদা না করা। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

---

[৯০৬]. সুরা আরাফ, ৭: ১৯৪
[৯০৭]. সুরা ফাতির, ৩৫: ১৩
[৯০৮]. সুরা জিন, ৭২: ২০

﴿لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ﴾

"তোমরা না সূর্যকে সিজদা করবে, না চাঁদকে। আর তোমরা আল্লাহকে সিজদা করো যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন।"[৯০৯]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا﴾

"সুতরাং তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করো এবং ইবাদত করো।"[৯১০]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ অন্তিম রোগশয্যায় ইরশাদ করেন, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের প্রতি আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক। কারণ তারা তাদের নবিগণের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে।"[৯১১]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا.

"হজরত আবু মারসাদ আল-গানাবি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা কবরের ওপর বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে না।"[৯১২]

আর এটা এজন্য ইরশাদ করেছেন যে, মানুষ কখনো যেন কবরবাসীকে উপাস্য মনে না করে বসে। এজন্য কবরের দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেও নিষেধ করেছেন। যেখানে কবরের দিকে ফিরে সালাত পড়তেও

---

[৯০৯]. সুরা ফুসসিলাত, ৪১: ৩৭

[৯১০]. সুরা নাজম, ৫৩: ৬২

[৯১১]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১৩৯০; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৫২৯; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ২০৪৭

[৯১২]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৯৭২; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩২২৯; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ১০৫০; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৭২১৬

নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে কবরকে সিজদা করা কীভাবে জায়েজ হতে পারে?

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ، فَقُلْتُ: رَسُولُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ، فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ.

"হজরত কায়েস ইবনে সাদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি (কুফার) আল-হিরা শহরে এসে দেখি, সেখানকার লোকেরা তাদের নেতাকে সিজদা করছে। আমি ভাবলাম, (তাহলে তো) রাসুল ﷺ-ই সিজদার অধিক হকদার। তারপর আমি নবিজি ﷺ-এর খেদমতে এসে বলি যে, আমি আল-হিরা শহরে গিয়ে দেখে এসেছি, সেখানকার লোকেরা তাদের নেতাকে সিজদা করে। সুতরাং হে আল্লাহর রাসুল! (ﷺ) আপনিই তো এর অধিক হকদার যে, আমরা আপনাকে সিজদা করি? তিনি বললেন, যদি (মৃত্যুর পর) তুমি আমার কবরের পাশ দিয়ে যাও তখন কি তুমি সেটাকে সিজদা করবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সাবধান! তোমরা এরূপ করবে না। আমি যদি কোনো মানুষকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে স্ত্রীদের নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীদের সিজদা করতে। কেননা আল্লাহ স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের অধিকার দিয়েছেন।"[৯১৩]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য আর কাউকে সিজদায়ে তাজিমি তথা সম্মানসূচক সিজদা করাও হারাম।

বর্তমান সময়ের চিত্র হলো, অনেক মাজার জিয়ারতকারী লোকেরা কবরের সামনে এ উদ্দেশ্যে সিজদা করে থাকে যে, যেন এই কবরবাসী ব্যক্তি এ ব্যাপারে সদয় হয় এবং তার দয়া-অনুগ্রহ লাভ হতে থাকে।

৪. পর্দার রক্ষা করে যাওয়া

চতুর্থ শর্ত হলো, পর্দার রক্ষা করে যাওয়া। কখনোই বেপর্দা অবস্থায় না যাওয়া। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

---

৯১৩. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২১৪০; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৮৫৩। সনদ সহিহ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَدْخُلُ دُفِنَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبِي، فَأَضَعُ ثَوْبِي، وَأَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ- فَوَاللهِ- مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ ثِيَابِي؛ حَيَاءً مِنْ عُمَرَ.

"হজরত আয়েশা রা. বলেন, আমার যে ঘরে নবিজি ﷺ-কে দাফন করা হয়েছে, আমি পর্দা ছাড়াও সেখানে প্রবেশ করে ফেলতাম। আমি ভাবতাম যে, এখানে তো আমার স্বামী এবং আমার পিতা রয়েছে। তারপর যখন হজরত উমর রা-কে তাদের সঙ্গে দাফন করা হলো, তখন হজরত উমর রা.-এর লজ্জার কারণে যখনই আমি সেখানে প্রবেশ করতাম, তখনই পরিপূর্ণ পর্দার সঙ্গে প্রবেশ করতাম।"[৯১৪]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—কবরের নিকট পর্দার সঙ্গে যাওয়া উচিত।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾

"আর মুমিন নারীদের বলো, যেন তারা তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজেদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারও কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।"[৯১৫]

এই আয়াতে বলা হয়েছে, মহিলারা যেন নিজের সৌন্দর্য অন্য কারও জন্য প্রকাশ না করে।

---

[৯১৪]. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২৫৬৬০। সনদ সহিহ।

[৯১৫]. সুরা নুর, ২৪: ৩১

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

"আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলি যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না।"[৯১৬]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

"হজরত আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন মহিলারা হচ্ছে আওরাত তথা আবরণীয় বস্তু। সে বাইরে বের হলে শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়।"[৯১৭]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নারীরা যখন সাজ-সজ্জা করে বের হয়, তখন শয়তান মানুষকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে যে, এই নারীকে দেখো।

পুরুষদেরকেও নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ﴾

"মুমিন পুরুষদের বলো, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র।"[৯১৮]

এই আয়াতে যেখানে পুরুষদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে নারীদের কীভাবে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে যে, তারা কবর বা মাজারসমূহে বেপর্দা অবস্থায় যাবে।

৫. কবর বা মাজারে বিলাপ না করা

পঞ্চম শর্ত হলো, কবর বা মাজারে বিলাপ তথা চিৎকার করে কান্নাকাটি না করা। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

---

৯১৬. সুরা আহযাব, ৩৩: ৩৩

৯১৭. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ১১৭৩। হাদিসটির সনদ হাসান।

৯১৮. সুরা নুর, ২৪: ৩০

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ، وَضَرَبَ الْخُدُودَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

"হজরত আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি (মৃত্যুশোকে) বুকের কাপড় ছিঁড়ে, মুখমণ্ডলে আঘাত করে এবং জাহেলি যুগের ন্যায় চিৎকার করে কান্নাকাটি করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৯১৯]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، وَأَبِي بُرْدَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَا: لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى، أَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللهِ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ فَأَفَاقَ، فَقَالَ لَهَا: أَوَ مَا عَلِمْتِ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَانَ يُحَدِّثُهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ، وَسَلَقَ، وَخَرَقَ.

"হজরত আবদুর রহমান বিন ইয়াজিদ ও আবু বুরদা রা. থেকে বর্ণিত তারা বলেন, আবু মুসা আশআরি রা. যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর, তখন তার স্ত্রী উম্মে আবদুল্লাহ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে আসে। তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে তাকে বললেন, তুমি কি জানো না, রাসুল ﷺ যার প্রতি অসন্তুষ্ট, আমিও তার প্রতি অসন্তুষ্ট। তিনি তার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি (মৃত্যুশোকে) মাথা মুণ্ডন করে, চিৎকার করে কান্নাকাটি করে এবং জামা ছিঁড়ে, আমি তার থেকে দায়মুক্ত।"[৯২০]

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ... قَالَ: لَا، وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، خَمْشِ وُجُوهٍ، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ.

"হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত... তিনি বললেন, না; বরং আমি দুটি নির্বোধসুলভ ও পাপাচারমূলক চিৎকার নিষেধ করেছি। বিপদের সময় চিৎকার করা, মুখমণ্ডলে আঘাত করা এবং জামার সম্মুখভাগ ছিঁড়ে ফেলা আর শয়তানের মতো (চিৎকার) কান্নাকাটি করা।"[৯২১]

---

৯১৯. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৫৮৪। সনদ সহিহ।
৯২০. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৫৮৬। সনদ সহিহ।
৯২১. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ১০০৫। সনদ হাসান।

এই হাদিসসমূহে চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। অনেক লোক মহররম মাস এলে এভাবে চিৎকার করে কান্নাকাটি করে থাকে।

৬. কবরবাসীকে সালাম দেবে এবং দুআ পাঠ করবে

ষষ্ঠ শর্ত হলো, মানুষ কবর বা মাজারে গিয়ে অনেক অনর্থক কথাবার্তা বলে অনর্থক কাজ করে থাকে। এজন্য সেখানে কোনো প্রকার অনর্থক কথাবার্তা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। শুধু কবরবাসীকে সালাম দেবে। তাদের জন্য ইস্তিগফার করবে। তাদের জন্য দুআ করবে এবং কুরআনুল কারিম ও দুআ ইত্যাদি পাঠ করে বখশে দেবে। আর মৃত্যুকে স্মরণ করবে এবং এই চিন্তা করবে যে, আমাকেও একদিন কবরস্থানে আসতে হবে। কবর বা মাজারের জন্য শুধু এই কাজগুলোই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আর বাকি কাজগুলো ওই রকমই। কবরবাসীকে সালাম দেওয়া ও তাদের জন্য দুআ করার ব্যাপারে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ.

“হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ মদিনার গোরস্তানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কবরবাসীর দিকে মুখ করে বললেন,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ.

অর্থাৎ হে কবরবাসী তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তাআলা আমাকে ও তোমাকে ক্ষমা করে দিন। তুমি আমাদের পূর্বসূরি এবং আমরা পরবর্তী সময়ে আগমনকারী।”[৯২২]

এই হাদিসে কবরবাসীকে সালাম দেওয়া ও তাদের জন্য দুআ করার কথা বলা হয়েছে।

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ.

---

৯২২. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১০৫৩। সনদ হাসান।

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর যে রাত্রির পালা আসত, সেই রাত্রির শেষ ভাগে নবিজি ﷺ জান্নাতুল বাকি নামক কবরস্থানে তাশরিফ নিয়ে যেতেন এবং বলতেন—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ.

অর্থাৎ সালাম তোমাদের ওপর হে ঘরওয়ালা মুমিনগণ! এসে গেছে তোমাদের নিকট তোমাদের সঙ্গে যার ওয়াদা ছিল। শীঘ্রই তোমাদের কর্মফল পেয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। হে আল্লাহ, জান্নাতুল বাকির অধিবাসীদের আপনি ক্ষমা করে দিন।"[৯২৩]

এই দুই হাদিসে দুটি কথা রয়েছে। এক তো হলো, কবরবাসীকে কীভাবে সালাম করবে। দ্বিতীয়ত হলো, তাদের জন্য ইস্তিগফার করা।

৭. কবরবাসীর জন্য ইস্তিগফার

সপ্তম শর্ত হলো, কবরবাসীর জন্য ইস্তিগফার করা। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ، وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.

"হজরত উসমান ইবনে আফফান রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ মৃতের দাফন শেষ করে সেখানে দাঁড়িয়ে বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য তোমরা ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং সে যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে সেজন্য দুআ করো। কেননা তাকে এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[৯২৪]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ.

"নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আমার রব আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে যান এবং তাদের জন্য ইস্তিগফার করুন। হজরত

---

[৯২৩]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৯৭৪; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ২০৩৯

[৯২৪]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩২২১। সহিহ।

আয়েশা রা. বলেন, আমি নবিজি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, কীভাবে তাদের জন্য দুআ করব? নবিজি ﷺ তখন বললেন, তাদের জন্য এভাবে দুআ করো,

اَلسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ.

অর্থাৎ সালাম তথা শান্তি বর্ষিত হোক হে ঘরওয়ালা মুমিন ও মুসলিমগণ! আল্লাহ তাআলা রহম করুন আমাদের থেকে পূর্বে চলে যাওয়া লোকদের ওপর। ইনশাআল্লাহ নিশ্চয় আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব।"[৯২৫]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ.

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর যে রাত্রির পালা আসত, সেই রাত্রির শেষ ভাগে নবিজি ﷺ জান্নাতুল বাকি নামক কবরস্থানে তাশরিফ নিয়ে যেতেন এবং বলতেন,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ.

অর্থাৎ সালাম তোমাদের ওপর হে ঘরওয়ালা মুমিনগণ! এসে গেছে তোমাদের নিকট তোমাদের সঙ্গে যার ওয়াদা ছিল। শীঘ্রই তোমাদের কর্মফল পেয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। হে আল্লাহ, জান্নাতুল বাকির অধিবাসীদের আপনি ক্ষমা করে দিন।"[৯২৬]

এই হাদিসে মৃতের জন্য ইস্তিগফার করতে বলা হয়েছে।

কবরবাসীকে সালাম করার জন্য কবরের দিকে ফিরা যাবে

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ.

---

৯২৫. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৯৭৪

৯২৬. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৯৭৪; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ২০৩৯

"হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ মদিনার গোরস্তানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কবরবাসীদের দিকে মুখ করে বললেন,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ.

অর্থাৎ হে কবরবাসী তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তাআলা আমাকে ও তোমাকে ক্ষমা করে দিন। তুমি আমাদের পূর্বসূরি এবং আমরা পরবর্তী সময়ে আগমনকারী।"[৯২৭]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—কবরবাসীকে সালাম করার জন্য নবিজি ﷺ মদিনার কবরের দিকে ফিরেছিলেন।

কবরের নিকট বসতে হলে মুখ কিবলামুখি করে বসবে

কবরের নিকট বসতে হলে মুখ কিবলামুখি করে বসা উচিত। যেন কেউ এটা মনে না করে যে, কবরবাসীর নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَجَلَسْنَا مَعَهُ.

"হজরত বারা ইবনে আজেব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে আনসারদের এক ব্যক্তির জানাজা পড়ার জন্য বের হলাম। আমরা সেখানে পৌঁছে দেখি, তখনো কবর খনন শেষ হয়নি। রাসুল ﷺ কিবলামুখি হয়ে বসলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বসে গেলাম।"[৯২৮]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি ﷺ কবরস্থানে কিবলামুখি হয়ে বসেছেন। আর আদব বা শিষ্টাচারের দাবিও এটাই।

সাধারণ অবস্থায় মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়া নিষেধ

সাধারণ অবস্থায় মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়া নিষেধ। কেননা তারা সেখানে গিয়ে বিলাপ করে এবং শরিয়তবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে যায়। তবে অন্যান্য হাদিসসমূহের কারণে কেউ কেউ কখনো মাঝেমধ্যে মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও পেছনে বর্ণিত সাতটি

---

[৯২৭]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ১০৫৩। সনদ হাসান।
[৯২৮]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩২১২। সনদ সহিহ।

শর্ত প্রযোজ্য। (হানাফি ফুকাহাদের অধিকাংশই শর্তসাপেক্ষে মহিলাদের কবর জিয়ারতকে জায়েয বলেছেন।)

হাদিস শরিফে মহিলাদের কবরস্থানে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ.

"হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ কবর জিয়ারতকারী মহিলাদের লানত তথা অভিসম্পাত করেছেন।"[৯২৯]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

"হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ কবর জিয়ারতকারী মহিলাদের ওপর, কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণকারীদের ওপর এবং কবরে বাতি জ্বালানো ব্যক্তিদের ওপর লানত তথা অভিসম্পাত করেছেন।"[৯৩০]

এই হাদিসে এসেছে, যে-সকল মহিলা কবর জিয়ারত করে তাদের ওপর নবিজি ﷺ লানত তথা অভিসম্পাত করেছেন। এজন্য সাধারণ অবস্থায় কবরস্থানে যাওয়া ঠিক নয়। তবে মাঝেমধ্যে কখনো গেলে অসুবিধা নেই।[৯৩১]

মহিলাদের জন্য মাঝেমধ্যে কবর জিয়ারতের অনুমতি রয়েছে

এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ.

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ কবর জিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন।"[৯৩২]

---

[৯২৯]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৫৭৫। সনদ হাসান।

[৯৩০]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩২৩৬; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩২০; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ২০৪৫। সনদ যইফ।

[৯৩১]. আহলে ইলমদের একদল বলে থাকেন, এসব নিষেধাজ্ঞার হাদিস ব্যাপকভাবে কবর জিয়ারতের অনুমতি দেওয়ার পূর্বেকার হাদিস।

[৯৩২]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৫৭০। সনদ সহিহ।

'অনুমতি দিয়েছেন' বাক্যটি থেকে বুঝা যায়—সর্বদা নয়; বরং কখনো মাঝেমধ্যে জিয়ারত করার অনুমতি রয়েছে।

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.

"হজরত সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন, আমি কবর জিয়ারত করতে তোমাদের নিষেধ করেছিলাম। মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে তাঁর মায়ের কবর জিয়ারত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কবর জিয়ারত করো। কেননা, তা আখিরাতের কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৯৩৩]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْحُبْشِيِّ، قَالَ: فَحُمِلَ إِلَى مَكَّةَ، فَدُفِنَ فِيهَا، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. হুবশী নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। পরে তাকে মক্কায় এনে এখানে কবর দেওয়া হলো। হজরত আয়েশা রা. মক্কায় এসে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা.-এর কবর জিয়ারতে গেলেন।"[৯৩৪]

এই হাদিস থেকে বুঝা গেল, মহিলারাও কখনো কখনো কবরস্থানে যেতে পারে।

কবরের ওপর কোনো প্রকার স্থাপনা নির্মাণ করা মাকরুহ বা নিষেধ

কবরের ওপর কোনো প্রকার স্থাপনা নির্মাণ করা মাকরুহ বা নিষেধ। তার দলিল হলো হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ.

---

[৯৩৩]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ১০৫৪। সনদ সহিহ।
[৯৩৪]. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১০৫৫। সনদ যইফ।

"হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কবর পাকা করতে, তার ওপর কোনো কিছু লিখতে বা কিছু নির্মাণ করতে এবং তা পদদলিত করতে নবিজি ﷺ নিষেধ করেছেন।"[৯৩৫]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

"হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কবর পাকা করতে, তার ওপর বসতে এবং তার ওপর স্তম্ভ নির্মাণ করতে নবিজি ﷺ নিষেধ করেছেন।"[৯৩৬]

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ.

"হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ কবরের ওপর কিছু নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।"[৯৩৭]

এই তিনও হাদিসেই কবরের ওপর স্থাপনা নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।

কবরের ওপর স্থাপনা নির্মাণকারীদের একটি দলিল

কেউ কেউ বলেন, মানুষের কুরআন পড়ার জন্য, অথবা দুআ করার জন্য কবরের নিকট ভবন নির্মাণ করা জায়েজ আছে। আর এর জন্য তারা কিছু বুজুর্গদের বাণী পেশ করে থাকে। কিন্তু তাতে নিম্নের ত্রুটিসমূহ বিদ্যমান। যথা :

ক. হাদিস শরিফে যেহেতু কঠোরভাবে নিষেধ রয়েছে, সুতরাং তারপর এ ক্ষেত্রে কোনো বুজুর্গের বাণী দ্বারা দলিল পেশ করা উচিত নয়।

খ. বর্তমানে খুব কমই কুরআন পড়ার জন্য বরং যশখ্যাতি, কাওয়ালি গাওয়া ও ঢোল-তবলা বাজানোর জন্যই কবরের নিকট অধিকাংশ ভবন নির্মাণ করে থাকে। সম্মানিত পাঠক! এর জন্য আপনি ইউটিউব ও ইন্টারনেট দেখলেই বুঝতে পারবেন।

গ. নবিজি ﷺ আশঙ্কা করেছেন, পূর্ববর্তী উম্মতদের ন্যায় এই উম্মতও কবর ও কবরবাসী সম্পর্কে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হয়ে যায়। এজন্য কবরের

---

[৯৩৫]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৫৬২; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ১০৫২। সনদ সহিহ।

[৯৩৬]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৯৭০

[৯৩৭]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৫৬৪। সনদ সহিহ।

ওপর কোনো প্রকার স্থাপনা নির্মাণ ও কবরের ওপর বাতি জ্বালাতে অনেক কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

নবিজি ﷺ-এর রওজা মুবারকের ওপর গম্বুজ কেন?

হাদিসের ভাষ্যমতে তো নবিজি ﷺ-এর রওজা মুবারকের ওপর ছাদ না হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রথম কথা হলো, নবিজি ﷺ-এর রওজা মুবারক হজরত আয়েশা রা.-এর কক্ষে ছিল। এজন্য পূর্ব থেকেই ছাউনি ছিল। আর এই ছাউনি অনেক বছর যাবৎ ছিল। পরবর্তী সময়ে দেখা গেল, বাহির থেকে যে লোকই বাহির আসে, সে কবরের নিকটই যেতে চায়। আর কিছু লোক সেখান থেকে মাটি পর্যন্ত নিতে লাগল। কেননা বাহিরের সকল লোক এতটা সুশিক্ষিত হয় না। এজন্য এর আশেপাশে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। যেন লোকজন সে পর্যন্ত যেতে না পারে এবং কোনো প্রকার অসম্মানজনক কাজে লিপ্ত হতে না পারে।

৫৫৭ হিজরি মোতাবেক ১১৬২ সালে সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-এর যুগে একটি ঘটনা ঘটে। তা হলো, কিছু ইহুদি নবিজি ﷺ-এর রওজা পর্যন্ত সুরঙ্গ খনন করে এবং নবিজি ﷺ-কে অপমানের চেষ্টা করে। এজন্য নুরুদ্দিন জিনকি রহ. রওজার আশেপাশে সিসা গলিয়ে তা দিয়ে মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করেন। যেন আর কোনো ইহুদি সুরঙ্গ খনন করতে না পারে।

এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে ৬৭৮ হিজরি মোতাবেক ১২৭৯ সালে সুলতান সাইফুদ্দিন কালায়ুন তার মেরামত করেন এবং কাঠের মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করেন। সঙ্গে ছাদও তৈরি করেন। যেন ওপর দিক থেকেও কেউ না আসতে পারে। আশপাশ থেকেও যেন কেউ ভেতরে যেতে না পারে এবং এর কোনো প্রকার ক্ষতি করতে না পারে। এজন্য এই অপারগতার কারণে নবিজি ﷺ-এর রওজা শরিফের আশপাশে কাঠের প্রাচীর ও ওপরে কাঠের ছাদ নির্মাণ করা হয়। আর না হয় হাদিস অনুযায়ী এর ওপরও কোনো প্রকার প্রাচীর কিংবা ছাদ না হওয়াই উচিত ছিল।

তখনকার সময়ে এই প্রাচীর ছিল কাঠের। এজন্য ৮৮৬ হিজরি মোতাবেক ১৪৮১ সালে এই প্রাচীরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। যার ফলে মিশরীয় সুলতান কাইতবাই ইট ও পাথর দিয়ে তা পুনর্নির্মাণ করে তার ওপর মজবুত গম্বুজ স্থাপন করেন। যেন কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। ওই সময় উক্ত প্রাচীরের সাদা রং দিয়ে রাঙানো হয়। তারপর ২য় অটোম্যান সুলতান

মাহমুদ ইবনে আবদুল হামিদ তাকে সবুজ রঙ্গে রঙিন করেন। যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান।

কবরের ওপর কোনো প্রকার স্থাপনা নির্মাণ করো না। এই হাদিসের ওপর আমল করে আজও পর্যন্ত নবিজি ﷺ-এর কবর এবং হজরত আবু বকর রা. ও হজরত উমর রা.-এর কবর মাটিরই রাখা হয়েছে এবং তার ওপর কাঁকর ছিটিয়ে রাখা হয়েছে। তবে মানুষের নিকট থেকে হেফাজতের উদ্দেশ্যে দূরে প্রাচীর ও ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে।

নবিজি ﷺ-এর কবর এবং হজরত আবু বকর রা. ও হজরত উমর রা.-এর কবর যে মাটিরই রাখা হয়েছে তার দলিল হলো এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ الْقَاسِمِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ: يَا أُمَّهْ، اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ، لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لَاطِئَةٍ، مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ.

"হজরত কাসিম রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হজরত আয়েশা রা.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ফুফু! আমাকে রাসুল ﷺ ও তাঁর দুই সাথির কবর খুলে একটু দেখান। তিনি তিনটি কবরই আমাকে (পর্দা) খুলে দেখালেন। আমি দেখি যে, তা খুব উঁচুও নয়, আবার একেবারে সমতলও নয়। কবর তিনটির ওপর আল-আরসা নামক স্থানের লালা কাঁকর বিছানো ছিল।"[৯৩৮]

এজন্য নবিজি ﷺ-এর কবরের চতুষ্পার্শের প্রাচীর দ্বারা অন্যদের কবরের ওপর স্তম্ভ এবং গম্বুজ বানানোর বিষয়ে দলিল দেওয়া উচিত নয়। এটা হাদিসের খেলাফ।

কবর অনেক উঁচু করাও মাকরুহ বা নিষিদ্ধ

কবর অনেক উঁচু করাও ঠিক নয়। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ.

---

৯৩৮. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩২২০। হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ তাফাররুদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এবং এর সনদ হাসান ও সালেহ। অনেকে এই সনদের রাবি 'আমর ইবনু উসমান'-কে মাজহুলুল হাল হওয়ার অভিযোগ তুলে যইফ বলেছেন। তবে অনেক মুহাদ্দিসগণ তাকে রিজালশাস্ত্রে মাকবুল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

"হজরত আবুল হাইয়াজ আল-আসাদি রহ. বলেন, হজরত আলি রা. আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমাকে সেই কাজের জন্য প্রেরণ করব না? যে কাজের জন্য আল্লাহর নবি ﷺ আমাকে প্রেরণ করেছিলেন। অর্থাৎ তা হলো, কোনো ছবি কিংবা ভাস্কর্য না ভেঙে অবশিষ্ট রাখবে না এবং কোনো উঁচু কবর ভেঙে সমান করা ব্যতীত অবশিষ্ট রাখবে না।"[৯৩৯]

এই হাদিসে বলা হয়েছে—উঁচু কবরকে ভেঙে সমান করে দাও। এজন্য কবর উঁচু রাখাও ঠিক নয়। সুতরাং কবরকে পাকা করে উঁচু করা ভালো কাজ নয়।

কেউ কেউ বলেছেন, এটা কাফিরের কবরের ব্যাপারে সমান করার নির্দেশ ছিল। কিন্তু এই ব্যাখ্যা এজন্য সঠিক নয় যে, এই হাদিসে কোনো কবরকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং সকল কবরের জন্য ব্যাপকভাবেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কবরের আশেপাশে মসজিদ নির্মাণ করাও মাকরুহ বা নিষিদ্ধ

এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

"হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ কবর জিয়ারতকারী মহিলাদের ওপর, কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণকারীদের ওপর এবং কবরে বাতি জ্বালানো ব্যক্তিদের ওপর লানত তথা অভিসম্পাত করেছেন।"[৯৪০]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ.

---

[৯৩৯]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৯৬৯; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৭৪১

[৯৪০]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩২৩৬; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩২০; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ২০৪৫। সনদ যইফ।

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, হজরত উম্মে সালামা রা. রাসুল ﷺ-এর নিকট তাঁর হাবশায় দেখা মারিয়া নামক একটা গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। তিনি সেখানে যেসব প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন, সেগুলোর বর্ণনা দিলেন। তখন রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন, এরা এমন সম্প্রদায় যে, এদের মধ্যে কোনো সৎ বান্দা অথবা বলেছেন কোনো সৎ লোক মারা গেলে তার কবরের ওপর তারা মসজিদ বানিয়ে নিত। আর তাতে ওই সব ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি স্থাপন করত। এরা আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম সৃষ্টজীব।"[৯৪১]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, কবরের নিকট মসজিদ বানানোও মাকরুহ বা নিষেধ। কিন্তু কিছু লোক অযথাই এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে।

কবরের ওপর বাতি জ্বালানোও মাকরুহ বা নিষিদ্ধ

এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

"হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ কবর জিয়ারতকারী মহিলাদের ওপর, কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণকারীদের ওপর এবং কবরে বাতি জ্বালানো ব্যক্তিদের ওপর লানত তথা অভিসম্পাত করেছেন।"[৯৪২]

বর্তমানে মানুষ কবর ও মাজারে কি পরিমাণ বাতি জ্বালায় এবং কত রংবেরঙের ঝাড়বাতি জ্বালায় এবং তাকে সাওয়াবের কাজ মনে করে থাকে।

কবরের ওপর ফুল দেওয়াও মাকরুহ বা নিষিদ্ধ

নবিজি ﷺ অথবা সাহাবায়ে কেরাম কখনো কোনো কবরে ফুল দেননি।

এটা হিন্দুদের তরিকা। তারা তাদের মূর্তি ও প্রতিমাসমূহকে ফুল দিয়ে এদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে থাকে। আমাদের জন্য হিন্দুদের এই তরিকা অবলম্বন করা উচিত নয়।

---

[৯৪১]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪৩৪

[৯৪২]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩২৩৬; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩২০; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ২০৪৫। সনদ যইফ।

কেউ কেউ নিম্নের হাদিসটি দিয়ে কবরের ওপর ফুল দেওয়ার দলিল দিয়ে থাকেন—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

"হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ এমন দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে কবর দুটির বাসিন্দাদের ওপর আজাব দেওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি ইরশাদ করেন, এদের দুজনকে আজাব দেওয়া হচ্ছে অথচ তাদের এমন গুনাহর জন্য আজাব দেওয়া হচ্ছে না (যা হতে বিরত থাকা) দুরুহ ছিল। তাদের একজন পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না, আর অপরজন চোগলখুরি করে বেড়াত। তারপর তিনি খেজুরের একটি তাজা ডাল নিয়ে তা দুভাগে বিভক্ত করলেন, তারপর প্রতিটি কবরে একটি করে পুঁতে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কেন এরূপ করলেন? তিনি বললেন, ডাল দুটি না শুকানো পর্যন্ত আশা করি তাদের আজাব হালকা করা হবে।"[৯৪৩]

এই হাদিসে নবিজি ﷺ বলেন, কবরবাসীর ওপর আজাব হচ্ছে। তাই নবিজি ﷺ খেজুরের ডাল পুঁতে দিয়েছেন এবং বলেছেন, ডাল দুটি না শুকানো পর্যন্ত আশা করি তাদের আজাব হালকা করা হবে।

কিন্তু এতে দেখার বিষয় হলো, নবিজি ﷺ জীবনে মাত্র একবারই এমনটি করেছেন। এজন্য সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটা নবিজি ﷺ-এর বরকতেই আজাব হালকা হবে। এজন্য কি এটা জরুরি যে, আমাদের পুঁতার দ্বারাও আজাব কমে যাবে? দ্বিতীয়ত নবিজি ﷺ পুঁতেছেন খেজুরের ডাল। আর আমরা দিই ফুল। আর ফুল দেওয়া হলো হিন্দুদের তরিকা। তারাও তাদের মূর্তিদের ফুল দিয়ে থাকে। এজন্য এটা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম।

আজকাল কবরের ওপর একটি ফুল দেওয়া হয় না বরং এটা মাজারসমূহের একটি ব্যবসায় পরিণত হয়েছে এবং এর দ্বারা অসংখ্য লোক ব্যবসা করছে। ভেবে দেখুন উভয়টির মাঝে কত বড় পার্থক্য।

---

[৯৪৩]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১৩৬১; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৯২; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ২০৬৮

গারায়েবুল ফতোয়া গ্রন্থের একটি ফতোয়া

কেউ কেউ এই ফতোয়া পেশ করে থাকে। কিন্তু এই ফতোয়া এজন্য গ্রহণীয় নয়—ফতোয়ায়ে হিন্দিয়ার লেখক 'গারায়েব' কোনো একটি গ্রন্থ থেকে ফতোয়া বর্ণনা করেছেন এবং তাতে কোনো হাদিস পেশ করেননি। গরায়েব গ্রন্থের ফতোয়াটি হলো—

وضع الورد والرياحين على القبور حسن و ان تصدق بقيمة الورد كان احسن كذا في الغرائب.

অর্থাৎ কবরের ওপর গোলাপ ফুল অথবা সুগন্ধি রাখা উত্তম। আর যদি তার মূল্য সাদকাহ করা আরও উত্তম। গারায়েব গ্রন্থে এমনটিই লেখা আছে।[১৪৪]

এই মূলপাঠে দেখুন, কোনো হাদিস উল্লেখ করেননি এবং গুরুত্বপূর্ণ কোনো গ্রন্থের সূত্রও উল্লেখ করেননি। এটা তো গারায়েব গ্রন্থের একটি ইবারত বা মূলপাঠমাত্র। এজন্য এই ফতোয়া সঠিক নয়। বিশেষ করে বর্তমানে এটা অনেক বড় একটি ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

কবরের ওপর কোনো কিছু লেখাও ঠিক নয়

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيْءٌ.

"হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ কবরের ওপর কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন।"[১৪৫]

এই হাদিসের ভাষ্যমতে কবরের ওপর কোনো কিছু লেখা নিষেধ।

কবরের ওপর পাথরের চিহ্ন রাখা জায়েজ

কবরের ওপর কোনো চিহ্ন-জাতীয় বস্তু রেখে দেওয়ার যার দ্বারা চেনা যায় যে, এটা অমুকের কবর। এটা সামান্য সুযোগ আছে। তবে এটাকে ব্যাপক প্রচলন বানানো যাবে না। এর দলিল হলো, হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِصَخْرَةٍ.

---

[১৪৪]. *ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া*, ৫/৩৫১

[১৪৫]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৫৬৩। সনদ সহিহ।

"হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ হজরত উসমান ইবনে মাযঊন রা.-এর কবর একটি পাথর দিয়ে চিহ্নিত করে রাখেন।"[৯৪৬]

কবরের দিকে ফিরে সালাত পড়া জায়েজ নেই

কবরের দিকে ফিরে সালাত পড়াও জায়েজ নেই। তাহলে কবরের সামনে সিজদা করা কীভাবে জায়েজ হয়?

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا.

"হজরত আবু মারসাদ আল-গানাবি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা কবরের ওপর বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে না।"[৯৪৭]

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো, কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করাও জায়েজ নেই। যেন মানুষ এটা মনে না করে যে, এটা কবরবাসীর ইবাদত করা হচ্ছে।

কবরের ওপর বসা মাকরুহ বা নিষিদ্ধ

কবরের ওপর বসার দ্বারা কবরবাসীর অপমান হয়। এজন্য কবরের ওপর বসাও মাকরুহ বা নিষেধ। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا.

"হজরত আবু মারসাদ আল-গানাবি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—তোমরা কবরের ওপর বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে না।"[৯৪৮]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

---

[৯৪৬]. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৫৬১। সনদ হাসান।

[৯৪৭]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৯৭২; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩২২৯; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ১০৫০; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৭২১৬

[৯৪৮]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৯৭২; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩২২৯; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ১০৫০; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৭২১৬

"হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কবর পাকা করতে, তার ওপর বসতে এবং তার ওপর স্তম্ভ নির্মাণ করতে নবিজি ﷺ নিষেধ করেছেন।"[৯৪৯]

কবরকে পদদলিত করা মাকরুহ বা নিষিদ্ধ

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ.

"হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কবর পাকা করতে, তার ওপর কোনো কিছু লিখতে বা কিছু নির্মাণ করতে এবং তা পদদলিত করতে নবিজি ﷺ নিষেধ করেছেন।"[৯৫০]

কবরের ওপর দিয়ে চলাচলের প্রয়োজন হলে জুতা খুলে চলাচল করবে

কবরের ওপর দিয়ে চলাচলের প্রয়োজন হলে জুতা খুলে চলাচল করবে। যেন কবরের অসম্মান না হয়। কিন্তু সেখানে যদি লতাপাতা ইত্যাদির কারণে চলা সম্ভব না হয়, জুতা পরিধান করতে পারবে। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

أَنَّ بَشِيرَ ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ شَرًّا كَثِيرًا، ثُمَّ مَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ، فَرَأَى رَجُلًا يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ فِي نَعْلَيْهِ، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِهِمَا.

"হজরত বশির ইবনে খাসাসিয়া রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একবার নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে চলতেছিলাম। তিনি মুসলমানদের কবরস্থানে গিয়ে বললেন যে, এরা বহু মন্দ কাজ পরিত্যাগে অগ্রগামী হয়েছে। তারপর তিনি মুশরিকদের একটি কবরস্থানে গিয়ে বললেন যে, এরা বহু মঙ্গলময় কাজ পরিত্যাগে অগ্রগামী হয়েছে। তারপর তিনি অন্যদিকে লক্ষ করে দেখলেন যে, এক ব্যক্তি জুতা পায়ে কবরস্থানের মাঝখান দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে।

---

[৯৪৯]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৯৭০

[৯৫০]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৫৬২; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ১০৫২। সনদ সহিহ।

তখন তিনি বললেন, হে পাকা জুতা পরিধানকারী! জুতা খুলে ফেলে দাও (খুলে নাও)।"[৯৫১]

এই হাদিসে নবিজি ﷺ বলেন, জুতা খুলে কবরস্থানে চলাচল করো।

বি.দ্র. السِّبْتِيَّتَيْنِ বলা হয় চামড়ার জুতাকে।

মৃত্যুব্যক্তির পরিবারের জন্য খাবার রান্না করে খাওয়ানো সুন্নত

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ، أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ.

"হজরত আবদুল্লাহ বিন জাফর রা. থেকে বর্ণিত, জাফর রা.-এর শহিদ হওয়ার সংবাদ এসে পৌঁছলে রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন—তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খাদ্য তৈরি করো। কেননা তাদের ওপর এমন বিপদ অথবা বিষয় এসেছে যা তাদের ব্যস্ত রেখেছে।"[৯৫২]

এই হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী মৃতের ঘরে খাবার পাঠানো উচিত।

কিন্তু বর্তমানের অবস্থা হলো, যার ঘরে কেউ মারা যায় তার ঘরে খাবার পাঠাবে তো দূরের কথা, উলটো আরও তার ঘরে তার সকল আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশী সবাই মিলে এ পরিমাণ খায় যে, সেই ঘরের লোকদের খাবারের অভাব হয়ে যায়।

মৃতের বাড়িতে খানা খাওয়া মাকরুহ বা নিষিদ্ধ

বর্তমানে ইসালে সাওয়াবের নামে এ পরিমাণ খরচ করানো হয়, মৃতের ওয়ারিশগণ অভাবে পড়ে যায়। অথচ ইসালে সাওয়াব করা একটি মুস্তাহাব কাজ এবং তা একান্তই ওয়ারিশদের ঐচ্ছিক বিষয়। যখন ইচ্ছা স্বেচ্ছায় কিছু গরিব-গুরাবাকে গোপনে আহার করিয়ে দেবে অথবা বস্ত্র দান করবে। আর এর সাওয়াব মৃতের রূহে পৌঁছে দেবে। এই সাওয়াবটুকুই মৃতের নিকট পৌঁছে থাকে।

এজন্য সময় নির্ধারণ করা কিংবা ঘোষণা দেওয়া জরুরি নয়। কেননা গরিব-গুরাবাকে চুপিসারে আহার করাতে হবে। কিন্তু আমি দেখেছি, অনেক গরিব লোকের মা অথবা অন্য কোনো আত্মীয়স্বজন মারা গেলে সমাজের কিছু

---

[৯৫১]. *সুনানে নাসায়ি* হাদিস নং ২০৫০

[৯৫২]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৬১০

বিত্তশালী মানুষ তাদের এমনভাবে বাধ্য করে যে, তারা সুধী মহাজন থেকে সুদের বিনিময়ে ঋণ করে সমাজের লোকদের খানা খাওয়াতে হয়। এজন্য হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نَرَى الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ.

"হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালি রা. থেকে বর্ণিত, মৃতের বাড়িতে ভিড় জমানো ও তাদের ঘরে খাদ্য প্রস্তুত করানোকে বিলাপের অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ বিলাপের মতোই নিষিদ্ধ) মনে করতাম।"[৯৫৩]

এই হাদিসে এসেছে, আমরা মৃতের জন্য বিলাপ করাকে যেমন নাজায়েজ মনে করতাম ঠিক তেমনই মৃতের ঘরে খাদ্য প্রস্তুত করানোকেও নাজায়েজ মনে করতাম।

মৃতের জন্য অনেক বেশি ঘোষণা করাও ঠিক নয়

মৃতের জন্য যদি অনেক বেশি ঘোষণা করা হয়, তাহলে তার এখানে ভিড় বেশি হবে এবং তা সামলানো কঠিন হবে। এজন্য শরিয়ত এই সীমানা নির্ধারণ করেছেন—মৃতের বাড়িতে যেন অধিক ভিড় না হয়। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَالنَّعْيُ أَذَانٌ بِالْمَيِّتِ.

"হজরত আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, সাবধান! তোমরা মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা থেকে নিবৃত্ত থাকো। যেহেতু এটা জাহিলি যুগের কাজ। আবদুল্লাহ রা. বলেন, 'نَعْيٌ' শব্দের অর্থ হলো, মৃত্যুর সংবাদ ঢালাওভাবে ঘোষণা করা।"[৯৫৪]

এই হাদিসে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে মানুষের মাঝে মৃতের মৃত্যুর ঘোষণা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ! সাধারণভাবে জানাজার সংবাদ দেওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু অনেক বেশি ভিড় জমানো ঠিক নয়।

---

[৯৫৩]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৬১২। সনদ সহিহ।

[৯৫৪]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৯৮৪; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, ১৪৮৬। সনদ যইফ। তবে এই মর্মে আরও বর্ণনা পাওয়া যায়।

বর্তমানের অবস্থা হলো, যার কেউ মারা যায়, তার ঘরে মেহমানগণ একত্রিত হতে থাকে এবং ঘরের লোকদের কোনো কাজ করাই কঠিন হয়ে যায় এবং অনেক খরচাপাতি করতে হয়।

তিন দিনের অধিক শোক পালন করা নিষেধ

স্বামী মারা গেলে স্ত্রী চার মাস ১০ দিন শোক পালন করবে। তাকে ব্যতীত অন্যান্য লোকদের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা নিষেধ। হাদিস শরিফে তা নিষেধ করা হয়েছে।

এরা যারা ৪০ দিন পর্যন্ত শোক পালন করে থাকে অথবা প্রতিবছর শোক পালন করে থাকে এবং খুব হইচই করে থাকে; এটা হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল। এজন্য হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"হজরত উম্মে আতিয়্যা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কোনো মৃতব্যক্তির জন্যে আমাদের তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হতে নিষেধ করা হতো। কিন্তু স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস ১০ দিন (শোক পালনের অনুমতি ছিল)।"[৯৫৫]

এই হাদিসে তিন দিনের অধিক শোক পালন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

কবরে গুনাহগারদের আজাব হয়ে থাকে

কবরের আজাব সত্য এবং উক্ত জীবনকে বরজখি জীবন বলা হয়। এর প্রমাণ হলো পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّآ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

"অবশেষে যখন তাদের কারও মৃত্যু আসে, সে বলে, হে আমার রব, আমাকে ফেরত পাঠান, যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরজখ।"[৯৫৬]

---

[৯৫৫]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩১৩; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৪৮৬

[৯৫৬]. সুরা মুমিনুন, ২৩: ৯৯-১০০

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

"আর ফিরাউনের অনুসারীদেরকে ঘিরে ফেলল কঠিন আজাব। আগুন, তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় তার সামনে উপস্থিত করা হয়, আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন ঘোষণা করা হবে) ফিরাউনের অনুসারীদের কঠোরতম আজাবে প্রবেশ করাও।"[৯৫৭]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُوْنَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْ أَيْدِيْهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ﴾

"আর যদি তুমি দেখতে, যখন জালিমরা মৃত্যুকষ্টে থাকে, এমতাবস্থায় ফেরেশতারা তাদের হাত প্রসারিত করে আছে (তারা বলে) তোমাদের জান বের করো। আজ তোমাদের প্রতিদান দেওয়া হবে লাঞ্ছনার আজাব।"[৯৫৮]

এই তিনও আয়াতে কবরের আজাবের দিকে ইঙ্গিত করে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا.

"হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সূর্য ডুবে যাওয়ার পর নবিজি ﷺ বের হলেন। তখন নবিজি ﷺ একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন, ইহুদিদের কবরে আজাব হচ্ছে।"[৯৫৯]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا...قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، زَادَ غُنْدَرٌ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ.

---

৯৫৭. সুরা গাফির, ৪০: ৪৫-৪৬

৯৫৮. সুরা আনআম, ৬: ৯৩

৯৫৯. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১৩৭৫

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত... আয়েশা রা. বলেন, এরপর থেকে নবিজি ﷺ কে এমন কোনো সালাত আদায় করতে দেখিনি, যাতে তিনি কবরের আজাব হতে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেননি। [এ হাদিসের বর্ণনায়] গুণদার রহ. অধিক উল্লেখ করেছেন যে, কবরের আজাব সত্য।"[৯৬০]

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

حَدَّثَتْنِي ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

"খালিদ ইবনে সাইদ ইবনে আসের কন্যা উম্মে খালিদ থেকে বর্ণিত, তিনি নবিজি ﷺ-কে কবরের আজাব থেকে আশ্রয় চাইতে শুনেছেন।"[৯৬১]

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ... قَالَ فَتُعَادُ رُوْحِهِ فِيْ جَسَدِهِ؛ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللّٰهُ.... تُعَادُ رُوحُهُ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ هَاهْ؛ لَا أَدْرِي.

"হজরত বারা ইবনে আজেব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে আনসার গোত্রের এক ব্যক্তির জানাজায় শরিক হওয়ার জন্য রওনা হয়ে কবরের নিকট গেলাম... নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, মৃতব্যক্তির শরীরে রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তার নিকট দুজন ফেরেশতা আসে। এসে উভয় ফেরেশতা মৃতব্যক্তিকে বসায়। বসিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার রব কে? সে তখন বলে, আমার রব আল্লাহ...

মৃতব্যক্তির শরীরে রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তার নিকট দুজন ফেরেশতা আসে। এসে উভয় ফেরেশতা মৃতব্যক্তিকে বসায়। বসিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার রব কে? সে তখন বলে, হায়! আমার তো জানা নেই।"[৯৬২]

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহে বর্ণিত হয়েছে—মানুষের কবরে আজাব হয়ে থাকে। আর এটাও জানা গেল যে, মানুষের এই জীবনকে বরজখি জীবন বলে।

---

৯৬০. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৩৭২

৯৬১. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৩৭৬

৯৬২. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৭৫৩; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৮০৬৩। সনদ সহিহ।

কবর বা মাজারে উরস করা জায়েজ নেই

এ আকিদা সম্পর্কে ২টি আয়াত এবং ১০টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

কবর বা মাজারে উরস করাটা ঈদ বা উৎসবের সাদৃশ্য হয়ে থাকে। আর নবিজি ﷺ কবর বা মাজারে ঈদ বা উৎসব করতে নিষেধ করেছেন। এজন্য এটাও জায়েজ নেই। এর দলিল হলো হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না (অর্থাৎ তাতে সালাত, তিলাওয়াত ও জিকির-আজকার না করা) এবং আমার কবরকে ঈদ তথা উৎসবের স্থানে পরিণত করো না। তোমরা আমার ওপর দরুদ পাঠ করো। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌছানো হবে।"[৯৬৩]

এই হাদিসে বলা হয়েছে—কবরকে ঈদ তথা উৎসবের স্থানে পরিণত করো না। আর উরস করাটা ঈদ বা উৎসবের সাদৃশ্য হয়ে থাকে। এজন্য এটা জায়েজ নেই।

উরসের ওপর দলিল পেশ করা ঠিক নয়

কেউ কেউ নিম্নের হাদিসটি দিয়ে উরস জায়েজ হওয়ার ওপর দলিল দিয়েছেন। হাদিসটি হলো—

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ.

---

[৯৬৩]. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২০৪২। সনদ সহিহ।

"হজরত মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম আত-তাইমি রহ. বলেন, নবিজি ﷺ বছরের শুরুতে শহিদদের কবরে নিকট গিয়ে পাঠ করতেন—

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

অর্থাৎ শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের ওপর, কারণ তোমরা সবর করেছ, আর আখিরাতের এ পরিণাম কতই-না উত্তম।

হজরত আবু বকর রা. ও হজরত উমর রা. এবং হজরত উসমান রা.-ও এমনটি করতেন।"[৯৬৪]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—নবিজি ﷺ প্রত্যেক বছরের শুরুতে উহুদের শহিদদের নিকট তাশরিফ নিয়ে যেতেন। এর দ্বারা কেউ কেউ দলিল পেশ করেছেন যে, প্রতিবছর একবার উরস করা জায়েজ আছে। কিন্তু এতে পাঁচটি ত্রুটি রয়েছে। যথা :

১. প্রথম কথা হলো, নবিজি ﷺ কোনো প্রকার ঘোষণা ছাড়াই যেতেন। আর এ কারণেই বিষয়টি কেউ জানতেন কেউ জানতেন না। আর এই হাদিস "বছরের শুরুতে যেতেন" সিহাহ সিত্তার কোনো হাদিস গ্রন্থে নেই এবং তাদের উস্তাদদের কোনো গ্রন্থেও নেই। শুধু *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক* গ্রন্থের লেখক তা উল্লেখ করেছেন।

এই হাদিস অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যদি কখনো কবরস্থানে যায় এবং শুধু السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ পাঠ করে ফিরে চলে আসে, তাহলে কারও কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এখানে তো যা ঘটছে তা হলো, তারিখ নির্ধারণ করা হয়। উরসের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। কয়েক মাস আগে থেকে তার ঘোষণা দেওয়া হয়। অসংখ্য লোকদের দাওয়াত দেওয়া হয় এবং এ পরিমাণ ভিড় হয়ে থাকে যে, হিন্দুদের মেলাও লজ্জিত হয়ে যায়। এর অবকাশ কীভাবে দেওয়া যেতে পারে?

২. দ্বিতীয় কথা হলো, এই হাদিসে তাবেয়ি নবিজি ﷺ-এর বাণী বর্ণনা করেছেন এবং মাঝখানে সাহাবির নাম ছেড়ে দিয়েছেন। (কেননা মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম আত-তাইমি রহ. হলেন একজন তাবেয়ি) এজন্য এই হাদিস মারফু নয় মুরসাল। সুতরাং এই হাদিসের মান নিম্ন পর্যায়ের।

---

[৯৬৪]. *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক*, ৩/৫৭৩ হাদিস নং ৬৭১৬। হাদিসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

৩. উরসের মধ্যে ঈদ তথা মিলনমেলা হয়ে থাকে। আর পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে—কবরস্থানে ঈদ তথা মিলনমেলা করতে নবিজি ﷺ নিষেধ করেছেন। তাহলে উরসের অনুমতি কীভাবে দেওয়া যেতে পারে?

৪. কখনো কোনো সাহাবি কিংবা তাবেয়ি উরস করেননি। তাহলে বর্তমানে উরস জায়েজ হয় কীভাবে?

৫. আসল কথা হলো, উরস হলো কিছু লোকের খাওয়া-দাওয়া ও পুরো বছরের খরচপাতি উঠানোর একটি ধান্ধামাত্র। আপনি নিজেও এ ব্যাপারে চিন্তা করে দেখুন।

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, নবিজি ﷺ কখনো কখনো শহিদদের কবরস্থানে যেতেন। কিন্তু তার জন্য কোনো দিন-তারিখ নির্ধারণ ছিল না।

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ الْهُدَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَ حَدِيثٍ وَاحِدٍ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُرِيدُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ، حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى حَرَّةِ وَاقِمٍ، فَلَمَّا تَدَلَّيْنَا مِنْهَا وَإِذَا قُبُورٌ بِمَحْنِيَّةٍ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقُبُورُ إِخْوَانِنَا هَذِهِ؟ قَالَ: قُبُورُ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا جِئْنَا قُبُورَ الشُّهَدَاءِ، قَالَ: هَذِهِ قُبُورُ إِخْوَانِنَا.

"হজরত রাবিআহ ইবনে হুদাইর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.-কে রাসুল ﷺ থেকে একটি হাদিস ছাড়া অন্য কোনো হাদিস বর্ণনা করতে শুনিনি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, তা কী? তিনি বললেন, আমরা রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে শহিদদের কবর জিয়ারতে রওনা হই। শেষ পর্যন্ত আমরা 'হাররা ওয়াকিমের' উঁচু টিলায় উঠি। আমরা সেখান থেকে নেমে উপত্যকায় বাঁকে কিছু কবর দেখলাম। তালহা রা. বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল (ﷺ)! এগুলা কি আমাদের ভাইদের কবর? তিনি বললেন, আমাদের সাথিদের কবর? তারপর আমরা শহিদদের কবরের কাছে এলে তিনি বললেন, এগুলো আমাদের ভাইদের কবর।"[৯৬৫]

এই হাদিস থেকে এতটুকু জানা গেল, নবিজি ﷺ মাঝেমধ্যে শহিদদের কবরে নিকট যেতেন।

---

৯৬৫. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২০৪৩। সনদ সহিহ।

কেউ কেউ ১১০০ এগারো বছর পরের বুজুর্গদের বাণী ও আমল থেকে উরস ও চেহলাম ইত্যাদি জায়েজের প্রমাণ পেশ করে থাকে। কিন্তু এটা মোটেও ঠিক নয়। কেননা অনেক পরের বুজুর্গদের আমল দ্বারা আকিদার মাসআলা প্রমাণিত হয় না। তা প্রমাণের জন্য সুস্পষ্ট আয়াত কিংবা বিশুদ্ধ হাদিস প্রয়োজন। তদুপরি এর বিপরীতে বেশ কয়েকটি হাদিসও পেশ করা হয়েছে। আর বর্তমানে এটা আখিরাতের স্মরণ ও দুনিয়াবিমুখতার বস্তু অবশিষ্ট নেই বরং শুধু আনন্দভ্রমণ ও বিনোদন এবং ধর্মের নামে লুটপাটের অনেক বড় একটি মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

গান-বাজনা ও ঢোল-তবলা বাজানো হারাম

সামান্য গান-কবিতা কিংবা নাত পাঠ করা জায়েজ। তবে তার জন্য শর্ত হলো, ঢোল-তবলা; গিটার ও হারমোনিয়াম ইত্যাদি কোনো প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজানো যাবে না। বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে কোনো গানই জায়েজ নেই। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

“আর মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বেহুদা কথা খরিদ করে, আর তারা ওইগুলোকে হাসি-ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আজাব।”[৯৬৬]

এই আয়াতে মানুষকে উদাসীন করে এমন কথাবার্তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾

“আর কাবার নিকট তাদের সালাত শিস ও হাত-তালি ছাড়া কিছু ছিল না। সুতরাং তোমরা আস্বাদন করো আজাব। কারণ তোমরা কুফরি করতে।”[৯৬৭]

কাফিররা বাইতুল্লাহর নিকট তালি ও শিস বাজাত। আল্লাহ তাআলা এদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। আর কাওয়ালির মধ্যেও এ ধরনের বস্তুই হয়ে থাকে। এজন্য তা থেকেও বেঁচে থাকা উচিত। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

---

৯৬৬. সুরা লুকমান, ৩১: ৬
৯৬৭. সুরা আনফাল, ৮: ৩৫

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَاللهِ مَا كَذَبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ، وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ.

"হজরত আবদুর রহমান ইবনে গানাম আশআরি রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট আবু আমের কিংবা আবু মালেক আশআরি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর কসম! তিনি আমার নিকট মিথ্যা কথা বলেননি। তিনি নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে।"[৯৬৮]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَزَامِيرَ وَالْكِنَّارَاتِ يَعْنِي الْبَرَابِطَ وَالْمَعَازِفَ وَالأَوْثَانَ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

"হজরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাকে গোটা দুনিয়ার জন্য রহমত ও হিদায়াত হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং এ নির্দেশ প্রদান করেছেন—বাঁশি, ঢোল, তবলা, বাদ্যযন্ত্র ও মূর্তিকে ঘুড়িয়ে দাও। জাহেলি যুগে যেগুলোর ইবাদত করা হতো।"[৯৬৯]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—ঢোল-তবলা ও বাদ্যযন্ত্র হারাম। তাহলে উরসের মধ্যে গান-বাজনা ও কাওয়ালি এবং বাদ্যযন্ত্র কীভাবে জায়েজ হয়?

চিৎকার করে গান-বাজনা করাও মাকরুহ বা নিষিদ্ধ

খেলাধুলা ও ক্রীড়া-কৌতুকের সময় চিৎকার করে যে গান-বাজনা করা হয়, হাদিসে সেটাকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ... وَلَكِنِّي نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ، صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَهْوٍ وَلَعِبٍ وَمَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ.

---

[৯৬৮]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৫৫৯০

[৯৬৯]. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২২২১৮। এই সনদে 'আলি ইবনু ইয়াযিদ' নামক রাবি যইফ। তবে মুসনাদে আহমাদের অন্যতম মুহাক্কিক হামযা আহমাদ আয যাইন এর সনদকে হাসান বলেছেন। (১৬/২৩৮ হাদিস নং ২২১১৯)

"হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. থেকে বর্ণিত... কিন্তু আমাকে দুটি পাপাচারমূলক চিৎকার নিষেধ করা হয়েছে। একটি হলো, খেলাধুলা ও ক্রীড়া-কৌতুকের সময়ের চিৎকার। আর অপরটি হলো, শয়তানের বাঁশির আওয়াজ।"[৯৭০]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, খেলাধুলা ও ক্রীড়া-কৌতুকের সময় চিৎকার করে যে গান-বাজনা করাও ঠিক নয়।

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ... قَالَ: لَا، وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، خَمْشِ وُجُوهٍ، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ.

"হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত... তিনি বললেন, না; বরং আমি দুটি নির্বোধসুলভ ও পাপাচারমূলক চিৎকার নিষেধ করেছি। বিপদের সময় চিৎকার করা, মুখমণ্ডলে আঘাত করা এবং জামার সম্মুখভাগ ছিঁড়ে ফেলা আর শয়তানের মতো (চিৎকার) কান্নাকাটি করা।"[৯৭১]

উপর্যুক্ত দুটি হাদিসেই গান-বাদ্যকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এজন্য মাজারে যে ঢোল-তবলা ও বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে যেসব গান-বাজনা করা হয় তা ঠিক নয়। আর বর্তমানে তো উরসে তরুণীরাও কাওয়ালি গাওয়ার জন্য এসে থাকে।

কাওয়ালিকে জায়েজ প্রমাণ করা

কেউ কেউ নিম্নের হাদিসসমূহ দ্বারা কেউ কেউ কাওয়ালিকে জায়েজ প্রমাণ করতে চান। এই প্রমাণ এজন্য ঠিক নয় যে, এতে শুধু নাত ও কবিতার আকৃতি রয়েছে। কোনো প্রকার ঢোল-তবলা ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল না। আর কাওয়ালিতে সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে। সুতরাং এটা কীভাবে জায়েজ হবে?

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: مَرَّ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُنْشِدُ، فَقَالَ: كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

---

[৯৭০]. *মুসতাদরাকে হাকেম*, ৪/৪৩ হাদিস নং ৬৮২৫। সনদ হাসান।

[৯৭১]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ১০০৫। সনদ হাসান।

اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: أَجِبْ عَنِّي اَللّٰهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، قَالَ: نَعَمْ.

"হজরত সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হজরত উমর রা. মসজিদে নববিতে আগমন করেন, তখন হাস্‌সান ইবনে সাবিত রা. কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। তখন তিনি বললেন, এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির (নবিজি ﷺ-এর) উপস্থিতিতেও আমি কবিতা আবৃত্তি করতাম। তারপর হজরত আবু হুরাইরা রা.-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি; আপনি কি আল্লাহর রাসুল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন যে, 'তুমি আমার পক্ষ হতে জবাব দাও। হে আল্লাহ, আপনি তাকে রুহুল কুদুস তথা হজরত জিবরাইল আ. দ্বারা সাহায্য করুন।' তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ।"[৯৭২]

এই হাদিসে কবিতা আবৃত্তি করার কথা তো রয়েছে কিন্তু এ কথাও রয়েছে যে, হজরত উমর রা. এটাকে অপছন্দ করেছেন। এ কারণে হজরত হাস্‌সান রা.-কে হজরত আবু হুরাইরা রা.-এর সাক্ষ্য নিতে হয়েছে। এজন্য কবিতা আবৃত্তি করা এতটা ভালো কাজ নয়।

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ حَسَّانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، ائْذَنْ لِي فِي أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: كَيْفَ بِقَرَابَتِي مِنْهُ؟ قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْخَمِيرِ، فَقَالَ حَسَّانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَإِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ - بَنُو بِنْتِ مَخْزُومٍ وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ، قَصِيدَتَهُ هَذِهِ.

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হজরত হাস্‌সান রা. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল (ﷺ)! আমাকে আবু সুফিয়ানের বদনাম করার অনুমতি দিন। (এই আবু সুফিয়ান হলো হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। নবিজি ﷺ-এর চাচাতো ভাই। যে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নবিজি ﷺ-এর বদনাম করত) তখন নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, সে তো আমার আত্মীয়। (সুতরাং তুমি কীভাবে তার বদনাম করবে?) তখন হাস্‌সান রা. বললেন, ওই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন। আপনাকে আমি তার

[৯৭২]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩২১২; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৪৮৫

বদনাম থেকে এমনভাবে বের করে আনব যেমনভাবে আটার খামিরা থেকে চুল বের করে আনা হয়। তারপর হাস্‌সান রা. এই কবিতা আবৃত্তি করেন—

وَإِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ - بَنُو بِنْتِ مَخْزُومٍ وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ

অর্থাৎ নিশ্চয় সম্মান ও গৌরব হাশিমের পরিবারের, যিনি মাখজুমের মেয়ের ঘরের পত্নী। আর তোমার বাবা হলো একজন দাস।"[৯৭৩]

এই হাদিসে হজরত হাস্‌সান রা.-কে নবিজি ﷺ কবিতা আবৃত্তির অনুমতি দিয়েছেন।

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى.

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, আবু বকর রা. তাঁর নিকট এলেন। এসময় মিনার দিনসমূহের একদিন তাঁর নিকট দুটি মেয়ে দফ বাজাচ্ছিল, নবিজি ﷺ তাঁর চাদরাবৃত অবস্থায় ছিলেন। তখন আবু বকর রা. মেয়ে দুটিকে ধমক দিলেন। তারপর নবিজি ﷺ মুখমণ্ডল হতে কাপড় সরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আবু বকর! ওদের বাধা দিয়ো না। কেননা এসব ঈদের দিন। আর সে দিনসমূহ ছিল মিনার দিন।"[৯৭৪]

এই হাদিস থেকে বুঝা গেল, মাঝেমধ্যে সামান্য কবিতা আবৃত্তি করা যাবে এবং বিনা উত্তেজনায় দফ বা তবলাও বাজানো যাবে।

কিন্তু হাদিসটির ওপর চিন্তাভাবনা করলে বুঝে আসে—সাহাবায়ে কেরাম এতটুকুও পছন্দ করতেন না। এজন্য হজরত আবু বকর রা. মেয়ে দুটিকে বাধা দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু ঈদের দিন ছিল এবং মেয়ে দুটোও ছিল ছোট বাচ্চা তাই নবিজি ﷺ সামান্য সুযোগ দিয়েছেন।

আমরা দেখি যে, উলামায়ে কেরামের মজলিসে ছাত্ররা কবিতা আবৃত্তি ও নাত পাঠ করে থাকে। আর তাতে কোনো প্রকার দফ বা তবলা ইত্যাদিও বাজানো হয় না। কোনো প্রকার হাত তালিও দেওয়া হয় না এবং কোনো

---

[৯৭৩]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৪৮৯

[৯৭৪]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৯৮৭; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৮৯২

রকম উত্তেজনাও তৈরি হয় না। তাই এতটুকু হাদিস অনুযায়ী জায়েজ আছে।

বুজুর্গানে দ্বীন ও উলামা-মাশায়েখও জিকির-আজকার করে ক্লান্ত হয়ে গেলে মনোরঞ্জনের জন্য কখনো মাঝেমধ্যে কবিতা, নাত ইত্যাদি শুনে থাকেন। যা হাদিস অনুযায়ী জায়েজ আছে।

পরবর্তী লোকেরা নিজেদের জীবিকা অর্জনের জন্য এটাকেই সামা সংগীত বানিয়েছেন। কাওয়ালি বানিয়েছেন। তারপর এতে সুর ও ঢোল-তবলা সবকিছু জুড়ে দিয়েছেন। যা কুরআন-হাদিসে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। তারপর সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র এমনভাবে জুড়ে দিয়েছেন—এখন হিন্দুদের মেলাও এর কাছে লজ্জিত। আফসোস!

এটিও একটি কথা বুঝতে হবে—হাদিসে যে সামান্য আবৃত্তি জায়েজ ছিল, তা আনন্দের মুহূর্তে গাওয়া হতো। অথবা বুজুর্গদের যেসব সামা সংগীত ছিল, তা হতো তাদের নিজেদের খানকায়। আর কাওয়ালি তো ঢোল-তবলা ও বাদ্যযন্ত্র সহকারে গাওয়া হয়। মূলত এ জায়গা হলো পরকালের কথা চিন্তাভাবনা করার জায়গা। তাই এখানে গান-বাজনা ও কাওয়ালি গাওয়ার আসর মোটেও বুঝে আসে না। এগুলো তো তাহলে হিন্দুদের মন্দিরে মূর্তির সামনে ভোজন গাওয়ার মতো হয়ে গেল।

হিন্দুরা তাদের বুজুর্গদের মন্দিরের নিকট মেলা বসিয়ে থাকে

হিন্দুরা প্রতিবছর তাদের বুজুর্গদের মন্দিরের নিকট মেলা বসিয়ে থাকে। তাতে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের আয়োজন করে। মূর্তির নিকট বিভিন্ন বস্তু কামনা করে প্রার্থনা করে। তাদের পূজা করে। তাদের সামনে মাথা ঝুঁকায় ও সিজদা করে। যা শিরক।

কবরের ওপর উরস তারই সদৃশ। এজন্য তা করা উচিত নয়।
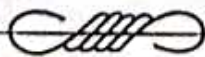
ফয়েজ বা বরকত হাসিল করা

এ আকিদা সম্পর্কে ৩টি আয়াত এবং ৪টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

কারও কাছ থেকে ফয়েজ বা বরকত হাসিল করা এ যুগে একটি ফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফয়েজ বা বরকত হাসিল করার পদ্ধতি দুটি। যথা :

১. জীবিতদের কাছ থেকে ফয়েজ বা বরকত হাসিল করা।

২. মৃতদের কাছ থেকে ফয়েজ বা বরকত হাসিল করা।

জীবিতদের কাছ থেকে ফয়েজ বা বরকত হাসিল করা

উস্তাদ কিংবা পিরের মধ্যে যদি নিম্নের ৩টি গুণ থাকে, তাহলে তাদের কাছ থেকে ফয়েজ বা বরকত হাসিল করা যায়। যথা :

১. প্রথম গুণ হলো, উস্তাদ কিংবা পির মুখলিস হতে হবে। তাদের একটাই উদ্দেশ্য হবে যে, মানুষের ইসলাহ বা সংশোধন করা এবং তাদের দ্বীনের ওপর আনা। আর এ ব্যাপারে একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করা। অর্থ উপার্জনের জন্য পির-মুরিদি না করা। তাদের উদ্দেশ্য এটা না হওয়া যে, ফয়েজ বা বরকত হাসিলের নামে পুরো বছরের ব্যয়ভার একত্র করা হবে এবং গোটা পরিবারের ব্যয়ভার কামিয়ে নেওয়া হবে অথবা খানকার নামে নিজের ঘর বানিয়ে ফেলা। যদি এ সকল উদ্দেশ্যে পির-মুরিদি করে, তাহলে তাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার ফয়েজ বা বরকত হাসিল হবে না।

২. উস্তাদ কিংবা পির নিজেও শরিয়তের খাঁটি অনুসারী হওয়া। আর যদি সে নিজেই ফরজ সালাত পড়ে না, সিয়াম পালন করে না, তাহলে আপনাকে কীসের ফয়েজ বা বরকত দেবে? তার নিজের কাছেই তো কিছু নাই।

৩. তার মধ্যে রিয়া বা লৌকিকতা না হওয়া। সে এ কাজটি যশখ্যাতির জন্য না করা। কেননা সে যদি মিডিয়া ও ইউটিউবে আসার জন্য এ কাজ করে,

তাহলে এটা যশখ্যাতির জন্যই। অথবা তার উদ্দেশ্য হলো এ কাজের দ্বারা তার পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। তাহলে আপনার কি উপকার হবে আর এতে কীসের ফয়েজ বা বরকত হাসিল হবে?

এজন্য আমার নিষ্ঠাপূর্ণ পরামর্শ হলো, পির নির্বাচন করতে খুব চিন্তাভাবনা করে ভালোভাবে জেনেবুঝে পির নির্বাচন করবে।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে চার প্রকার ফয়েজ বা বরকতের কথা উল্লেখ রয়েছে

পবিত্র কুরআনুল কারিমে চার প্রকার ফয়েজ বা বরকতের কথা উল্লেখ রয়েছে। যথা :

১. পির সাহেব মুরিদদের সামনে বিশুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং তাদের তিলাওয়াতও শুদ্ধ করবে।

২. তাদের পবিত্র কুরআনের অর্থ শিক্ষা দেবে।

৩. পবিত্র কুরআনুল কারিমে যে হিকমত রয়েছে অর্থাৎ হালাল-হারামের যে-সকল বিধান রয়েছে সেগুলো শিক্ষা দেবে।

৪. তাদের অন্তর-আত্মাকে তাজকিয়া বা পরিশুদ্ধ করবে। অর্থাৎ শিরক ইত্যাদি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

“হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করুন, যে তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে আর তাদের পবিত্র করবে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”[৯৭৫]

এই আয়াত অনুযায়ী নবিজি ﷺ চার কাজের জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

[৯৭৫]. সুরা বাকারা, ২: ১২৯

"অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদের পরিশুদ্ধ করে আর তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।"[৯৭৬]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾

"যেভাবে আমি তোমাদের মধ্যে একজন রাসুল প্রেরণ করেছি তোমাদের মধ্য থেকে, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তোমাদের পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। আর তোমাদের শিক্ষা দেয় এমন কিছু যা তোমরা জানতে না।"[৯৭৭]

এই আয়াতসমূহ থেকে বুঝা গেল, উস্তাদ কিংবা পির যদি মুখলিস তথা একনিষ্ঠ হয়, তাহলে চার প্রকারের ফয়েজ বা বরকত হাসিল হয়। যথা :

১. পির সাহেব মুরিদদের সামনে বিশুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং তাদের তিলাওয়াতও শুদ্ধ করবে।

২. তাদের পবিত্র কুরআনের অর্থ শিক্ষা দেবে।

৩. পবিত্র কুরআনুল কারিমে যে হিকমত রয়েছে অর্থাৎ হালাল-হারামের যে-সকল বিধান রয়েছে সেগুলো শিক্ষা দেবে।

৪. তাদের অন্তর-আত্মাকে তাজকিয়া বা পরিশুদ্ধ করবে। অর্থাৎ শিরক ইত্যাদি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে।

পির যদি ভালো হয় এবং মুরিদও যদি একাগ্রতার সঙ্গে ফয়েজ বা বরকত হাসিল করে, তাহলে মুরিদের কুরআনে বর্ণিত এই চার প্রকারের ফয়েজ বা বরকত হাসিল হয়ে থাকে।

কিছু লোক মনে করে—পির সাহেব মুরিদকে কোনো বিশেষ গোপনীয় বস্তু প্রদান করে থাকেন। আর মুরিদ তা অর্জন করার জন্য বছরের পর বছর পির সাহেবের খেদমত করে থাকে। কিন্তু কুরআন-হাদিস থেকে এমন কিছু মনে হয় না। বরং উপর্যুক্ত চারটি বিষয়ই অর্জন হয়।

---

[৯৭৬]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৬৪

[৯৭৭]. সুরা বাকারা, ২: ১৫১

يُزَكِّيكُمْ-এর তাফসির

কিছু লোক মনে করে—পির সাহেব মুরিদকে কোনো বিশেষ গোপনীয় বস্তু প্রদান করে থাকেন। তারা নিম্নের আয়াতটি দিয়ে দলিল দিয়ে থাকে। আয়াতটি হলো—

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾

"যেভাবে আমি তোমাদের মধ্যে একজন রাসুল প্রেরণ করেছি তোমাদের মধ্য থেকে, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তোমাদের পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। আর তোমাদের শিক্ষা দেয় এমন কিছু যা তোমরা জানতে না।"[৯৭৮]

এই আয়াতের ﴿وَيُزَكِّيكُمْ﴾ রাসুল তোমাদের পবিত্র করে বাক্যটি দ্বারা দলিল দিয়ে থাকে।

কিন্তু তাফসিরে ইবনে আব্বাস থেকে জানা যায়, এই কোনো গোপনীয় বস্তু প্রদানের অর্থ নেই। বরং يُزَكِّيكُمْ-এর অর্থ হলো, তাওহিদ শেখানোর মাধ্যমে শিরক ও অন্যান্য গুনাহ থেকে তোমাদের পবিত্র করে থাকে। যেমন তাফসিরে ইবনে আব্বাসে এসেছে—

وَيُزَكِّيهِمْ: يطهرهم بِالتَّوْحِيدِ من الشّرك وَيُقَال بِالزَّكَاةِ وَالتَّوْبَة من الذُّنُوب أَي يَدعُوهُم إِلَى ذَلِك.

অর্থ : মানুষকে আত্মশুদ্ধি করে। অর্থাৎ তাওহিদের মাধ্যমে পবিত্র করার চেষ্টা করে। কোনো কোনো মুফাসসির এটাও বলেছেন, পবিত্র করার অর্থ হলো গুনাহ থেকে তাওবা করায়। তাওবা করার দিকে মানুষকে আহ্বান করে।[৯৭৯]

এই তাফসিরে বলা হয়েছে—তাওহিদের মাধ্যমে মুরিদদের শিরক থেকে পবিত্র করার চেষ্টা করবে এবং গুনাহ থেকে তাওবা করানোর চেষ্টা করবে। এজন্য وَيُزَكِّيهِمْ-এর অর্থ এটা নয় যে, অন্তরের বিশেষ কোনো পরিচ্ছন্নতা

---

৯৭৮. সুরা বাকারা, ২: ১৫১

৯৭৯. *তাফসিরে ইবনে আব্বাস*, সুরা জুমার ২ নং আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

করবে। বরং এর অর্থ হলো শরিয়তে যে হালাল ও হারামের বিধানসমূহ রয়েছে, পির সাহেব সেগুলো শেখাবে। যেমনটি একজন উস্তাদ শিখিয়ে থাকেন।

পির যদি আল্লাহ ভীরু হয় তাহলে তার অনেক প্রভাব পড়ে

পির সাহেব যদি আল্লাহ ভীরু হয় ও একাগ্রতার সঙ্গে আত্মশুদ্ধির কাজ করেন এবং মুরিদও একাগ্রতার সঙ্গে মেহনত করে, তাহলে এর প্রভাব বেশি হয়। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا، ذُكِرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

"হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—আমি কি তোমাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কথা জানিয়ে দেবো না? তারা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল! তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যাদের দেখলে মহান আল্লাহ তাআলার স্মরণ হয়।"[৯৮০]

এই হাদিসে বলা হয়েছে—যাকে দেখে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ হয়, সেই হল ভালো লোক। এজন্য পির এমন আল্লাহওয়ালা হবেন, যাকে দেখে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ হয়।

উপর্যুক্ত চারটি উপকার তখনই হবে যখন পির সাহেব জীবিত হবেন এবং আপনি তার কাছ থেকে নিয়মিত সবক হাসিল করবেন। কিন্তু কারও যদি মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে সে এই উপকার করতে পারবে না। কেননা মৃত্যুর পরে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। হাদিসে এমনটিই বলা হয়েছে। এজন্য এখন সে উক্ত ফয়েজ বা বরকত দিতে পারবে না।

কবর বা মাজার এবং মৃতদের থেকে কেমন ফয়েজ বা বরকত হাসিল হয়

অনেক লোক মৃতদের থেকে ও মাজারসমূহ থেকে অনেক ফয়েজ বা বরকতের কথা বলে থাকেন। কিন্তু কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করলে জানা যায়—কবর বা মাজারে গেলে ৩টি ফয়েজ বা বরকত হাসিল হয়। যথা :

১. পরকালের কথা স্মরণ হয়।

২. অন্তর দুনিয়া থেকে উদাসীন হতে থাকে।

[৯৮০]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৪১১৯। সনদ সহিহ লি গাইরিহি।

৩. মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। অর্থাৎ এ কথা ভাবতে থাকে যে, এ সকল বড় লোকেরা যেভাবে দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে, কিছু দিন পর আমাকেও এভাবে এ সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে। এজন্য দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ জমা করে কি ফায়দা হবে। অথবা দুনিয়ার যশখ্যাতি লাভ করে কি করব।

যদি কবরস্থানে যাওয়ার পরে এই তিনটি বিষয় লাভ হয়, তাহলে তো উত্তম। আর যদি কবর হয় সুসজ্জিত, তার ওপর চলে দুনিয়াবি ক্রীড়া-কৌতুক এবং পরকাল স্মরণ হওয়ার পরিবর্তে সেখানে হয় বিনোদন ও দুনিয়ার লোভ-লালসা তৈরির স্থান। বরং মাজার হয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ও দুনিয়াবি ক্রীড়া-কৌতুকের একটি মাধ্যম, তাহলে এই কবর বা মাজারের কোনো ফয়েজ বা বরকত নেই। বরং তার ক্ষতি রয়েছে। কবর বা মাজার জিয়ারতের উপকারিতা সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে–

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—আমি তোমাদের কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর জিয়ারত করো। কেননা তা দুনিয়াবিমুখ বানায় এবং আখিরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৯৮১]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ তাঁর মায়ের কবর জিয়ারত করেন। তিনি কান্নাকাটি করেন এবং তাঁর সঙ্গের লোকদেরও কাঁদান। তারপর তিনি বলেন, আমি আমার রবের নিকট তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। আমি রবের নিকট তার কবর জিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দেন।

---

৯৮১. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৫৭১। সনদ সহিহ।

অতএব তোমরা কবর জিয়ারত করো। কেননা তা তোমাদের মৃত্যু স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৯৮২]

এই হাদিসসমূহে তিনটি উপকারিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা :

১. প্রথম উপকার হলো, দুনিয়ার প্রতি অনীহা তৈরি হয়ে যাবে।

২. দ্বিতীয় উপকার হলো, পরকাল স্মরণ হবে।

৩. তৃতীয় উপকার হলো, কবর বা মাজার দেখে নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ হবে যে, আমাকেও একদিন এই কবরে আসতে হবে।

এই হলো কবর বা মাজারে যাওয়ার ফয়েজ বা বরকত।

যদি কবর বা মাজারে গেলে এই তিনটি উপকার লাভ হয়, তাহলে উত্তম। কিন্তু যদি সেখানে যাওয়ার দ্বারা আপনার আনন্দ লাভ হয়, দুনিয়ার প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি হয় এবং আপনি সেখানে বিনোদনের জন্য যান, তাহলে এগুলো কবর বা মাজারের ফয়েজ নয়। এটা উলটো ফল। আর শরিয়তে এগুলোর জন্য কবর বা মাজার জিয়ারতের অনুমতি নেই। কিন্তু বহু লোক সেখানে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ও নিজের যশখ্যাতি লাভের আশ্চর্য রকমের ফয়েজ বা বরকত কথা উল্লেখ করেছেন যে, ওলিদের কাছ থেকে এই এই ফয়েজ বা বরকত লাভ হবে এবং এই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যাবে। হাদিসে তা উল্লেখ নেই।

পির সাহেব আপনাকে অভ্যন্তরীণ কোনো প্রাচুর্য এনে দেবে এমন নয়

কোনো কোনো পির সাহেব এমনটি বুঝিয়ে থাকে যে, আমার খেদমত করলে আমি তোমাকে অভ্যন্তরীণ প্রাচুর্য এনে দেবো। আর মুরিদ তা অর্জন করার জন্য বছরের পর বছর তার খেদমতে লেগে থাকে। তারা নিম্নের হাদিস দিয়ে দলিল দিয়ে থাকে। কিন্তু মনে রাখবেন—এই অভ্যন্তরীণ বস্তু প্রদানের ঘটনাটি শুধু একবারই ঘটেছে। যা ছিল মুজিযা। তারপর আর কখনো তা প্রকাশ পায়নি। না হয় পির তার সন্তানকেই প্রথম এই অভ্যন্তরীণ প্রাচুর্য এনে দিত। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ... وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَوْمًا لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا، فَبَسَطْتُ نَمِرَةً لَيْسَ

---

৯৮২. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৯৭৬; *সুনানে নাসায়ি* হাদিস নং ২০৩৪; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩২৩৪; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৫৭২; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৯৩৯৫

عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرُهَا حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ ﷺ مَقَالَتَهُ، ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন... একদিন নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—তোমাদের যে কেউ আমার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত তার চাদর বিছিয়ে রাখবে এবং আমার কথা শেষ হলে চাদরখানা তার বুকের সঙ্গে মিলাবে, তাহলে সে আমার কথা কখনো ভুলবে না। তাই আমি আমার পশমি চাদরটা নবিজি ﷺ-এর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিছিয়ে রাখলাম। সে চাদর ছাড়া আমার গায়ে আর কোনো চাদর ছিল না। নবিজি ﷺ-এর কথা শেষ হওয়ার পর আমি তা আমার বুকের সঙ্গে মিলালাম। সে সত্তার কসম! যিনি তাঁকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আজ পর্যন্ত আমি তাঁর একটি কথাও ভুলিনি।"[৯৮৩]

এই হাদিসটি হলো নবিজি ﷺ-এর মুজিযাসংক্রান্ত। যা জীবনে একবারই হয়েছিল। সর্বদা এমনটি হয়নি। এজন্য হজরত আবু হুরাইরা রা. এই বক্তব্য শুধু একবারই দিয়েছেন। তারপর আর কেউ এ বক্তব্য দেওয়ার কথা হাদিসে উল্লেখ নেই।

মুস্তাহাব কাজে কঠোরতা

বর্তমানে এটাও অনেক বড় একটি মাসআলা হলো, কোনো একটি বিষয় হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কিন্তু উক্ত কাজটি নবিজি ﷺ কখনো মাঝেমধ্যে করেছেন। তাতে কাউকে আহ্বানও করেননি। বরং যে-সকল লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তারাই করে ফেলেছেন। যেমন, সাহাবায়ে কখনো মাঝেমধ্যে একত্র হয়েছেন এবং তখন আল্লাহ তাআলার জিকির করেছেন। সুতরাং এটাও তো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং এতটুকু করা জায়েজও বটে। কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায় (আলহামদুলিল্লাহ সব জায়গায় এমনটি হয় না) যে, জিকিরের নামে মাসব্যাপী পোস্টারিং করা হয়। মাইকিং করা হয়। এর জন্য অনেক চাঁদাও তোলা হয় এবং অজস্র পরিমাণে খরচ করা হয় এবং এমনভাবে হেলেদুলে জিকির করা হয়, মনে হয় যেন তারা নাচানাচি করছে এবং এটা একটা নাচ-গানের মজলিস। তাদেরকে যদি কিছু বলতে গেলে তারা হাদিসের রেফারেন্স দিয়ে থাকে। তারা এটা ভাবে না যে, সেটা তো ছিল মাঝেমধ্যে ও হঠাৎ। আর তারা জিকিরের নামে যে হইচই

---

[৯৮৩]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ২৩৫০

করছে এবং ইউটিউবে তা প্রচার করছে, তা যদি যাচাই করা হয় তাহলে তাদের হাভ-ভাবে এটাই মনে হয়—তারা এটাই বুঝাতে চায় যে, আমরা জিকির করছি কিংবা দ্বীনের খেদমত করছি। কিন্তু প্রকৃতার্থে এ ধরনের কর্মকাণ্ড যারা তাদের উদ্দেশ্য ৩টি। যথা :

১. সাধারণ মানুষদের মাঝে তাদের প্রসিদ্ধি লাভ করা। যেন আরও অনেক বেশি মানুষ তাদের মজলিসে একত্র হয়।

২. সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা।

৩. এই মজলিসের অসিলা দিয়ে এ পরিমাণ অর্থ জমা করা, যা দিয়ে তাদের পুরো বছরের ব্যয় নির্বাহ হয়ে যায়।

এজন্য এমন অনেক মুস্তাহাব থেকে বেঁচে থাকা জরুরি যার মধ্যে ঘোষণা হয়। অর্থাৎ মানুষকে আহ্বান করে একত্র করা হয়। কেননা *দুররে মুখতার* গ্রন্থে এসেছে—মুস্তাহাব আমলের জন্য ঘোষণা অর্থাৎ মানুষকে আহ্বান করে করে মুস্তাহাব আমল করা মাকরুহ বা নিষেধ। শরিয়ত এমন ঘোষণাকে নিষিদ্ধ করেছে। এজন্য এর থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

কবর বা মাজার জিয়ারতে, মৃত্যুর সময় ও বিয়েশাদিতে দেখা যায় যে, অনেক কাজ মূলত মুস্তাহাব। কিন্তু মানুষ তার ব্যাপারে এমন কঠোরতা করে থাকে যে, তা শরিয়ত ঘোষিত নিষিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

কোনো কোনো সময় তাতে এ পরিমাণ লৌকিকতা ও প্রদর্শনী হয় এবং অনেক সময় তো এমন প্রথার কারণে এ পরিমাণ খরচ করা হয় যে, মানুষ অভাবে পড়ে যায়। আর অনেক সময় তো সুদের বিনিময়ে ঋণ করে এ সকল সামাজিক প্রথা পালন করতে হয়। এজন্য কোনো মুস্তাহাব আমলের ব্যাপারে এতটা কঠোরতা মোটেও জায়েজ নেই।
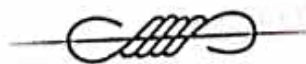
কবরের নিকট জবাই করা নিষেধ

এ আকিদা সম্পর্কে ৪টি আয়াত এবং ৩টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

পশু জবাই করে গরিবদের খাওয়ানো হলো সাদকাহ। শরিয়তে সাদকাহ করে তার সাওয়াব মৃতদেরকে পৌঁছানো জায়েজ আছে। কিন্তু তার জন্য শর্ত হলো, উক্ত পশু আল্লাহ তাআলার নামে জবাই করতে হবে। এর জন্য শুধু এতটুকু নিয়তই যথেষ্ট যে, এই পশু জবাইয়ের উদ্দেশ্য মৃতের জন্য সাওয়াব পৌঁছানো। কিন্তু বর্তমানে তাতে অসংখ্য লৌকিকতা ও প্রদর্শনী প্রবেশ করেছে।

জবাই করার পদ্ধতি চারটি

ক. প্রথম পদ্ধতি হলো, আল্লাহ তাআলার নাম ব্যতীত জবাই করা।

আল্লাহ তাআলার নাম ব্যতীত জবাই করলে হয়তো অন্য কারও নামই নেয়নি অথবা নাম নিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার নাম ব্যতীত অন্য নাম নিলে এই গোশত হারাম। এটা খাওয়া হারাম। এর দলিল হলো পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾

“আর তোমরা তা থেকে আহার করো না, যার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি এবং নিশ্চয় তা সীমালঙ্ঘন।”[৯৮৪]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾

---

৯৮৪. সুরা আনআম, ৬: ১২১

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ভিন্ন কারও নামে জবাই করা হয়েছে; গলা চিপে মারা জন্তু, প্রহারে মারা জন্তু, উঁচু থেকে পড়ে মরা জন্তু, অন্য প্রাণীর শিঙের আঘাতে মরা জন্তু এবং যে জন্তুকে হিংস্র প্রাণী খেয়েছে—তবে যা তোমরা জবাই করে নিয়েছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূজার বেদিতে বলি দেওয়া হয়েছে।"[৯৮৫]

এই আয়াতসমূহে বলা হয়েছে—যদি আল্লাহ তাআলার নাম না নেওয়া হয়, তাহলে তা খেয়ো না। কেননা তা হালালই নয়।

খ. দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, কবর কিংবা মূর্তির ওপর জবাই করা।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, আল্লাহ তাআলার নাম ব্যতীত জবাই করা। যেমন, মূর্তি কিংবা কবরবাসীকে সন্তুষ্ট করার মূর্তি কিংবা কবরের নিকট জবাই করা। এ পদ্ধতিতে আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে জবাই করলেও হালাল নয়। কেননা গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জবাই করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ভিন্ন কারও নামে জবাই করা হয়েছে; গলা চিপে মারা জন্তু, প্রহারে মারা জন্তু, উঁচু থেকে পড়ে মরা জন্তু, অন্য প্রাণীর শিঙের আঘাতে মরা জন্তু এবং যে জন্তুকে হিংস্র প্রাণী খেয়েছে—তবে যা তোমরা জবাই করে নিয়েছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তিপূজার বেদীতে বলি দেওয়া হয়েছে।"[৯৮৬]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

"হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তিরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার করো, যাতে তোমরা সফল হও।"[৯৮৭]

---

[৯৮৫]. সুরা মায়িদা, ৫: ৩
[৯৮৬]. সুরা মায়িদা, ৫: ৩
[৯৮৭]. প্রাগুক্ত, ৫: ৯০

এই আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, যদি মূর্তির জন্য বলি দেওয়া হয়, তাহলে ওই গোশত হারাম।

হাদিস শরিফেও বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের নামে জবাই করা জায়েজ নেই। জবাইকারীদের ওপর লানত বা অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ؟ فَغَضِبَ عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ، وَقَالَ: مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ، غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي، بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَأَنَا وَهُوَ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ.

"হজরত আমের ইবনে ওয়াসেলা রা. থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি হজরত আলি রা.-কে জিজ্ঞেস করল, নবিজি ﷺ কি আপনাকে এমন কোনো গোপন কথা বলেছেন যা অন্য কাউকে বলেননি? এ কথা শুনে রাগে হজরত আলি রা.-এর চেহারা লাল হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, নবিজি ﷺ আমাকে এমন কোনো গোপন কথা বলেননি। তবে হ্যাঁ! একদিন আমার ঘরে চারটি কথা বলেছেন। আর তা হলো :

১. যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতার ওপর অভিশাপ দেয়, তার ওপর আল্লাহ তাআলার অভিশাপ।

২. যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু জবাই করে তার ওপর আল্লাহ তাআলার অভিশাপ।

৩. যে ব্যক্তি কোন বিদআতিকে (অপরাধী) আশ্রয় দেয়, তার ওপর আল্লাহ তাআলার অভিশাপ।

৪. যে ব্যক্তি জমিনের সীমানাকে পরিবর্তন করে তার ওপরও আল্লাহ তাআলার অভিশাপ।"[৯৮৮]

এই হাদিসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু জবাই করে তার ওপর আল্লাহ তাআলার অভিশাপ।

---

[৯৮৮]. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৯৭৮; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ৪৪২৭

গ. তৃতীয় পদ্ধতি হলো, কবরের নিকট জবাই করা।

তৃতীয় পদ্ধতি হলো, আল্লাহ তাআলার নামেই কবাই করে কিন্তু কবরের নিকট জবাই করে। এটাও মাকরুহ বা নিষিদ্ধ। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً.

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন— ইসলামে কোনো বলিদান নেই। আবদুর রায্যাক রহ. বলেন, জাহিলি যুগে লোকেরা কবরের কাছে গরু-ছাগল বলি দিত।"[৮৮৯]

কবরের নিকট জবাই করার সম্ভাবনাও যদি থাকে, তাহলে এটাও নিষেধ

কবরের নিকট জবাই করে মানুষ শিরকে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই যদি কবরের নিকট জবাই করার সম্ভাবনাও থাকে, তাহলে সেটাকেও নিষেধ করা হয়েছে। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِن أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟، قَالُوا: لَا، قَالَ: هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟، قَالُوا: لَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ.

"হজরত সাবিত ইবনে যাহ্হাক রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ-এর যুগে এক ব্যক্তি মানত করে যে, সে বুওয়ানা নামক স্থানে একটি উট জবাই করবে। সে নবিজি ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি বুওয়ানা নামক স্থানে একটি উট কুরবানি করার মানত করেছি। নবিজি ﷺ তখন বললেন, সেখানে কি জাহিলি যুগের কোন মূর্তি রয়েছে? লোকেরা বলল, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে কি তাদের কোনো মেলা বসত? লোকেরা বলল, না। নবিজি ﷺ তখন বললেন, তোমার মানত পূর্ণ করতে পারো। কেননা

---

৮৮৯. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩২২২; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১২৬২০। সনদ সহিহ।

আল্লাহর নাফরমানিমূলক কাজের জন্য কৃত মানত পূর্ণ করা জায়েজ নয় এবং আদমসন্তান যে জিনিসের মালিক নয় তারও কোন মানত নেই।"[৯৯০]

এই হাদিসে বলা হয়েছে—সেখানে যদি জাহিলি যুগে মেলাও হতো, তাহলেও সেখানে পশু জবাই করা জায়েজ নেই। কেননা মানুষ এভাবে পরবর্তী সময়ে মূর্তিকে পূজা করবে। কবরকে পূজা করবে এবং ধীরে ধীরে শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

বর্তমানের অবস্থা হলো, মাজারের গোশত কালেকশন করার জন্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ও হাদিয়া-তোহফা সংগ্রহের জন্য অনেক জোড় দেওয়া হয় এবং বলা হয়, মাজারে শায়িত ব্যক্তি আপনার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে দেবেন। এজন্য এরা কবরের নিকটই পশু জবাই করে থাকে এবং মানুষকে একটি নাজায়েজ কাজে লিপ্ত করার চেষ্টা করে। এগুলো থেকে আমাদের বেঁচে থাকা উচিত।

ঘ. চতুর্থ পদ্ধতি হলো, আল্লাহ তাআলার নামেই জবাই করা এবং কবর থেকে দূরে জবাই করা

চতুর্থ পদ্ধতি হলো, আল্লাহ তাআলার নামেই পশু জবাই করা এবং কবর থেকে দূরে জবাই করা। এতে কবরে শায়িত ব্যক্তিকে সন্তুষ্টি করাও উদ্দেশ্য নয়। বরং শুধু এই নিয়তে জবাই করা যে, এই গোশত গরিবদের খাওয়াবে। তাহলে যেহেতু কবরের নিকটও জবাই করা হয়নি এবং জবাইয়ের সময় একমাত্র আল্লাহর নামেই জবাই করা হয়েছে, সুতরাং এই গোশত হালাল। কিন্তু মৃতব্যক্তি এতটুকুই সাওয়াব পাবে যতটুকু গোশত গরিব-মিসকিনকে খাওয়াবে।

এর প্রকৃত পদ্ধতি হলো, কবরের নিকট থেকে অনেক দূরে পশু জবাই করে তার গোশত গরিব-মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দেবে। অথবা রান্না করে গরিব-মিসকিনদের খাইয়ে দেবে। তাহলে তাদের খাওয়ানোর সাওয়াব মৃতব্যক্তি পেয়ে যাবে। এটি একটি জায়েজ পদ্ধতি। এতে লৌকিকতা ও যশ-খ্যাতি এবং লোক দেখানোর মনোবৃত্তি যত কম হবে, মৃতব্যক্তি তত বেশি সাওয়াব পাবে। আর লৌকিকতা ও যশ-খ্যাতি এবং লোক দেখানোর মনোবৃত্তি যত বেশি হবে, মৃতব্যক্তি সাওয়াব তত কম পাবে। আর যদি শুধু লৌকিকতা ও যশ-খ্যাতি এবং লোক দেখানোর মনোবৃত্তিই হয়ে থাকে, তাহলে একদম কোনো সাওয়াবই হবে না।

---

[৯৯০]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩৩১৩। এই হাদিসের সনদ সহিহ।

কিন্তু বর্তমানে গরিব-মিসকিনদের পরিবর্তে সমাজের ধনী ও বিত্তশালী লোকদের ও আত্মীয়স্বজনদেরকেই বেশি খাওয়ানো হয়। অথবা মাজারের লোকেরাই লুটপাট করে খায়। গরিব-মিসকিনরা খুব কমই পেয়ে থাকে। এর থেকে বেঁচে থাকা চাই। দান-খয়রাতের সাওয়াব যে মৃতব্যক্তি পায় তার দলিল হলো হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.

"হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, সাদ ইবনে উবাদাহ রা.-এর মা মারা গেলেন এবং তিনি সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। পরে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা যান। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সদকাহ করি, তাহলে কি তাঁর কোনো উপকারে আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! সাদ রা. বললেন, তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষী করছি আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তাঁর জন্য সদকাহ করলাম।"[৯৯১]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—অন্যের করা সদকাহর সাওয়াব মৃতব্যক্তি পায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইসালে সাওয়াব অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

[৯৯১]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ২৭৫৬; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৬৩০; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৩৫০৮
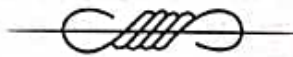
বিলাপ করা হারাম

এ আকিদা সম্পর্কে ৩টি আয়াত এবং ৫টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

হঠাৎ কোনো পেরেশানি চলে আসার কারণে অশ্রু বের হলে তাতে কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু এখানে দুটো বিষয় লক্ষ রাখতে হবে। একটি হলো, এমতাবস্থায় মুখ দিয়ে যেন এমন কোনো কথা না বের হয়, যা দ্বারা অধৈর্য প্রকাশ পায় অথবা আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন। আর দ্বিতীয়ত হলো, তাতে চিৎকার-চ্যাচামেচি করা, কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, যাকে বিলাপ বলা হয়, তা জায়েজ নেই এবং অনেকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও তা বারবার স্মরণ করা, মানুষকে নিজের এই শোকের কথা বলে বেড়ানো, তারপর বুক থাপড়ানো ও চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করাও জায়েজ নেই।

কুরআনুল কারিম বিপদের সময় ধৈর্যধারণের শিক্ষা দেয়

ইসলামের শিক্ষা এটা নয়, বিপদ-মুসিবতের সময় চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করবে ও বিলাপ করবে। বরং ইসলামের শিক্ষা হলো, যদি বিপদ চলে আসে তাহলে ধৈর্যধারণ করবে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট নিরাপত্তা কামনা করবে। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾

"হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না। আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জীবন ও

সম্পদের এবং ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা, তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।"[৯৯২]

এই আয়াতসমূহে তিনবার ধৈর্যধারণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং এটাও বলা হয়েছে, যে ধৈর্যধারণ করবে, তার ওপর মাগফিরাত ও রহমত নাজিল করা হয় এবং তারাই প্রকৃতার্থে হিদায়াতপ্রাপ্ত।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾

"আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের ওপর কঠিন।"[৯৯৩]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধর ও ধৈর্যে অটল থাক এবং পাহারায় নিয়োজিত থাকো। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হও।"[৯৯৪]

এই আয়াতসমূহে বারবার ধৈর্যধারণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এজন্য বিলাপ করা ও চিৎকার-চ্যাচামেচি করা মোটেও ঠিক নয়।

আত্মীয়স্বজনদের কান্নার দ্বারা মৃতব্যক্তির আজাব হয়

হাদিসের মধ্যে এসেছে—আত্মীয়স্বজনদের কান্নার দ্বারা মৃতব্যক্তির আজাব হয়। এজন্য বিনা কারণে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করা উচিত নয়। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ، وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا، أَوْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ

---

[৯৯২]. সুরা বাকারা, ২: ২৫৩-২৫৭
[৯৯৩]. প্রাগুক্ত, ২: ৪৫
[৯৯৪]. সুরা আলে ইমরান, ৩: ২০০

بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মক্কায় হজরত উসমান রা.-এর জনৈকা কন্যার মৃত্যু হলো। আমরা সেখানে (জানাজায়) অংশগ্রহণ করার জন্য গেলাম। ইবনে উমর এবং ইবনে আব্বাস রা.-ও সেখানে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁদের দুজনের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম, অথবা তিনি বলেছেন, আমি তাঁদের একজনের পার্শ্বে গিয়ে উপবেশন করলাম, পরে অন্যজন আগমন করে আমার পার্শ্বে উপবেশন করলেন। (ক্রন্দনের শব্দ শুনে) ইবনে উমর রা. আমর ইবনে উসমানকে বললেন, তুমি কেন ক্রন্দন করতে নিষেধ করছ না? কেননা আল্লাহর রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, মৃতব্যক্তিকে তার পরিজনদের কান্নার কারণে আজাব দেওয়া হয়।"[৯৯৫]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—পরিবার-পরিজনদের কান্নার কারণে মৃতব্যক্তির আজাব হয়। তা সত্ত্বেও জানা নেই কেন অনেক লোকেরা প্রতিবছর বুক থাপড়িয়ে থাপড়িয়ে কান্না করে থাকে এবং মৃতব্যক্তির আজাবকে বৃদ্ধি করে।

বিলাপ করা নিষেধ

একটি হলো নিজে নিজেই অশ্রু চলে আসে। এটা জায়েজ। কেননা মানুষ এখানে অক্ষম। আরেকটি হলো, এমনিতেই চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করছে ও গলা ফাটাচ্ছে। এটা নাজায়েজ। নিম্নের হাদিসসমূহে বিলাপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, যারা (মৃতব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশে) গণ্ডে চপেটাঘাত করে, জামার বক্ষ ছিন্ন করে এবং জাহিলি যুগের মত চিৎকার দেয়, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। অর্থাৎ এটি কোনো মুসলিমের কাজ নয়।"[৯৯৬]

---

[৯৯৫]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১২৮৬

[৯৯৬]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১২৯৪; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১০৩

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى... قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَرِئَ مِنْ: الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ.

"হজরত আবু বুরদা ইবনে আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বললেন... সে সব লোকের সঙ্গে আমি সম্পর্ক রাখি না যাদের সঙ্গে আল্লাহর রাসুল (ﷺ) সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। আল্লাহর রাসুল (ﷺ) সেসব নারীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা প্রকাশ করেছেন, যারা চিৎকার করে ক্রন্দন করে, যারা মস্তক মুণ্ডন করে এবং যারা জামা কাপড় ছিন্ন করে।"[৯৯৭]

নিজে নিজে অশ্রু প্রবাহিত হলে সেটা মাফ

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: تَدْمَعُ الْعَيْنُ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، إِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ.

"হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আজ রাতে আমার ঘরে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আমি আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহিম আ.-এর নাম অনুসারে তার নাম রেখেছি ইবরাহিম। আনাস রা. বলেন, আমি দেখেছি ইবরাহিম নবিজি ﷺ-এর সামনেই প্রাণ ত্যাগ করলেন। নবিজি ﷺ-এর দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। তিনি বললেন, চোখ অশ্রু ঝরাচ্ছে, অন্তর দুঃখভারাক্রান্ত, তবুও আমরা শুধু তাই বলব যাতে আমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হবেন (অর্থাৎ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। হে ইবরাহিম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা শোকার্ত।"[৯৯৮]

এই হাদিসে দেখা যায়, নিজে নিজে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গেলে তা মাফ।

---

৯৯৭. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১২৯৬; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১০৩

৯৯৮. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১৩০৩; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৩১৫; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩১২৬

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا... فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ قَالَ: حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَنٌّ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. فَقَالَ سَعْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.

"হজরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ... তখন শিশুটিকে নবিজি ﷺ-এর নিকট তুলে দেওয়া হলো। তখন সে ছটফট করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি এ কথা বলেছিলেন, যেন তার শ্বাস মশকের মতো (শব্দ হচ্ছিল)। আর নবিজি ﷺ-এর দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সাদ রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! একী? তিনি বললেন, এ হচ্ছে রহমত, যা আল্লাহ তাঁর বান্দার অন্তরে গচ্ছিত রেখেছেন। আর আল্লাহ তো তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন।"[৯৯৯]

এই হাদিস থেকে জানা গেল, অধিক শোকের কারণে নিজে নিজেই যদি অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যায় এবং মুখ থেকে কোনো অশালীন বাক্য বের হয়, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

৯৯৯. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১২৮৪

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়
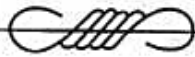
ইসালে সাওয়াব একটি মুস্তাহাব কাজ

এ আকিদা সম্পর্কে ১১টি আয়াত এবং ১৪টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

কোনো নেক কাজ করে তার সাওয়াব মৃতব্যক্তিকে পৌছানোকে ইসালে সাওয়াব বলা হয়। এই ইসালে সাওয়াব হলো একটি মুস্তাহাব কাজ। কেউ করতে চাইলে করতে পারে আর না করতে চাইলে কোনো গুনাহ নেই।

এই ইসালে সাওয়াবের জন্য ৫টি বিষয় জরুরি। যথা :

১. এতে লৌকিকতা তথা লোক দেখানোর মনোবৃত্তি থাকা যাবে না। যদি মানুষকে দেখানোর জন্য করা হয়, তাহলে যেহেতু সাওয়াবের নিয়তে করা হয়নি এজন্য সাওয়াব হবে না। আর যেখানে যারা এটা করছে তাদেরই সাওয়াব হবে না, তাহলে মৃতব্যক্তির কীভাবে সাওয়াব হবে? বরং উত্তম হলো, এমন গোপনীয়তার সঙ্গে দান করা যেন ডান হাতে দান করলে বাম হাত না জানে।

২. সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির অনুসরণের জন্য না হওয়া। যেহেতু এ কাজের প্রথা হয়ে গেছে, এজন্যই তা করা হচ্ছে।

৩. আর্থিক সদকাহ করতে হলে গরিব-মিসকিনকে দিয়ে দেওয়া। কেননা সদকাহ তাদেরই হক। তাই তাদের দিলে অধিক সাওয়াব পাওয়া যাবে।

৪. এতে অনর্থক খরচ না করা।

৫. ইসালে সাওয়াব করার সময় মানুষকে আহ্বান করে খুব ভিড় জমিয়ে করা ঠিক নয়।

কেননা মানুষের মৃত্যুর জন্য ঘোষণা করা ও লোকজনকে একত্রিত করাও হাদিসের দৃষ্টিতে ভালো নয়। তাহলে ইসালে সাওয়াবের জন্য লোকজনকে একত্রিত করা, নাচ-গানের আয়োজন করা এবং ওই সকল প্রথা ও রীতিনীতি পালন করা যা হিন্দুদের মেলায় হয়ে থাকে কীভাবে জায়েজ হতে পারে। এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَالنَّعْيُ أَذَانٌ بِالْمَيِّتِ.

"হজরত আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, সাবধান! তোমরা মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা থেকে নিবৃত্ত থাকো। যেহেতু এটা জাহিলি যুগের কাজ। আবদুল্লাহ রা. বলেন, 'নাঈ' শব্দের অর্থ হলো, মৃত্যুর সংবাদ ঢালাওভাবে ঘোষণা করা।"[১০০০]

এই হাদিসে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে মানুষের মাঝে মৃতের মৃত্যুর ঘোষণা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ! সাধারণভাবে জানাজার সংবাদ দেওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু অনেক বেশি ভিড় জমানো ঠিক নয়।

এটা তো শোকের সময়। এটা তার সঙ্গে চির বিদায়ের সাক্ষাৎ এবং তার জানাজা পড়ার সময়। তা সত্ত্বেও শরিয়ত অধিক ভিড় জমাতে নিষেধ করেছে। তাহলে ইসালে সাওয়াবের মতো গোপনীয় একটি আমল অর্ধ পৃথিবী একত্র করে কীভাবে সহিহ হবে? তবে হ্যাঁ! কোনো প্রথা ও রীতিনীতি ব্যতীত এমনিতেই যদি লোকজন জমা হয়ে কিছু পাঠ করে মৃতের জন্য বখশে দেয়, উলামায়ে কেরাম তার অবকাশ দিয়েছেন।

এই সময়ের সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি

বর্তমান সমাজের অবস্থা হলো, এই মুস্তাহাব কাজটিতে অনেক সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে।

এক ব্যক্তির পিতার মৃত্যু হয়েছে। এজন্য ৪০ দিন পর্যন্ত লোকজন আসতে থাকে এবং ৪০ হাজার পাউন্ড খরচ করানো হয় এবং ওই ব্যক্তির খুব শোচনীয় অবস্থা হয়ে যায়। কোনো মুস্তাহাব আমলের ক্ষেত্রে কি এমন সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি জায়েজ আছে?

আমার গ্রামে কয়েক ব্যক্তির ইন্তেকাল হয়েছে। তাদের ওয়ারিশদের নিকট কাফনের পয়সাও নেই। কিন্তু সমাজের লোকজন তাকে সুদি ঋণ নিতে বাধ্য করেছে। সে সুদি মহাজন থেকে ৩ হাজার রুপি ঋণ নিয়ে লোকদের খানা খাইয়েছে।

[১০০০]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৯৮৪; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, ১৪৮৬। সনদ যইফ। তবে এই মর্মে আরও অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়।

এমতাবস্থায় আত্মীয়স্বজনরা পেছনে লেগে যায় এবং সমাজের কিছু বিত্তশালী লোকও এদের সঙ্গ দিয়ে থাকে। ইসালে সাওয়াবের নামে এ পরিমাণ কঠোরতা করে থাকে—গরিবের চামড়া তুলে ফেলে। হায় আফসোস!

ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি ৩টি

ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি ৩টি। যথা :

১. অর্থ-সম্পদ সদকাহ করে সাওয়াব পৌঁছানো। যেমন, অর্থ-সম্পদ দান করে সাওয়াব পৌঁছানো। খানা খাইয়ে সাওয়াব পৌঁছানো। গরিব-মিসকিনদের মাঝে পশু সদকাহ করে সাওয়াব পৌঁছানো। কুরবানি করে সাওয়াব পৌঁছানো ইত্যাদি।

২. শারীরিক ইবাদত করে সাওয়াব পৌঁছানো। যেমন, হজ করে তার সাওয়াব পৌঁছানো। সিয়াম পালন করে তার সাওয়াব মৃতব্যক্তিকে পৌঁছানো। সালাত পড়ে করে তার সাওয়াব মৃতব্যক্তিকে পৌঁছানো ইত্যাদি।

৩. কোনো কিছু পাঠ করে করে সাওয়াব পৌঁছানো। যেমন, নবিজি ﷺ-এর ওপর দরুদ পাঠ করা। কুরআন তিলাওয়াত করে করে তার সাওয়াব মৃতব্যক্তিকে পৌঁছানো। দুআ করে করে তার সাওয়াব মৃতব্যক্তিকে পৌঁছানো।

১. অর্থ-সম্পদ সদকাহ করে সাওয়াব পৌঁছানোর দ্বারা মৃতব্যক্তির নিকট সাওয়াব পৌঁছে

এ সম্পর্কে *আকিদাতুত তহাবিতে* এসেছে—

وَفِي دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ مَنْفَعَةٌ لِلْأَمْوَاتِ.

অর্থাৎ জীবিতদের পক্ষ থেকে দুআ ও সাদাকাহ দ্বারা মৃতদের উপকার হয়।[১০০১]

শরহে ফিকহে আকবারে এসেছে—

ومنها: أن دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم نفع لهم في علو الحالات.

অর্থাৎ এটাও একটি উপকার—জীবিত লোকেরা মৃতদের জন্য দুআ করবে অথবা তার পক্ষ থেকে সদকাহ করবে। এতে তার অবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রে উপকার হয়।[১০০২]

১০০১. *আকিদাতুত তহাবি*, আকিদা নং ৮৯ পৃষ্ঠা- ১৯

এই ইবারত বা মূলপাঠে উল্লেখ করা হয়েছে—অর্থ-সম্পদ সদকাহ করার দ্বারা মৃতব্যক্তির উপকার হয়। এ ব্যাপারে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.

"হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, সাদ ইবনে উবাদাহ রা.-এর মা মারা গেলেন এবং তিনি সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। পরে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা যান। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সদকাহ করি, তাহলে কি তাঁর কোনো উপকারে আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! সাদ রা. বললেন, তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষী করছি আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তাঁর জন্য সদকাহ করলাম।"[১০০৩]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْمَاءُ، قَالَ: فَحَفَرَ بِئْرًا، وَقَالَ: هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ.

"হজরত সাদ ইবনে উবাদাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! উম্মে সাদ মৃত্যুবরণ করেছেন (তার পক্ষ হতে) কোনো সদকাহ সর্বোত্তম হবে? তিনি বললেন, পানি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সাদ) একটি কূপ খনন করে বললেন, এটা উম্মে সাদের (কল্যাণের) জন্য সদকাহ।"[১০০৪]

এই হাদিসসমূহে বর্ণিত হয়েছে, অন্যরা সদকাহ করলে তার সাওয়াব মৃতরা পায়।

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟، قَالَ: نَعَمْ.

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা হঠাৎ ইন্তেকাল করেছে। যার

[১০০২]. *শরহে ফিকহে আকবার*, পৃষ্ঠা- ২২৪

[১০০৩]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ২৭৫৬; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৬৩০; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৩৫০৮

[১০০৪]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ১৬৮১। হাদিসটির সনদ হাসান। তবে মুরসাল।

ফলে কোনো অসিয়ত করে যেতে পারেনি। আমার মনে তিনি যদি কথা বলতে পারতেন তাহলে অবশ্যই সদকাহ করার কথা বলতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদকাহ করি, তাহলে তিনি সাওয়াব পাবেন? নবিজি ﷺ বললেন, হ্যাঁ! পাবেন।"[১০০৫]

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي.

"হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ঈদুল আজহার দিন আমি নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে ঈদগাহে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবাহ শেষে মিম্বার থেকে নামলেন। একটি বকরি আনা হলো। নবিজি ﷺ নিজ হাতে জবাই করেন এবং বলেন بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ তথা আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ মহান। এই কুরবানি আমার ও আমার উম্মাতের যারা কুরবানি করতে অক্ষম তাদের পক্ষ হতে।"[১০০৬]

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ حَنَشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ.

"হজরত হানাশ রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হজরত আলি রা.-কে দুটি দুম্বা কুরবানি করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি (দুটি কেন)? তিনি বললেন, নবিজি ﷺ আমাকে ওয়াসিয়্যাত করেছেন, আমি যেন তাঁর পক্ষ হতে কুরবানি করি। তাই তাঁর পক্ষ হতেও কুরবানি করছি।"[১০০৭]

এই পাঁচটি হাদিস থেকে প্রমাণিত হলো, অর্থ-সম্পদ সদকাহ করলে তার সাওয়াব মৃতব্যক্তির নিকট পৌঁছে।

তবে তাতে খ্যাতি, লৌকিকতা তথা লোক দেখানো ও অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তি এবং সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি পালনের জন্য করা যাবে না এবং অতিরিক্ত খরচ করা যাবে না।

[১০০৫]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১০০৪

[১০০৬]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৮১০। সনদ সহিহ।

[১০০৭]. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২৭৯০। হাদিসটির সনদ দুর্বল। তবে এর দুর্বলতা খুবই সামান্য।

এ কাজটি মাঝেমধ্যে কখনো করে নেবে এবং তার সাওয়াব মৃতকে পৌছানোর নিয়ত করবে। কেননা এটা শুধু মুস্তাহাব।

২. শারীরিক ইবাদত করে সাওয়াব পৌছানোর দ্বারা মৃতব্যক্তির নিকট সাওয়াব পৌছানো যায়

এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَحُجُّ عَنْ أَبِي؟، قَالَ: نَعَمْ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ.

"হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবিজি ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি কি আমার পিতার পক্ষ থেকে হজ করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ করো।"[১০০৮]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي الْغَوْثِ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، رَجُلٌ مِنَ الْفُرْعِ أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ عَنْ حَجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَكَذٰلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّذْرِ، يُقْضَى عَنْهُ.

"হজরত আবুল গাউস বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ-এর নিকট তার পিতার ওপর ফরজ হওয়া হজ সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করেন, যিনি মারা গেছেন কিন্তু হজ করতে পারেননি। নবিজি ﷺ বলেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ আদায় করো। নবিজি ﷺ আরও বলেন, মান্নতের সিয়ামও অনুরূপ অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে তা আদায় করা যাবে।"[১০০৯]

হজ করা ও সিয়াম পালন করা হলো শারীরিক ইবাদত। এজন্য উপর্যুক্ত দুটি হাদিস থেকে জানা গেল, শারীরিক ইবাদত করে মৃতের জন্য সাওয়াব পৌছানো যায়।

৩. কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করে ও দুআ করে মৃতব্যক্তির নিকট সাওয়াব পৌছানো যায়

কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করে ও দুআ করে মৃতব্যক্তির নিকট সাওয়াব পৌছানো যায়। কিন্তু এর জন্য সময় নির্ধারণ করা, যাতে খুব হইচই হবে,

---

[১০০৮]. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২৯০৪। সনদ সহিহ।

[১০০৯]. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২৯০৫। সনদ যইফ।

ভিডিয়ো করা হবে, নাচ-গান ও ঢোল-তবলার আয়োজন হবে এবং এতে নতুন ধরনের নিত্য হবে। যেন অনেক দিন যাবৎ তা ইউটিউব ও ইন্টারনেটে সংরক্ষিত থাকে। এগুলো কতটুকু জায়েজ তা আপনি নিজেই ফতোয়া দিন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾

"যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের ক্ষমা করুন।"[১০১০]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾

"হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন।"[১০১১]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ (ঊর্ধ্ব জগতে ফেরেশতাদের মধ্যে) নবির প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবির জন্য দুআ করে। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবির ওপর দরুদ পাঠ করো এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।"[১০১২]

এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—আল্লাহ তাআলা ও ফেরেশতারা নবিজি ﷺ-এর ওপর দরুদ প্রেরণ করে। এজন্য মুমিনদেরকেও নির্দেশ দিয়েছেন—তারা নিজেরাও যেন নবিজি ﷺ-এর ওপর দরুদ পাঠ করে। এজন্য নবিজি ﷺ-এর ওপর নিজে দরুদ পাঠ করা উচিত। পাঠ করার ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে বড় ইবাদত।

এই আয়াতে নবিজি ﷺ-এর ওপর দরুদ পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে যদি সাওয়াব না হতো, তাহলে দরুদ পাঠ করার নির্দেশ কেন দিলেন!

[১০১০]. সুরা হাশর, ৫৯: ১০

[১০১১]. সুরা নুহ, ৭১: ২৮

[১০১২]. সুরা আহজাব, ৩৩: ৫৬

এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমলের সুযোগও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সাওয়াব বন্ধ হয় না। এক. সদকাহ জারিয়া। দুই. এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে।"[১০১৩]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ.

"হজরত মাকিল ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা তোদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদের নিকট 'সুরাহ ইয়াসিন' পাঠ করো।"[১০১৪]

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে ডাকবে সে তার অনুসারীর সমান সাওয়াব পাবে, অথচ অনুসরণকারীর সাওয়াব কমানো হবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি কোনো ভ্রষ্টতার দিকে ডাকবে সে তার অনুসারীর সমান পাপে জর্জরিত হবে, তার অনুসারীর পাপ মোটেও কমানো হবে না।"[১০১৫]

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আপনার পথপ্রদর্শনের কারণে যদি কেউ কোনো কাজ করে, তাহলে যিনি কাজ করেছেন তার সমান সাওয়াব পথপ্রদর্শনকারীও পাবে। ঠিক তেমনইভাবে আপনার ভ্রান্ত পথপ্রদর্শনের

[১০১৩]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৬৩১; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৮৮০; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৮৮৪৪

[১০১৪]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩১২১। হাদিসটির সনদকে ইমাম নববি রহ. তার 'আযকারে' ইমাম ইবনু হাজার রহ. তার 'তালখিসে' (২/১০৪) যইফ বলেছেন।

[১০১৫]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৬৭৪; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৬০৯; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২৬৭৪

কারণে যদি কেউ কোনো গুনাহ করে, তাহলে উক্ত গুনাহের শাস্তিও ভ্রান্ত পথপ্রদর্শনকারী পাবে। কেননা এই গুনাহ ভ্রান্ত পথপ্রদর্শনের কারণেই হয়েছে।

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি কোনো কাজের কারণ হয়, তাহলে কারণ হওয়ার কারণে তার সাওয়াব কিংবা গুনাহ সেও পাবে। আর যেহেতু ঈমানদারের ঈমানের কারণেই সাওয়াবের অধিকারী হয়েছে, এজন্য যে সাওয়াব পৌঁছবে তার সাওয়াব মৃতব্যক্তিও পাবে।

কবরের নিকট অনর্থক কজের দ্বারা সাওয়াব পাওয়া যায় না

কবরের ওপর যত নজর-মানত মানা হয়, কিংবা পশু জবাই করা হয় অথবা হাদিয়া দেওয়া হয়, এগুলো কোনোটির প্রমাণই হাদিসে নেই। বরং তার বিরুদ্ধে হাদিস রয়েছে। আর এগুলোর কোনো সাওয়াব নেই। সুতরাং শরিয়ত অনুযায়ী যতটুকু ইসালে সাওয়াব করা হবে, ততটুকুর সাওয়াবই মৃতব্যক্তি পাবে এবং ওইটাই করা উচিত।

এ আকিদা সম্পর্কে যত আয়াত ও হাদিস এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছ, আপনি এগুলো প্রত্যেকটির ওপর চিন্তাভাবনা করুন।

মাজারের ধোঁকা

যতগুলো হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, কবরের নিকট গিয়ে মৃতের জন্য দুআ করা। আর মাঝেমধ্যে কখনো গোপনে গরিব-মিসকিনদের দান করা। আর এমনটি করা মুস্তাহাব।

কিন্তু বর্তমানে এই ফিতনার আড়ালে প্রায় মাজারেই বড় বড় মিনার বানিয়ে বিভিন্ন রঙিন সাজসজ্জা করা হয়। আর প্রত্যেক আগমনকারীকে এই উপদেশ দেওয়া হয় যে, এই বুজুর্গ আপনার সকল উদ্দেশ্য পূর্ণ করে দেবেন এবং এর দ্বারা এমন বরকত হবে যে, আপনার গোটা জীবন পরিবর্তন হয়ে যাবে। এভাবে উক্ত মজলিসে আগমনকারীদের থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ উসুল করে তাদের পকেট খালি করে থাকে। আর যে এই চক্করে একবার পড়ে তাকে একদম নিঃস্ব করে ছাড়ে। কোথায় মাঝেমধ্যে কখনো কবর জিয়ারত করা আর কোথায় এই লুটেরাদের লুটপাটের খেলা।

তারপর তারা এতটুকুতেই ক্ষান্ত হয় না। প্রতি বৃহস্পতিবার মাজারে উপস্থিত হওয়া। উরস ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নাম দিয়ে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে নেওয়া। তারপর উরসের নামে মেলা জমানো। কাওয়ালি গাওয়া। নর্তকীদের

নাচানো এবং সারা রাত চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করা, যা হিন্দুদের মেলাকেও হার মানায়।

কেউ কেউ বলে থাকেন, কবরস্তান থেকে ফয়েজ বা বরকত হাসিল হয়। আর হাদিসে বর্ণিত বিশেষ ফয়েজ বা বরকত হলো, কবর ও তার নীরবতাকে দেখে পরকাল স্মরণ হবে। অন্তরে দুনিয়ার প্রতি অনীহা তৈরি হবে। আর এখানে উলটো দুনিয়াকে আরও সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে প্রদর্শন করা হয়। বরং ধর্মের নামে এমন চমৎকারভাবে দুনিয়া ও দুনিয়ার সৌন্দর্য পেশ করা হয় যে, পরকাল ভুলে যায়। আর বর্তমানে তো এ সকল কাওয়ালি ও নাচ-গান এবং এ জাতীয় সকল নির্লজ্জতা ইউটিউবে আপলোড করে তা আরও অধিকহারে প্রচার-প্রসার করা হয়। কোথায় ছিল কবর দেখে পরকালের কথা স্মরণ করা আর আজ কোথায় এ সকল নির্লজ্জ কর্মকাণ্ড। আফসোস!

মৃতব্যক্তির শ্রবণ

এ আকিদা সম্পর্কে ৪টি আয়াত এবং ৭টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

মৃতব্যক্তি শুনেন কিনা এটা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। মৃতব্যক্তির শ্রবণ সম্পর্কে তিনটি মত পাওয়া যায়। আর এই তিনটি মতের পক্ষেই কুরআন-হাদিসের দলিল রয়েছে। যথা :

১. প্রথম মত হলো, মৃতব্যক্তি শুনে না।

২. দ্বিতীয় মত হলো, মৃতব্যক্তি শুনে।

৩. তৃতীয় মত হলো, সকল কথা শুনে না। তবে হ্যাঁ! আল্লাহ তাআলা যে কথা শুনাতে চান তা শুনেন। তিনি ফেরেশতাদের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে শুনিয়ে থাকেন।

নোট : মৃতব্যক্তির শ্রবণ নিয়েই যেখানে মতভেদ রয়েছে, সেখানে এই অনুমতি কীভাবে দেওয়া যায়—মানুষ নবি ও ওলিদের নিকট নিজের প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করবে এবং তাদের নিজের প্রয়োজন পূরণকারী বলে আহ্বান করবে?

১. প্রথম মত হলো, মৃতব্যক্তি শুনে না।

যারা বলে মৃতব্যক্তি শুনে না। তাদের দলিল হলো, পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾

"নিশ্চয় তুমি মৃতকে শুনাতে পারবে না, আর তুমি বধিরকে আহ্বান শুনাতে পারবে না, যখন তারা পিঠ দেখিয়ে চলে যায়।"[১০১৬]

১০১৬. সুরা নামল, ২৭: ৮০

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾

"নিশ্চয় তুমি মৃতকে শুনাতে পারবে না, না পারবে বধিরকে আহ্বান শুনাতে, যখন তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ফিরে যায়।"[১০১৭]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾

"আর জীবিতরা ও মৃতরা এক নয়; নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনাতে পারেন, কিন্তু যে ব্যক্তি কবরে আছে তাকে তুমি শুনাতে পারবে না।"[১০১৮]

এই তিন আয়াতে নবিজি ﷺ-কে বলা হয়েছে—আপনি মৃতদের শুনাতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ! আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে শুনাতে পারবেন। এই আয়াত থেকে এক বুজুর্গ দলিল পেশ করেন, আমরা মৃতকে শুনাতে পারব না। তবে হ্যাঁ! আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে শুনাতে পারব।

হজরত আয়েশা রা. এ মতের পক্ষে ছিলেন, মৃতরা শুনে না এবং নবিজি ﷺ যে শুনিয়েছেন, তা ছিল নবিজি ﷺ-এর মুজিজার মাধ্যমে শুধু তখনই শুনিয়েছিলেন। সর্বদা শুনাতে পারেননি। এজন্য হাদিস শরিফে يَسْمَعُ الْآنَ তথা এ মুহূর্তে তারা শুনছে বাক্যটি বিদ্যমান। যেহেতু হজরত আয়েশা রা. বলেছেন, মৃতরা শুনে না এবং এর জন্য ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ﴾ সুরা রুমের ৮০ নং আয়াতটি পাঠ করেছেন। এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَلِيبِ بَدْرٍ، فَقَالَ: هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُمُ الْآنَ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ، فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُّ، ثُمَّ قَرَأَتْ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى سورة النمل آية ٨٠ حَتَّى قَرَأَتِ الْآيَةَ

"হজরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ বদরে অবস্থিত কূপের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, (হে মুশরিকগণ) তোমাদের রব তোমাদের কাছে যা ওয়াদা করেছিলেন তা তোমরা সত্য হিসেবে পেয়েছ কি?

১০১৭. সুরা রুম, ৩০: ৫২

১০১৮. সুরা ফাতির, ৩৫: ২২

পরে তিনি বললেন, এ মুহূর্তে তাদের আমি যা বলছি তারা তা সবই শুনতে পাচ্ছে। এ বিষয়টি আয়েশা রা.-এর সামনে উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, নবিজি ﷺ যা বলেছেন তার অর্থ হলো, তারা এখন জানতে পারছে যে, আমি তাদের যা বলতাম তাই সঠিক ছিল। এরপর তিনি সুরা রুমের ৮০ নং আয়াত ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ﴾ তথা "নিশ্চয় তুমি মৃতকে শুনাতে পারবে না" তিলাওয়াত করলেন।"[১০১৯]

এই হাদিসে হজরত আয়েশা রা. বলেছেন, এটা নয় যে, মৃতরা শুনে; বরং নবিজি ﷺ এটা বলেছেন, তারা এখন জানতে পারছে যে, আমি তাদের যা বলতাম তাই সঠিক ছিল।

হজরত কাতাদাহ রা.-এর নিম্নের ব্যাখ্যার দ্বারাও এর সত্যায়ন হয়—

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا، ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ، وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، قَالَ قَتَادَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَحْيَاهُمُ اللهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنَقِيمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَمًا.

"হজরত আবু তালহা রা. থেকে বর্ণিত, বদরের দিন নবিজি ﷺ-এর নির্দেশে ২৪ জন কুরাইশ সর্দারের লাশ বদর প্রান্তরের একটি নোংরা আবর্জনাপূর্ণ কূপে নিক্ষেপ করা হলো। নবিজি ﷺ কোনো দলের বিরুদ্ধে জয় লাভ করলে সে স্থানের পার্শ্বে তিন দিন অবস্থান করতেন। বদর প্রান্তরে অবস্থানের পর তৃতীয় দিনে তিনি তাঁর সাওয়ারি প্রস্তুত করার আদেশ দিলেন, সাওয়ারির জিন শক্ত করে বাঁধা হলো। এরপর নবিজি ﷺ পদব্রজে অগ্রসর হলে সাহাবিগণও তাঁর পেছনে পেছনে চললেন। তাঁরা বলেন, আমরা ভাবছিলাম, কোনো প্রয়োজনে তিনি কোথাও যাচ্ছেন। তারপর তিনি ওই কূপের পাশে

[১০১৯]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৯৮০

গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কূপে নিক্ষিপ্ত ওই নিহত ব্যক্তিদের নাম ও তাদের পিতার নাম নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন, হে অমুকের পুত্র অমুক, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি এখন অনুভব করতে পারছ যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য তোমাদের জন্য পরম খুশির বিষয় ছিল? আমাদের প্রতিপালক আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তোমরাও তা সত্য পেয়েছ কি? বর্ণনাকারী বলেন, উমর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (ﷺ)! আপনি আত্মাহীন দেহগুলোর সঙ্গে কী কথা বলছেন? নবিজি ﷺ বললেন, ওই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আমি যা বলেছি তা তাদের চেয়ে তোমরা অধিক শুনতে পাচ্ছ না। কাতাদাহ রা. বলেন, আল্লাহর রাসুল (ﷺ)-এর কথার মাধ্যমে তাদেরকে ধমক, লাঞ্ছনা, দুঃখ-কষ্ট, আফসোস এবং লজ্জা দেওয়ার জন্য (সাময়িকভাবে) তাদের দেহে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন।"[১০২০]

এই তিন আয়াত ও দুই হাদিস থেকে এটা বুঝা গেল, মৃতরা শুনে না।

২. দ্বিতীয় মত হলো, মৃতব্যক্তি শুনে।

যারা বলে মৃতব্যক্তি শুনে। তাদের দলিল হলো, হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ فَقَالَ: وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، فَقِيلَ لَهُ: تَدْعُو أَمْوَاتًا، فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ.

"হজরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ গর্তবাসীদের (যে কূপে বদরের যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের নিক্ষেপ করা হয়েছিল) দিকে ঝুঁকে দেখে বললেন, তোমাদের সঙ্গে রব যে ওয়াদা করেছিলেন, তা তোমরা বাস্তবে পেয়েছ তো? তখন তাকে বলা হলো, আপনি মৃতদের ডেকে কথা বলছেন? (ওরা কি শুনতে পায়?) নবিজি ﷺ তখন বললেন, তোমরা তাদের চেয়ে অধিক শুনতে পাও না, তবে তারা জবাব দিতে পারছে না।"[১০২১]

এই হাদিসের ভাষ্যমতে মৃতরা শুনতে পায়।

১০২০. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৯৭৬

১০২১. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১৩৭০

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُوُلِّيَ، وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ.

"হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তাকে পেছনে রেখে তার সাথিরা চলে যায় (এতটুকু দূরে যে,) তখনো সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়, এমন সময় তার নিকট দুজন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে দেন। তারপর তাঁরা প্রশ্ন করেন, এই যে মুহাম্মাদ (ﷺ)! তাঁর সম্পর্কে তুমি কী বলতে? তখন সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুল।"[১০২২]

এই হাদিসে এসেছে, মৃতব্যক্তি তার সাথিদের জুতার শব্দ শুনতে পায়।

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّ عَلي عِنْدَ قَبْرِيْ وُ كَّلَ بِهِمَا مَلَكٌ يَبْلغُنِيْ وَ كُفِى بِهِمَا أَمْرِ دُنْيَاهُ وَ آخِرَتَهُ وَ كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا أَوْ شَفِيْعًا هَذَا اللَّفْظ حَدِيْثِ الْأَصْمَعِيْ وَ فِيْ رِوَايَةِ الْحَنَفِيِّ قَالَ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ سَمِعْتُهُ وَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أَبْلَغْتُهُ

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট এসে দরুদ প্রেরণ করে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন। যে আমার নিকট তার দরুদ পৌছে দেয়। তার জন্য দুনিয়ার ও আখিরাতের কল্যাণ যথেষ্ট হয়ে যায় এবং আমি তার জন্য সাক্ষী হব অথবা সুপারিশকারী হব। হাদিসের এই বাক্যটি হজরত আসমায়ি রহ. থেকে বর্ণিত। আর হজরত হানাফির বর্ণনায় এসেছে—নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, কেউ যদি আমার কবরের নিকট এসে দরুদ প্রেরণ করে, তাহলে তা আমি নিজে শুনি। আর কেউ যদি দূর থেকে দরুদ প্রেরণ করে, তাহলে তা আমার নিকট পৌছানো হয়।"[১০২৩]

[১০২২]. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৩৩৮

[১০২৩]. *শুআবুল ঈমান*, বায়হাকি, ২/২১৮ হাদিস নং ১৫৮৩। হাদিসটি যইফ। তবে এর অনেক শাহেদ আছে যার ফলে অনেক ইমামগণ এর সনদকে জায়্যিদ বলেছেন। (*মাজমুউল ফাতাওয়া*, ৩৭/১১৬; *আজবিবাতুল মারদ্বিয়াহ*, সাখাবি ৩/৯২৯; *ফাতহুল বারি*, ৬/৩৭৯)

এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—কেউ যদি আমার কবরের নিকট এসে দরুদ প্রেরণ করে, তাহলে তা আমি নিজে শুনি।

আমি মাকতাবায়ে শামেলায় অনেক খুঁজেছি। কোনো কিতাবে عِنْدَ قَبْرِيْ سَمِعْتُهُ বাক্যটি পাইনি। অনেক মুহাদ্দিসগণ এটাকে যইফ বলেছেন।[১০২৪]

৩. তৃতীয় মত হলো, সকল কথা শুনে না। তবে হ্যাঁ! আল্লাহ তাআলা যে কথা শুনাতে চান তা শুনেন।

যারা বলে মৃতব্যক্তি সকল কথা শুনে না। তবে হ্যাঁ! আল্লাহ তাআলা যে কথা শুনাতে চান তা শুনেন। তাদের দলিল হলো পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾

"আর জীবিতরা ও মৃতরা এক নয়; নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনাতে পারেন, কিন্তু যে ব্যক্তি কবরে আছে তাকে তুমি শুনাতে পারবে না।"[১০২৫]

এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, যারা কবরে রয়েছে, আল্লাহ তাআলা চাইলে তাদেরকে শুনাতে পারেন। নবিজি ﷺ-কে বলেছেন আপনি তাদেরকে শুনাতে পারবেন না। এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ، قَالَ: يَقُولُونَ: بَلِيتَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.

"হজরত আউস ইবনে আউস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের সর্বোত্তম দিন হলো জুমার দিন। সুতরাং এই দিন তোমরা আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ করবে। কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পেশ করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের দরুদ আপনার নিকট কীভাবে পেশ করা হবে অথচ আপনি তো মাটির সঙ্গে মিশে যাবেন? বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনি তো নিশ্চিহ্ন হয়ে

[১০২৪]. এই বাক্যে বিভিন্ন গ্রন্থেই হাদিসটি বিদ্যমান রয়েছে।

[১০২৫]. সুরা ফাতির, ৩৫: ২২

যাবেন। নবিজি ﷺ বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নবিদের দেহকে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।"[১০২৬]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না (অর্থাৎ তাতে সালাত, তিলাওয়াত ও জিকির-আজকার না করা) এবং আমার কবরকে ঈদ তথা উৎসবের স্থানে পরিণত করো না। তোমরা আমার ওপর দরুদ পাঠ করো। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছানো হবে।"[১০২৭]

এই হাদিসসমূহ থেকে বুঝা যায়, নবিজি ﷺ সরাসরি শুনেন না। বরং তাঁকে শুনানো হয় এবং তার নিকট দরুদ পৌঁছানো হয়।

এক উস্তাদের অভিমত

আমার এক সম্মানিত উস্তাদ বলতেন, উভয় হাদিস ও আয়াতসমূহকে মিলালে বুঝা যায় যে, মৃতরা নিজেরা তো শুনে না, তবে হ্যাঁ! আল্লাহ তাআলা যা শুনাতে চান তা শুনিয়ে দেওয়া হয়। এটাই নিরাপদ পদ্ধতি এবং উভয় প্রকার আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
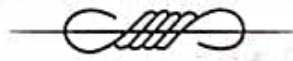
[১০২৬]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ১৫৩১; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১০৮৫। ১৬৬ নং টীকা (পৃ.) দ্রষ্টব্য।
[১০২৭]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২০৪২; *মুসনাদে আহমাদ*, ৮৭৯০ হাদিসটির সনদ 'সহিহ লি গাইরিহি।

কিয়ামতের প্রধান নিদর্শনসমূহ

এ আকিদা সম্পর্কে ৩টি আয়াত এবং ১৬টি হাদিস রয়েছে। আসুন এগুলোর বিস্তারিত পাঠ করি।

কিয়ামতের নিদর্শন অসংখ্য। তার মধ্যে প্রধান নিদর্শন হলো :

১. ধোঁয়া।

২. দাজ্জালের আগমন ঘটবে।

৩. পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় হবে।

৪. হজরত ঈসা আ. আকাশ থেকে জমিনে অবতরণ করবে।

৫. ইয়াজুজ-মাজুজ নামক এক প্রকার প্রাণী বের হবে। যারা গোটা পৃথিবীকে তছনছ করে দেবে।

৬. তিনটি স্থানে ভূমিধস হবে। পাশ্চাত্যে একটি, প্রাচ্যে একটি, আরব উপদ্বীপে একটি।

৭. ইয়ামানের আদান নামক স্থানের নিচু ভূমি হতে আগুন বের হবে, যা মানুষকে হাশরের (সিরিয়ার) দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

৮. কিয়ামতের আরও কিছু নিদর্শন।

আমরা কিয়ামতের উক্ত নিদর্শনসমূহের ওপর ঈমান রাখি

আমরা কিয়ামতের উক্ত নিদর্শনসমূহের ওপর ঈমান রাখি। কেননা এর প্রমাণ পবিত্র কুরআনুল কারিমে ও হাদিস শরিফে রয়েছে। যেমন উপর্যুক্ত নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا نَتَحَدَّثُ فِي ظِلِّ غُرْفَةٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرْنَا السَّاعَةَ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَنْ تَكُونَ أَوْ لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهَا عَشْرُ آيَاتٍ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَالدَّجَّالُ وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَالدُّخَانُ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ: خَسْفٌ

بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ.

"হজরত হুজাইফা ইবনে আসিদ আল-গিফারি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবিজি ﷺ-এর ঘরের ছায়ায় বসে কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আমাদের আওয়াজ উচ্চকিত হলে রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন, ১০টি নিদর্শন প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কখনো কিয়ামত হবে না। সেগুলো হলো, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, 'দাব্বাতুল আরদ' নামক জন্তুর আবির্ভাব, ইয়াজুজ-মাজুজ, দাজ্জাল ও ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. ও ধোঁয়ার প্রকাশ, আর তিনটি ভূমিধস : পাশ্চাত্যে একটি, প্রাচ্যে একটি, আরব উপদ্বীপে একটি। এগুলোর পরেই ইয়ামানের আদান নামক স্থানের নিচু ভূমি হতে আগুন বের হবে, যা মানুষকে হাশরের (সিরিয়ার) দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।"[১০২৮]

কিয়ামতের পূর্বে বড় বড় এই ১০টি নিদর্শন প্রকাশ পাবে।

হজরত ঈসা আ. দ্বিতীয়বার জমিনে অবতরণ করবেন

কেউ কেউ বলেন, হজরত ঈসা আ. দ্বিতীয়বার আসবেন না। এ কথাটি সঠিক নয়। কেননা পরিপূর্ণ সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ঈসা আ.-কে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি দ্বিতীয়বার জমিনে অবতরণ করবেন এবং নবিজি ﷺ-এর শরিয়ত অনুযায়ী শরিয়ত বাস্তবায়ন করবেন। তখন তাঁর শরিয়ত হবে না। হজরত ঈসা আ. নবিজি ﷺ-এর উম্মত হয়ে আসবেন। কেননা নবিজি ﷺ খাতামুন নাবিয়্যিন তথা সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি আসবেন না। সুতরাং সে-ই বর্তমানে নবি দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী।

কেউ কেউ এটাও দাবি করেছে—আমিই ঈসা আ.। কিন্তু এই দাবি সম্পূর্ণ ভুল। কেননা হজরত ঈসা আ. একেবারে শেষ সময়ে আসবেন এবং নিজ হাতে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। আর যারা দাবি করেছে, তারা কেউ কখনো দাজ্জালকে না দেখেছে, না হত্যা করেছে। এজন্য তাদের এই দাবি মিথ্যা। হজরত ঈসা আ. অবতরণের দলিল হলো পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

[১০২৮]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৯০১; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৩১১

﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾

"আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাঁর কাছে তাকে তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। কিতাবিদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবে না[১০২৯] এবং কিয়ামতের দিনে সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।"[১০৩০]

তাফসিরে ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী এই আয়াতে হজরত ঈসা আ. দ্বিতীয়বার জমিনে অবতরণ করা ও সকল আহলে কিতাবগণ তাঁর ওপর ঈমান আনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ... فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّهُمْ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন... যখন মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হতে শুরু করামাত্র সালাতের সময় হবে। তারপর হজরত ঈসা আ. অবতরণ করবেন এবং সালাতে তাদের ইমামত করবেন। আল্লাহর শত্রু তাকে দেখামাত্রই বিচলিত হয়ে যাবে যেমন লবণ পানিতে মিশে যায়। যদি ঈসা আ. তাকে এমনিই ছেড়ে দেন তবে সেও নিজে নিজেই বিগলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহ তাআলা ঈসা আ.-এর হাতে তাকে হত্যা করবেন এবং তার রক্ত ঈসা আ.-এর বর্শাতে তিনি তাদেরকে দেখিয়ে দেবেন।"[১০৩১]

[১০২৯]. কিয়ামতের পূর্বে হজরত ঈসা আ. যখন অবতরণ করবেন, তখন সে যুগের ইহুদি-খ্রিষ্টানরা পুরো বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং সকলেই মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে; কিন্তু ফিরাউনের মতো তাদের ঈমানও তখন কোনো কাজে আসবে না।

[১০৩০]. সুরা নিসা, ৪: ১৫৭-১৫৯

[১০৩১]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৮৯৭

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ، حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। শীঘ্রই তোমাদের মাঝে ঈসা ইবনে মারইয়াম আ.-কে একজন ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক হিসেবে অবতীর্ণ করা হবে। তখন তিনি ক্রুশ (চিহ্ন) ধ্বংস করবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিজিয়া কর রহিত করবেন। তখন সম্পদ এত বেশি হবে যে তা গ্রহণ করার কেউ থাকবে না।"[১০৩২]

অপর বর্ণনায় ইরশাদ হয়েছে—

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন—তোমাদের জীবন কতই-না ধন্য হবে, যখন ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন এবং তোমাদেরই একজন তোমাদের ইমাম হবেন।"[১০৩৩]

অপর বর্ণনায় ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ...قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: تَدْرِي مَا أَمَّكُمْ مِنْكُمْ؟ قُلْتُ: تُخْبِرُنِي، قَالَ: فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ ﷺ.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত... ইবনে আবু যিব বলেছেন, أَمَّكُمْ مِنْكُمْ؟ তথা 'তোমাদের থেকেই তোমাদের ইমাম হবে' কথাটির মর্ম জানো কি? আমি বললাম, বলুন। তিনি বললেন, অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত কিতাব ও তোমাদের নবি ﷺ-এর অনুসৃত আদর্শের অবলম্বনে তিনি তোমাদের নেতৃত্ব প্রদান করবেন।"[১০৩৪]

[১০৩২]. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৫৫

[১০৩৩]. প্রাগুক্ত

[১০৩৪]. প্রাগুক্ত

এই হাদিসসমূহ থেকে বুঝা গেল, হজরত ঈসা আ. দ্বিতীয়বার জমিনে অবতরণ করবেন এবং তিনি নবিজি ﷺ-এর শরিয়তের অনুসারী হবেন এবং উম্মত হয়েই আসবেন।

হজরত ইমাম মাহদি আ.-এর আগমন

এটাও কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম একটি।

হজরত মাহদি আ.-এর নাম হবে নবিজি ﷺ-এর নামে মুহাম্মাদ এবং পিতার নামও নবিজি ﷺ-এর পিতার নামেই হবে আবদুল্লাহ। তিনি হজরত ফাতিমা রা.-এর পুত্র হজরত হাসান রা.-এর বংশধর হবেন।

কিয়ামতের পূর্বে মানুষ তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করবে এবং তিনি হবেন শেষ খলিফা। তিনি সালাত পড়ানো অবস্থায় হজরত ঈসা আ. আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং তাঁর ইমামতিতে সালাত আদায় করবেন। তারপর এরা দুজনে মিলে দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে এবং হজরত ঈসা আ. দাজ্জালকে হত্যা করবে। এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ... وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.

"নবিজি ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, জনৈক খলিফার মৃত্যুকালে মতনৈক্য সৃষ্টি হবে। এ সময় মদিনাবাসী জনৈক ব্যক্তি পালিয়ে মক্কায় চলে যাবে। মক্কাবাসীরা তার নিকট এসে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে আসবে এবং তারা রুকন ও মাকামে ইবরাহিমের মাঝখানে তার হাতে বাইআত প্রদান করবে... তখন ইসলাম গোটা পৃথিবীতে প্রসারিত হবে। তারপর তিনি সাত বছর অবস্থান করার পর মারা যাবেন। আর মুসলিমরা তার জানাজার সালাত পড়বে।"[১০৩৫]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي.

[১০৩৫]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪২৮৬। সনদ যইফ।

"হজরত আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, আমার পরিবারের একজন আরবের অধিপতি না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবী ধ্বংস হবে না। আমার নামের অনুরূপই তার নাম হবে।"[১০৩৬]

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَشِينَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نَبِيِّنَا حَدَثٌ، فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيَّ يَخْرُجُ يَعِيشُ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ تِسْعًا... قَالَ: فَيَجِيءُ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَيَقُولُ: يَا مَهْدِيُّ، أَعْطِنِي أَعْطِنِي، قَالَ: فَيَحْثِي لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْمِلَهُ.

"হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা ভয় পাচ্ছিলাম যে, আমাদের রাসুল ﷺ-এর পরে নতুন কোন দুর্ঘটনা ঘটবে। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে রাসুল ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মাঝে মাহদির আগমন ঘটবে, সে পাঁচ অথবা সাত অথবা নয় বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকবে... মানুষ তার নিকট এসে বলবে, হে মাহদি! আমাকে কিছু দান করুন, আমাকে কিছু দান করুন। রাসুল ﷺ বলেন, তারপর সে তার কাপড় বা থলেতে যেটুকু পরিমাণ বহন করে নিতে পারবে তিনি তাকে সেটুকু পরিমাণ দান করবেন। অর্থাৎ সম্পদ এ পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যে, হজরত মাহদি মানুষকে প্রচুর পরিমাণে দান করবেন।"[১০৩৭]

এ সকল হাদিস থেকে বুঝা যায়, হজরত মাহদি কিয়ামতের পূর্বে আসবেন। তিনি খলিফা হবেন। তার যুগে মুসলিমদের অনেক বিজয় হবে এবং সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পাবে।

দাজ্জালের বর্ণনা

দাজ্জাল মানুষই হবে কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে এত শক্তি দান করবেন যে, সে মানুষকে গোমরাহ বা বিভ্রান্ত করতে পারবে।

দাজ্জাল আসবে। দাজ্জাল হবে কাফির। সে তার কুফরির দিকে মানুষকে আহ্বান করবে। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

[১০৩৬]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিসস নং ২২৩০। সনদ হাসান।
[১০৩৭]. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২২৩২

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَّالِ ... فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ، هَلْ تَشُكُّونَ فِي الْأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لَا، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يُحْيِيهِ، فَيَقُولُ: حِينَ يُحْيِيهِ، وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَقْتُلُهُ، فَلَا أُسَلَّطُ عَلَيْهِ.

"হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ আমাদের সামনে দাজ্জাল সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেছেন... দাজ্জাল বলবে, আমি যদি একে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করতে পারি তাহলেও কি তোমরা আমার ব্যাপারে সন্দেহ করবে? তারা বলবে, না। এরপর দাজ্জাল লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে। জীবিত হয়েই লোকটি বলবে, আল্লাহর শপথ! আজকের চেয়ে অধিক প্রত্যয় আমার আর কখনো ছিল না। তারপর দাজ্জাল বলবে, আমি তাকে হত্যা করে ফেলব। কিন্তু সে লোকটিকে আর হত্যা করতে সক্ষম হবে না।"[১০৩৮]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ লোক সমাবেশে দাঁড়ালেন এবং মহান আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর তিনি দাজ্জাল প্রসঙ্গে বললেন, তার সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করছি। এমন কোনো নবি নেই যিনি তাঁর সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে সতর্ক করেননি। তবে তার সম্পর্কে আমি তোমাদের এমন একটি কথা বলব যা কোনো নবিই তাঁর সম্প্রদায়কে বলেননি। তা হলো এই যে, সে কানা হবে আর আল্লাহ অবশ্যই কানা নন।"[১০৩৯]

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ فِي الدَّجَّالِ: إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا، فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ، وَمَاؤُهُ نَارٌ.

১০৩৮. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১৮৮২

১০৩৯. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৭১২৭; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৭৫৭; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২২৩৫

"হজরত হুজাইফা রা. নবিজি ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছেন, তার সঙ্গে পানি ও আগুন থাকবে। আসলে তার গুণই হবে শীতল পানি, আর তার পানি হবে আগুন।"[১০৪০]

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: يَسْتَعِيْذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

"হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুল ﷺ-কে সালাতের ভেতরে দাজ্জালের ফিতনা হতে পানাহার চাইতে শুনেছি।"[১০৪১]

দাজ্জালের ফিতনা অনেক বড় এক ফিতনা। এ ফিতনা থেকে পানাহ চাওয়া উচিত। এটাও কিয়ামতের বড় নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন।

ইয়াজুজ-মাজুজ বের হবে

ইয়াজুজ-মাজুজ অনেক বড় একটি জাতি। যারা কিয়ামতের পূর্বে বের হবে এবং গোটা পৃথিবীতে অনেক বড় তাণ্ডব চালাবে। নবিজি ﷺ-এর সংবাদ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾

"অবশেষে যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্তি দেওয়া হবে, আর তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে। আর সত্য ওয়ায়ার (কিয়ামতের) সময় নিকটে।"[১০৪২]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ، وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا.

"হজরত জয়নাব বিনতে জাহাশ রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ একবার ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় বলছিলেন, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ আরবের লোকদের জন্য সেই অনিষ্টের কারণে ধ্বংস অনিবার্য যা নিকটবর্তী হয়েছে।

[১০৪০]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৭১৩০
[১০৪১]. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৭১২৯
[১০৪২]. সুরা আম্বিয়া, ২১: ৯৬-৯৭

আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে গেছে। এ কথা বলার সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগকে তার সঙ্গের শাহাদাত অঙ্গুলির অগ্রভাগের সঙ্গে মিলিয়ে গোলাকার করে ছিদ্রের পরিমাণ দেখান।"[১০৪৩]

এই আয়াত ও হাদিস থেকে বুঝা যায়, ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্ত করা হবে।

পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়

কিয়ামতের পূর্বে সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে। এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا، فَذَاكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا، لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। লোকেরা যখন তা দেখবে, তখন পৃথিবীর সকলে ঈমান আনবে এবং সেটি চচ্ছে এমন সময় যে-সময় সম্পর্কে সুরা আনআমের ১৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে—পূর্বে ঈমান আনেনি এমন ব্যক্তির ঈমান তার কাজে আসবে না।"[১০৪৪]

আশ্চর্য রকম এক প্রকার জন্তু বের হবে

কিয়ামতের পূর্বে আশ্চর্য রকম এক প্রকার জন্তু বের হবে, যা মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। আর সে সময় তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾

"আর যখন তাদের ওপর বাণী (আজাব) বাস্তবায়িত হবে তখন আমি জমিনের জন্তু (দাব্বাতুল আরদ) বের করব, যে তাদের সঙ্গে কথা বলবে। কারণ মানুষ আমার আয়াতসমূহে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখত না।"[১০৪৫]

[১০৪৩]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৩৪৬; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৮৮০; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪২৪৯; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২১৮৭; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৩৯৫৩; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৯০৭৩

[১০৪৪]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪৬৩৫; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৫৭; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৩১২; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৪০৬৮; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৭১৬১

[১০৪৫]. নামল- ২৭: ৮২

কিয়ামতের আরও কিছু নিদর্শন

কিয়ামতের পূর্বে জিনা-ব্যভিচার ব্যাপক হবে। গান-বাজনা ব্যাপক হবে। মাদকের ছড়াছড়ি হবে। দ্বীন সম্পর্কে মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে। পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক হবে গোলাম ও মনিবের মতো অর্থাৎ পরস্পর কোনো মায়া-মহব্বত থাকবে না এবং সন্তান পিতা-মাতাকে কোনো প্রকার সম্মান করবে না এবং সমাজের নিম্ন শ্রেণির লোকেরা উঁচু উঁচু অট্টালিকা বানাবে। যেমন হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ... وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ.

"হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন... তবে আমি আপনাকে কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ বলে দিচ্ছি, বাঁদি যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে এবং উটের নগণ্য রাখালেরা বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে।"[১০৪৬]

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ... إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَفْشُوَ الزِّنَا، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ، وَيَبْقَى النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ.

"হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ... কিয়ামতের কতক নিদর্শন এই যে, ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অজ্ঞতার বিস্তার ঘটবে, জিনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, মদপান করা হবে, পুরুষ লোকের অধিক হারে মৃত্যু হবে, অধিক হারে নারীরা বেঁচে থাকবে, এমনকি ৫০ জন নারীর রক্ষণাবেক্ষণকারী হবে একজনমাত্র পুরুষ।"[১০৪৭]

।। সমাপ্ত ।।

[১০৪৬]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৫০

[১০৪৭]. *সহিহ বুখারি*, ৫২৮৬; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৪০৪৫

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ؛ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ؛ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

আলহামদুলিল্লাহ! আজ গ্রন্থটি সমাপ্ত হলো। যা আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ।

অধম সামীরুদ্দীন কাসেমী গুফিরালাহু
70 Stampord Street, Old trafford
Manchester, England- M16 9LL
Email: samiruddinqasmi@gmail.com
website: samiruddinbooks.co.uk

এ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য

- অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় লেখা।
- বর্তমান সময়ের প্রয়োজনীয় আকিদা নিয়ে রচিত।
- প্রতিটি আকিদার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট আয়াত ও সহিহ হাদিসের সমাবেশ।
- সম্ভাব্য সকল মতাদর্শের লোকদের আকিদার আলোচনা।
- সম্মানিত খতিবদের জন্য এই গ্রন্থটি থেকে খুব সহজে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আয়াত ও হাদিস সংগ্রহ করে বয়ান করার সুবিধা।
- অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী একটি রচনা। যা সকল মতাদর্শের লোকদের জন্যই উপকারী।
- প্রতিটি আকিদার ক্ষেত্রে কয়টি আয়াত ও কয়টি হাদিস অধ্যায়ের শুরুতেই তা উল্লেখ করে দেওয়া এবং প্রতিটি আয়াত ও হাদিসের তথ্যসূত্র উল্লেখ করা।
- গ্রন্থটিতে প্রয়োজনীয় ছোট-বড় প্রায় ৩৫০টি আকিদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর উক্ত আকিদাসমূহ প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রতিটি আকিদার জন্য ৩টি করে আয়াত ও ৩টি করে হাদিস; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারও অধিক আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় স্থানে কিছুটা কম-বেশি করা হয়েছে।
- বর্ণিত আকিদাসমূহ প্রমাণের ক্ষেত্রে সর্বমোট ৫৬৩টি আয়াত এবং ৩৭৩টি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বমোট বিষয়বস্তু হলো ৪৬৫টি। আর মৌলিক আকিদা হলো ৪৪টি।